তাফসীর
ইব্নে
কাসীর
পঞ্চদশ খন্ড
মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

পঞ্চদশ খণ্ড

সূরাঃ মুমিনূন, নূর, ফুরকান, শু'আরা, নামল, কাসাস, আনকাবূত, রূম, লোকমান, সাজদাহ ও আহযাব

মূলঃ
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)

অনুবাদঃ
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২

৪র্থ সংস্করণ ঃ
ফেব্রুয়ারী-২০০৪ ইং
জিলহাজ্ব-১৪২৪ হিঃ
ফাল্গুন - ১৪১০ বাং

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল ইবতিকার
১০৫, ফকিরাপুল
মালেক মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪৮৭৩৬

মুদ্রণ ঃ
আব্দুল্লাহ্ এন্টারপ্রাইজ
৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ
(৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪
মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২
০১৭১-০৫৫৬৪০

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৫০.০০

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। **ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান**
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২

২। **মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ**
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা।
টেলি ঃ ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭

৩। **মোঃ নূরুল আলম**
বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২
সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৯১৪৯৮৩

৪। **ইউসুফ ইয়াছিন**
৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ
(৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪
মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২
০১৭১-০৫৫৬৪০

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। —আমীন!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১৫ নম্বর খণ্ডের প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় ১৫ নম্বর খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

মুদ্রণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন 'আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ' এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাবগাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও অবিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল-পঠিত সর্ব সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি? তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনূদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা। জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন জনাব নূরুল আলম ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩ ও ১৪ নং খণ্ড প্রকাশ করে। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১৫ নম্বর খণ্ড সূরা ভিত্তিক প্রকাশ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য।

এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং-এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততির আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

বর্তমানে
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমিণ্ড হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮
যুক্তরাষ্ট্র

বিনয়াবনত
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

সূরা ঃ মু'মিনূন, মাক্কী
(আয়াত ঃ ১১৮, রুকু ঃ ৬)

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ١١٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

١- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ

১। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।

٢- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

২। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে।

٣- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ

৩। যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে।

٤- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

৪। যারা যাকাত দানে সক্রিয়।

٥- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

৫। যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।

٦- اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

৬। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

٧- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

৭। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ

৮। এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ

৯। আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে।

১০। তারাই হবে অধিকারী।

١٠- أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝

১১। অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে।

١١- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হতো তখন তাঁর মুখের কাছে মৌমাছির গুন্‌গুন্‌ শব্দের মত শব্দ শোনা যেতো। একদা তাঁর উপর এ অবস্থাই ঘটে। অল্পক্ষণ পরে যখন অহী অবতীর্ণ হওয়ার কাজ শেষ হয় তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ নিম্নের দু'আটি পাঠ করেনঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশী করে দিন, কম করবেন না। আমাদেরকে সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করবেন না। আমাদেরকে প্রদান করুন, বঞ্চিত করবেন না। অন্যদের উপর আমাদেরকে পছন্দ করে নিন, আমাদের উপর অন্যদেরকে পছন্দ করবেন না। আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন।" তারপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হতে দশটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন।[১]

হযরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেনঃ "কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র।" অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হতে وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র এরূপই ছিল।"[২]

হযরত কা'ব আল আহবার (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদন সৃষ্টি করেন এবং ওর মধ্যে (গাছপালা ইত্যাদি) স্বহস্তে রোপণ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে মুনকার বলেছেন। কেননা এর বর্ণনাকারী শুধু ইউনুস ইবনে সুলায়েম রয়েছেন, যিনি মুহাদ্দিসদের নিকট পরিচিত নন।

২. এটা নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করেন তখন ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ওকে বলেনঃ "কিছু কথা বলো।" ঐ জান্নাতে আদন তখন قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ-এই আয়াতগুলো পাঠ করে। যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে অবতীর্ণ করেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ জান্নাত সৃষ্টি করেন যার এক ইট সোনার ও এক ইট রূপার তৈরী। তাতে তিনি গাছ রোপণ করেন। অতঃপর তিনি জান্নাতকে বলেনঃ "কথা বলো।" জান্নাত তখন قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ বলে। তাতে ফেরেশতারা প্রবেশ করে বলেনঃ "বাঃ! বাঃ! এটা তো বাদশাহদের জায়গা।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ওর গারা ছিল মৃগনাভির। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাতে এমন এমন জিনিস রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি এবং কোন অন্তর কল্পনা করেনি।

আরেকটি বর্ণনায় আছে যে, জান্নাত যখন এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ "আমার বুযর্গী ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কৃপণ কখনো প্রবেশ করতে পারে না।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে আদন সৃষ্টি করেন যার একটি ইট সাদা মুক্তার, একটি ইট লাল পদ্মরাগের এবং একটি ইট সবুজ পান্নার। আর ওর গারা (গাঁথুনির চুন-সুরকি) মৃগনাভির এবং ওর ঘাস হলো যাফরান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ওকে বলেনঃ "তুমি কথা বলো।" জান্নাত তখন "قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ" বলে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওকে বলেনঃ "আমার বুযর্গী ও মর্যাদার শপথ! তোমার মধ্যে কৃপণ প্রবেশ করতে পারবে না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিম্নের আয়াতাংশটুকু পাঠ করেনঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ "যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।"[২] (৫৯ঃ ৯)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে), অর্থাৎ তারা ভাগ্যবান হয়েছে এবং পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। এই মুমিনদের বিশেষণ এই যে, তারা নামাযের অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী হয়। মন তাদের আল্লাহর দিকেই থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে এবং বাহুদ্বয় থাকে ঝুঁকানো অবস্থায়।

---

১. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁদের দৃষ্টিগুলো নামাযের অবস্থায় আকাশের দিকে উঠিয়ে রাখতেন। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁদের দৃষ্টি নীচের দিকে হয়ে যায়। সিজদার স্থান হতে তাঁরা নিজেদের দৃষ্টি সরাতেন না। যদি কারো অভ্যাস এর বিপরীত হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার উচিত তার দৃষ্টি নীচের দিকে করে নেয়া। একটি হাদীসে রয়েছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহও (সঃ) এরূপ করতেন।[১]

সুতরাং এই বিনয় ও নম্রতা ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যার অন্তঃকরণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ হয়, নামাযে পুরোপুরিভাবে মনোযোগ থাকে এবং সমস্ত কাজ অপেক্ষা নামাযে বেশী মন বসে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমার কাছে সুগন্ধি ও স্ত্রীলোক খুবই পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হলো নামায।"[২]

ইসলাম গ্রহণকারী এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে বেলাল (রাঃ)! নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দান কর।"[৩]

বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) নামাযের সময় স্বীয় দাসীকে বলেনঃ "অযুর পানি নিয়ে এসো, যাতে আমি নামায পড়ে শান্তি লাভ করতে পারি।" তিনি দেখলেন যে, উপস্থিত জনগণ তাঁর একথা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- "হে বেলাল (রাঃ)! ওঠো, নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও।"[৪]

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ মুমিনরা বাতিল, শিরক, পাপ এবং বাজে ও নিরর্থক কথা হতে দূরে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا -

অর্থাৎ "এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।" (২৫ ঃ ৭২)

১. এ হাদীসটি মুরসাল।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ যারা যাকাত দানে সক্রিয়। অর্থাৎ মুমিনদের আর একটি বিশেষণ এই যে, তারা তাদের মালের যাকাত আদায় করে থাকে। অধিকাংশ তাফসীরকার এটাই অর্থ করেছেন। কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, এটা তো মক্কী আয়াত, অথচ যাকাত তো ফরয হয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। সুতরাং মক্কী আয়াতে যাকাতের বর্ণনা কেমন? এর উত্তর এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়েছিল, তবে ওর নিসাবের পরিমাণ কত ইত্যাদি সমস্ত হুকুম মদীনায় নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন দেখা যায় যে, সূরায়ে আনআমও তো মক্কী সূরা, অথচ ওর মধ্যেও যাকাতের এই হুকুমই বিদ্যমান রয়েছে। ঘোষিত হয়েছে- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ অর্থাৎ "ফসল কাটার দিনই ওর যাকাত আদায় কর।" (৬ঃ ১৪১) আবার অর্থ এও হতে পারেঃ নফসকে তারা শিরক এবং কুফরীর ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰـىهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰـىهَا ـ

অর্থাৎ "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (৯১ ঃ ৯-১০) নিম্নের আয়াতেও একটি উক্তি এই রয়েছেঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ـ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ "দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্যে যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে না।" (৪১ ঃ ৬-৭) আবার এও হতে পারে যে, নফসেরও যাকাত, মালেরও যাকাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

অতঃপর মুমিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। অর্থাৎ যারা ব্যভিচার, লাওয়াতাত ইত্যাদি দুষ্কর্ম হতে বেঁচে থাকে। তবে যে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে বৈধ করেছেন এবং জিহাদে যেসব দাসী লাভ করা হয়েছে, যা মহান আল্লাহ তাদের জন্যে হালাল করেছেন, তাদের সাথে মিলনে কোন দোষ নেই।

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছেঃ যারা এদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে কামনা করে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক তার গোলামকে গ্রহণ করে (অর্থাৎ গোলামের সাথে সহবাস করে) এবং দলীল হিসেবে এই

আয়াতটিই পেশ করে। হযরত উমার (রাঃ) এটা জানতে পেরে সাহাবীদের (রাঃ) সামনে এটা পেশ করেন। সাহাবীগণ বলেনঃ "সে এ আয়াতের অর্থ ভুল বুঝেছে।" তখন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) গোলামটিকে প্রহার করেন এবং তার মাথা মুণ্ডন করেন। আর ঐ স্ত্রীলোকটিকে তিনি বলেনঃ "এরপরে তুমি প্রত্যেক মুসলমানের উপর হারাম।"[১]

ইমাম শাফিয়ী (রঃ) এবং তাঁর অনুসরণকারীরা এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, স্বীয় হস্ত দ্বারা স্বীয় বিশেষ পানি (শুক্র বা বীর্য) বের করা হারাম। কেননা, এটাও উক্ত দু'টি হালাল পন্থার বাইরের ব্যবস্থা। সুতরাং হস্তমৈথুনকারী ব্যক্তি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম হাসান ইবনে আরাফা (রঃ) তাঁর বিখ্যাত জু'যএ একটি হাদীস আনয়ন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাত প্রকারের লোক রয়েছে যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে (পাপ হতে) পবিত্র করবেন না, আমলকারীদের সাথে তাদেরকে একত্রিত করবেন না এবং সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তাদের জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবেন, তবে যদি তারা তাওবা করে তবে সেটা অন্য কথা।

তারা হলো স্বীয় হস্তের মাধ্যমে বিবাহকারী অর্থাৎ হস্তমৈথুনকারী, সমমৈথুনকারী, সমমৈথুনকৃত, মদ্যপানকারী, পিতামাতাকে প্রহারকারী, যার ফলে পিতামাতা চীৎকার শুরু করে দেয়, প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা, যার ফলে সে তার উপর লা'নত করে এবং প্রতিবেশিনীর সাথে ব্যভিচারকারী।"[২]

মুমিনদের আরো গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। তারা আমানতে খিয়ানত করে না; বরং আমানত আদায়ের ব্যাপারে তারা অগ্রগামী হয়। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এর বিপরীত স্বভাব হলো মুনাফিকের। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"

১. এ 'আসার'টি মুনাকাতা' এবং গারীব বা দুর্বলও বটে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা সূরায়ে মায়েদার তাফসীরের শুরুতে আনয়ন করেছেন। কিন্তু এখানে আনয়ন করাই উচিত ছিল। ঐ স্ত্রীলোকটিকে সাধারণ মুসলমানদের উপর হারাম করার কারণ হলো তার ইচ্ছার বিপরীত তার সাথে মুআমালা করা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২. এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ মুমিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের নামাযে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ তারা নামাযের সময়ের হিফাযত করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "নামাযকে সময়মত আদায় করা।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন আমল? তিনি জবাব দিলেনঃ "পিতা-মাতার খিদমত করা।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"[১]

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সময় দ্বারা রুকু, সিজদা ইত্যাদির হিফাযত উদ্দেশ্য। দেখা যায় যে, প্রথমে একবার নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং শেষেও আবার বর্ণিত হলো। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সবচেয়ে বেশী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"তোমরা সোজা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আর তোমরা কখনো (আল্লাহর নিয়ামতরাশি) গণনা করে শেষ করতে পারবে না এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো নামায। আর অযুর হিফাযত শুধু মুমিনই করতে পারে।"

মুমিনদের এই প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করলে ফিরদাউসের জন্যে প্রার্থনা করো। ওটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও মধ্যস্থলে অবস্থিত জান্নাত। সেখান হতেই জান্নাতের সমস্ত নহর প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওরই উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ।"[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি মনযিল রয়েছে। একটি মনযিল জান্নাতে এবং একটি মনযিল জাহান্নামে। যদি কেউ মারা যায় ও জাহান্নামে প্রবেশ করে তবে তার (জান্নাতের) মনযিলের উত্তরাধিকারী হয় আহলে জান্নাত। 'তারাই হবে উত্তরাধিকারী' আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বান্দারই দু'টি বাসস্থান রয়েছে, একটি জান্নাতে ও একটি জাহান্নামে। মুমিন তার জান্নাতের ঘরটিকে সজ্জিত করে এবং জাহান্নামের ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলে। পক্ষান্তরে কাফিররা জাহান্নামের ঘরটিকে সজ্জিত করে এবং জান্নাতের ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলে। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুমিনদেরকে কাফিরদের মনযিলগুলোর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা, ঐ কাফিরদেরকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁর ইবাদত পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং তাদের জন্যে যেসব পুরস্কার ছিল সেগুলো তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর ইবাদতকারী মুমিনদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্যেই তাদেরকে ওয়ারিস বলা হয়েছে।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলো লোক পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসবে। তখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের গুনাহগুলো ইয়াহূদী ও নাসারার উপর চাপিয়ে দিবেন।[১]

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট একজন ইয়াহূদী ও একজন খৃষ্টানকে হাযির করবেন। অতঃপর তাকে বলা হবেঃ "এরা হলো তোমার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মুক্তিপণ।" এ হাদীসটি শ্রবণ করার পর (হাদীসটির বর্ণনাকারী) আবূ বুরদাহ (রাঃ)-কে আল্লাহর নামে শপথ করতে বলেন। তখন আবূ বুরদাহ (রাঃ) তিনবার শপথ করে হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করেন। এই ধরনের আয়াত আরো রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا-

অর্থাৎ "এটা হলো ঐ জান্নাত যার অধিকারী আমি আমার এমন বান্দাদেরকে করে থাকি, যারা আমাকে ভয় করে।" (১৯ ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ "এটা হলো ঐ জান্নাত যার অধিকারী তোমাদেরকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় হিসেবে।" (৪৩ ঃ ৭২) হযরত মুজাহিদ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(রঃ) এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, রোমকদের ভাষায় বাগানকে ফিরদাউস বলা হয়। পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেন যে, ফিরদাউস ঐ বাগানকে বলা হয় যাতে আঙ্গুর (এর গাছ) থাকে। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

১২। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে।

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ

১৩। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।

١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ

১৪। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশ্তপিণ্ডে এবং গোশ্তপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশ্ত দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

১৫। এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

١٥- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝

১৬। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

١٦- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাথমিক সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা কাদা ও বেজে ওঠে এমন মাটির আকারে ছিল। অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর শুক্র হতে তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা এখন মানুষরূপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো।" (৩০ ঃ ২০)

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা তিনি সমস্ত যমীন হতে গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসেবেই হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের রূপ ও রঙ বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়েছে লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ হয়েছে অন্য রঙ-এর। তাদের মধ্যে অশ্লীলও রয়েছে, পবিত্রও রয়েছে।"[১]

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً-এর মধ্যে 'ه' সর্বনামটি جِنْسِ اِنْسَان (মানবজাতি)-এর দিকে ফিরেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "তিনি কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" (৩২ ঃ ৭-৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ـ فَجَعَلْنٰهُ فِیْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করিনি, অতঃপর স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে?" (৭৭ ঃ ২০-২১) সুতরাং মানুষের জন্যে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার মাতার গর্ভাশয়ই বাসস্থান হয়ে থাকে। সেখানে সে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে এবং এক আকার হতে অন্য আকারের দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। তারপর শুক্র, যা তীব্রবেগে বহির্গত হয় এমন পানি, যা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ হতে ও নারীর বক্ষদেশ হতে বহির্গত হয়, রূপ পরিবর্তন করে লাল রঙ-এর পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এরপর ওটা গোশ্তপিণ্ডের রূপে পরিবর্তিত হয়। তখন তাতে কোন আকার বা কোন রেখা থাকে না। তারপর তাতে অস্থি তৈরী করেন এবং মাথা, হাত, পা, হাড়, শিরা, পাছা ইত্যাদি বানিয়ে দেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষের সারা দেহ গলে পচে যায়, শুধু মেরুদণ্ডের (পাছার) হাড়টি অবশিষ্ট থাকে। ওর থেকেই তাকে (পুনরায়) সৃষ্টি করা হবে এবং পুনর্গঠন করা হবে।"

মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে আমি গোশ্ত দ্বারা ঢেকে দিই, যেন তা গুপ্ত ও দৃঢ় থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাতে রূহ ফুঁকে দেন, যাতে সে নড়া চড়া করা ও চলাফেলা করার যোগ্য হয়ে ওঠে। ঐ সময় সে জীবন্ত মানবরূপ ধারণ করে। সে দেখার, শুনার, বুঝার, নড়ার এবং স্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, যখন শুক্রের উপর চার মাস অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন যিনি তিন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। 'অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে' আল্লাহ পাকের এই উক্তির অর্থ এটাই। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের এই সৃষ্টির দ্বারা রূহ ফুঁকে দেয়াকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং মায়ের পেটের মধ্যে এক অবস্থা হতে দ্বিতীয় অবস্থায় এবং দ্বিতীয় অবস্থা হতে তৃতীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পর একেবারে অবুঝ ও জ্ঞান শূন্য শিশুরূপে সে জন্মগ্রহণ করে। তারপর সে ধীরে ধীরে বড় হতে হতে যৌবনে পদার্পণ করে। তারপর হয় পৌঢ় এবং এর পর বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। পরিশেষে সে সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। মোটকথা রূহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং পরে এসব রূপান্তর সাধিত হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িতঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (এর মাধ্যম শুক্র) তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা থাকে। তারপর ওটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিণ্ডের আকারে থাকে। এরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশ্তপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন, যিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে চারটি বিষয় লিখে নেন। তাহলো তার রিযক, আয়ুষ্কাল, আমল এবং সে হতভাগ্য হবে কি সৌভাগ্যবান হবে। যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর আমল করতে থাকে, এমনকি সে জান্নাত হতে শুধুমাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার তকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়ে যায়, ফলে সে শেষ অবস্থায় জাহান্নামবাসীর আমল করতে শুরু করে এবং ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

সুতরাং সে জাহান্নামী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্য একটি লোক খারাপ কাজ করতে করতে জাহান্নাম হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়। কিন্তু তকদীরের লিখন অগ্রগামী হয় এবং শেষ জীবনে সে জান্নাতবাসীর আমল করতে শুরু করে দেয়। সুতরাং সে জান্নাতবাসী হয়ে যায়।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শুক্র বা বীর্য যখন গর্ভাশয়ে পতিত হয় তখন ওটা প্রত্যেক চুল ও নখের স্থানে পৌঁছে যায়। অতঃপর চল্লিশ দিন পরে ওটা জমাট রক্তের আকার ধারণ করে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) সাথে কথাবার্তা বলছিলেন, এমন সময় একজন ইয়াহূদী আগমন করে। তখন কুরায়েশ কাফিররা তাকে বলেঃ "হে ইয়াহূদী! এই লোকটি (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) নবুওয়াতের দাবী করছেন।" সে তখন বলেঃ "আচ্ছা, আমি তাঁকে এমন এক প্রশ্ন করবো যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না।" অতঃপর সে নবী (সঃ)-এর মজলিসে এসে বসে পড়ে। সে প্রশ্ন করেঃ "আচ্ছা বলুন তো, মানুষের জন্ম কি জিনিস থেকে হয়?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "পুরুষ ও স্ত্রীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে। পুরুষের শুক্র মোটা ও গাঢ় হয় এবং তার থেকে অস্থি ও পাছা বা নিতম্ব গঠিত হয়। আর স্ত্রীর শুক্র হয় তরল ও পাতলা। তার থেকে গঠিত হয় গোশ্ত ও রক্ত।" তাঁর এই জবাব শুনে ইয়াহূদী বলেঃ "আপনি সত্য বলেছেন। পূর্ববর্তী নবীদেরও (আঃ) উক্তি এটাই ছিল।"[৩]

হযরত হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, গর্ভাশয়ে শুক্রের যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন একজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! এ ভাল হবে, না মন্দ হবে? নর হবে না নারী হবে?" উত্তরে যা বলা হয় তাই তিনি লিখে নেন এবং তার আমল, বয়স, বিপদ-আপদ, রিযক ইত্যাদি সবকিছু লিখে ফেলেন। তারপর ঐ খাতাপত্র জড়িয়ে নেয়া হয় এবং তাতে কমবেশী করার কোন অবকাশ থাকে না।[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।
২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা গর্ভাশয়ে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যিনি আরয করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! এখন শুক্র। হে আল্লাহ! এখন রক্তপিণ্ড। হে আমার প্রতিপালক! এখন গোশ্তপিণ্ড।" যখন আল্লাহ তা'আলা ওকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ! নর হবে, না নারী হবে? দুর্ভাগা হবে, না ভাগ্যবান হবে? এর রিযক কি হবে এবং আয়ুষ্কাল কত হবে?" তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেন এবং তিনি তার মায়ের পেটেই সবকিছু লিখে নেন।[১]

এসব কথা এবং নিজের পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেনঃ অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "আমি চারটি বিষয়ে আমার প্রতিপালকের আনুকূল্য করেছি। যখন তিনি وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখ হতে বেরিয়ে যায় فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ। অর্থাৎ "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা কতই না মহান! আমার প্রতিপালক পরে এটাই আবার অবতীর্ণ করেন।"[২]

হযরত আমির শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ)-কে وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ হতে ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত আয়াতগুলো লিখাতে ছিলেন তখন হযরত মুআয (রাঃ) হঠাৎ করে فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ-এই অংশটুকু বলে ফেলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে ওঠেন। তাঁকে হাসতে দেখে হযরত মুআয (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার হাসার কারণ কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমার এই কথার দ্বারাই এই আয়াতকে সমাপ্ত করা হয়েছে।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে তাখরীজ করেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এই হাদীসের সনদে জাবির জুফী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি খুবই দুর্বল। আর এ রিওয়াইয়াতটি সম্পূর্ণরূপে মুনকার বা অনস্বীকার্য। অহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) মদীনায় ছিলেন, মক্কায় নয়। হযরত মুআয (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও মদীনার ঘটনা। অথচ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। সুতরাং উল্লিখিত রিওয়াইয়াত নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই প্রথম সৃষ্টির পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমাদের হিসাব নিকাশ হবে এবং ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

১৭। আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।	١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশসমূহের সৃষ্টির বর্ণনা দিচ্ছেন। মানব সৃষ্টির তুলনায় আকাশসমূহের সৃষ্টি বহুগুণে বেশী শিল্প চাতুর্যের পরিচায়ক। সূরায়ে আলিফ-লাম-মীম সাজদাহতেও এরই বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুমআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে এই সূরাটি পাঠ করতেন। সেখানে প্রথমে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মানব সৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরপর পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

অর্থাৎ "সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবই তাঁর মহিমা কীর্তন করে।" (১৭ ঃ ৪৪) অন্য এক স্থানে রয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

অর্থাৎ "তারা কি দেখেনি যে, কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?" (৭১ ঃ ১৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا -

অর্থাৎ "আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও ওগুলোর মতই, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" (৬৫ ঃ ১২)

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই। অর্থাৎ তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশের উচ্চ হতে উচ্চতম স্থানে অবস্থিত জিনিস, যমীনের গোপনীয় জিনিস, পর্বতের শৃঙ্গ, সমুদ্রের তলদেশ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর সামনে প্রকাশমান। পাহাড়-পর্বত-টিলা, মরুভূমি, সমুদ্র, ময়দান ইত্যাদি সবকিছুরই খবর তিনি রাখেন। গাছের এমন কোন পাতা ঝরে পড়ে না যা তাঁর জানা থাকে না, যমীনের অন্ধকারে এমন বীজ নেই যা তাঁর অজানা রয়েছে এবং এমন কোন আর্দ্র ও শুষ্ক জিনিস নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে বিদ্যমান নেই।

١٨- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۚ

১৮। এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম।

١٩- فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

১৯। অতঃপর আমি ওটা দ্বারা তোমাদের জন্যে খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার করে থাক।

٢٠- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝

২০। এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্যে তৈল ও ও ব্যঞ্জন।

٢١- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ

২১। আর তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে

لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে; তোমাদেরকে আমি পান করাই ওগুলোর উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা হতে ভক্ষণ করে থাক।

٢٢- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۧ

২২। এবং তোমরা তাতে ও নৌযানে আরোহণও করে থাক।

আল্লাহ তা'আলার তো অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে, কিন্তু এখানে তিনি তাঁর কতকগুলো বড় বড় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, তিনি প্রয়োজন অনুপাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। তিনি এতো বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করেন না যে, তার ফলে যমীন খারাপ হয়ে যায় এবং শস্য পচে সড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আবার এতো কমও নয় যে, ফল, শস্য ইত্যাদি জন্মেই না। বরং এমন পরিমিতভাবে তিনি বৃষ্টি দিয়ে থাকেন যে, এর ফলে শস্যক্ষেত্র সবুজ-শ্যামল থাকে এবং ফলের বাগান তরুতাজা হয়। পুকুর-পুষ্করিণী, নদ-নদী এবং খাল-বিল পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে নিজেদের পান করা এবং গবাদি পশুগুলোকে পান করানোর কোন অসুবিধা হয় না। যেখানে পানির বেশী প্রয়োজন সেখানে বেশী পানি বর্ষিত হয় এবং যেখানে কম প্রয়োজন সেখানে কম। আর যেখানকার ভূমি এর যোগ্যতাই রাখে না সেখানে পানি মোটেই বর্ষিত হয় না। কিন্তু নদী-নালার সাহায্যে সেখানে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং এভাবে সেখানকার ভূমিকে পরিতৃপ্ত করা হয়। যেমন মিসর অঞ্চলের মাটি, যা নীল নদীর পানিতে পরিতৃপ্ত হয়ে সদা সবুজ-শ্যামল ও সতেজ থাকে। ঐ পানির সাথে লাল মাটি আকর্ষণ করা হয়, যা হাবশা বা আবিসিনিয়া অঞ্চলে থাকে। সেখানকার বৃষ্টির সাথে তথাকার মাটি বয়ে চলে আসে যা জমিতে এসে থেকে যায় এবং এর ফলে জমি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। আসলে কিন্তু তথাকার মাটি লবণাক্ত এবং চাষের মোটেই উপযোগী নয়। আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা! সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা, ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কি ক্ষমতা ও নিপুণতা যে, তিনি

পানিকে জমিতে স্থির রাখেন এবং জমিকে ঐ পানি শোষণ করার ক্ষমতা দান করেন, যাতে ওটা ওর মধ্যেই বীজকে পানি পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

এরপর তিনি বলেনঃ আমি ঐ পানিকে অপসারিত করতেও সক্ষম অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে পানি বর্ষণ নাও করতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে ঐ পানি কংকরময় ভূমিতে এবং পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ষাতে পারি। আমি যদি চাই তবে পানিকে তিক্ত ও লবণাক্ত করতে পারি। ফলে তা তোমরা নিজেরাও পান করতে পারবে না, তোমাদের গবাদি পশুকেও পান করাতে পারবে না এবং ঐ পানি দ্বারা ফসল উৎপাদন করতেও সক্ষম হবে না। আর তোমরা ঐ পানিতে গোসলও করতে পারবে না। আমি ইচ্ছা করলে মাটিতে ঐ শক্তি দিবো না যার সাহায্যে সে পানি শোষণ করতে পারে। বরং ঐ পানি মাটির উপরেই ভেসে বেড়াবে। এটাও আমার অধিকারে আছে যে, আমি এ পানি এমন দূর-দূরান্তের বিলে বর্ষিয়ে দিবো যে, তা তোমাদের কোনই কাজে আসবে না, তোমাদের কোনই উপকার হবে না। এটা আমার এক বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ যে, মেঘ হতে আমি সুমিষ্ট, উত্তম, হালকা ও সুস্বাদু পানি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর ওটা জমিতে পৌঁছিয়ে দিই। ফলে জমিতে ফসল হয় এবং বাগানে পানি বর্ষণের ফলে বাগানের গাছ-পালাগুলো সতেজ হয়। তোমরা নিজেরা এই পানি পান কর, জীব-জন্তুকে পান করাও এবং এই পানিতে গোসল করে দেহ-মন পবিত্র করে থাকো। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। জমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। ফলের বাগান সবুজ-শ্যামল আকার ধারণ করে। বাগান তখন সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় এবং সাথে সাথে খুব উপকারী হয়। মহান আল্লাহ আরববাসীর পছন্দনীয় ফল খেজুর ও আঙ্গুর জন্মিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দেশবাসীর জন্যেই তিনি বিভিন্ন প্রকারের ফলের ব্যবস্থা করে দেন। পুরোপুরিভাবে এগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা কারো নেই। বহু ফল আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। যেগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করার সাথে সাথে তারা ওগুলোর স্বাদও গ্রহণ করে থাকে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ যায়তূন গাছের বর্ণনা দিচ্ছেন। তূরে সীনা হলো ঐ পাহাড় যার উপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং ওর আশে পাশের পাহাড়গুলো। তূর ঐ পাহাড়কে বলে যাতে গাছপালা থাকে এবং থাকে সদা সবুজ-শ্যামল। এরূপ না হলে ওকে 'জাবাল'

বলবে, তূর বলবে না। সুতরাং তূরে সীনায় যে যায়তূন গাছ জন্মে তার থেকে তেল বের হয় এবং ওটা ভোজনকারীদের জন্যে তরকারীর কাজ দেয়। যেমন হযরত মালিক ইবনে রাবীআ সায়েদী আনাসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যায়তূনের তেল খাও এবং (শরীরে) লাগাও, কেননা এটা কল্যাণময় গাছ হতে বের হয়ে থাকে।[১]

বর্ণিত আছে যে, একবার একজন লোক আশুরা দিবসে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর বাড়ীতে অতিথি হন। তিনি তখন তাঁকে উটের মাথা (এর গোশত) ও যায়তূনের তেল খেতে দেন। অতঃপর তিনি লোকটিকে বলেনঃ "এটা হচ্ছে ঐ বরকতময় গাছের তেল যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)-এর কাছে দিয়েছেন।"[২]

এরপর মহান আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তুর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ঐগুলোর দ্বারা মানুষ যে উপকার লাভ করে থাকে ঐসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করছেন। তিনি বলেনঃ তোমরা ওগুলোর দুধ পান করে থাকো, গোশত ভক্ষণ কর এবং লোম বা পশম দ্বারা পোশাক তৈরী করে থাকো। আর তোমরা ওগুলোর উপর সওয়ার হও, ওগুলোর উপর তোমাদের আসবাবপত্র চাপিয়ে দিয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছিয়ে থাকো। যদি এগুলো না থাকতো তবে তোমাদের এসব জিনিসপত্র অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর হতো। সত্যি মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর খুবই দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। যেমন তিনি বলেনঃ

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "এবং ওগুলো তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারবে না; তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" (১৬ ঃ ৭) অন্যত্র বলেনঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ـ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ـ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ـ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্য হতে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী? আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি; এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং ওদের কতক তারা আহার করে। তাদের জন্যে এগুলোতে আছে বহু উপকার আর আছে পানীয় বস্তু; তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?" (৩৬ ঃ ৭১-৭৩)

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

২৩। আমি নূহ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

٢٤- فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ۝

২৪। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল, তারা বললোঃ এতো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে, এ কথা শুনিনি।

٢٥- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

২৫। এতো এমন লোক যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে; সুতরাং এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-কে তিনি সুসংবাদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে তাঁর কওমের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে গিয়ে বলেনঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়। তোমরা তাঁকে ছেড়ে যে অন্যদের উপাসনা করছো এতে কি তোমাদের ভয় হচ্ছে না? তাঁর একথা শুনে তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললোঃ হে জনগণ! এই লোকটি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবুওয়াতের দাবী করে সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। তার উদ্দেশ্য হলো নেতৃত্ব লাভ করা। মানুষের কাছে অহী আসা কি সম্ভব? আল্লাহ তা'আলার নবী পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে তিনি কোন আসমানী ফেরেশতাকে পাঠাতেন? এরূপ কথা আমরা কেন, আমাদের পূর্বপুরুষরাও শুনেনি যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। হে নূহ (আঃ)! তুমি একজন পাগল ছাড়া কিছুই নও। পাগল না হলে তুমি কখনো এরূপ দাবী করতে না এবং আত্মগর্বী হতে না। সুতরাং হে জনমণ্ডলী! তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর (সে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৬। নূহ (আঃ) বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

٢٦- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ○

২৭। অতঃপর আমি তার কাছে অহী করলামঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলিয়ে উঠবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের মধ্যে

٢٧- فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا

تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

٢٨- فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৮। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বলোঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে।

٢٩- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

২৯। আরো বলো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

٣٠- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ○

৩০। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর কওমের হিদায়াত প্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন! যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে তাদের উপর আমাকে জয়যুক্ত করুন! যেমন অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ -

অর্থাৎ "তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলঃ আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর।" (৫৪ ঃ ১০) তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে অহী করলেনঃ তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার অহী অনুযায়ী

নৌযান নির্মাণ কর এবং তাতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও উঠিয়ে নাও তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হয়ে যাবে। তারা হলো তাঁর কওমের কাফির লোকেরা এবং তাঁর স্ত্রী ও তাঁর পুত্র। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জনেন। এর পূর্ণ ঘটনা সূরায়ে হূদের তাফসীরে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবেঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ـ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এবং যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস; এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এগুলোকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো।" (৪৩ ঃ ১২-১৪) হযরত নূহ (আঃ) এ কথাই বলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "সে বললোঃ এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (১১ ঃ ৪১) সুতরাং নৌকা চলতে শুরু করার সময়ও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং যখন ওটা থামবার উপক্রম হয় তখনও তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন। তিনি প্রার্থনা করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। এতে অর্থাৎ মুমিনদের মুক্তি ও কাফিরদের ধ্বংসের মধ্যে নবীদের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে এবং এই আলামত রয়েছে যে,

আল্লাহ যা চান তাই করে থাকেন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু অবগত আছেন।

নিশ্চয়ই তিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়ে স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন।

৩১। অতঃপর তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

٣١- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۚ

৩২। এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিলঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

٣٢- فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۠

৩৩। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিলঃ এতো তোমাদের মত একজন মানুষই; তোমরা যা আহার কর সে তো তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।

٣٣- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۙ

৩৪। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٣٤- وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۙ

٣٥- اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ○

৩৫। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

٣٦- هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ○

৩৬। অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব।

٣٧- اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

৩৭। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না।

٣٨- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৩৮। সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।

٣٩- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

৩৯। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

٤٠- قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ○

৪০। আল্লাহ বললেনঃ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।

٤١- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১। অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পরেও বহু উম্মতের আগমন ঘটে। বলা হয়েছে যে, قَرْنًا اٰخَرِيْنَ দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সামূদ সম্প্রদায়কে। তাদের উপর বিকট শব্দের শাস্তি এসেছিল। যেমন এই আয়াতে রয়েছে। তাদের কাছেও রাসূল এসেছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, বিরোধিতা করে এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ শুধুমাত্র এটাই যে, তিনি মানুষ। তারা কিয়ামতকেও অস্বীকার করে। শারীরিক পুনরুত্থানকে তারা অবিশ্বাস করে এবং বলেঃ "ওটা অসম্ভব ব্যাপার। এই লোকটি নিজেই এটা বানিয়ে বলছে। আমরা এসব বাজে কথা বিশ্বাস করতে পারি না।" নবী (আঃ) তখন বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন! কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।" অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়ায তাদেরকে আঘাত করলো এবং তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ্য করে দেয়া হলো। সুতরাং যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এই শাস্তির যোগ্যই ছিল। প্রচণ্ড ঝটিকার সাথে সাথে ফেরেশতার বিকট ও ভয়াবহ শব্দ তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলো। ভূষির মত তারা উড়ে গেল। রয়ে গেল শুধু তাদের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়।" যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ "আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।" (৪৩ : ৭৬) সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত।

৪২। অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

٤٢- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

৪৩। কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

٤٣- مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

৪৪। অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে; অতঃপর আমি তাদের একের পর একক ধ্বংস করলাম, আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি; সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা!

٤٤- ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের পরে বহু জাতির আগমন ঘটেছিল। যাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাদের জন্যে যে কাল নির্ধারণ করেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছিল। তা ত্বরান্বিত হয়নি এবং বিলম্বিতও হয়নি। আমি একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছি। প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল এসেছেন। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক পথে এসে যায় এবং কারো কারো উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ জাতিই তাদের নবীকে অস্বীকার করে। যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

অর্থাৎ "পরিতাপ বান্দাদের জন্যে! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।"(৩৬ ঃ ৩০)

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ -

অর্থাৎ "নূহ (আঃ)-এর পরেও আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি।" (১৭ঃ১৭)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। যেমন তিনি বলেনঃ

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ -

অর্থাৎ "সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে ফেলেছি।" (৩৪ ঃ ১৯)

৪৫। অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা (আঃ) ও তার ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে পাঠালাম;

٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ ○

৪৬। ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট; কিন্তু তারা অহংকার করলো; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۚ ○

৪৭। তারা বললোঃ আমরা কি আমাদের মত দু' ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করবো যারা আমাদেরই মত এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?

٤٧- فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۚ ○

৪৮। অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

٤٨- فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ○

৪৯। আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায়।

٤٩- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-কে নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মতই তাঁদেরকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা তাঁদেরকে বলেঃ 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং আমরা তোমাদের নবুওয়াতকে বিশ্বাস করতে পারি না।' তাদের অন্তর তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের

মতই শক্ত হয়ে যায়। অবশেষে একদিনেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সবকেই সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন।

এরপর লোকদেরকে হিদায়াত করার জন্যে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাওরাত প্রদান করা হয়। আবার মুমিনদের হাতে কাফিররা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। ফিরাউন ও তার কওম কিবতীদের পরে এরূপভাবে সাধারণ আযাবে কোন উম্মত সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ-

অর্থাৎ "আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করবার পর মূসা (আঃ)-কে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্যে জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (২৮ঃ ৪৩)

٥٠- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝ (ع ۱۸ ۳)

৫০। এবং আমি মারইয়াম তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

আল্লাহ তা'আলা খরব দিচ্ছেন যে, তিনি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে তাঁর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশের এক বড় নিদর্শন বানিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ)কে তিনি নর ও নারীর মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। হযরত হাওয়া (আঃ)-কে স্ত্রী ছাড়া শুধু পুরুষের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে তিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ লোক ছাড়া শুধু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে তিনি নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

رَبْوَةٌ বলা হয় ঐ উঁচু ভূমিকে যা সবুজ-শ্যামল ও কৃষি কার্যের উপযোগী। এরূপ তৃণলতা ও পানি বিশিষ্ট তরুতাজা এবং সবুজ-শ্যামল স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও নবী হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে আশ্রয় দান করেছিলেন। সেখানে পানি প্রবাহিত হতো। ওটা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক মসৃণ ও সমতলভূমি। কোন কোন গুরুজনের মতে ওটা ছিল মিসরের ভূখণ্ড। আবার কারো কারো মতে ওটা ছিল দামেস্ক

অথবা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড। رَبْوَة বালুকাময় ভূমিকেও বলা হয়। যেমন হযরত মুররাতল বাহ্যী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যা তিনি একজন সাহাবী (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "রাবওয়াতে তোমার ইন্তেকাল হবে।"[১] ঐ সাহাবী (রাঃ) বালুকাময় ভূমিতেই মৃত্যুবরণ করেন। এসব উক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য উক্তি হলো এই যে, এর দ্বারা নহরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا -

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক তোমার পাদদেশে এক নহর সৃষ্টি করেছেন।" (১৯ ঃ ২৪) সুতরাং এটা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি স্থান। তাহলে এ আয়াতটি যেন ঐ আয়াতেরই তাফসীর। আর কুরআনের তাফসীর প্রথমতঃ কুরআন দ্বারা, তারপর হাদীস দ্বারা এবং এরপর আসার দ্বারা করা উচিত।

---

৫১ - يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

৫১। হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত।

৫২ - وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

৫২। এবং তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।

৫৩ - فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

৫৩। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত।

৫٤ - فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

৫৪। সুতরাং কিছুকালের জন্যে তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হাদীস।

৫৫। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দ্বারা

৫৫- اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۝

৫৬। তাদের জন্যে সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।

৫৬- نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী (আঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন হালাল খাদ্য ভক্ষণ করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হালাল খাদ্য সৎ কার্যের সহায়ক। নবীগণ (আঃ) সর্বপ্রকারের মঙ্গল সঞ্চয় করেছেন। কথা, কাজ, পথ-প্রদর্শন, উপদেশ ইত্যাদি সবকিছুই জমা করেছেন। এখানে আল্লাহ পাক রং, স্বাদ ইত্যাদি বর্ণনা করেননি, বরং শুধুমাত্র হালাল খাদ্য খেতে বলেছেন। আবূ মাইসারা আমর ইবনে শুরাহবীল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতার বয়ন করার পারিশ্রমিক হতে খেতেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, এমন কোন নবী ছিলেন না যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ তখন জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনিও কি (ছাগল চরিয়েছেন)?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, আমিও কয়েকটি কীরাতের[১] বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম।"

আর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হযরত দাঊদ (আঃ) স্বহস্তের উপার্জন হতে ভক্ষণ করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় রোযা হলো হযরত দাঊদ (আঃ)-এর রোযা। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কিয়াম (রাত্রিকালে ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকা) হলো হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কিয়াম। তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং এক ষষ্ঠাংশ শুয়ে থাকতেন। একদিন তিনি রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছেড়ে দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না।

শাদ্দাদ ইবনে আউসের কন্যা হযরত উম্মে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (একদা) দিনের প্রথম ভাগে কঠিন গরমের সময় আমি এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে প্রেরণ করি এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি

১. কীরাত হলো এক আউন্সের চব্বিশভাগের একভাগ পরিমাণ ওজন।

এটা দ্বারা রোযার ইফতার করবেন। তিনি আমার প্রেরিত দূতকে এই বলে ফিরিয়ে পাঠালেনঃ "এ দুধ যদি তোমার নিজের বকরীর হতো তবে আমি তা পান করতাম।" আমি তখন বলে পাঠালামঃ আমি এ দুধ নিজের মাল দ্বারা ক্রয় করেছি। তখন তিনি তা পান করলেন। পরের দিন শাদ্দাদের কন্যা উম্মে আবদিল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দিনের দীর্ঘ সময়ের অত্যন্ত গরমের মধ্যে আমি আপনার নিকট দুধ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (এর কারণ কি?)!" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, আমি এরূপ করতেই আদিষ্ট হয়েছি। নবীরা শুধু হালাল খাদ্যই ভক্ষণ করে থাকেন এবং ভাল কাজই সম্পাদন করেন।"[১]

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র ছাড়া তিনি কিছুই কবূল করেন না। মুমিনদেরকে তিনি ঐ হুকুমই দিয়েছেন যে হুকুম তিনি রাসূলদেরকে (আঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর ও সৎ কার্য সম্পাদন কর এবং জেনে রেখো যে, তোমরা যা কিছু আমল করছো আমি তা দেখতে রয়েছি।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ কর যা আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দান করেছি।" অতঃপর তিনি এমন একটি লোকের বর্ণনা দেন যে দীর্ঘ সফর করে, যার চুল থাকে এলো মেলো এবং চেহারা থাকে ধূলো বালিতে আচ্ছন্ন। সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!' কিন্তু তার দু'আ কবূল করা হবে এটা অসম্ভব (কেননা, সে হারাম পন্থায় উপার্জন করে ও হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে)।"[২]

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি।' অর্থাৎ হে নবীগণ (আঃ)! তোমাদের এই দ্বীন একই দ্বীন, এই মিল্লাত একই মিল্লাত। আর তাহলো শরীক বিহীন এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেয়া। এ জন্যেই এর পরে বলেছেনঃ 'আমিই তোমাদের প্রতিপালক! সুতরাং আমাকে ভয় কর।' সূরায়ে আম্বিয়ায় এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, জামেউত তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

أُمَّةً وَّاحِدَةً-এর উপর حَال বা অবস্থা বোধক-এর কারণে যবর দেয়া হয়েছে। যে উম্মতদের নিকট নবীদেরকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে শতধা বিভক্ত করে ফেলেছিল এবং এতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত। সুতরাং তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছেঃ কিছুকালের জন্যে তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে দাও। অবশেষে তাদের ধ্বংসের সময় এসে পড়বে। তাদেরকে পানাহার ও হাসি খুশীতে মগ্ন থাকতে দাও। সত্বরই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল জানতে পারবে।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দান করেছি তা তাদের মঙ্গলের জন্যে? আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট বলেই কি তাদেরকে এ সবকিছু দিয়েছি? কখনই না। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তারা প্রতারণার মধ্যে পড়ে গেছে। তারা মনে করছে যে, দুনিয়ায় যেমন তারা সুখে-শান্তিতে রয়েছে, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তারা সুখ-শান্তি লাভ করবে। তাদেরকে সেখানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে না। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাদেরকে কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে মাত্র। কিন্তু তারা বুঝে না। প্রকৃত ব্যাপার তারা অনুধাবন করতে পারে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا অর্থাৎ "অতএব তাদেরকে (কাফিরদেরকে) অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে।" (৮৬ ঃ ১৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ "তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।" (৯ ঃ ৫৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْۤا اِثْمًا অর্থাৎ "আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি হয়।" (৩ ঃ ১৭৮) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا হতে عَنِيْدًا পর্যন্ত। অর্থাৎ "আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাঁকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর

উপকরণ। এরপরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।” (৭৪ ঃ ১১-১৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

অর্থাৎ “তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নৈকট্য লাভ করাতে পারবে না, আমার নৈকট্য লাভকারী তো তারাই হবে যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে।” (৩৪ ঃ ৩৭) এই বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যে কওমকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হয়েছে তারা প্রতারিত হয়েছে। ধন-মাল ও সন্তানাদি দ্বারা মানুষের গুণ ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না, বরং তাদের কষ্টিপাথর হলো ঈমান ও সৎ আমল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্রকে বন্টন করে দিয়েছেন যেমনভাবে তোমদের মধ্যে বন্টন করেছেন তোমাদের জীবিকাকে। যাকে তিনি ভালবাসেন তাকেও দুনিয়া দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া (-এর সুখ-ভোগ) দান করে থাকেন। আর দ্বীন শুধু তাকেই তিনি দান করেন যাকে ভালবাসেন। সুতরাং যাকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীন দান করেন, জানবে যে, তাকে তিনি ভালবাসেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! বান্দা মুসলিম হয় না যে পর্যন্ত না তার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলিম হয়। আর বান্দা মুমিন হয় না যে পর্যন্ত না তার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ হয়।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তার অনিষ্ট কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “প্রতারণা, যুলুম ইত্যাদি। জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মাল উপার্জন করে, অতঃপর তা থেকে খরচ করে, তার খরচে বরকত দেয়া হয় না এবং সে যে দান করে সেই দান গৃহীত হয় না। সে যা কিছু ছেড়ে যাবে তা হবে তার জন্যে জাহান্নামের খাদ্যসম্ভার। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেন না। বরং তিনি মন্দকে মিটিয়ে থাকেন ভাল দ্বারা। কলুষতা কলুষতাকে দূর করে না।[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٥٧- اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۙ

৫৭। যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত,

٥٨- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۙ

৫৮। যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে।

٥٩- وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۙ

৫৯। যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না।

٦٠- وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ

৬০। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।

٦١- اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝

৬১। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইহসান ও ঈমানের সাথে সাথে সৎ কাজ করা এবং এরপরেও আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হওয়া মুমিনের বিশেষণ। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মুমিন ভাল কাজ করে এবং সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিক খারাপ কাজ করে, আবার আল্লাহ থেকে নির্ভয় থাকে।

ঘোষিত হচ্ছেঃ তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। যেমন মহান আল্লাহ হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ অর্থাৎ "সে তার প্রতিপালকের কালেমা ও কিতাবসমূহকে সত্য বলে জেনেছিল।" (৬৬ঃ ১২) অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শরীয়তের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তাঁর আদিষ্ট প্রতিটি কাজকে তিনি ভালবাসতেন। আর তাঁর নিষেধকৃত প্রতিটি কাজকে তিনি অপছন্দ করতেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে না বরং তাকে এক বলে বিশ্বাস করে। তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান নেই। তিনি অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তাঁর নামে তারা দান-খয়রাত করে থাকে। কিন্তু তা কবূল হবে কি না এ ভয় তাদের অন্তরে থাকে। তাই আল্লাহর পথে খরচ করার সময় তারা ভীত-কম্পিত হয়। হযরত সাঈদ ইবনে অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'যারা যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে'-এর দ্বারা কি ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা চুরি করে, ব্যভিচার করে এবং মদ্যপান করে, অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহকে ভয় করে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)-এর কন্যা! হে সিদ্দীক (রাঃ)-এর কন্যা। না, তারা নয়; বরং যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-খয়রাত করে, অথচ আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।"[১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।

يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا অন্য কিরাতে يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا রয়েছে। অর্থাৎ তারা যা করার তা করে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তর থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ আসিম (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁকে মারহাবা বলে সাদর সম্ভাষণ জানান এবং বলেনঃ "তুমি মাঝে মাঝে আমাকে দর্শন দান কর না কেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনি হয়তো বিরক্তিবোধ করবেন এ জন্যেই আসি না। আজকে একটি আয়াতের শব্দগুলোর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে এটা পড়তেন তা আমি জানতে চাই।" হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওটা কোন আয়াত?" তিনি জবাবে বললেনঃ "আয়াতটি হলোঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا উনি এভাবে পাঠ করতেন, না اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا এভাবে পাঠ করতেন?" হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ দুটোর মধ্যে কোনটি তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ اَلَّذِيْنَ

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। জামেউত তিরমিযী ও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আছেঃ "হে সিদ্দীক (রাঃ)-এর কন্যা! না, তারা নয়, বরং যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-খয়রাত করে অথচ ওগুলো কবূল হয় কি-না এজন্যে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে (তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে)।"

يَاْتُوْنَ مَا اٰتَوْا এরূপভাবে পঠিত হয়ে থাকলে আমি যেন সারা দুনিয়াই পেয়ে যাবো, এমনকি এর চেয়েও বেশী আমি আনন্দিত হবো।" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ তুমি শুনে খুশী হও যে, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই আয়াতটি এভাবেই পড়তে শুনেছি।"[১]

٦٢- وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৬২। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

٦٣- بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ○

৬৩। বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরো কাজ আছে যা তারা করে থাকে।

٦٤- حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ○

৬৪। আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।

٦٥- لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৬৫। তাদেরকে বলা হবেঃ আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার সাহায্যে পাবে না।

٦٦- قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ○

৬৬। আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে।

১. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এর একজন বর্ণনাকারী হলেন ইসমাঈল ইবনে মুসলিম। তিনি দুর্বল। বর্তমানে কুরআনে যেরূপ আছে এটাই প্রসিদ্ধ সাতটি কিরআত ও জমহূরের কিরাত। অর্থের দিক দিয়েও এটাই বেশী প্রকাশমান। কেননা, তাদেরকে অগ্রগামী বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কিরআতটি নিলে তারা অগ্রগামী থাকেন না। বরং মধ্যম স্থালক্ষা হয়ে যান। এসব ব্যাপারে আল্লাহই বেশী ভাল জানেন।

৬৭। দম্ভভরে এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে।

٦٧- مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শরীয়তকে সহজ করেছেন। তিনি বান্দাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেন না যা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন। ওগুলো তারা পুস্তিকাকারে লিখিতরূপে বিদ্যমান পাবে। এই আমলনামা সঠিকভাবে তাদের এক একটি কাজের কথা প্রকাশ করে দেবে। কারো উপর কোন প্রকারের যুলুম করা হবে না। কারো পুণ্য কমিয়ে দেয়া হবে না। তবে অধিকাংশ মুমিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ বরং এই বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া আরো কাজ আছে যা তারা করে থাকে, যেমন শিরক ইত্যাদি। এ সবকিছু তারা নির্ভয়ে করে চলেছে। মৃত্যু পর্যন্ত তারা এসব মন্দ কাজ করতেই থাকবে যাতে তারা সমস্ত শাস্তির হকদার হয়ে যায়। যেমন ইতিপূর্বে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ "যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! কোন লোক জান্নাতের কাজ করতে করতে জান্নাত হতে মাত্র এক হাত দূরে রয়ে যায়, অতঃপর তার তকদীরের লিখন তার উপর বিজয়ী হয় এবং সে জাহান্নামীদের কাজ করতে শুরু করে দেয়। পরিণামে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আর আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে। সূরায়ে মুয্যাম্মিলে রয়েছেঃ

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ـ اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, আর কিছুকালের জন্যে তাদেরকে অবকাশ দাও। আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি।" (৭৩ ঃ ১১-১২) অন্য জায়গায় আছেঃ

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ـ

অর্থাৎ "তাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্তচীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।" (৩৮ঃ ৩) এখানে বলা হচ্ছেঃ আজ তোমরা চীৎকার করছো কেন? কেন আজ আর্তনাদ

করছো? আজ এসবের কিছুই তোমাদের কাজে আসবে না। তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়েছে। এখন চীৎকার-আর্তনাদ সবই বৃথা। এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে পড়তে দম্ভভরে।

مُسْتَكْبِرِيْنَ তাদের সত্য হতে সরে পড়া ও সত্যকে অস্বীকার করা হতে حَال হয়েছে যে, তারা ঐ সময় অহংকার করতো এবং সত্যপন্থীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো। এই অর্থ হিসেবে بِهٖ-এর 'ہ' সর্বনামটি হয়তো বা حَرَم-এর দিকে অর্থাৎ মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যে, তারা সেখানে বাজে ও অর্থহীন গল্প-গুজব করতো। কিংবা ওর مَرْجَع হবে কুরআন, যাকে তারা উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল। কখনো ওটাকে কবিতা বলতো, কখনো বলতো ভবিষ্যৎ কথন ইত্যাদি। অথবা এর مَرْجَع স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)। রাত্রিকালে অযথা বসে থেকে তাদের গল্প-গুজবের মধ্যে তারা তাঁকে কখনো কবি বলতো, কখনো বলতো যাদুকর, কখনো বলতো, মিথ্যাবাদী এবং কখনো পাগল বলতো। অথচ 'হারাম' আল্লাহর ঘর, কুরআন তাঁর কালাম এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর রাসূল, যাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং মক্কার উপর বিজয়ী করেছেন। মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় সেখান থেকে বের করিয়েছেন। আবার ভাবার্থ এও বলা হয়েছে যে, তারা বায়তুল্লাহর কারণে গর্ব করতো। তারা ধারণা করতো যে, তারা আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র। অথচ ওটা ছিল তাদের অলিক ধারণা মাত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশ মুশরিকরা বায়তুল্লাহর উপর ফখর করতো এবং নিজেদেরকে ওর ব্যবস্থাপক এবং মুতাওয়াল্লী মনে করতো। অথচ না তারা ওটা আবাদ করতো না ওর আদব করতো। ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে অনেক কিছু লিখেছেন যেগুলোর মূল বক্তব্য এটাই।

৬৮। তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি?

٦٨- اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاۤءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاۤءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

٦٩- اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ٥

৬৯। অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?

٧٠- اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ٥

৭০। অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

٧١- وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ ٥

৭১। সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো তবে বিশৃংখল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সবকিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٧٢- اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ ق وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ٥

৭২। অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

٧٣- وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

৭৩। তুমি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছো।

٧٤- وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ٥

৭৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত।

৭৫- وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৭৫। আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

মুশরিকরা যে কুরআন বুঝতো না, ওর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতো না, বরং ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। কেননা, তিনি তাদের প্রতি এমন পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা ইতিপূর্বে কোন নবীর উপর অবতীর্ণ করেননি। এই কিতাব সবচেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও উত্তম। তাদের যেসব পূর্বপুরুষ অজ্ঞতার যুগে মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ ছিল না এবং তাদের কাছে কোন নবীরও আগমন ঘটেনি। সুতরাং এদের উচিত ছিল আল্লাহর এই রাসূল (সঃ)-কে মেনে নেয়া, তাঁর কিতাবের মর্যাদা দেয়া এবং দিবা-নিশি এর উপর আমল করতে থাকা। যেমন তাদের মধ্যকার বিবেকবান লোকেরা করেছিল। তারা মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। আর নিজেদের কাজের দ্বারা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাফিররা বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করেনি। কুরআন কারীমের অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা কি ওয়াকিফহাল নয়? তিনি তো তাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদেরই মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছেন। অথচ এখন কি কারণে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করে দিলো? এর পূর্বে তো তারা তাঁকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এখন তাদের তাঁর থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ কি? হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর সামনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্পর্কে এ কথাই বলেছিলেনঃ "বিশ্ব প্রতিপালক এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল (সঃ) প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ গরিমা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ অবগতি ছিল।"

হযরত মুগীরা ইবনে শুবাহ (রাঃ) জিহাদের প্রান্তরে পারস্য সম্রাট কিসরার সামনেও একথাই বলেছিলেন। আবূ সুফিয়ান সখর ইবনে হারব (রাঃ) রোম

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং সদ্বংশের কথা ঘোষণা করেছিলেন। যে সময় সম্রাট তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। অথচ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় মুসলমান ছিলেন না।

কাফির ও মুশরিকরা বলতো যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পাগল কিংবা তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃত কথা শুধু এটাই যে, তাদের অন্তর ঈমান-শূন্য। তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না। মুখে যা আসে তাই তারা বলে দেয়। কুরআন তো এমন কালাম যার তুল্য কিছু পেশ করতে সারা দুনিয়া অপারগ হয়ে গেছে। কঠিন বিরোধিতা, পূর্ণ চেষ্টা এবং সীমাহীন মুকাবিলা সত্ত্বেও কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি যে, এই কুরআনের অনুরূপ নিজে বানিয়ে নেয় বা সবারই সাহায্যের মাধ্যমে এইরূপ একটি সূরা আনয়ন করে। এটা তো সরাসরি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। পরবর্তী বাক্যটি 'হাল' বা অবস্থাবোধক বা এটা খাবারিয়্যাহ মুসতানেফাও হতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) একদা একটি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বলেনঃ "ইসলাম কবূল কর।" তখন লোকটি বলেঃ "আপনি আমাকে এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন যা আমি অপছন্দ করি।" নবী (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ "যদিও তুমি অপছন্দ কর (তবুও ইসলাম কবূল করে নাও।)"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী (সঃ) একটি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে বলেনঃ "তুমি ইসলাম কবূল কর।" একথা তার কাছে খুব কঠিন ঠেকে এবং তার চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তিনি তখন তাকে বলেনঃ "দেখো, তুমি যদি কোন জনমানবহীন বিপদ সংকুল পথে চলতে থাকো এবং এমতাবস্থায় পথে এক লোকের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, যার নাম ও বংশ এবং সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তুমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এখন সে যদি তোমাকে বলেঃ 'তুমি ঐ পথে চল যে পথটি প্রশস্ত, সহজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।' তাহলে তুমি তার প্রদর্শিত ঐ পথে যাবে কি যাবে না?" লোকটি উত্তরে বলেঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই আমি ঐ পথই ধরবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তাহলে বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তুমি দুনিয়ার এই কঠিন ও বিপদ

সংকুল পথের চেয়েও বেশী মন্দ ও ভয়াবহ পথে রয়েছো। আর আমি তোমাকে সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছি। সুতরাং আমার কথা মেনে নাও।"

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, একটি লোকের সাথে নবী (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তা তার কাছে কঠিন বোধ হয়। তখন তিনি তাকে বলেনঃ "আচ্ছা, যদি তোমার দু'জন সঙ্গী থাকে, যাদের একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এবং অপরজন মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক, তবে তুমি কার সাথে ভালবাসা রাখবে?" উত্তরে লোকটি বলেঃ "আমি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সঙ্গীটিকেই ভালবাসবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এরূপই বটে।"

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ -এই আয়াতে حَقٌّ দ্বারা মুজাহিদ (রঃ), আবূ সালেহ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর উক্তি হিসেবে মহামহিমান্বিত আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের বাসনা অনুযায়ী শরীয়ত নির্ধারণ করতেন তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিশৃংখল হয়ে পড়তো। যেমন মহান আল্লাহ তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ "দুই জনপদের মধ্য হতে কোন বড় (নেতৃস্থানীয়) লোকের উপর কেন এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি?" (৪৩ ঃ ৩১) তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছেঃ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ অর্থাৎ "তারাই কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করছে?" আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ

অর্থাৎ "তুমি বলে দাওঃ যদি তোমাদেরই হাতে আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার থাকতো তবে তোমরা অবশ্যই খরচের ভয়ে তা আটকিয়ে রাখতে।" (১৭ ঃ ১০০) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا -

অর্থাৎ "তবে কি রাজ-শক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকেও এক কপর্দকও দিবে না।" (৪ ঃ ৫৩) সুতরাং এ সমুদয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানবীয় মস্তিষ্ক মাখলূকের ব্যবস্থাপনার মোটেই যোগ্যতা রাখে না। এটা একমাত্র আল্লাহর মাহাত্ম্য যে, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ফরমান, তাঁর কার্যাবলী, তাঁর শরীয়ত, তাঁর তকদীর, তাঁর তদবীর তাঁর

সৃষ্টজীবের জন্যে কামেল বা পূর্ণ এবং সবই সমস্ত মাখলূকের প্রয়োজন পূরণের অনুকূলে। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নেই কোন প্রতিপালক।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের দিয়েছি উপদেশ অর্থাৎ কুরআন, কিন্তু তারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

স্বীয় নবী (সঃ)-কে আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেনঃ তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? অর্থাৎ তুমি তাদের কাছে তো কোন প্রতিদান চাও না। তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা প্রদানকারী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের কাছে যে প্রতিদান চেয়েছি তা তোমাদেরই জন্যে, আমার প্রতিদান তো রয়েছে আল্লাহরই দায়িত্বে।" (৩৪ : ৪৭) আরো বলেনঃ

قُلْ مَآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ۔

অর্থাৎ "তুমি বল— আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছি না এবং আমি লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (৩৮ : ৮৬) অন্যত্র বলেনঃ

قُلْ لَّآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ "তুমি বলঃ এর জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান যাঞ্চা করছি না, শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখাই আমার কাম্য।" (৪২ঃ ২৩) আরো বলেনঃ

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا۔

অর্থাৎ "নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো, সে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না।" (৩৬ : ২০-২১) এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। তুমি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) শায়িত ছিলেন, এমন সময় দু'জন ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করেন। তাঁদের একজন তাঁর পদদ্বয়ের নিকট এবং অপরজন তাঁর শিয়রে উপবেশন করেন। তাঁর

পদদ্বয়ের পাশে উপবিষ্টজন শিয়রে উপবিষ্টজনকে বলেনঃ "তাঁর ও তাঁর উম্মতের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।" তিনি তখন বললেনঃ "তাঁদের দৃষ্টান্ত ভ্রমণরত ঐ যাত্রী দলের মত যারা জনশূন্য এক মরুপ্রান্তরে অবস্থান করছিল। না তাদের কাছে পাথেয় ছিল, না খাদ্য ও পানীয় ছিল। তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ারও শক্তি ছিল না এবং পিছনে হটবারও ক্ষমতা ছিল না। তাদের পরিণতি কি হবে এই চিন্তায় ছিল তারা উদ্বিগ্ন। এমন সময় তারা দেখলো যে, একজন সৎ ও ভদ্রলোক সুন্দর পোশাক পরিহিত অবস্থায় চলে আসছেন। তিনি তাদেরকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখে বললেনঃ "যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে আমার সাথে যাত্রা শুরু কর তবে আমি তোমাদেরকে ফলভর্তি বাগানে এবং পানিপূর্ণ জলাশয়ে পৌঁছিয়ে দিবো।" তারা তাঁর কথা মেনে নিলো এবং সত্যিই তিনি তাদেরকে সবুজ-শ্যামল তরুতাজা বাগানে এবং প্রবাহিত জলাশয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানে তারা নির্বিঘ্নে পানাহার করলো এবং পরিতৃপ্ত হওয়ার কারণে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। একদিন ঐ ভদ্রলোকটি তাদেরকে বললেনঃ "দেখো, আমি তোমাদেরকে ঐ ধ্বংস ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করে এখানে এনেছি। যদি এখন তোমরা আমার কথা মেনে নাও তবে আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উন্নতমানের বাগানে, এর চেয়েও উত্তম জায়গায় এবং এর অপেক্ষাও বেশী উন্নতমানের জলাশয়ে পৌঁছিয়ে দিবো।" তাঁর এ কথায় তাদের একটি দল সম্মত হয়ে গেল এবং তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু অপর একটি দল বললোঃ "আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। আমরা এখানেই থাকবো।"[১]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা প্রজাপতি ও বর্ষাকালীন পোকা-মাকড়ের মত আমার থেকে ছুটে ছুটে আগুনে পড়তে রয়েছো। তোমরা কি চাচ্ছ যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিই? জেনে রেখো যে, হাউযে কাওসারের উপরও আমি তোমাদের নেতা হবো। তোমরা এক এক করে এবং দলবদ্ধ হয়ে আমার নিকট আসবে। আমি তোমাদেরকে চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে চিনে নেবো, যেমন একজন অপরিচিত লোক অন্যদের উটগুলোর মধ্য হতে নিজের উটকে চিনে থাকে। আমার চোখের সামনে তোমাদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে বাম দিকের শাস্তির ফেরেশতারা ধরে নিয়ে যেতে চাইবে। আমি তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আরয করবোঃ হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সম্প্রদায়ের ও উম্মতের লোক। উত্তরে তিনি বলবেনঃ 'তোমার (তিরোধানের) পর তারা ধর্মকার্যে যে

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিল তা তুমি জান না। তোমার পরে তারা পশ্চাদপদে ফিরে গিয়েছিল।' আমি ঐ লোকটিকেও চিনে নেবো যে কাঁধের উপর বকরী উঠিয়ে নিয়ে আসবে। বকরী প্যাঁ প্যাঁ শব্দ করতে থাকবে। লোকটি আমার নাম ধরে ডাকতে থাকবে। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলে দেবোঃ 'আমি আজ আল্লাহর সামনে তোমার কোন উপকার করতে পারবো না। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।' অনুরূপভাবে কেউ উট নিয়ে আসবে, উট শব্দ করতে থাকবে। লোকটি হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)! বলে ডাক দেবে। কিন্তু আমি তাকে বলবোঃ আল্লাহর কাছে তোমার ব্যাপারে আমি কোনই অধিকার রাখি না। আমি তোমার নিকট তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। কেউ কেউ এমন অবস্থায় আসবে যে, ঘোড়া তার কাঁধে সওয়ার হয়ে থাকবে এবং ঐ ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি করবে। লোকটি আমাকে ডাকবে। কিন্তু অনুরূপ জবাবই আমি দেবো। কেউ চামড়ার মোশক বহন করে নিয়ে আসবে এবং বলবেঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি বলবোঃ আমি আজ তোমার ব্যাপারে কোন কিছুরই অধিকারী নই। আমি তো তোমার কাছে মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত। যখন কোন লোক সোজা-সরল পথ হতে সরে পড়ে তখন আরববাসী বলে থাকেঃ

نَكَبَ فُلَانٌ عَنِ الطَّرِيْقِ অর্থাৎ 'অমুক রাস্তা হতে বিচ্যুত হয়েছে।'

আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর পরিপক্কতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ আমি তাদের প্রতি দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

যা কিছু হয়নি তা যখন হবে তখন কিভাবে হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। এজন্যেই অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ۔

অর্থাৎ "আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতেন তবে অবশ্যই তাদেরকে শুনাতেন। আর যদি তাদেরকে শুনাতেনও তবুও তারা বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

১. এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রঃ) বলেন যে. হাদীসটির সনদ তো হাসান বটে, কিন্তু এর হাফস ইবনে হুযাইদ নামক একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত। তবে ইমাম ইয়াহইয়া আবি মুঈন (রঃ) তাঁকে সৎ বলেছেন এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে হিব্বানও (রঃ) তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন।

করতো।" (৮ ঃ ২৩) আর এক জায়গায় আছে– "হায়, যদি তুমি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে (পুনরায় দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা নিষিদ্ধ কাজগুলোর দিকে আবার ফিরে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।" সুতরাং এগুলো এমন বিষয় যা হবে না, কিন্তু হলে কি হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন কারীমে যে বাক্য لَوْ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা কখনই সংঘটিত হবে না।

٧٦- وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

৭৬। আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।

٧٧- حَتّٰىٓ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ؏

৭৭। অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেই তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

٧٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৭৮। তিনিই তোমাদের জন্যে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।

٧٩- وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৭৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে।

৮০। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

٨٠- وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

৮১। এতদসত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীগণ।

٨١- بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ ○

৮২। তারা বলেঃ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?

٨٢- قَالُوٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ○

৮৩। আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও; এটা তো কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

٨٣- لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম অর্থাৎ আমি তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করে ফেললাম, কিন্তু এতেও তারা না কুফরী পরিত্যাগ করলো, না তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হলো। বরং তখন তারা কুফরী ও বিভ্রান্তির উপর অটল থাকলো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ "তাদের কাছে যখন আমার শাস্তি এসে গেল তখন কেন তারা বিনীতভাবে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে।" (৬ ঃ ৪৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে যা কুরায়েশদের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে না

মানার কারণে পতিত হয়েছিল, যার অভিযোগ নিয়ে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট গমন করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যম দিয়ে বলছি যে, (দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়ে এখন) আমরা গোবর ও রক্ত খেতে শুরু করে দিয়েছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا ... الخ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[১]

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের মত এদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন!"[২]

হযরত আমর ইবনে কাইসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ)-কে বন্দী করা হলে তথায় একজন নব যুবক তাঁকে বলেনঃ "হে আবূ আবদিল্লাহ (রঃ)! আপনার মনোরঞ্জনের জন্যে আমি কিছু কবিতা পাঠ করবো কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এখন আমরা আল্লাহর শাস্তির মধ্যে রয়েছি। আর যারা এরূপ অবস্থাতেও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে না তাদের বিরুদ্ধে কুরআন কারীমে অভিযোগ করা হয়েছে।" অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটি রোযা রাখেন (মাঝে ইফতার না করে)। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আবূ আবদিল্লাহ! এটা কিরূপ রোযা (যাতে আপনি মাঝে ইফতার করেননি)?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমাদের জন্যে একটি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা হয়েছে, সুতরাং আমরাও একটা নতুন বিষয় উদ্ভাবন করলাম। অর্থাৎ আমাদেরকে বন্দী করে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, সুতরাং আমরাও ইবাদতে বাড়াবাড়ি করলাম।"[৩]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দরযা খুলে দেই তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে শাস্তির কথা তারা কল্পনাও করেনি সেই শাস্তি আকস্মিকভাবে যখন তাদের উপর এসে পড়ে তখন তারা পরিত্রাণ লাভে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তিনি চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর একত্ব

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসাঈতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

৩. মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে এটা বর্ণনা করা হয়েছে।

ও ব্যাপক ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধিপত্য অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু যতই নিয়ামত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই শুকরগুযারী কমে যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেনঃ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ "তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।" আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

তোমার চাহিদা থাকলেও অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়।" (১২ ঃ ১০৩)

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এবং মহাশক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। প্রথমেও তিনি সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পরে পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করবেন। ছোট, বড়, পূর্বের ও পরের কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। পচা সড়া হাড়কে জীবিতকারী এবং মানুষকে মৃত্যুদানকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমেই দিন যাচ্ছে রাত্রি আসছে এবং রাত্রি যাচ্ছে দিন আসছে। সুশৃংখলভাবে একটার পর একটা আসছে ও যাচ্ছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।" (৩৬ ঃ ৪০) তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তবুও কি তোমরা বুঝবে না? এতো বড় বড় নিদর্শন দেখেও কি তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে চিনবে না? তিনি যে মহা-ক্ষমতাবান ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী এটা তোমাদের মেনে নেয়া উচিত।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এতদসত্ত্বেও তারা বলে, যেমন বলেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। প্রকৃত কথা এই যে, এ যুগের কাফির ও পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের অন্তর একই। তাদের ও এদের উক্তির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। ঐ উক্তি হলোঃ "আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হবো? এটা বোধগম্য নয়। এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এই প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। এটা তো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা তো মৃত্যুর পরে কাউকেও জীবিত হতে দেখিনি।" এর দ্বারা তারা বুঝাতে

চেয়েছে যে, পুনরুত্থান সম্ভব নয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ

ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ـ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ـ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ـ

অর্থাৎ "(তারা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবো) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে, তাই যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। এটা তো শুধু এক বিকট আওয়াজ, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।" (৭৯ ঃ ১১-১৪) আর এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ـ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ـ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সামনে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

٨٤- قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮৪। জিজ্ঞেস করঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো?

٨٥- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৮৫। তারা বলবেঃ আল্লাহর; বলঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

٨٦- قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

৮৬। জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি?

৮৭। তারা বলবেঃ আল্লাহ্; বলঃ তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।

٨٧- سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ○

৮৮। জিজ্ঞেস করঃ সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো?

٨٨- قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৮৯। তারা বলবেঃ আল্লাহ্র; বলঃ তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?

٨٩- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

৯০। বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী।

٩٠- بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ব, সৃষ্টির কর্তৃত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ও আধিপত্য সাব্যস্ত করছেন যাতে অবহিত হওয়া যায় যে, প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র তিনিই। তাঁর ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করা মোটেই উচিত নয়। তিনি এক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। তাই তিনি স্বীয় সম্মানিত রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর– এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে সে সব কার, যদি তোমরা জানো? তারা অবশ্যই উত্তরে বলবেঃ আল্লাহ্র; সুতরাং তুমি তাদেরকে বলঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক যখন একমাত্র আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কেউ নয় তখন তিনি একাই কেন মা'বূদ হবেন না? কেনই বা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদত করা হবে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা তাদের মা'বূদদেরকেও আল্লাহ্র সৃষ্ট ও তাঁর দাস বলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মনে করে এই উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদত করে যে, তাদের মাধ্যমে তারাও তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। সুতরাং নবী (সঃ)-কে বলা হচ্ছে, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও আরশের অধিপতি? অবশ্যই তারা উত্তর দেবে যে, এগুলোর অধিপতি হচ্ছেন

একমাত্র আল্লাহ। তাহলে হে রাসূল (সঃ)! তুমি আবারও তাদেরকে বলঃ এই স্বীকারোক্তির পরেও কি তোমরা এতোটুকুও বুঝ না যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই? কেননা, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা তো তিনি ছাড়া আর কেউই নয়? তিনিই আকাশকে মাখলূকের জন্যে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর শান বা মাহাত্ম্য খুবই বড়। তাঁর আরশ আকাশসমূহের উপর এই ভাবে রয়েছে।" তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ইশারা করে গম্বুজের মত দেখিয়ে দেন।"[১]

অন্য হাদীসে আছে যে, সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক কুরসীর তুলনায় এমনই যেমন কোন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে কোন বৃত্ত। আর কুরসীও সমুদয় জিনিসসহ আরশের তুলনায় ঠিক অনুরূপ। পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, আরশের একদিক হতে অন্য দিকের দূরত্ব হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। সপ্ত যমীন হতে ওর উচ্চতা পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। আরশের উচ্চতার কারণেই ওর এই নামকরণ করা হয়েছে।

হযরত কাব আহবার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরশের তুলনায় আকাশ এমনই যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কোন লণ্ঠন থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, আল্লাহ তা'আলার আরশের তুলনায় আসমান ও যমীন এমনই যেমন কোন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে কোন আংটি পড়ে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আরশের বড়ত্ব ও বিরাটত্বের সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই করতে পারে না।

পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, আরশ লাল রঙ-এর ইয়াকূত বা মণি-মানিক্য দ্বারা নির্মিত। এই আয়াতে عَرْشُ عَظِيْمُ এবং এই সূরার শেষে عَرْشُ كَرِيْمُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অত্যন্ত বড় ও খুবই সুন্দর। সুতরাং দৈর্ঘে, প্রস্থে, বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে ওটা অতুলনীয়। এ কারণেই কেউ কেউ এটাকে রক্তিম বর্ণের ইয়াকূত বলেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট রাত দিন কিছুই নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জোতির্ময় হয়েছে। মোটকথা, এই প্রশ্নের জবাবে মুশরিক ও কাফিররা এ কথাই বলবে যে, আসমান, যমীন এবং আরশের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয়

১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নবী (সঃ)-কে বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলঃ তবুও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করছো না কেন? কেন তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের উপাসনা করছো?

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের হাদীসটি প্রায়ই বর্ণনা করতেনঃ "অজ্ঞতার যুগে একটি স্ত্রী লোক পাহাড়ের চূড়ায় ছাগল চরাতো। তার সাথে তার পুত্রও থাকতো। একদা তার পুত্র তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আম্মা! বলুন তো, আপনাকে কে সৃষ্টি করেছেন?' উত্তরে সে বলে, 'আল্লাহ।' পুত্র প্রশ্ন করে– 'আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করেছেন?' সে জবাব দেয়, 'আল্লাহ।' ছেলে আবার জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে সৃষ্টি করেছেন কে?' সে উত্তর দেয়, 'আল্লাহ।' পুত্র পুনরায় প্রশ্ন করে, 'এই আকাশের সৃষ্টিকর্তা কে?' সে জবাবে বলে, 'আল্লাহ।' ছেলে প্রশ্ন করে, 'যমীন সৃষ্টি করেছেন কে?' সে উত্তর দেয়, 'আল্লাহ।' পুত্র জিজ্ঞেস করে, 'এই পাহাড়গুলো কে সৃষ্টি করেছেন?' জবাবে সে বলে, 'এইগুলোর সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ।' ছেলে প্রশ্ন করে, 'এই ছাগলগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে?' মা উত্তর দেয়, 'এই ছাগলগুলোর সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহই বটে।' ছেলেটি এসব উত্তর শুনে বলে, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার এত বড় মাহাত্ম্য!' অতঃপর তার অন্তরে আল্লাহর বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে স্থান পেলো যে, সে কাঁপতে শুরু করলো এবং কম্পনের ফলে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে পড়ে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো।"[১]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ জিজ্ঞেস কর সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই নিম্নলিখিত শব্দগুলোর মাধ্যমে শপথ করতেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ!" কোন গুরুত্বপূর্ণ শপথের সময় বলতেনঃ "যিনি অন্তরসমূহের মালিক এবং যিনি অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী তাঁর শপথ!"

ঘোষিত হচ্ছে–জিজ্ঞেস কর, কে তিনি যিনি সকলকে আশ্রয় দান করে থাকেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই? অর্থাৎ তিনি এতো বড় নেতা ও অধিপতি যে, সমস্ত সৃষ্টি, আধিপত্য ও হুকুমত তাঁরই হাতে রয়েছে। আরবে এই প্রথা ছিল যে, গোত্রপতি কাউকে আশ্রয় দান করলে সবাই তার অনুগত হয়ে যেতো কিন্তু

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) তাঁর 'কিতাবুত তাফাককুর ওয়াল ইতেবার' নামক গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর পিতা উবাইদুল্লাহ ইবনে জাফর আল মাদীনী। তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। এসব ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

গোত্রের কেউ কাউকে আশ্রয় দিলে গোত্রপতিকে তার অনুগত মনে করা হতো না। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান এবং সবারই শাসনকর্তা। তাঁর ইচ্ছা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। যেমন তিনি বলেনঃ

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

অর্থাৎ "তিনি যা করেন তাতে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" (২১ ঃ ২৩) অর্থাৎ কারো ক্ষমতা নাই যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তাঁর কোন কাজের কৈফিয়ত তলব করে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, প্রভাব, মর্যাদা, ক্ষমতা, কৌশল এবং ন্যায়পরায়ণতা অতুলনীয়। মমস্ত মাখলূক তাঁর সামনে অপারগ, অক্ষম ও নিরুপায়। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কাছে তাদের কাজের কৈফিয়ত তলবকারী। এইরূপ গুণে গুণান্বিত কে? এই প্রশ্নের জবাবেও এই মুশরিকরা বলতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী। এই রূপ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বল, এর পরেও কি করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছ? এই স্বীকারোক্তির পরেও কেমন করে তোমরা অন্যদের উপাসনা করছো? এটা তোমাদের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়।

আল্লাহ পাক বলেনঃ বরং আমি তো তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী। তাদের কাছে আমি তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের সাথে সাথে তাওহীদে উলূহিয়্যাত বর্ণনা করেছি, সঠিক প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তারা যে ভুল পথে রয়েছে তা আমি প্রকাশ করে দিয়েছি যে, আমার সাথে অন্যদেরকে শরীক করার ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি এই সূরারই শেষাংশে বলেছেনঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ-

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে, ঐ বিষয়ে তার কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।" (২৩ ঃ ১১৭) সুতরাং মুশরিকরা কোন দলীলের মাধ্যমে

এটা করছে না, বরং তারা তাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করছে মাত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ـ

অর্থাৎ "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এর উপরই পেয়েছি এবং আমরা তাদের পিছনে তাদেরই অনুকরণকারী। (৪৩ঃ ২৩)

৯১- مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

৯১। আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র!

৯২- عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ع

৯২। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধে।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সন্তান ও শরীক হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করছেন। অধিকারিত্বে, ব্যবস্থাপনায় ও ইবাদতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে তিনি একক। তাঁর সন্তানও নেই এবং অংশীদারও নেই। যদি কয়েকটি মা'বূদ মেনে নেয়া হয় তবে প্রত্যেক মা'বূদের স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। আর এরূপ হলে সৃষ্টিজগতে শৃঙ্খলা বজায় থাকা সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা ও পরিচালনা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। ঊর্ধজগত, নিম্নজগত, আসমান, যমীন ইত্যাদি পরস্পরের পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নিজ নিজ নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত ও ব্যস্ত রয়েছে। এগুলো বিধিবদ্ধ আইন-শৃঙ্খলা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয় না। সুতরাং জানা গেল যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, কয়েকজন নয়। কয়েকটি মা'বূদ মেনে নেয়া অবস্থায় এটাও প্রকাশমান যে, একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইবে। একজন বিজয়ী হলে অপরজন আর

মা'বূদ থাকে না। আবার বিজয়ীজন বিজয় লাভে অসমর্থ হলে সেও আর মা'বূদ থাকে না। এ দু'টো দলীল এটাই প্রমাণ করছে যে, মা'বূদ একজনই এবং তিনিই আল্লাহ। দার্শনিকদের পরিভাষায় এই দলীলকে দলীলে তামানু' বলা হয়। তাঁদের যুক্তি এই যে, যদি দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয় তবে একজন চাইবে দেহকে গতি বিশিষ্ট রাখতে এবং অপরজন চাইবে ওটাকে গতিবিহীন রাখতে। এখন যদি দু'জনেরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবে দু'জনই অপারগ প্রমাণিত হবে। তাহলে কেউই আল্লাহ হতে পারবে না। কেননা ওয়াজিব কখনো অপারগ হয় না। আর দু'জনেরই উদ্দেশ্য যে সফল হবে এটাও সম্ভব নয়। কারণ, একজনের চাহিদা অপরজনের বিপরীত। সুতরাং দু'জনেরই চাহিদা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আর এই অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি এ কারণেই হচ্ছে যে, দুই বা ততোধিক আল্লাহ মেনে নেয়া হয়েছিল। সুতরাং এই বেশী সংখ্যা বাতিল হয়ে গেল। এখন বাকী থাকলো তৃতীয় অবস্থা, অর্থাৎ একজনের চাহিদা পূর্ণ হলো এবং অপরজনের পূর্ণ হলো না। যার চাহিদা পূর্ণ হলো সে তো থাকলো বিজয়ী ও ওয়াজিব, আর যার চাহিদা পূর্ণ হলো না সে হয়ে গেল পরাজিত ও মুমকিন বা সম্ভাবনাময়। কেননা, ওয়াজিবের বিশেষণ এটা নয় যে, সে পরাজিত হবে। তাহলে এই অবস্থাতেও আল্লাহর সংখ্যার আধিক্য বাতিল হয়ে গেল। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, মা'বূদ একজনই।

এই উদ্ধত, যালিম ও সীমালংঘনকারী মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সন্তান থাকার কথা বলছে এবং তাঁর শরীক স্থাপন করছে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধে। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। সৃষ্টজীবের কাছে যা কিছু অজ্ঞাত আছে এবং যা কিছু তাদের কাছে প্রকাশমান এই সবকিছুরই খবর আল্লাহ তা'আলা রাখেন। মুশরিকরা যাদেরকে তাঁর শরীক করছে তাদের থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি তাদের থেকে বহু ঊর্ধে রয়েছেন। তিনি হলেন অতুলনীয়।

৯৩। বলঃ হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, তা যদি আপনি আমাকে দেখাতে চান।

٩٣- قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ○

৯৪। তবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

٩٤- رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ○

٩٥- وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ○

৯৫। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

٩٦- اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ○

৯৬। মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٩٧- وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ○

৯৭। আর বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে।

٩٨- وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ○

৯৮। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি যেন দু'আ করেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি আমার বিদ্যমানতায় ঐ অসৎ লোকদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তবে আমাকে ঐ শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন। যেমন হাদীসে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আপনি কোন কওমকে ফিৎনায় পতিত করার ইচ্ছা করেন তখন ফিৎনায় পতিত করার পূর্বেই আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নেন।"[১]

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে এই শিক্ষা দেয়ার পর বলেনঃ আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে ঐ কাফিরদের উপর যে শাস্তি ও বিপদ-আপদ আসবে তা ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে দেখাতে পারি।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)-কে এমন কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন যা সমস্ত কঠিন সমস্যা ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। তা হলো, তুমি মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। অর্থাৎ যারা তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর যাতে তাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে এবং ঘৃণা প্রেম-প্রীতিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেনঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

অর্থাৎ "মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল; এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।" (৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচবার উত্তম পন্থা বলে দেয়ার পর মহান আল্লাহ শয়তানের অনিষ্ট হতে বাঁচবার উপায় বলে দিচ্ছেনঃ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। কেননা, তার প্ররোচনা হতে বাঁচবার অস্ত্র এই প্রার্থনা ছাড়া তোমাদের অধিকারে আর কিছুই নেই। সদাচরণ দ্বারা সে মানুষের বশে আসতে পারে না। আশ্রয় প্রার্থনা করার বর্ণনায় আমরা লিখে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করতেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ

অর্থাৎ "আমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা, কুমন্ত্রণা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। শয়তান যেন আমার কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

সুতরাং প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর স্মরণ ঐ কাজের মধ্যে শয়তানের প্রবেশকরণকে সরিয়ে রাখে। পানাহার, সহবাস, যবেহ ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের দু'আটিও পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতি বার্ধক্য হতে, আশ্রয় চাচ্ছি পিষ্ট হয়ে (আকস্মিকভাবে) মৃত্যুবরণ করা হতে ও ডুবে মরা হতে এবং শয়তান যেন আমাকে আমার মৃত্যুর সময় বিভ্রান্ত করতে না পারে সে জন্যে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কছি।"[১]

হযরত আমর ইবনে শোআইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে একটি দু'আ শিখাতেন যেন ওটা আমরা ঘুমোবার সময় পাঠ করি যাতে উদ্বেগের কারণে নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার রোগ দূর হয়ে যায়। তা হলোঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি আল্লাহর নামে তাঁর পূর্ণ কালেমার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর গযব হতে, তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানদের প্ররোচনা হতে এবং আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নীতি ছিল এই যে, তিনি তাঁর প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে উপরোক্ত দু'আটি শিখিয়ে দিতেন এবং এটা লিখে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গলায় লটকিয়ে দিতেন।[২]

৯৯- حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ

৯৯। যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন!

---

১. এটা ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

١٠٠- لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

১০০। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি; না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মৃত্যুর সময় কাফির ও পাপীরা ভীষণ লজ্জিত হয় এবং দুঃখ ও আফসোসের সাথে আকাঙ্ক্ষা করে যে, হায়! যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে তারা সৎ কাজ করতো! কিন্তু ঐ সময় তাদের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৃথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَانْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ হতে وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত। অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্যে অবকাশ দিলে আমি সাদকা দিতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দিবেন না; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (৬৩ : ১০-১১) আর এক জায়গায় বলেনঃ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ হতে مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ পর্যন্ত। অর্থাৎ "যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্যে অবকাশ দিন! আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো! (উত্তরে বলা হবে) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?" (১৪ : ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের

সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী!" (৩২ ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় আছেঃ

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না– হতে– নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" (৬ ঃ ২৭-২৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ـ

অর্থাৎ "তুমি যালিমদেরকে দেখবে, যখন তারা শাস্তি অবলোকন করবে তখন বলবেঃ আমাদের ফিরবার কোন পথ আছে কি?" (৪২ ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় আছেঃ

قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ "তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দু'বার আমাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন এবং দু'বার জীবিত করেছেন, এখন আমরা আমাদের পাপসমূহ স্বীকার করে নিয়েছি, সুতরাং (জাহান্নাম হতে) বের হওয়ার কোন পথ আছে কি?" (৪০ ঃ ১১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ـ

অর্থাৎ "তারা ওর মধ্যে চীৎকার করে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (জাহান্নাম হতে) বের করে নিন (এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন), তাহলে আমরা (পূর্বের) কৃত (মন্দ) আমল বাদ দিয়ে ভাল আমল করবো। (উত্তরে বলা হবেঃ) তোমাদেরকে কি আমি এমন বয়স দান করিনি যে, যে উপদেশ গ্রহণ করার (ইচ্ছা করতো) সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? আর

তোমাদের কাছে তো ভয় প্রদর্শকের আগমন ঘটেছিল, সুতরাং (আজ ওসব কথা বলে কোন লাভ নেই, বরং) তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, অত্যাচারীদের জন্যে কোনই সাহায্যকারী নেই।" (৩৫ ঃ ৩৭) এ সব আয়াতে এই বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এইরূপ পাপী লোকেরা মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে এবং সৎ আমল করার অঙ্গীকার করবে। কিন্তু ঐ সময় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। এটা ঐ কথা যা ঐ ভয়াবহ অবস্থায় বাধ্য হয়েই তারা বলে ফেলবে। আর প্রকৃতপক্ষে ওটা শুধু তাদের মুখের কথা। যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়েও দেয়া হয় তবুও তারা ভাল কাজ করবে না। বরং পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। তারা তো মিথ্যাবাদী। কতই না ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে এই পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করে থাকে। আর ঐ লোকগুলো কতই না হতভাগ্য যারা ঐ বিচার দিবসে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষা করবে না এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক তারা কামনা করবে না, বরং দুনিয়ায় মাত্র কয়েক দিন বাস করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করার আকাঙ্ক্ষা করবে। কিন্তু সেই দিনের আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও বাসনা সবই বৃথা হবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, যখন তারা এরূপ আকাঙ্ক্ষা করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলবেনঃ "এটা শুধু তোমাদের মুখের কথা। এর পরেও তোমরা ভাল কাজ করবে না।"

হযরত আ'লা ইবনে যিয়াদ (রঃ) কতই না সুন্দর কথা বলেছেন! তিনি বলেছেনঃ "তোমরা এটা মনে করে নাও যে, আমার মৃত্যু এসে গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট কয়েক দিনের অবকাশ চেয়েছিলাম যাতে আমি পুণ্য অর্জন করতে পারি। তিনি আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। সুতরাং এখন অন্তর খুলে পুণ্য কামানো আমার উচিত।"

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "তোমরা কাফিরদের এই আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করে নিজেদের জীবনের মুহূর্তগুলো আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগিয়ে দাও।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, যখন কাফিরকে কবরে রাখা হয় এবং সে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখে নেয় তখন বলেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ফিরিয়ে দিন, আমি তাওবা করবো ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করবো।" উত্তরে বলা হবেঃ "তোমাকে যে বয়স দেয়া হয়েছিল তা তুমি শেষ করে ফেলেছো।"[১] অতঃপর তার কবরকে সংকুচিত করে দেয়া হবে এবং সর্প ও বিচ্ছু তাকে দংশন করতে থাকবে।

১. এটা মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, পাপীদের কবর অত্যন্ত বিপদপূর্ণ ও ভয়াবহ জায়গা। তাদের কবরের মধ্যে কালো সর্প তাদেরকে দংশন করতে থাকে। এই সর্পগুলোর মধ্যে একটি বিরাটাকার সাপ প্রত্যেকের শিয়রে থাকে এবং অনুরূপ আর একটি সাপ থাকে তার পায়ের কাছে। সাপ দু'টি তাকে দংশন করতে করতে এগুতে থাকে এবং দেহের মধ্যভাগে এসে উভয়ে মিলিত হয়। এটাই হলো বারযাখের শাস্তি যার কথা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন।[১]

مِنْ وَّرَآءِهِمْ بَرْزَخٌ-এর অর্থ করা হয়েছেঃ তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে। বারযাখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে পর্দা বা আড়। সে না সরাসরি দুনিয়ায় আছে যে, পানাহার করবে এবং না সরাসরি আখিরাতে আছে যে, আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। বরং রয়েছে এ দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায়। সুতরাং এই আয়াতে অত্যাচারী ও সীমালংঘন কারীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আলমে বারযাখেও তাদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে রাখা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ مِنْ وَّرَآءِهِمْ جَهَنَّمُ অর্থাৎ "তাদের সামনে জাহান্নাম রয়েছে।" (৪৫ ঃ ১০) আর এক জায়গায় আছেঃ وَمِنْ وَّرَآءِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ অর্থাৎ "তার সামনে রয়েছে খুবই কঠিন শাস্তি।" (১৪ ঃ ১৭) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর বারযাখের এই শাস্তি চালু থাকবে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "ওর মধ্যে সদা সর্বদা সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।" অর্থাৎ যমীনের মধ্যে (তাকে সব সময় শাস্তি দেয়া হবে)।

١٠١- فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

১০১। এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবে না।

١٠٢- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০২। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।

---

১. এটাও মুহাম্মাদ ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১০৩। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

١٠٣- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ۚ

১০৪। অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়।

١٠٤- تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ۝

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন পুনরুত্থানের জন্যে শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং মানুষ জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে পড়বে তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং একে অপরের কোন খোঁজ খবর নিবে না। না পিতার সন্তানের উপর কোন ভালবাসা থাকবে, না সন্তান পিতার দুঃখে দুঃখিত হবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ـ يُبَصَّرُونَهُمْ

অর্থাৎ "সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না, তাদের এককে অপরের দৃষ্টি গোচর করা হবে।" (৭০-১০-১১) আর এক জায়গায় আছেঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ـ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ـ وَصَاحِبَتِهِ ـ وَبَنِيهِ ـ

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে।" (৮০ ঃ ৩৪-৩৬)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ "যার কোন হক অন্যের উপর রয়েছে সে যেন এসে তার হক তার নিকট থেকে নিয়ে যায়।" এ কথা শুনে কারো হক তার পিতার উপর থাকলে বা পুত্রের উপর থাকলে অথবা স্ত্রীর উপর থাকলে সেও আনন্দিত হয়ে দৌড়িয়ে আসবে এবং নিজের হক বা প্রাপ্যের জন্যে তার কাছে তাগাদা শুরু করে দেবে। যেমন এই আয়াতে রয়েছে।[১]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফাতেমা (রাঃ) আমার দেহের একটা অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয় সে আমাকেও কষ্ট দেয়। আর যে তাকে খুশী করে সে আমাকেও খুশী করে। কিয়ামতের দিন সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।"[১]

এই হাদীসের মূল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফাতেমা (রাঃ) আমার দেহের একটা অংশ। তাকে অসন্তুষ্টকারী ও কষ্টদানকারী আমাকেও অসন্তুষ্টকারী ও কষ্টদানকারী।"

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছেনঃ "লোকদের কি হয়েছে যে, তারা বলে–রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়তার সম্পর্কও তাঁর কওমের কোন উপকারে আসবে না? আল্লাহর শপথ! আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়া ও আখিরাতে মিলিতভাবে রয়েছে। হে লোক সকল! আমি তোমাদের আসবাব পত্রের রক্ষক হবো যখন তোমরা আসবে।" একটি লোক বলবেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি অমুকের পুত্র অমুক।" আমি উত্তরে বলবোঃ "হ্যাঁ, আমি বংশ চিনে নিয়েছি। কিন্তু আমার পরে তুমি বিদআতের আবিষ্কার করেছিলে এবং উল্টো পদে ফিরে গিয়েছিলে।"[২]

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মুসনাদে কয়েকটি সনদের মাধ্যমে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যখন তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "কিয়ামতের দিন সমস্ত মূল ও বংশের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বংশ ও মূলের সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।" এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর মোহর ধার্য করেছিলেন চল্লি[illegible]ার (দিরহাম)।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া সমস্ত বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
৩. এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি যে, যেখানে আমার বিয়ে হয়েছে এবং যার সাথে আমি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি তারা সবাই যেন জান্নাতে আমার সঙ্গ লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা আমার এ দু'আ কবূল করেছেন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। যার একটি মাত্র পুণ্য পাপের উপর বেশী হবে সেই পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। তার উদ্দেশ্য সফল হবে এবং যা থেকে সে ভয় করতো তা থেকে সে বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, অর্থাৎ পুণ্যের চেয়ে পাপ বেশী হয়ে যাবে তারা হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ফেরেশতা দাঁড়ি-পাল্লার উপর নিযুক্ত থাকবেন যিনি প্রত্যেক মানুষকে দাঁড়ি-পাল্লার দুই পাল্লার মাঝে দাঁড় করিয়ে দিবেন। অতঃপর পাপ ও পুণ্য ওজন করা হবে। যদি পুণ্য বেশী হয়ে যায় তবে তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবেনঃ "অমুকের পুত্র অমুক মুক্তি পেয়ে গেছে। এরপর ক্ষতি ও ধ্বংস তার কাছেও যাবে না।" আর যদি পাপ বেশী হয়ে যায় তবে সবারই সামনে তিনি উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবেনঃ "অমুকের পুত্র অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন সে কল্যাণ লাভে বঞ্চিত হয়েছে।"[১]

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা চিরদিনই জাহান্নামে থাকবে। কখনো তাদেরকে তা থেকে বের করা হবে না।

অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। আগুনকে সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা তাদের হবে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রথম অগ্নিশিখা তাদেরকে জড়িয়ে ধরামাত্রই তাদের গোশ্ত অস্থি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তাদের পায়ের উপর পড়ে যাবে।[২] ফলে তাদের চেহারা বীভৎস ও বিকৃত হয়ে যাবে। দাঁত বের হয়ে থাকবে, ওষ্ঠ উপরের দিকে উঠে

১. এটা হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী দাঊদ ইবনে হাজর দুর্বল ও বর্জনীয়।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

যাবে এবং অধর নীচের দিকে নেমে থাকবে। উপরের ঠোঁট তালু পর্যন্ত উঠে যাবে এবং নীচের ঠোঁট নাভী পর্যন্ত নেমে আসবে।"[১]

১০৫। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা ওগুলো অস্বীকার করতে!

١٠٥- اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

১০৬। তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

١٠٦- قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ○

১০৭। হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো।

١٠٧- رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○

কাফিরদেরকে তাদের কুফরী, পাপ ও সত্য-প্রত্যাখ্যানের কারণে কিয়ামতের দিন যে ভীতি প্রদর্শন করা হবে ও ধমক দেয়া হবে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ আমি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তোমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম, তোমাদের সন্দেহ দূর করে দিয়েছিলাম, তোমাদের কোনই যুক্তি-প্রমাণ অবশিষ্ট রাখিনি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

অর্থাৎ "যেন রাসূলদের পরে লোকদের জন্যে আল্লাহর উপর কোন বাদানুবাদের সুযোগ না থাকে।" (৪ : ১৬৫) আর এ জায়গায় বলেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

১. এটা মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে।

অর্থাৎ "রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদানকারী নই।" (১৭ ঃ ১৫) তিনি আরো বলেনঃ

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ হতে كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ السَّعِيرِ। পর্যন্ত। অর্থাৎ "যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবেঃ অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা-বিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরো বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে; সুতরাং অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্যে।" (৬৭ ঃ ৮-১১)

এ জন্যেই তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবো। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ - ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ-

অর্থাৎ "আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন বের হওয়ার কোন পথ আছে কি? তোমাদের এই শাস্তি তো এই জন্যে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে; বস্তুতঃ সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।" (৪০ ঃ ১১-১২) অর্থাৎ এখন তোমাদের জন্যে সব পথই বন্ধ। আমলের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন হলো প্রতিদান প্রদানের সময়। তাওহীদের সময় তোমরা শিরক করেছিলে। সুতরাং এখন অনুশোচনা করে কি লাভ?

১০৮। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।

١٠٨- قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ○

১০৯- اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১০৯। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলতোঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১১০- فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰۤى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ○

১১০। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে।

১১১- اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْۤا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১১১। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে যে, যখন তারা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখন তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাকো। খবরদার! এ ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে কথা বলো না! পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর হবে এটা উক্তি। কাফির ও মুশরিকরা সমস্ত কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা প্রথমে জাহান্নামের রক্ষককে ডাকতে থাকবে। ডাকতে থাকবে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত। কিন্তু কোন উত্তর তারা পাবে না। চল্লিশ বছর পরে উত্তর দেয়া হবেঃ "তোমরা এখানেই পড়ে থাকো।" জাহান্নামের রক্ষকের কাছে এবং মহান আল্লাহর কাছে তাদের ডাকের কোনই গুরুত্ব থাকবে না। আবার তারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে ও বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি এবং বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছি। হে আল্লাহ! এখন

আপনি আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিন এবং পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন! এরপরেও যদি আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি তবে আপনার ইচ্ছামত শাস্তি আপনি দিবেন। আমাদের আর কিছুই বলার থাকবে না।" তাদের এ কথার জবাব তাদেরকে এই দুনিয়ার দ্বিগুণ বয়স পর্যন্তও দেয়া হবে না। তারপর তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা আমার রহমত হতে দূর হয়ে গিয়ে এই জাহান্নামের মধ্যেই লাঞ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করতে থাকো। আমার সাথে আর একটি কথাও বলো না।" তখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে এবং গাধার মত বিকট শব্দ করতে থাকবে। ঐ সময় তাদের চেহারা বদলে যাবে এবং তাদের সুন্দর আকৃতি কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। এমন কি কতকগুলো, মুমিন ব্যক্তি শাফা'আতের অনুমতি লাভ করে এখানে আসবে কিন্তু তাদের কাউকেও চিনতে পারবে না। জাহান্নামীরা তাদেরকে দেখে বলবেঃ "আমি অমুক।" কিন্তু তারা তাদেরকে উত্তরে বলবেঃ "তোমরা মিথ্যা বলছো, আমরা তোমাদেরকে চিনি না।" তখন ঐ জাহান্নামীরা মহান আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। উত্তরে তাদেরকে যে কথা বলা হবে তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামের দরযা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারা সেখানেই সড়তে পচতে থাকবে।

তাদেরকে লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে এক বড় পাপকার্য পেশ করা হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেনঃ আমার বান্দাদের মধ্যে এক দল এমন ছিল যারা বলতো–হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু হে জাহান্নামীর দল! তোমরা আমার ঐ বান্দাদেরকে নিয়ে এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, ওটা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ـ

অর্থাৎ "পাপীরা মুমিনদেরকে দেখে হাসতো ও তাদেরকে উপহাস করতো।" (৮৩ ঃ ২৯)

তাই আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে বলবেনঃ আমি আজ আমার ঐ মুমিন বান্দাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলাম এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করলাম।

١١٢- قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○

১১২। তিনি বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?

١١٣- قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ○

১১৩। তারা বলবেঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন!

١١٤- قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১১৪। তিনি বলবেনঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।

١١٥- اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

১১৫। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?

١١٦- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

১১৬। মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের বয়সে এই মুশরিক ও কাফিররা অন্যায় কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যদি তারা মুমিন হয়ে সৎ কাজ করে থাকতো তবে আজ আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান লাভ করতো। কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমরা দুনিয়ায় কতদিন অবস্থান করেছিলে?" তারা উত্তরে বলবেঃ "খুবই অল্প সময় আমরা দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলাম। ঐ সময়টুকু হবে এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ। গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।" তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এ সময়টুকু বেশী বটে, কিন্তু আখিরাতের সময়ের তুলনায় নিঃসন্দেহে এটা অতি অল্প সময়। যদি

তোমরা এটা জানতে তবে নশ্বর দুনিয়াকে কখনো অবিনশ্বর আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতে না আর খারাপ কাজ করে এই অল্প সময়ে আল্লাহ তা'আলাকে এতো অসন্তুষ্ট করতে না। এই সামান্য সময় যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকতে তবে আজ পরম সুখে থাকতে। তোমাদের জন্যে থাকতো শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতের মধ্যে এবং জাহান্নামীদেরকে জান্নামের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন– 'তোমরা দুনিয়ায় কতদিন অবস্থান করেছিলে?' উত্তর তারা বলবে– 'এই তো একদিন বা একদিনের কিছু অংশ।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন– 'তবে তো তোমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, এই অল্প সময়ের সৎ কার্যের বিনিময়ে এতো বেশী প্রতিদান প্রাপ্ত হয়েছো যে, তোমরা আমার রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করেছো এবং এখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদেরকে তাদের দুনিয়ার অবস্থানকাল জিজ্ঞেস করলে তারাও উত্তর দিবে যে, তারা এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ দুনিয়ায় অবস্থান করেছে। তখন তিনি তাদেরকে বলবেন– 'তোমরা তো তোমাদের ব্যবসায়ে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো! এটুকু সময়ের মধ্যে তোমরা আমার অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও জাহান্নাম ক্রয় করে নিয়েছো, যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে।'

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে আমার কোন হিকমত নেই? তোমাদেরকে কি আমি শুধু খেল-তামাশার জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তোমরা শুধু লাফালাফি করে বেড়াবে? তোমরা পুরস্কার ও শাস্তির অধিকারী হবে না? তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা কি এটা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না? এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?" (৭৫ ঃ ৩৬) আল্লাহর সত্তা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি অযথা কোন কাজ করবেন, তিনি অনর্থক বানাবেন এবং ভেঙ্গে ফেলবেন। এই সত্য ও প্রকৃত সম্রাট এ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ

নেই। সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি, যা ছাদের মত সমস্ত মাখলূককে ছেয়ে রয়েছে। ওটা খুবই ভাল, সুন্দর ও সুদৃশ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَمْ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ-

অর্থাৎ "আমি তাতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিবদ।" (২৬ ঃ ৭)

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) তাঁর শেষ ভাষণে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা অনর্থক সৃষ্ট হওনি এবং তোমাদেরকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হয়নি। মনে রেখো যে, ওয়াদার একটা দিন রয়েছে যেই দিন স্বয়ং আল্লাহ্ ফায়সালা করার জন্যে অবতীর্ণ হবেন। ঐ ব্যক্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হতভাগ্য হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে এবং শূন্য হস্ত হয়ে গেছে যে আল্লাহর করুণা হতে দূর হয়ে গেছে এবং ঐ জান্নাতে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হয়েছে যার বিস্তৃতি সমস্ত যমীন ও আসমানের সমান। তোমাদের কি জানা নেই যে, কাল কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে যার অন্তরে আজ ঐ দিনের ভয় রয়েছে? আর যে এই নশ্বর দুনিয়াকে ঐ চিরস্থায়ী আখিরাতের উপর উৎসর্গ করে দিয়েছে? যে এই অল্পকে ঐ অধিক লাভের উদ্দেশ্যে দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যয় করে দিচ্ছে? আর ঐ দিনের ভয়কে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হওয়ার উপায় অবলম্বন করছে? তোমরা কি দেখো না যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এখন তোমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছো, অনুরূপভাবে তোমরাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এরপর পরবর্তীরা আসবে এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় এসে যাবে যখন সারা দুনিয়া কুঞ্চিত হয়ে ঐ খাইরুল ওয়াসীন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। হে জনমণ্ডলী! মনে রেখো যে, তোমরা রাত দিন নিজেদের মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে রয়েছো এবং নিজেদের কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমাদের ফল পাকতে রয়েছে, তোমাদের আশা শেষ হতে চলেছে, তোমাদের বয়স পূর্ণ হতে রয়েছে এবং তোমাদের আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের যমীনের গর্তে দাফন করে দেয়া হবে। যেখানে না আছে কোন বিছানা, না আছে কোন বালিশ। বন্ধু-বান্ধব সব পৃথক হয়ে যাবে। হিসাব নিকাশ শুরু হবে। আমল সামনে এসে যাবে। যা ছেড়ে এসেছো তা অন্যদের হয়ে যাবে এবং যা আগে পাঠিয়েছো তা তোমার সামনে দেখতে পাবে। তোমরা পুণ্যের মুখাপেক্ষী হবে এবং পাপের শাস্তি ভোগ করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাঁর ওয়াদা সামনে আসার পূর্বে। মৃত্যুর পূর্বেই জবাবদিহি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।"

এসব কথা বলার পর তিনি চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে নিয়ে কাঁদতে শুরু করেন এবং জনগণও কান্নায় ফেটে পড়ে।[১]

বর্ণিত আছে যে, জ্বিনে ধরা এক রুগ্ন ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। তখন তিনি اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا হতে সূরাটির শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো লোকটির কানের মধ্যে পাঠ করেন। সাথে সাথে লোকটি ভাল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আব্দুল্লাহ (রাঃ)! তুমি তার কানের মধ্যে কি পাঠ করেছিলে?" তিনি উক্ত আয়াতগুলো পাঠের কথা বলে দিলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি এ আয়াতগুলো তার কানে পাঠ করে তাকে জ্বালিয়ে (পুড়িয়ে) দিয়েছো। আল্লাহর কসম! যদি কেউ এই আয়াতগুলো বিশ্বাসসহ কোন পাহাড়ের উপর পাঠ করে তবে ঐ পাহাড়টিও নিজের স্থান থেকে সরে যাবে।"[২]

হযরত ইবরাহীম ইবনে হারিস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর পিতা) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এক সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন সকাল-সন্ধ্যায় اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করতে থাকি। তাঁর নির্দেশমত আমরা সকাল-সন্ধ্যায় এটা বরাবরই পাঠ করতে থাকি। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, আমরা বিজয় লাভ করে গনীমতের মালসহ নিরাপদে ফিরে আসি।"[৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের জন্যে পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভের উপায় হলো এই যে, তারা যখন নৌকায় আরোহণ করবে তখন পাঠ করবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটাও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এটা আবূ নঈম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "আমি সত্য মালিকের নামে শুরু করছি। তারা আল্লাহকে তাঁর সঠিক ও ন্যায্য মর্যাদা দেয়নি, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তাঁর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর দক্ষিণ হস্তে জড়ানো থাকবে, তিনি পবিত্র ও সমুন্নত ঐগুলো হতে যেগুলোকে তারা তাঁর শরীক করছে। আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

১১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে, ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।

١١٧- وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

১১৮। বলঃ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

١١٨- وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা যে শিরক করছে এর কোন দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তাদের কাছে নেই। এটা হলো جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ এবং শরতের জাযা فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ-এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ এর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। কাফির তাঁর কাছে কৃতকার্য হতে পারে না। সে পরিত্রাণ লাভে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কার উপাসনা কর?" উত্তরে লোকটি বলেঃ "আল্লাহর এবং অমুক অমুকের (আমি উপাসনা করে থাকি)।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে প্রশ্ন করেনঃ "এদের মধ্যে কাকে তুমি তোমার বিপদের সময় ডেকে থাকো এবং তিনি তোমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করে থাকেন?" জবাবে সে বলেঃ "তিনি হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "তাহলে তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদত করার তোমার কি প্রয়োজন? তুমি কি মনে কর যে, তিনি

১. এটা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

একাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হবেন না?” সে উত্তর দেয়ঃ “এ কথা আমি বলতে পারি না। তবে তাঁর সাথে অন্যদের উপাসনা করি এই উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! জ্ঞানের সাথে এই অজ্ঞতা? তুমি জান অথচ অজ্ঞ হচ্ছো?” এরপর সে আর কোন জবাব দিতে পারলো না। পরে সে মুসলমান হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর সে বলেঃ “আমি এমন একটি লোকের সাথে মিলিত হয়েছি যিনি তর্কে আমার উপর জয়যুক্ত হয়েছেন।”[১]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি প্রার্থনার বাক্য, যা বান্দাদেরকে বলতে বলা হয়েছে। غَفَرَ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো পাপরাশি মিটিয়ে দেয়া এবং ওগুলো লোকদের থেকে গোপন রাখা। আর رَحْمٌ-এর অর্থ হলো সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ভাল কথা ও কাজের তাওফীক দেয়া।

সূরা ঃ মু'মিনূন এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি মুরসাল। ইমাম তিরমিযী (রঃ)-ও এটা বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٦٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

সূরা ঃ নূর, মাদানী
(আয়াত ঃ ৬৪, রুকূ’ ঃ ৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

١- سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

১। এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’ কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

‘আমি এই সূরা অবতীর্ণ করেছি’ এ কথার দ্বারা এই সূরার বুযুর্গী ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যান্য সূরাগুলোর বুযুর্গী ও প্রয়োজনীয়তা নেই।

فَرَضْنَاهَا-এর অর্থ মুজাহিদ (রঃ) ও কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা ইত্যাদির বর্ণনা এতে রয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আমি তোমাদের উপর ও তোমাদের পরবর্তী

লোকদের উপর এটা নির্ধারিত করে দিয়েছি। এর মধ্যে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি উজ্জ্বল নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পার, আমার হুকুমসমূহ স্মরণ রাখো এবং ওগুলোর উপর আমল কর।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বিবাহিত ও বিবাহিতা হবে অথবা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হবে। সুতরাং অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের শাস্তির বিধান হলো ওটাই যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ একশ' বেত্রাঘাত। আর জমহূর উলামার মতে তাদেরকে এক বছরের জন্যে দেশান্তরও করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত এর বিপরীত। তাঁর মতে এটা নেতার ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে দেশান্তর করবেন বা করবেন না। জমহূর উলামার দলীল হলো নিম্নের হাদীসটিঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। একজন বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার ছেলে এ লোকটির বাড়ীতে মজুর ছিল। সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে। আমি তার মুক্তিপণ হিসেবে একশটি বকরী ও একটি দাসী একে প্রদান করি। অতঃপর আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, আমার ছেলের উপর শরঈ শাস্তি হলো একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তরকরণ। আর এর স্ত্রীর শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিক ফায়সালা করছি। একশ' বকরী ও দাসী তুমি ফিরিয়ে পাবে এবং তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরকাল দেশান্তর।" আর আসলাম গোত্রের উনায়েস নামক একটি লোককে তিনি বললেনঃ "হে উনায়েস! সকালে তুমি এই লোকটির স্ত্রীর নিকট গমন করো। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয় তবে তুমি তাকে রজম করবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথামত উনায়েস সকালে ঐ স্ত্রী লোকটির নিকট গমন করলো এবং সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয়ায় তাকে রজম করে দিলো।[১] এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশ' বেত্রাঘাতের সাথে সাথে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করতে হবে। আর যদি বিবাহিত হয় তবে রজম করে দেয়া হবে।

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে হামদ ও সানার পর বলেনঃ "হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর নিজের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর এই কিতাবে রজম করার হুকুমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, মুখস্থ করেছি এবং আমলও করেছি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগেও রজম হয়েছে এবং তাঁর (ইন্তেকালের) পরে আমরাও রজম করেছি। আমি ভয় করছি যে, কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর না জানি লোকেরা হয়তো বলতে শুরু করে দেবে যে, তারা রজম করার হুকুম আল্লাহর কিতাবে পাচ্ছে না। আল্লাহ না করুন তারা হয়তো আল্লাহর এই ফরয কাজকে যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। রজমের সাধারণ হুকুম ঐ ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে যে ব্যভিচার করবে এবং বিবাহিত হবে, সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক, যখন তার ব্যভিচারের উপর শরঈ দলীল পাওয়া যাবে অথবা সে গর্ভবতী হবে বা স্বীকারোক্তি করবে।"[১]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তাঁর এক ভাষণে বলতে শুনেছেনঃ "লোকেরা বলে যে, তারা রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার কথা আল্লাহর কিতাবে পায় না। কুরআন কারীমে শুধুমাত্র চাবুক মারার হুকুম রয়েছে। জেনে রেখো যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) রজম করেছেন, তারপরে আমরাও রজম করেছি। 'কুরআনে যা নেই, উমার (রাঃ) তা লিখিয়ে নিয়েছেন' লোকদের একথা বলার ভয় যদি আমি না করতাম তবে রজমের আয়াত আমি ঐ ভাবেই লিখিয়ে নিতাম যেভাবে ওটা অবতীর্ণ হয়েছিল।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) ভাষণে রজমের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ "রজম জরুরী এবং ওটা আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি। যদি আমি লোকদের একথা বলার ভয় না করতাম যে, কুরআন কারীমে যা নেই তা উমার (রাঃ) বাড়িয়ে দিয়েছেন তবে আমি কুরআনের এক পার্শ্বে রজমের আয়াত লিখে দিতাম।" উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং অমুক ও অমুকের সাক্ষ্য এই

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ)-এর মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এর চেয়েও দীর্ঘভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। সুনানে নাসাঈতেও এ হাদীসটি রয়েছে।

যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রজম করেছেন এবং আমরাও রজম করেছি। মনে রেখো যে, তোমাদের পরে এমন লোক আসবে যারা রজমকে, শাফাআতকে এবং কবরের আযাবকে অবিশ্বাস করবে। আর কতকগুলো লোককে যে কয়লা হয়ে যাওয়ার পরেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এটাকেও অবিশ্বাস করবে।[১]

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা রজমের হুকুমকে অস্বীকার করার ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকো (শেষপর্যন্ত)।"[২]

কাসীর ইবনে সাল্‌ত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মারওয়ানের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সেখানে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলেনঃ আমরা কুরআন কারীমে পড়তাম– "বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তোমরা অবশ্যই রজম করবে।" মারওয়ান তখন জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কুরআন কারীমে এটা লিখেন না যে?" উত্তরে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ "আমাদের মধ্যে যখন এই আলোচনা চলতে থাকে তখন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে, একটি লোক (একদা) নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করে। সে তাঁর সামনে এরূপ এরূপ বর্ণনা দেয়। আর সে রজমের কথা বর্ণনা করে। কে একজন বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি রজমের আয়াত লিখিয়ে নিন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এখনতো আমি এটা লিখিয়ে নিতে পারি না।"[৩]

এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রজমের আয়াত পূর্বে লিখিত ছিল। তারপর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে এবং হুকুম বাকী রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকটির স্ত্রীকে রজম করার নির্দেশ দেন যে তার চাকরের সাথে ব্যভিচার করেছিল। অনুরূপভাবে তিনি হযরত মায়েয (রাঃ) ও এক গামেযিয়্যাহ মহিলাকে রজম করিয়েছিলেন। এসব হাদীসে এর উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রজমের পূর্বে তাদেরকে চাবুক লাগিয়েছিলেন। বরং এসব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীসে শুধু রজমের বর্ণনা আছে। কোন হাদীসেই চাবুক মারার

---

১. এটাও মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. এটাও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা আনয়ন করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।
৩. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদেই বর্ণিত হয়েছে। সুনানে নাসাঈতেও এ রিওয়াইয়াতটি আছে।

বর্ণনা নেই। এ জন্যেই জমহূর উলামার এটাই মাযহাব। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ীও (রঃ) এদিকেই গিয়েছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, প্রথমে চাবুক মেরে পরে রজম করা উচিত যাতে কুরআন ও হাদীস উভয়ের উপরই আমল হয়ে যায়। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে সুরাজা নাম্নী একটি মহিলাকে নিয়ে আসা হয় যে বিবাহিতা ছিল এবং ব্যভিচার করেছিল। তখন তিনি বৃহস্পতিবারে তাকে চাবুক মারিয়ে নেন এবং শুক্রবারে তাকে রজম করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "কিতাবুল্লাহর উপর আমল করে আমি তাকে চাবুক লাগিয়েছি এবং সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর উপর আমল করে তাকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছি।"

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর, তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর! আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে পন্থা বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করলে একশ' চাবুক ও এক বছরের জন্য দেশান্তর আর বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী ব্যভিচার করলে রজম।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। অন্তরের দয়া তো অন্য জিনিস, ওটা তো থাকবেই। কিন্তু আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ইমামের অবহেলা ও ত্রুটি প্রদর্শন নিন্দনীয়। যখন ইমাম বা বাদশাহ্র কাছে এমন কোন ঘটনা ঘটবে যাতে হদ জারী করা অপরিহার্য, এরূপ ক্ষেত্রে বাদশাহর উচিত হদ জারী করা এবং ওটা ছেড়ে না দেয়া। হাদীসে এসেছেঃ "তোমরা পরস্পরের মধ্যকার হদকে উপেক্ষা কর। হদযুক্ত কোন ঘটনা আমার কাছে পৌঁছে গেলে হদ জারী করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।" অন্য হাদীসে এসেছেঃ "যমীনে হুদূদ কায়েম হওয়া যমীনবাসীদের জন্যে চল্লিশ দিনের বৃষ্টিপাত অপেক্ষা উত্তম।" এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে'। আল্লাহ পাকের এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রহারকে হালকা করো না। মধ্যমভাবে চাবুক মারো। মেরে যে অস্থি ভেঙ্গে দেবে এটাও ঠিক নয়। অপবাদদাতার উপর হদ জারী করার সময় তার দেহে কাপড় থাকতে হবে। তবে ব্যভিচারীর উপর হদ জারী করার সময় তার দেহে কাপড় রাখা চলবে না। এটা

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আরবাআ ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হলো হযরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান (রাঃ)-এর উক্তি। এটা বর্ণনা করার পর তিনি وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ পাঠ করেন। তখন হযরত সাঈদ ইবনে আবি উরূবাহ (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'এটা কি হুকুমের অন্তর্ভুক্ত?' উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং চাবুক অর্থাৎ হদ কায়েম করা প্রহারকে কঠিন করার অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর দাসী ব্যভিচার করলে তিনি তার পায়ের উপর ও কোমরের উপর চাবুক মারেন। তখন হযরত নাফে' (রাঃ) তাঁর সামনে 'আল্লাহর বিদান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে'– আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তিটি পাঠ করেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "তোমার মতে কি আমি এই দাসীর উপর কোন দয়া দেখিয়েছি? জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেননি এবং একথাও বলেননি যে, তার মাথার উপর চাবুক মারা হবে। আমি তাকে সাধ্যমত চাবুক মেরেছি এবং পূর্ণ শাস্তি দিয়েছি।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো তবে তোমাদের উচিত আল্লাহর নির্দেশ পুরোমাত্রায় পালন করা এবং ব্যভিচারীদের উপর হদ জারী করার ব্যাপারে টাল-বাহানা না করা। তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে হবে, কিন্তু এই প্রহার এমন হওয়া উচিত নয় যাতে অস্থি ভেঙ্গে যায়। এ কারণে যে, যেন তারা পাপকার্য থেকে বিরত তাকে এবং তাদের এই শাস্তি দেখে অন্যেরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দয়া খারাপ জিনিস নয়। হাদীসে এসেছে যে, একটি লোক বলেঃ "আমি বকরী যবেহ করি, কিন্তু আমার মনে ব্যথা আসে এবং মমতা লাগে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "এতেও তুমি পুণ্য লাভ করবে।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যাতে সবারই অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং ব্যভিচারী লাঞ্ছিতও হয়। যাতে অন্য লোকেরাও এ কাজ থেকে বিরত থাকে। প্রকাশ্যভাবে শাস্তি দিতে হবে। গোপনে মারধর করে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। একটি লোক এবং তদপেক্ষা বেশী লোক হলেই একটি দল হয়ে যাবে এবং আয়াতের উপর আমল হয়ে যাবে। এটার উপর ভিত্তি করেই ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, একটি লোকও একটি জামাআত। আতা' (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দু'জন হতে হবে। সাঈদ ইবনে

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, চারজন হওয়া চাই। যুহরী (রঃ)-এর মতে তিন বা তদপেক্ষা বেশী হতে হবে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, চার বা তার চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কেননা, ব্যভিচারে চারজনের কমে সাক্ষী হয় না। চার অথবা তদপেক্ষা বেশী সাক্ষী হতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এরও মাযহাব এটাই। রাবীআ' (রঃ) বলেন যে, পাঁচজন হওয়া চাই। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে দশজন হওয়া উচিত। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একটি দল হতে হবে যাতে উপদেশ, শিক্ষা ও শাস্তি হয়। নাযর ইবনে আলকামা (রঃ) এই জামাআতের প্রয়োজনীয়তার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, যাদের উপর হদ জারী করা হচ্ছে তাদের জন্যে এরা আল্লাহর নিকট করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

৩- اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩। ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী–তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিয়ে করে না, মুমিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ব্যভিচারীর উপর একমাত্র ঐ লোকই সন্তুষ্ট হতে পারে যে নিজে ব্যভিচারিণী বা শিরককারিণী। সে ঐ সব অসৎ কাজকে খারাপ মনেই করে না। এরূপ অসতী ও ব্যভিচারিণীর সাথে ঐ পুরুষই মিলতে পারে যে তার মতই অসৎ, ব্যভিচারী বা মুশরিক। যে এ কাজের অবৈধতা স্বীকার করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটা সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, এখানে নিকাহ দ্বারা সঙ্গম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিকই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। এই উক্তিটিই মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রঃ), যহ্হাক (রঃ), মাকহূল (রঃ), মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) এবং আরো বহু তাফসীরকার হতে বর্ণিত আছে। মুমিনদের উপর এটা হারাম। অর্থাৎ ব্যভিচার করা, ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা এবং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক নারীদের এই ব্যভিচারী পুরুষদের সাথে বিয়ে দেয়া মুমিনদের জন্যে হারাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের ভাবার্থ হলোঃ মুসলমানদের জন্যে ব্যভিচার হারাম। কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, অসতী ও ব্যভিচারিণী নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের উপর হারাম। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ "যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়।" (৪ ঃ ২৫) অর্থাৎ যে নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের উচিত তাদের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ থাকতে হবে। তারা হবে সচ্চরিত্রের অধিকারিণী, তারা ব্যভিচারিণী হবে না এবং উপপতি গ্রহণকারিণীও হবে না। পুরুষদের মধ্যেও এই তিনটি গুণ থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, সৎ ও চরিত্রবান মুসলমানদের বিয়ে অসতী নারীর সাথে শুদ্ধ নয় যে পর্যন্ত না সে তাওবা করে। হ্যাঁ, তবে তাওবা করার পর শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে সতী ও চরিত্রবতী নারীর বিয়ে অসৎ ও ব্যভিচারী পুরুষের সাথে বৈধ নয় যে পর্যন্ত না সে বিশুদ্ধ মনে তার ঐ অপবিত্র কাজ হতে তাওবা করে। কেননা, কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে যে, মুমিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক উম্মে মাহ্যূল নাম্নী একটি অসতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً .... الخ-এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১] আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটিকে বিয়ে করার জন্যে লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, মুরসিদ ইবনে আবি মুরসিদ (রাঃ) নামক একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি মুসলমান বন্দীদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় আনয়ন করতেন। আন্নাক নাম্নী একটি অসতী নারী মক্কায় বাস করতো। অজ্ঞতার যুগে এই মহিলাটির সাথে ঐ সাহাবীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেনঃ "একবার বন্দীদেরকে আনয়নের জন্যে আমি মক্কায় গমন করি। রাত্রিকালে একটি বাগানের প্রাচীরের নীচে আমি পৌঁছি। চাঁদনী রাত ছিল। ঘটনাক্রমে আন্নাক তথায় পৌঁছে যায় এবং আমাকে দেখে নেয়। এমন কি আমাকে চিনে ফেলে। সে ডাক দিয়ে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বলেঃ “কে ওটা মুরসিদ?” আমি উত্তরে বলিঃ হ্যাঁ, আমি মুরসিদই বটে। সে খুবই খুশী হয় এবং বলেঃ ‘চলো, আজ রাত্রে আমার ওখানেই থাকবে।’ আমি বলিঃ হে আন্নাক! জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সে নিরাশ হয়ে যায়। সুতরাং আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে সে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলেঃ “হে তাঁবুতে অবস্থানকারীরা! তোমরা সতর্ক হয়ে যাও, চোর এসে গেছে। এটাই হলো ঐ লোক যে তোমাদের বন্দীদেরকে চুরি করে নিয়ে যায়।” লোকেরা তার চীৎকার শুনে জেগে ওঠে এবং আটজন লোক আমাকে ধরবার জন্যে আমার পিছনে ছুটতে শুরু করে। আমি মুষ্টি বন্ধ করে খন্দকের পথ ধরে পলায়ন করি এবং একটি গুহায় প্রবেশ করে আত্মগোপন করি। তারা ঐ গুহার নিকট পৌঁছে যায় কিন্তু আমাকে দেখতে পায়নি। তারা সেখানে প্রস্রাব করতে বসে। আল্লাহর শপথ! তাদের প্রস্রাব আমার মাথার উপর পড়ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্ষু অন্ধ করে দেন। তাদের দৃষ্টি আমার উপর পড়েনি। এদিক ওদিক খোঁজ করে তারা ফিরে যায়। আমি কিছুক্ষণ ঐ গুহায় কাটিয়ে দিলাম। শেষে যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তারা আবার শুয়ে গেছে তখন গুহা থেকে বের হয়ে পুনরায় আমি মক্কার পথ ধরি। সেখানে পৌঁছে আমি বন্দী মুসলমানকে আমার কোমরের উপর উঠিয়ে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে শুরু করি। লোকটি খুব ভারী ছিল বলে আযখার নামক স্থানে পৌঁছে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাকে কোমর থেকে নামিয়ে আমি তার বন্ধনগুলো খুলে দিই। অতঃপর তাকে উঠিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি মদীনায় পৌঁছে যাই। আন্নাকের ভালাবাসা আমার অন্তরে বদ্ধমূল ছিল বলে তাকে বিয়ে করার জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কথা শুনে নীরবতা অবলম্বন করেন। আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আন্নাককে বিয়ে করতে পারি কি? তিনি এবারও নীরব থাকেন। ঐ সময় اَلزَّانِیْ لَا یَنْكِحُ اِلَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِكَةً الخ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যভিচারীর উপর চাবুক লাগানো হয়েছে সে তার অনুরূপের সাথেই বিবাহিত হতে পারে।”[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) তাঁদের সুনান গ্রন্থের কিতাবুন্ নিকাহতে এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটা তাঁর সুনানে তাখরীজ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তারা হলো পিতা-মাতার অবাধ্য, পুরুষের সাদৃশ্য স্থাপনকারিণী স্ত্রী লোক এবং দাইয়ূস।[১] তিন প্রকারের লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। তারা হচ্ছেঃ পিতা-মাতার অবাধ্য, সদাসর্বদা মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করার পরে দানের খোঁটা দানকারী।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকারের লোকের প্রতি আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তারা হলোঃ সদা মদ্যপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং পরিবারের মধ্যে মালিন্য কায়েমকারী।"[৩]

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দাইয়ূস জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেন পুণ্যশীল স্বাধীনা নারীকে বিয়ে করে।"[৫] নির্লজ্জ ব্যক্তিকে দাইয়ূস বলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত হারূন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "আমার স্ত্রীর প্রতি আমার খুবই ভালবাসা রয়েছে, কিন্তু তার অভ্যাস এই যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাতকে ফিরিয়ে দেয় না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও।" সে বললোঃ "তাকে ছেড়ে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তাহলে তুমি তাকে উপভোগ কর।" এ হাদীসটি ইমাম আবূ আবদির রহমান আন্ নাসাঈ (রঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থের কিতাবুন্ নিকাহ্‌তে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। এর বর্ণনাকারী আবদুল করীম সুদৃঢ় নন। এর অন্য

১. যে পুরুষ তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয় ও তার উপার্জন খায়।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
৪. এ হাদীসটি আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
৫. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল।

একজন বর্ণনাকারী হারূন অপেক্ষাকৃত সবল বটে, কিন্তু তাঁর রিওয়াইয়াত মুরসাল। আর এটাই সঠিকও বটে। এই রিওয়াইয়াতই মুসনাদে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (রঃ)-এর ফায়সালা এই যে, এটা মুসনাদ করা ভুল এবং সঠিক এটাই যে, এটা মুরসাল। এই হাদীসটি অন্যান্য কিতাবসমূহে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) তো এটাকে মুনকার বা অস্বীকৃত বলেছেন। ইবনে কুতাইবা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ একথা যে বলা হয়েছে যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাততে ফিরিয়ে দেয় না, এর দ্বারা দানশীলতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে কোন ভিক্ষুককেই বঞ্চিত করে না। কিন্তু ভাবার্থ যদি এটাই হতো তবে হাদীসের শব্দ لَامِس-এর স্থলে مُلْتَمِس ব্যবহৃত হওয়াই উচিত ছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, তার অভ্যাস এইরূপ বলে মনে হতো, এ নয় যে, সে বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়ে পড়তো। কেননা, প্রকৃতপক্ষেই যদি এই দোষ তার মধ্যে থাকতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনোই ঐ সাহাবীকে তাকে রেখে দেয়ার অনুমতি দিতেন না। কারণ এটা তো দাইয়ূসী, যার জন্যে কঠোরভাবে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সম্ভব যে, স্বামী তার স্ত্রীর অভ্যাস এরূপ মনে করেছিল এবং এই জন্যেই আশংকা প্রকাশ করেছিল। তখন নবী (সঃ) তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে তালাক দেয়ার। কিন্তু সে যখন বললো যে, তার স্ত্রীর প্রতি তার খুবই ভালবাসা রয়েছে তখন তিনি তাকে রেখে দেয়ারই অনুমতি দেন। কেননা, তার প্রতি তার মহব্বত তো পুরোমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং শুধু একটি বিপদ ঘটবার সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তাকে ছেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি আর একটি অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মোটকথা অসতী ও ব্যভিচারিণী মহিলাদেরকে বিয়ে করা সৎ ও পুণ্যশীল মুমিনদের জন্যে নিষিদ্ধ। তবে সে তাওবা করলে তাকে বিয়ে করা বৈধ। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একটি লোক প্রশ্ন করেঃ "একটি অসতী নারীর সাথে আমার জঘন্য সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ এখন আমাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দান করেছেন। সুতরাং এখন আমি তাকে বিয়ে করতে চাই (এটা আমার জন্যে বৈধ হবে কি?)" তখন কতকগুলো লোক বলে ওঠেন যে, ব্যভিচারিণী ও মুশরিকা মহিলাকে শুধুমাত্র ব্যভিচারীই বিয়ে করতে পারে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "না, এই আয়াতের অর্থ এটা নয়। (হে প্রশ্নকারী ব্যক্তি!) তুমি ঐ মহিলাটিকে এখন বিয়ে করতে পার। যাও, কোন পাপ হলে তা আমার যিম্মায় থাকলো।"[১]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইয়াহইয়া (রঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, এটা এর পরবর্তী আয়াত وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ীও (রাঃ) এ কথাই বলেন।

৪। যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাযির করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী।

٤- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ۝

৫। তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে– আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

এই আয়াতে ব্যভিচারের অপবাদদাতাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হচ্ছেঃ যারা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ লোকের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাদের শাস্তি হলো এই যে, তাদেরকে আশিটি চাবুক মারতে হবে। হ্যাঁ, তবে যদি তারা সাক্ষী হাযির করতে পারে তবে এ শাস্তি হতে তারা বেঁচে যাবে। আর যাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে তাদের উপর হদ জারী করা হবে। যদি তারা সাক্ষী আনয়নে ব্যর্থ হয় তবে তাদেরকে আশিটি চাবুক মারা হবে এবং ভবিষ্যতে চিরদিনের জন্যে তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবে। তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ বলা হবে না। বরং সত্যত্যাগী বলা হবে।

এই আয়াতে যে লোকগুলোকে স্বতন্ত্র করে দেয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, এই স্বাতন্ত্র্য শুধুমাত্র ফাসেক না হওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ তাওবার পরে তারা আর ফাসেক থাকবে না। আবার অন্য কেউ বলেন যে, তাওবার পরে তারা ফাসেকও থাকবে না এবং তাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্যও হবে না। বরং পুনরায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। হ্যাঁ, তবে হদ যে রয়েছে তা তাওবা দ্বারা কোনক্রমেই উঠে যাবে না। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ)

এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, তাওবার মাধ্যমে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়া এবং তার সত্যত্যাগী হওয়া দু'টোই উঠে যাবে। তাবেয়ীদের নেতা হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় গুরুজনদের একটি জামাআতের মাযহাব এটাই। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাওবার পরে সে শুধুমাত্র ফাসেক থাকবে না, কিন্তু এর পরেও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। আরো কেউ কেউ একথাই বলেন। শা'বী (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, যদি সে তার পূর্বের অপবাদ দেয়ার কথা স্বীকার করে নেয় এবং পরে পূর্ণভাবে তাওবা করে নেয়ার কথা বলে তবে এর পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٦- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

৬। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

٧- وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ○

৭। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

٨- وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ○

৮। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

٩- وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

৯। আর পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।

১০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না; এবং আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

١٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۟ ع

এ কয়েকটি আয়াতে কারীমায় বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ঐ স্বামীদের মুক্তির উপায় বর্ণনা করেছেন যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে। এমতাবস্থায় যদি তারা সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হয় তবে তাদেরকে লেআন করতে হবে। এর রূপরেখা এই যে, স্বামী বিচারকের কাছে এসে নিজের বর্ণনা দেবে। যখন সে সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হবে তখন বিচারক তাকে চারজন সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে চারবার শপথ করতে বলবেন এবং সে শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী এবং সে যা বলছে তা সত্য। পঞ্চমবারে সে বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসবে। এটুকু বলা হলেই ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের মতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামী তার মহর আদায় করবে এবং স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারকের সামনে ঐ স্ত্রীও যদি মুলাআনা করে তবে তার উপর থেকে শাস্তি উঠে যাবে। সেও চারবার শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। এখানে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর জন্যে 'গযব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণতঃ কোন পুরুষ এটা চায় না যে, অযথা স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বদনাম করবে। সুতরাং প্রায়ই সে সত্যবাদী হয় এবং তার সত্যবাদিতার ভিত্তিতেই তাকে ক্ষমার্হ মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই পঞ্চমবারে তাকে বলিয়ে নেয়া হয় যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। গযব তার উপরই পতিত হয়ে থাকে যে সত্যকে জেনে শুনে ওর অপলাপ করে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না; এবং আল্লাহ তাওবা কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময়। তাদের গুনাহ যতই এবং যেমনই হোক না কেন, আর তারা যে কোন সময়েই ঐ গুনাহর জন্যে তাওবা করুক না কেন তিনি তা কবূল করে থাকেন।

তিনি আদেশ ও নিষেধকরণে বড়ই প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতের ব্যাপারে যেসব রিওয়াইয়াত রয়েছে সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا .... الخ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আনসারদের নেতা হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আয়াতটি কি এভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "হে আনসারের দল! তোমাদের নেতা যা বলছে তাকি তোমরা শুনতে পাও না?" তাঁরা জবাবে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তাঁকে ক্ষমা করে দিন। এটা শুধু তাঁর অত্যধিক লজ্জার কারণ। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর লজ্জার অবস্থা এই যে, তাঁকে কেউ কন্যা দিতে সাহস করে না।" তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বিশ্বাস তো আছে যে, এটা সত্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, যদি আমি কাউকে তার পা ধরে নিতে দেখতে পাই তবুও তাকে কিছুই বলতে পারবো না যে পর্যন্ত না আমি চারজন সাক্ষী আনয়ন করি! এই সুযোগে তো সে তার কাজ শেষ করে ফেলবে!" তাদের এসব আলাপ আলোচনায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় সেখানে হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) আগমন করেন। ইনি ছিলেন ঐ তিন ব্যক্তির একজন যাঁদের তাওবা কবূল হয়েছিল। তিনি এশার সময় জমি হতে বাড়ীতে ফিরেন। বাড়ীতে এসে তিনি একজন অপর পুরুষকে দেখতে পান। তিনি তাকে স্বচক্ষে দেখেন ও নিজের কানে তার কথা শুনতে পান। সকাল হলেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং তাঁর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে খুবই খারাপ বোধ হয় এবং তাঁর স্বভাবের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে যান এবং বলতে শুরু করেনঃ "হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর উক্তির কারণেই তো আমরা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি, আবার এমতাবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে অপবাদের হদ লাগাবেন এবং তাঁর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করবেন!" একথা শুনে হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আমি সত্যবাদী এবং আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি তিনি আমার মুক্তির একটা উপায় বের করে দিবেন।" অতঃপর তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি দেখছি যে, আমার কথা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী এবং আল্লাহ এটা ভালরূপেই জানেন।" কিন্তু তিনি সাক্ষী হাযির করতে অপারগ

ছিলেন বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে চাবুক মারার নির্দেশ দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন এমন সময় অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়ে গেল। সাহাবীগণ তাঁর চেহারা মুবারক দেখে বুঝতে পারলেন যে অহী নাযিল হচ্ছে। অহী নাযিল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হিলাল (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তুমি খুশী হয়ে যাও।" তখন হযরত হিলাল (রাঃ) বলেনঃ "আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর কাছে আমি এটাই আশা করছিলাম।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হিলাল (রাঃ)-এর স্ত্রীকে ডাকিয়ে নেন এবং উভয়ের সামনে মুলাআনার আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "দেখো, আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ার তুলনায় অনেক কঠিন।" হযরত হিলাল (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আমি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী।" তাঁর স্ত্রী বললো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী মিথ্যা কথা বলছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "ঠিক আছে, তোমরা লেআন কর।" হযরত হিলাল (রাঃ)-কে তিনি বললেনঃ "এভাবে চারবার শপথ কর এবং পঞ্চমবারে এইরূপ বল।" হযরত হিলাল (রাঃ) যখন চারবার শপথ করে ফেলেন এবং পঞ্চমবারের পালা আসে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে হিলাল (রাঃ)! আল্লাহকে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের তুলনায় খুবই সহজ। পঞ্চমবারে তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হওয়া মাত্রই তোমার উপর আল্লাহর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে।" তখন তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর কসম! যেভাবে তিনি আমাকে আমার সত্যবাদিতার কারণে দুনিয়ার শাস্তি হতে বাঁচিয়েছেন, অনুরূপভাবে আমার সত্যবাদিতার কারণে পরকালের শাস্তি হতেও তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।" অতঃপর পঞ্চমবারের ভাষাও তিনি মুখ দিয়ে বের করে দেন। তারপর তাঁর স্ত্রীকে বলা হয়ঃ "তুমি চারবার শপথ করে বল যে, তোমার স্বামী মিথ্যাবাদী।" চারবার সে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে পঞ্চমবারের কালেমা উচ্চারণ করা হতে বিরত রাখেন এবং যেমনভাবে হযরত হিলাল (রাঃ)-কে বুঝিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তাকেও বুঝাতে লাগলেন। ফলে তার অবস্থার কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। পঞ্চমবারের কালেমাটি উচ্চারণ করা হতে সে যবানকে সামলিয়ে নিলো। এমন কি মনে হলো যেন সে তার অপরাধ স্বীকার করেই নেবে। কিন্তু শেষে সে বললোঃ "চিরদিনের জন্যে আমি আমার কওমকে অপমানিত করতে পারি না।" অতঃপর সে বলে ফেললোঃ "যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ

(সঃ) তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার সম্পর্ক যেন হিলাল (রাঃ)-এর দিকে লাগানো না হয়। আর ঐ সন্তানকে অবৈধ সন্তানও যেন বলা না হয়। যে তাকে অবৈধ সন্তান বলবে বা ঐ স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করবে তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। তিনি এই ফায়সালাও দেন যে, তার পানাহারের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর অর্পিত হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। তালাকও হয়নি এবং স্বামী মৃত্যুবরণও করেনি। তিনি আরো বললেনঃ "দেখো, শিশুর বর্ণ যদি লাল ও সাদা মিশ্রিত হয় এবং পায়ের গোছা মোটা হয় তবে জানবে যে, ওটা হিলাল (রাঃ)-এর সন্তান। আর যদি তার পায়ের গোছা পাতলা হয় ও বর্ণ কিছুটা কালো হয় তবে ঐ শিশুকে ঐ ব্যক্তির মনে করবে যার সাথে তাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে।" সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা গেল যে, সে ঐ খারাপ গুণ বিশিষ্ট ছিল যা অপবাদের সত্যতার নিদর্শন ছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যদি এই মাসআলাটি কসমের সাথে জড়িত না থাকতো তবে অবশ্যই আমি স্ত্রীলোকটিকে হদ লাগাতাম।" এই ছেলেটি বড় হয়ে মিসরের গভর্নর হয়েছিল। তার সম্পর্ক তার মাতার সাথে লাগানো হতো।[১]

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। তাতে আছে যে, হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তাঁর স্ত্রীর উপর শুরায়েক ইবনে সাহমার সাথে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তা বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি সাক্ষী হাযির কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ লাগানো হবে।" হযরত হিলাল (রাঃ) তখন বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একজন লোক তার স্ত্রীকে স্বচক্ষে মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে সাক্ষী খুঁজতে যাবে?" কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কথাই বলতে থাকলেন। তাতে এও আছে যে, তাদের উভয়ের সামনে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা খুবই ভাল জানেন যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের একজন কি তাওবা করে নিজেকে মিথ্যা বলা হতে বিরত রাখছো?" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, পঞ্চমবারে তিনি বলেনঃ "তোমরা তার মুখ বন্ধ করে দাও।" অতঃপর তিনি তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ "দেখো, আল্লাহর লা'নত অপেক্ষা সবকিছুই হালকা।" অনুরূপ উপদেশবাণী স্ত্রীর সামনেও পেশ করা হয় (শেষ পর্যন্ত)।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবি দাউদে এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর অধিনায়কত্বের যুগে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পরস্পর লা'নতকারী বা লেআনকারী স্বামী স্ত্রীর মাঝে কি বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে?" এর উত্তর দিতে আমি সক্ষম না হয়ে হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট হাযির হই এবং তাঁকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! ঠিক এই প্রশ্নই ইতিপূর্বে অমুক ইবনে অমুক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করেছিল। সে বলেছিলঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন লোক তার স্ত্রীকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত অবস্থায় পেয়ে যদি মুখ দিয়ে কোন কথা বের করে তবে সেটাও লজ্জার কথা, আবার যদি নীরব থাকে তবে সেটাও খুবই নির্লজ্জতাপূর্ণ নীরবতা। সুতরাং এমতাবস্থায় কি করা যায়?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন। লোকটি আবার এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছি সেটা স্বয়ং আমারই ঘটনা।" তখন আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে নূরের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে পাশে ডেকে নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে উপদেশ দেন এবং অনেক কিছু বুঝান। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে সত্যবাদী বলে প্রকাশ করে। অতঃপর উভয়েই আয়াত অনুযায়ী শপথ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে পৃথক করে দেন।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় মসজিদে বসেছিলাম এমন সময় একজন আনসারী এসে বলেঃ "যখন কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন লোককে দেখে তখন যদি সে তাকে হত্যা করে দেয় তবে তোমরা তাকেও মেরে ফেলবে। আর যদি সে মুখ দিয়ে তা বের করে এবং সাক্ষী হাযির করতে অপারগ হয় তবে তোমরা তাকেই চাবুক মারবে। আবার সে যদি চুপ করে বসে থাকে তবে সেটাও বড়ই লজ্জার কথা! আল্লাহর শপথ! যদি সকাল পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো।" অতঃপর সে নিজের ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করে এবং দু'আ করেঃ "হে আল্লাহ! আপনি এর ফায়সালাযুক্ত আয়াত নাযিল করুন।" তখন লেআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। সর্বপ্রথম এই লোকটিই এতে জড়িয়ে পড়েছিল।"[২]

---

১. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এটাও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উওয়াইমির (রাঃ) হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে বলেনঃ "আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন যে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) অপর কোন লোককে দেখে তবে সে কি করবে? এমন তো নয় যে, যদি সে তাকে হত্যা করে দেয় তবে তাকেও হত্যা করে দেয়া হবে?" অতঃপর হযরত আসেম (রাঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ওটা জিজ্ঞেস করেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুণ্ন হন। যখন হযরত আসেম (রাঃ)-এর সাথে হযরত উওয়াইমির (রাঃ) সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি হযরত আসেম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি আমার কথাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কি উত্তর দেন?" উত্তরে হযরত আসেম (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "আপনি আমাকে ভাল কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠাননি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এই প্রশ্ন শুনে খুবই অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন।" তখন হযরত উওয়াইমির (রাঃ) বলেনঃ "আচ্ছা, আমি স্বয়ং গিয়ে তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করে আসছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে হযরত উওয়াইমির (রাঃ) জানতে পারেন যে, ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে হুকুম অবতীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং লেআনের পর হযরত উওয়াইমির (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন যদি আমি আমার এ স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাই তবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশের পূর্বেই তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। এরপর লেআনকারীদের জন্যে এই পন্থাই নির্ধারিত হয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)।[১]

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী ছিল এবং তার স্বামী ঐ গর্ভজাত শিশুকে নিজের সন্তান বলতে অস্বীকার করেছিলেন। এ কারণেই ঐ শিশুটি তার মায়ের দিকে সম্পর্কযুক্ত হতো। তারপর সুন্নাত তরীকা এটাই চালু হয়ে যায় যে, সে তার মায়ের ওয়ারিস হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে।

একটি মুরসাল ও গারীব হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "স্বয়ং যদি তোমাদের স্ত্রীদের সাথে তোমরা কোন পর পুরুষকে দেখতে পাও তবে তোমরা কি করবে?" দু'জনই উত্তর দেনঃ "আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। এই অবস্থায় দাইয়ূস ছাড়া অন্য কেউই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না।" ঐ সময় সূরায়ে নূরের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়েছিল।

১১। যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল, এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি।

١١- إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

এই আয়াত থেকে নিয়ে পরবর্তী দশটি আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কারাবতদারীর কারণে আল্লাহ তা'আলা এটাকে মর্যাদাহানিকর মনে করে আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন, যাতে তাঁর নবী (সঃ)-এর মর্যাদার উপর কোন দাগ না পড়ে। এই অপবাদ রচনাকারীদের একটি দল ছিল যাদের অগ্রনায়ক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। সে ছিল মুনাফিকদের নেতা। ঐ বেঈমানই কথাটিকে বানিয়ে সানিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে কানে কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের মুখও খুলতে শুরু হয়েছিল। এই কুৎসা রটনা প্রায় এক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে কুরআন কারীমের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, সফরে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নামে লটারী ফেলতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর এক যুদ্ধে গমনের সময় লটারীতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর সাথে গমন করি। এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আমি আমার হাওদাজ বা শিবিকায় বসে থাকতাম। যখন যাত্রীদল কোন জায়গায়

অবতরণ করতো তখন আমার হাওদাজ নামিয়ে নেয়া হতো। আমি হাওদাজের মধ্যেই বসে থাকতাম। আবার যখন কাফেলা চলতে শুরু করতো তখন আমার শিবিকাটি উষ্ট্রের উপর উঠিয়ে দেয়া হতো। এভাবে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাই। যুদ্ধ শেষে আমরা মদীনার পথে ফিরতে শুরু করি। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে রাত্রে গমনের ঘোষণা দেয়া হয়। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি এবং সেনাবাহিনীর তাঁবু থেকে বহু দূরে চলে যাই। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে আমি ফিরতে শুরু করি। সেনাবাহিনীর তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে আমি গলায় হাত দিয়ে দেখি যে, গলায় হার নেই। আমি তখন হার খুঁজবার জন্যে আবার ফিরে যাই এবং হার খুঁজতে থাকি। এদিকে তো এই হলো। আর ওদিকে সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করে দিলো। যে লোকগুলো আমার শিবিকা উঠিয়ে দিতো তারা মনে করলো যে, আমি শিবিকার মধ্যেই রয়েছি, তাই তারা আমার শিবিকাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দিলো এবং চলতে শুরু করলো। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ঐ সময় পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা খুব বেশী পানাহারও করতো না, ফলে তাদের দেহ বেশী ভারীও হতো না। তাই আমাকে বহনকারীরা হাওদাজের মধ্যে আমার থাকা না থাকার কোন টেরই পেলো না। তাছাড়া আমি ছিলাম ঐ সময় খুবই অল্প বয়সের মেয়ে। মোটকথা দীর্ঘক্ষণ পর আমি আমার হারানো হারটি খুঁজে পেলাম। সেনাবাহিনীর বিশ্রামস্থলে পৌঁছে আমি কোন মানুষের নাম নিশানাও পেলাম না। আমার চিহ্ন অনুযায়ী আমি ঐ জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে আমার উটটি বসা ছিল। সেখানে আমি এ অপেক্ষায় বসে পড়লাম যে, সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে যখন আমার না থাকার খবর পাবে তখন অবশ্যই এখানে লোক পাঠাবে। বসে বসে আমার ঘুম এসে যায়। ঘটনাক্রমে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল সালমী যাকওয়ানী (রাঃ) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাত্রে চলতে শুরু করেছিলেন, সকালে এখানে পৌঁছে যান। একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখে তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বলে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেন এবং উচ্চ স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ বেরিয়ে পড়ে। তাঁর এ শব্দ শোনা মাত্রই আমার চক্ষু খুলে যায় এবং আমি চাদর দিয়ে আমার মুখটা ঢেকে ফেলে নিজেকে সামলিয়ে নিই। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর উটটি বসিয়ে দেন এবং ওর হাতের উপর নিজের পাটা রাখেন। আমি উঠে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাই। তিনি উটকে উঠিয়ে চালাতে শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সাথে কোন

কথা বলিনি। إِنَّا لِلّٰهِ ছাড়া আমি তাঁর মুখে অন্য কোন কথা শুনিনি। প্রায় দুপুর বেলায় আমরা আমাদের যাত্রীদলের সাথে মিলিত হই। এটুকু ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধ্বংসপ্রাপ্তরা তিলকে তাল করে প্রচার শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা রচনাকারী ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। মদীনায় এসেই আমি রুগ্না হয়ে পড়ি এবং এক মাস পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকি ও বাড়ীতেই অবস্থান করি। আমি নিজেও কিছু শুনিনি এবং কেউ আমাকে কোন বলেওনি। আলোচনা সমালোচনা যা কিছু হচ্ছিল তা লোকদের মধ্যেই হচ্ছিল। আমি ছিলাম এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর। তবে মাঝে মাঝে এরূপ ধারণা আমার মনে জেগে উঠতো যে, আমার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে প্রেম ও ভালবাসা ছিল তা কমে যাওয়ার কারণ কি! অন্যান্য সময় আমি রোগাক্রান্তা হলে তিনি আমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাতেন, এই রোগের অবস্থায় আমি তা পেতাম না। এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিতা হতাম, কিন্তু এর কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। তিনি আমার কাছে আসতেন, সালাম দিতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া তিনি আর কিছু বলতেন না। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। কিন্তু অপবাদদাতাদের অপবাদ সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণরূপে উদাসীনা।

ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং আরবদের প্রাচীন অভ্যাসমত আমরা আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার জন্যে মাঠে গমন করতাম। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ রাত্রেই যেতো। বাড়ীতে পায়খানা তৈরী করতে মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণাবোধ করতো। অভ্যাসমত আমি উম্মে মিসতাহ বিনতে আবি রহম ইবনে আবদিল মুত্তালিব ইবনে আবদিল মানাফের সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার জন্যে গমন করি। ঐ সময় আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এই উম্মে মিস্তাহ আমার আব্বার খালা ছিলেন। তার মাতা ছিল সাখর ইবনে আম্মাহর কন্যা। তার পুত্রের নাম ছিল মিসতাহ ইবনে আসাসাহ ইবনে ইবাদ ইবনে আবদিল মুত্তালিব। আমরা যখন বাড়ী ফিরতেছিলাম তখন হযরত উম্মে মিসতাহর পা তার চাদরের আঁচলে জড়িয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। এটা আমার কাছে খুবই খারাপবোধ হয়। আমি তাকে বলিঃ তুমি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করেছো, সুতরাং তাওবা কর। তুমি এমন লোককে গালি দিলে যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন উম্মে মিসতাহ বলেঃ “হে সরলমনা মেয়ে! আপনি কি কিছুই খবর রাখেন না?” আমি বলিঃ ব্যাপার কি? সে উত্তরে বলেঃ “যারা আপনার উপর

অপবাদ আরোপ করেছে তাদের মধ্যে সেও একজন।” তার একথায় আমি খুবই বিস্ময়বোধ করি এবং তাকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি খুলে বলতে অনুরোধ করি। সে তখন অপবাদদাতাদের সমস্ত কার্যকলাপ আমার কাছে খুলে বলে। এতে আমি অত্যন্ত বিচলিতা হয়ে পড়ি। আমার উপর দুঃখ ও চিন্তার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। এই চিন্তার ফলে আমার রোগ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কোন রকমে আমি বাড়ী পৌঁছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, পিতার বাড়ী গিয়ে খবরটা ভালভাবে জানবো। সত্যিই কি আমার বিরুদ্ধে এসব গুজব রটে গেছে! কি কি খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তা আমি সঠিকভাবে জানতে চাই। ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং সালাম দিয়ে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। আমি তাঁকে বললামঃ আমাকে আপনি আমার পিতার বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন! তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতার বাড়ী চলে গেলাম। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলামঃ আম্মাজান! লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে কি কথা ছড়িয়ে পড়েছে? উত্তরে তিনি বলেনঃ “হে আমার কলিজার টুকরো! এটা তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। এতে তোমার মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। যে স্বামীর কাছে তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন স্ত্রী খুবই প্রিয় হয় সেখানে এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।” আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ! তাহলে সত্যিই তো লোকেরা আমার সম্পর্কে এরূপ গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তখন আমি শোকে ও দুঃখে এতো মুষড়ে পড়ি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন থেকে যে আমার কান্না শুরু হয়, তা ক্ষণেকের জন্যেও বন্ধ হয়নি। আমি মাথা নীচু করে শুধু কাঁদতেই থাকি। পানাহার, শোয়া, বসা, কথা বলা সবকিছুই বাদ দিয়ে আমার একমাত্র কাজ হয় চিন্তা করা ও কাঁদা। সারারাত এভাবেই কেটে যায়। এক মুহূর্তের জন্যেও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি। দিনেও ঐ একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অহী আসতে বিলম্ব হয়। তাই তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে পৃথক করে দিবেন কি না এ বিষয়ে এ দু'জনের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত উসামা (রাঃ) তো স্পষ্টভাবে বলে দেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার এ স্ত্রীর কোন মন্দগুণ আমার জানা নেই। আমাদের হৃদয় তাঁর মহব্বত, মর্যাদা ও ভদ্রতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে সদাবিদ্যমান রয়েছে।” তবে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে। আপনার বাড়ীর চাকরানীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর সম্পর্কে আপনি সঠিক তথ্য জানতে পারবেন।”

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চাকরানী হযরত বুরাইরা (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার সামনে আয়েশা (রাঃ)-এর এমন কোন কাজ কি প্রকাশ পেয়েছে যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছে?" উত্তরে হযরত বুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! তাঁর এ ধরনের কোন কাজ আমি কখনো দেখিনি। হ্যাঁ, তবে এটুকু শুধু দেখেছি যে, তাঁর বয়স অল্প হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে ঠাসা আটা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে বকরী এসে ঐ আটা খেয়ে নেয়। এছাড়া তাঁর অন্য কোন ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েনি।" এ ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না বলে ঐ দিনই রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরে উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ "কে এমন আছে যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেছে? আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে আমার এ পত্নীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা এ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি কিছুই দেখিনি। সে আমার সাথেই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করতো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে মুআয আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রস্তুত রয়েছি। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তবে এখনই আমি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি। আর যদি সে আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্যকার লোক হয় তবে আপনি নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ পালনে মোটেই ত্রুটি করবো না।" তাঁর একথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি খুবই সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ)-এর ঐ সময়ের ঐ উক্তির কারণে তাঁর গোত্রীয় মর্যাদায় আঘাত লাগে। তাই তিনি ওর পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "তুমি মিথ্যা বললে। না তুমি তাকে হত্যা করবে, না তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। সে যদি তোমার গোত্রের লোক হতো তবে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না।" তাঁর একথা শুনে হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান। তিনি ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বলতে শুরু করেনঃ "হে সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)! আপনি মিথ্যা বললেন। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। আপনি মুনাফিক বলেই মুনাফিকদের পক্ষপাতিত্ব করছেন।" এখন এঁদের পক্ষ থেকে এঁদের গোত্র এবং তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্যে

প্রস্তুত হয়ে যায় এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর থেকেই তাদেরকে থামাতে থাকেন। অবশেষে উভয় দল নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন। এতো ছিল সেখানকার ঘটনা। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, সারা দিন আমার কান্নাতেই কেটে যায়। আমার পিতা-মাতা ধারণা করলেন যে, এ কান্না আমার কলেজা ফেড়েই ফেলবে। বিষণ্ন মনে আমার পিতা-মাতা আমার নিকট বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় আনসারের একজন স্ত্রীলোক আমাদের নিকট আগমন করে এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করে। আমরা সবাই এভাবেই বসেছিলাম এমতাবস্থায় আকস্মিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেখানে আগমন ঘটে। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসে পড়েন। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন থেকে নিয়ে ঐ দিনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার পাশে বসেননি। এক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবস্থা ঐরূপই ছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই কোন সিদ্ধান্তেই তিনি পৌঁছতে পারেননি। বসেই তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে। যদি তুমি সত্যিই সতী-সাধ্বী থেকে থাকো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোন পাপে জড়িয়ে পড়ে থাকো তবে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। কারণ বান্দা যখন কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হবার পর তা স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে থাকেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটুকু বলার পর নীরব হয়ে যান। তাঁর একথা শুনেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। অশ্রু শুকিয়ে যায়। এমন কি এক ফোঁটা অশ্রুও চোখে ছিল না। প্রথমে আমি আমার পিতাকে বললাম যে, তিনি যেন আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জবাব দেন। কিন্তু তিনি বলেনঃ "আমি তাঁকে কি জবাব দেবো তা বুঝতে পারছি না।" তখন আমি আমার মাতাকে লক্ষ্য করে বলিঃ আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উত্তর দিন। কিন্তু তিনিও বলেনঃ "আমি তাঁকে কি উত্তর দেবো। তা খুঁজে পাচ্ছি না।" তখন আমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলাম। আমার বয়সতো তেমন বেশী ছিল না এবং কুরআনও আমার বেশী মুখস্থ ছিল না। আমি বললামঃ আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি

বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলেও এ পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। হ্যাঁ, তবে আমি এটা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ, তাহলে আপনারা আমার কথা মেনে নিবেন। এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ত তো সম্পূর্ণরূপে আবূ ইউসুফের (হযরত ইউসুফের আঃ পিতা হযরত ইয়াকূবের আঃ) নিম্নের উক্তিটিঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

অর্থাৎ "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।" (১২ ঃ ১৮) এটুকু বলেই আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করি এবং আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি। আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু আমি পবিত্র ও দোষমুক্ত, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ত থাকার কথা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে অবহিত করবেন। কিন্তু আমি এটা কল্পনাও করিনি যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। আমি নিজেকে অতি নগণ্য মনে করতাম যে, আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হতে পারে। হ্যাঁ, তবে বড় জোর আমার ধারণা এরূপ হতো যে, আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে হয়তো স্বপ্নযোগে আমার দোষমুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্র শপথ! তখনও রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের জায়গা থেকে সরেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও বাড়ী হতে বের হননি এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়ে যায়। তাঁর মুখমণ্ডলে ঐসব নিদর্শন প্রকাশ পায় যা অহীর সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর ললাট হতে ঘর্মের পবিত্র ফোঁটা পতিত হতে থাকে। কঠিন শীতের সময়ও অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঐ অবস্থাই প্রকাশ পেতো। অহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! তুমি খুশী হয়ে যাও। কারণ মহান আল্লাহ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।" তৎক্ষণাৎ আমার মাতা আমাকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যাও।" আমি উত্তরে বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবো না। তিনিই আমার দোষমুক্তি ও পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ঐ সময় অবতারিত আয়াতগুলো হলোঃ إِنَّ

الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ হতে দশটি আয়াত। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন আমার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আমার অপবাদ রচনাকারীদের মধ্যে মিসতাহ ইবনে আসাসাও (রাঃ) ছিল বলে আমার পিতা তার দারিদ্র্য ও তার সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বরাবরই তাকে যে সাহায্য করে আসছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আসছিলেন তা বন্ধ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى হতে وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত।

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলে উঠেনঃ "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন এটা আমি ভালবাসি।" অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে মিসতাহ (রাঃ)-এর উপর যে খরচ করতেন তা তিনি পুনরায় চালু করে দেন এবং বলেনঃ "আল্লাহর কসম! কখনো আমি তার থেকে এটা বন্ধ করবো না।"

আমার এই ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে হযরত যয়নব (রাঃ) আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁর আল্লাহর ভীতির কারণে তিনি আমার প্রতি কলংক আরোপ করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার কর্ণ ও চক্ষুকে রক্ষিত রাখছি, আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না।" অথচ তাঁর ভগ্নী হিমনাহ বিনতে জহশ আমার সম্পর্কে বহুকিছু বলেছিল এবং আমার বিরুদ্ধে বোনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। তথাপি হযরত যয়নব বিনতে জহশ (রাঃ) আমার সম্পর্কে একটিও মন্দ কথা উচ্চারণ করেননি। তবে তার ভগ্নী আমার অপবাদ রচনায় বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াতটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সনদে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ঐ ভাষণে একথাও বলেছিলেনঃ "হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে যে ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে সে আমার সফরে ও বাড়ীতে অবস্থানকালে আমার সাথে থেকেছে। আমার অনুপস্থিতিতে কখনো সে অমার বাড়ীতে আসেনি।" তাতে রয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)-এর মুকাবিলায় যে লোকটি দাঁড়িয়েছিলেন, উম্মে হাসসান তাঁর গোত্রেরই মহিলা ছিলেন। ঐ রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "যেদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ভাষণ দান করেন সেদিনের পর রাত্রে আমি উম্মে মিসতাহর সাথে বের হয়েছিলাম।" তাতে এটাও আছে যে, হযরত আয়েশা বলেনঃ "একবার উম্মে মিসতাহর পদস্খলন হলে সে তার ছেলে মিসতাহকে অভিশাপ দেয়। আমি তাকে নিষেধ করি। সে আবার পিছলে পড়লে আবার সে অভিশাপ দেয়। এবারেও আমি তাকে বাধা প্রদান করি। পুনরায় সে চাদরে জড়িয়ে পড়লে আবারও সে তার পুত্র মিসতাহকে অভিশাপ দেয়। আমি তখন তাকে ধমকাতে শুরু করি।" তাতে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ "ঐ সময় থেকেই আমার রোগ বৃদ্ধি পায়।" তাতে আরো আছে যে, তিনি বলেন, আমার মায়ের বাড়ী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সাথে একজন গোলামকে পাঠিয়ে দেন। আমি যখন মায়ের বাড়ী পৌঁছি তখন আমার পিতা উপরের ঘরে বসে কুরআন পাঠ করছিলেন। আমার মাতা ছিলেন নীচের ঘরে। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "আজ তুমি কেমন করে আসলে?" আমি তখন তাঁকে সবকিছু শুনিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম যে, এটা তাঁর কাছে না কোন অস্বাভাবিক কথা বলে মনে হলো এবং না তিনি তেমন দুঃখিতা ও চিন্তিতা হলেন, যেমনটি আমি আশা করেছিলাম।" ঐ রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি (আয়েশা রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার পিতার কানেও কি এ খবর পৌঁছেছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহও (সঃ) কি এ খবর পেয়েছেন? তিনি জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ।" এ কথা শুনে তো আমার কান্না এসে গেল। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। এমন কি আমার কান্নার শব্দ আমার পিতার কানেও পৌঁছে গেল। তাড়াতাড়ি তিনি নীচে নেমে আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" উত্তরে আমার মাতা বললেনঃ "তার উপর যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তা সে জেনে ফেলেছে।" একথা শুনে এবং আমার অবস্থা দেখে আমার পিতার চক্ষুদ্বয়ও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তিনি আমাকে বললেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি এখনই বাড়ী ফিরে যাও।" আমি

তখন বাড়ী ফিরে আসলাম। এখানে আমার অসাক্ষাতে বাড়ীর চাকরানীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে উত্তরে বলেঃ "আমি আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে মন্দ কিছুই দেখিনি, শুধু এটুকুই দেখেছি যে, ঠাসা আটা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়ে তিনি বে-খেয়ালে ঘুমিয়ে পড়েন, আর ওদিকে মাঝে মাঝে বকরী এসে ঐ আটা খেয়ে ফেলে।" এমন কি কোন কোন লোক তাকে ধমকের সুরে বলেঃ "দেখো, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সত্য কথা বল।" এভাবে তারা তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তখনো সে বলেঃ "খাঁটি সোনাকে আগুনে পোড়ালেও যেমন ওর কোন খুঁত বের করা যায় না, অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যেও কোন দোষ পাওয়া যাবে না।"

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে জড়িয়ে ফেলে যে লোকটির বদনাম করা হয়েছিল তিনি যখন এ খবর পান তখন তিনি বলে ওঠেনঃ "আল্লাহর শপথ! আজ পর্যন্ত আমি তো কোন স্ত্রীলোকের হাতটাও খুলে দেখিনি।" অবশেষ ঐ লোকটি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান। ঐ বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আসরের নামাযের পরে আগমন করেছিলেন। ঐ সময় আমার পিতা ও মাতা আমার ডান পাশে ও বাম পাশে বসেছিলেন। আর ঐ আনসারিয়া মহিলাটি যে এসেছিল সে দরযার উপর বসেছিল।" তাতে রয়েছে যে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাকে উপদেশ দেন এবং আমাকে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেন তখন আমি বলি, হায়! কি লজ্জার কথা! আপনি এই মহিলাটির কথাও খেয়াল করছেন না?" ঐ বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমিও আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর উত্তর দিয়েছিলাম।" ঐ সময় আমি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর নাম স্মরণ করবার খুবই চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁর নামটি এমনভাবে বিস্মৃত হই যে, কোনক্রমেই তা স্মরণ করতে পারিনি। তাই আবূ ইউসুফ (ইউসুফের আঃ পিতা) বলে ফেলি।" তাতে আছেঃ "অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাকে শুভ সংবাদ প্রদান করেন, আল্লাহর শপথ! ঐ সময় আমার চিন্তাপূর্ণ ক্রোধ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি আমার পিতা-মাতাকে বলেছিলাম, এই ব্যাপারে আমি আপনাদের নিকটও কৃতজ্ঞ নই। আপনারা একটা কথা শুনেছেন, কিন্তু শুনে তা আপনারা অস্বীকারও করেননি এবং একটু লজ্জাবোধও করেননি।" ঐ বর্ণনায় আরো আছেঃ "যারা এই অপবাদ রচনা করেছিল তারা হলো—হিমনাহ,

মিসতাহ্, হাসসান ইবনে সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। এই মুনাফিকই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সবচেয়ে বেশী এ খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিল।"

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমার ওযরের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে অপবাদের হদ লাগিয়েছিলেন। তারা হলোঃ হযরত ইবনে আসাসাহ (রাঃ) ও হিমনাহ্ বিনতে জহশ (রাঃ)।

অন্য একটি রিওয়ইয়াতে আছে যে, যখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর অপবাদের খবর জানতে পারেন এবং এটাও জানতে পারেন যে, ঐ খবর তাঁর পিতা-মাতা ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানেও পোঁছে গেছে তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কিছুটা জ্ঞান ফিরলে তাঁর শরীর জ্বরে খুবই গরম হয়ে যায় এবং তিনি খুব কাঁপতে থাকেন। তাঁর মাতা তৎক্ষণাৎ তাঁর গায়ে লেপ চাপিয়ে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় আগমন করেন এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে বলা হয় যে, তাঁর খুবই জ্বর হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সম্ভবতঃ এ খবর শুনেই তার অবস্থা এমন হয়েছে।" যখন তাঁর ওযরের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তখন তিনি আয়াতগুলো শুনে নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "এটা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, আপনার নয়।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপ কথা বলছো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ।"

আয়াতগুলোর ভাবার্থ হলোঃ যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল। তারা সংখ্যায় কয়েকজন। হে আবূ বকর (রাঃ)-এর পরিবার। তোমরা এটাকে তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না। বরং ফলাফলের দিক দিয়ে দ্বীন ও দুনিয়ায় এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। দুনিয়ায় তোমাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হবে এবং আখিরাতে তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নির্দোষ প্রমাণকারী আয়াতসমূহ কুরআন কারীমে অবতীর্ণ হবে, যার আশে পাশে মিথ্যা আসতেই পারে না। এ কারণেই যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর কাছে হাযির হয়ে বলেনঃ "আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্নী। তিনি আপনাকে খুবই মহব্বত করতেন এবং আপনি ছাড়া তিনি অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। আপনার দোষমুক্তি সম্বলিত আয়াতসমূহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জহশ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত যয়নব (রাঃ) নিজ নিজ প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিতে শুরু করেন। হযরত যয়নব (রাঃ) বলেনঃ "আমি ঐ মহিলা যার বিবাহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমার সততা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য কুরআন কারীমে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।" যখন হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ) আমাকে তাঁর সওয়ারীর উপর বসিয়ে নিয়েছিলেন।" হযরত যয়নব (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ " ঐ সময় আপনি কি কালেমা পাঠ করেছিলেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "ঐ সময় আমি পাঠ করেছিলামঃ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ "আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্য সম্পাদনকারী।"[১] একথা শুনে হযরত যয়নব (রাঃ) বলেনঃ "আপনি মুমিনদের কালেমা পাঠ করেছিলেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা (হযরত আয়েশার রাঃ) প্রতি এই অপবাদ রচনা করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে পাপ কর্মের ফল। আর তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। এর দ্বারা অভিশপ্ত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে বুঝানো হয়েছে। সঠিক উক্তি এটাই। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়। এ উক্তিটিও আছে বলেই আমরা এটা বর্ণনা করলাম। কেননা, হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ) মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের একজন। তাঁর বহু ফযীলত ও বুযর্গীর কথা হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ইনিই ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফির কবিদের নিন্দাসূচক কবিতাগুলোর জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেনঃ "তুমি কাফিরদের নিকৃষ্টতা বর্ণনা কর, তোমার সাথে হযরত জিবরাঈল (আঃ) রয়েছেন।"

হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় হযরত হাসসান (রাঃ) সেখানে আগমন করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসতে দেন এবং তাঁর জন্যে গদি বিছাবার নির্দেশ দেন। তিনি ফিরে গেলে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কেন তাঁকে আপনার কাছে আসতে দেন? তাঁর আগমনে কি লাভ? আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ "অপবাদ রচনায় সে

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি।" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "অন্ধত্বের চেয়ে বড় ও কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে?" তাঁর চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বলেনঃ "সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা এটাকেই কঠিন শাস্তি বলেছেন।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "তুমি কি খবর রাখো না যে, এই লোকটিই তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার জবাব দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল?"

হযরত আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "হাসসান (রাঃ)-এর কবিতা অপেক্ষা উত্তম কবিতা আমার চোখে পড়ে না। যখনই আমি তার ঐ কবিতাটি পাঠ করি তখনই আমার মনে খেয়াল জাগে যে, হাসসান জান্নাতী। কবিতাটি সে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন।"[১]

কবিতাটি হলোঃ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللّٰهِ فِيْ ذَاكَ الْجَزَاءُ

فَاِنَّ اَبِىْ وَ وَالِدَهٗ وَعِرْضِىْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

اَتَشْتُمُهٗ وَلَسْتَ لَهٗ بِكُفْءٍ * فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا فِدَاءُ

لِسَانِىْ صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيْهِ * وَبَحْرِىْ لَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَاءُ

অর্থাৎ "তুমি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দুর্নাম করেছো তাই আমি তার জবাব দিচ্ছি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি এর প্রতিদান লাভ করবো। আমার বাপ-দাদা এবং আমার ইযযত আবরূ সবই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর কুরবান হোক, আমি এ সবকিছু নিঃশেষ করে দিয়ে হলেও তোমার বদ যবানের মুকাবিলা করতে পিছ পা হবো না। তোমার মত একজন লোক যে আমার নবী (সঃ)-এর পায়ের তালুরও সমান হতে পারে না, তুমি আবার আমার নবী (সঃ)-এর দুর্নাম করছো? স্মরণ রেখো যে, তোমার মত একজন দুষ্ট লোক আমাদের নবী (সঃ)-এর মত একজন মহান ও সৎ লোকের উপর উৎসর্গীকৃত। তুমি যখন আমাদের নবী (সঃ)-এর দুর্নাম করছো তখন দোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারীর চাইতেও তীক্ষ্ণ আমার যবান থেকে তুমি রক্ষা পেতে পার না।

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন।

জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে উম্মুল মুমিনীন (রাঃ)! এটা কি বাজে কথা নয়?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “কখনই নয়। বাজে কথা তো হচ্ছে কবিদের ঐ সব কথা যা নারীদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে।” আবার প্রশ্ন করা হয়ঃ “কুরআন কারীমে কি আল্লাহ তা‘আলা বলেননি যে, এই অপবাদ রচনার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি?” জবাবে তিনি বলেনঃ “হ্যাঁ, বলেছেন বটে। কিন্তু যে শাস্তি তাকে দেয়া হয়েছে তা কি কঠিন ও বড় শাস্তি নয়? তার চক্ষু নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।” হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ) যখন শুনতে পান যে, হাসসান তাঁর দুর্নাম করেছে তখন তিনি তার উপর তরবারী উত্তোলন করেন এবং তাকে হত্যা করে দিতে উদ্যত হন। কিন্তু কি মনে করে হত্যা করা হতে বিরত থাকেন।

১২। এই কথা শুনবার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীরগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনিঃ এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ।

١٢- لَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○

১৩। তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী হাযির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।

١٣- لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর শানে জঘন্য কালেমা মুখ দিয়ে বের করেছে তাদের জন্যে ওটা মোটেই শোভনীয় হয়নি। বরং তাদের উচিত ছিল যে, যখনই তারা ঐ কথা শুনলো তখনই তাদের শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে তারা ঐ ধারণা করতো যে ধারণা তারা নিজেদের সম্পর্কে করে থাকে। তারা নিজেদের জন্যেও এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন মনে করে না। তাহলে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা তো তাদের মর্যাদার বহু উর্ধ্বে। ঠিক এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেও ছিল। হযরত আবু আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী উম্মে আইয়ূব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা

কি আপনি শুনেছেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যাঁ! এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। হে উম্মে আইয়ূব (রাঃ)! তুমিই বলতো, তুমি কি কখনো এরূপ কাজ করতে পার?” উত্তরে তাঁর স্ত্রী বলেনঃ “নাঊযুবিল্লাহ! এ কাজ আমি কখনো করতে পারি না। এটা আমার জন্যে অসম্ভব।” তখন হযরত আবূ আইয়ূব (রাঃ) বলেনঃ “তাহলে চিন্তা করে দেখতো, হযরত আয়েশা (রাঃ) তো তোমার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ও যর্মাদা সম্পন্না (তাহলে তাঁর দ্বারা এ কাজ কিরূপে সম্ভব হতে পারে)।” সুতরাং যখন আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তখন প্রথমে অপবাদ রচনাকারীদের বর্ণনা দেয়া হয়, অর্থাৎ হযরত হাসসান (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের। তারপর এই আয়াতগুলোতে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর এ কথাগুলোর বর্ণনা দেয়া হয় যেগুলো উপরে বর্ণিত হলো।

একটি উক্তি এও আছে যে, উপরে যে ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হলো ওটা ছিল হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর ঘটনা। মোটকথা, মুমিনদের মন পরিষ্কার থাকা উচিত এবং ভাল ধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আর মুখেও এরূপ ঘটনাকে খণ্ডন করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিত। কেননা, যতটুকু ঘটনা ঘটেছে তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) খোলাখুলিভাবে সওয়ারীর উপর আরোহণ করেছেন এবং দিন দুপুরে সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদ্যমান রয়েছেন। আল্লাহ না করেন যদি তাঁর পদস্খলন ঘটে থাকতো তবে এমন খোলাখুলিভাবে সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হতেন না, বরং গোপনীয়ভাবেই মিলিত হয়ে যেতেন, কেউ টেরই পেতো না। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপবাদ রচনাকারীরা যে কথা মুখ দিয়ে বের করেছে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর ফলে তারা নিজেদের ঈমান ও ইযযত নষ্ট করে ফেলেছে।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তারা কেন এই ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি তখন আল্লাহর বিধানে তারা মিথ্যাবাদী,পাপী ও অপরাধী প্রমাণিত হয়ে গেল।

১৪। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্যে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো।

١٤- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ

১৫। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট ছিল এটা গুরুতর বিষয়।

١٥- اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ قٍ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে ঐ লোক সকল! যারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে মুখে মন্দ ও অশোভনীয় কথা উচ্চারণ করেছো, জেনে রেখো যে, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো, এইভাবে যে, তিনি দুনিয়ায় তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং আখিরাতে তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে যে কথা বের করেছো এ কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করতো। এই আয়াতটি ঐ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের অন্তরে ঈমান ছিল, কিন্তু ত্বরা প্রবণতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে ঐ কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যেমন হযরত মিসতাহ (রাঃ), হযরত হাসসান (রাঃ) এবং হযরত হিমনাহ (রাঃ)! কিন্তু যাদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য, যারা ঐ তুফান উঠিয়েছিল, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল প্রমুখ মুনাফিকরা এই হুকুম বহির্ভূত। কেননা, না তাদের অন্তরে ঈমান ছিল, না তারা সৎকার্য সম্পাদন করতো। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যে অপরাধ ও পাপের উপর যে শাস্তির ভয় দেখানো হয় তা তখনই স্থির হয়ে যায় যদি ওর মুকাবিলায় তাওবা না থাকে বা ঐরূপ অথবা ওর চেয়ে বড় পুণ্য না থাকে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ এক মুখ হতে আর এক মুখে এবং আর এক মুখ হতে অন্য আর এক মুখে এভাবে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কিরআতে اِذْ تَلِقُوْنَهٗ রয়েছে। অর্থাৎ যখন তোমরা ঐ মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিচ্ছিলে। প্রথমটি জমহূরের কিরআত এবং ঐ কিরআতটি হলো তাঁদেরই কিরআত যাঁদের এই আয়াতের জ্ঞান বেশী ছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একথাটিকে হালকা মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়। কোন মুসলমানের স্ত্রীর এরূপ অপবাদ রচনা করা গুরুতর অপরাধ। আর ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র স্ত্রী। তাহলে তাঁর সম্পর্কে এই অপবাদ রচনা করা কত বড় অপরাধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই স্বীয় নবী (সঃ)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করতঃ নবী (সঃ)-এর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীত্ব প্রমাণ করেন। প্রত্যেক নবীর স্ত্রীকেই মহান আল্লাহ এই নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাজেই এটা কি করে সম্ভব যে, সমস্ত নবীর স্ত্রীদের চেয়ে উত্তম ও তাদের নেত্রী এবং সমস্ত নবী হতে উত্তম ও সমস্ত আদম সন্তানের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর স্ত্রী এই নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়বেন। এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে ছিল এটা গুরুতর বিষয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, কোন কোন সময় মানুষ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কোন কথা মুখে বলে ফেলে যার কোন গুরুত্ব তার কাছে থাকে না। কিন্তু ঐ কারণে সে জাহান্নামের এতো নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যতো নিম্নস্তরে আকাশ হতে যমীন রয়েছে। এমন কি তার চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়।

১৬। এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!

১৬- وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○

১৭। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন– তোমরা যদি মুমিন হও, তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

١٧- يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৮। আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	١٨- وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

পূর্বে ভাল ধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এখানে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভাল লোকদের সম্পর্কে সত্যাসত্য নিরূপণ না করে কোন মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের করা চলবে না। খারাপ ধারণা, জঘন্য অপবাদ এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকতে হবে। কখনো এরূপ খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের করতে হবে না। যদি অন্তরে এরূপ শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েও যায় তবুও জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত না ওটা মুখে প্রকাশ করে অথবা কার্যে পরিণত করে।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন তোমরা এটা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়? তোমাদের বলা উচিত ছিলঃ আমরা এ বেআদবী করতে পারি না যে, আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর স্ত্রীর সম্পর্কে এরূপ বাজে ও জঘন্য কথা বলে ফেলি। আল্লাহর সত্তা পবিত্র।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন–তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। হ্যাঁ, তবে যদি কোন লোক ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকে তাহলে সে তো বেআদব, অভদ্র এবং ভাল লোকদেরকে ঘৃণাকারী হবেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। বান্দার জন্যে কি কল্যাণকর তা তিনি সম্যক অবগত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন হুকুমই নিপুণতা শূন্য নয়।

১৯। যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।	١٩- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

এটা হলো তৃতীয় সতর্কতা, যে ব্যক্তি এ ধরনের কথা শুনবে তার জন্যে ওটা ছড়িয়ে দেয়া হারাম। যারা এ রকম জঘন্য কথা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদেরকে পার্থিব শাস্তি অর্থাৎ হদ লাগানো এবং পারলৌকিক শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামেও নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। সুতরাং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে দোষারোপ করো না এবং তাদের গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করো না। যে তার মুসলমান ভাই-এর গোপনীয় দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলাও তার গোপনীয় দোষের পিছনে লাগবেন এবং তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করবেন যে, তাকে তার বাড়ীর লোকেরাও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে।"[১]

٢٠- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

২০। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতো না, এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

٢١- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২১। হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ ও করুণা না হতো তবে ঐ সময় অন্য কিছু ঘটে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাওবাকারীদের তাওবা কবূল করে নিয়েছেন ও পবিত্রতা লাভ করতে ইচ্ছুকদেরকে তিনি শরীয়তের বিধান মতে শাস্তি প্রদানের পর পবিত্র করেছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, তার কথামত চলো না। সে তো তোমাদেরকে অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং তার অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকা তোমাদের উচিত। তার কাজ কর্ম এবং কুমন্ত্রণা হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহর অবাধ্যতায় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ প্রকাশ পায়। একটি লোক হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে বলেঃ "আমি অমুক খাদ্য নিজের উপর হারাম করার কসম করেছি।" তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাকে বলেনঃ "এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। তুমি তোমার কসমের কাফফারা আদায় কর এবং ঐ খাদ্য খেয়ে নাও।"

হযরত সুলাইমান তাইমী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ রাফে' (রঃ) বলেন, আমার স্ত্রী একদা আমার উপর রাগান্বিতা হয়ে বলেঃ "একদিন আমি ইয়াহূদী নারী এবং একদিন খৃষ্টান নারী, আর আমার সমস্ত গোলাম আযাদ যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে (আমাকে) তালাক না দাও।" আমি তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করি। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা।" যয়নব বিনতে উম্মে সালমা (রাঃ)-ও এ কথা বলেন, যিনি ঐ সময় মদীনার মধ্যে শরীয়তের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রাখতেন। তারপর আমি হযরত আসেম ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট আসি। তিনিও অনুরূপ কথাই বলেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো শিরক ও কুফরী হতে পবিত্র হতে পারতে না। এটা মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের তাওবা কবূল করতঃ তোমাদেরকে গুনাহ থেকে পাক-সাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করে থাকেন এবং যাকে চান ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেন। কে সঠিক পথের পথিক এবং কে পথভ্রষ্ট সবই তাঁর গোচরে রয়েছে। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

২২। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٢- وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং দান-খয়রাতকারী তারা যেন এরূপ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুহাজিরদেরকে কিছুই দিবে না। এভাবে তাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর পর তাদেরকে আরো নরম করার জন্যে বলেনঃ তারা যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে বসে তবে যেন তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের ঐ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। এটাও আল্লাহ তা'আলার সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর সৎ বান্দাদেরকে ভাল কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি হযরত মিসতাহ ইবনে আসাসা (রাঃ)-এর প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ ও সাহায্য সহানুভূতি না করার শপথ করেন। কেননা, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি গত হয়েছে। যখন প্রকৃত তথ্য আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে গেলেন। আর মুসলমানদের অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুমিনদের তাওবা কবূল করা হলো এবং অপবাদ রচনাকারীদের কাউকে কাউকে শরীয়তের বিধান মতে শাস্তি প্রদান করা হলো তখন মহান আল্লাহ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মনোযোগ হযরত মিসতা (রাঃ)-এর দিকে ফিরাতে বলেন, যিনি তাঁর খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি

ছিলেন খুবই দরিদ্র লোক। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে লালন-পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন মুহাজির। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ ঘটনায় তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিল। তাঁর উপর অপবাদের হদও লাগানো হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মুক্ত হস্তে দান করার অভ্যাসের কথাটি ছিল সর্বজন বিদিত। তাঁর দান ছিল আপন ও পর সবারই জন্যে সাধারণ। আয়াতের "তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন?" এই শব্দগুলো হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে ফেলেনঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন।" আর তখন থেকেই তিনি মিসতাহ (রাঃ)-এর সাহায্য ও দান পুনরায় চালু করে দেন। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে যেন এটাই উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হোক এটা যেমন আমরা কামনা করি অনুরূপভাবে অন্যদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া আমাদের উচিত। আমাদের এটাও লক্ষ্য রাখার বিষয় যে, পূর্বে যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেছিলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো মিসতাহ (রাঃ)-এর উপর খরচ ও সাহায্য সহানুভূতি করবো না।" অনুরূপভাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলেনঃ "আল্লাহর কসম! মিসতাহ (রাঃ)-এর উপর দৈনিক আমি যা খরচ করতাম তা আর কখনো বন্ধ করবো না।" সত্যিই তিনি সিদ্দীকই (সত্যপরায়ণই) ছিলেন।

٢٣- اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

২৩। যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি।

٢٤- يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৪। যেই দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে-

২৫। সেই দিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।	٢٥- يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○

যারা সাধারণ সতী সাধ্বী, সরলমনা ও মুমিনা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে এখানে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরই শাস্তি যদি এরূপ হয় তবে যারা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মুসলমানদের মাতাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে থাকে তাদের শাস্তি কি হতে পারে? বিশেষ করে ঐ স্ত্রীর উপর, যিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন।

উলামায়ে কিরামের এর উপর ইজমা রয়েছে যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে অপবাদের সাথে স্মরণ করে সে কাফির। কেননা, সে কুরআন কারীমের বিরুদ্ধাচরণ করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারেও সঠিক উক্তি এটাই যে, তাঁরাও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর মতই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি। যেমন তাঁর উক্তি অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দেয়।" (৩৩ঃ ৫৭)

কারো কারো ধারণা এই যে, এটা বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথাই বলেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি যে বিস্তারিত রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অহী আসা এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এই হুকুম হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিশিষ্ট হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বিশিষ্ট হলেও এর হুকুম সাধারণ। হতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তিরও ভাবার্থ এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কোন কোন মনীষী বলেন যে, সমস্ত পবিত্র স্ত্রীর হুকুম এটাই বটে, কিন্তু মুমিনা স্ত্রীলোকদের হুকুম এটা নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য, এই অপবাদে যেসব মুনাফিক অংশ নিয়েছিল তারা সবাই অভিশপ্ত সাব্যস্ত হয় এবং আল্লাহর ক্রোধের কোপানলে পতিত হয়। এর পরে মুমিনা স্ত্রীলোকদের উপর অপবাদ আরোপকারীদের হুকুম হিসেবে وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا .... الخ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাদেরকে চাবুক মারা হবে। তারা তাওবা করলে তাদের তাওবা কবূল করা হবে। কিন্তু তাদের সাক্ষ্য তখন থেকে নিয়ে চিরদিনের জন্যে অগ্রাহ্য হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার সূরায়ে নূরের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই আয়াতটি রাসূলল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঐ অপবাদ আরোপকারীদের তাওবা গৃহীত নয়। এ আয়াতটি অস্পষ্ট। আর চারজন সাক্ষী আনতে না পারার আয়াতটি সাধারণ ঈমানদার স্ত্রীলোকদের উপর অপবাদ আরোপকারীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তাদের তাওবা গৃহীত। তাঁর এ কথা শুনে সভার লোকদের ইচ্ছা হলো যে, তারা তাঁর কপাল চুম্বন করবে। কেননা, তিনি খুবই উত্তম তাফসীর করেছিলেন। ইবহাম বা অস্পষ্ট দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদের অবৈধতা সাধারণ। এটা প্রত্যেক সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এসব অপবাদ আরোপকারীদের সবাই অভিশপ্ত।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক অপবাদ রচনাকারী এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে এই হুকুম আরো বেশী প্রযোজ্য। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) সাধারণত্বকেই পছন্দ করেন এবং এটাই সঠিকও বটে। সাধারণত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও রয়েছেঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সাতটি ধ্বংসকারী পাপ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐগুলো কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ঐগুলো হলো- আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কাউকেও হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, সরলা মুমিনা স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ আরোপ করা।"[১]

১. ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর একশ বছরের পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়।"[১]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ "মুশরিকরা যখন দেখবে যে, জান্নাতে নামাযীরা ছাড়া আর কেউই প্রবেশ করে না তখন তারা তাদের শিরকের কথা অস্বীকার করে বসবে। তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে তখন সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। কাজেই তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।"[২]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, কাফিরদের সামনে যখন তাদের মন্দ কার্যাবলী পেশ করা হবে তখন তারা ঐগুলোকে অস্বীকার করে বসবে এবং নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলবে। তখন তাদেরকে বলা হবে–"এরা হলো তোমাদের প্রতিবেশী। এরা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।" তারা বলবেঃ "এরা মিথ্যাবাদী।" আবার তাদেরকে বলা হবে–"এরা তোমাদের পরিবার ও গোত্রের লোক। এরা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করছে।" তারা জবাবে বলবেঃ "এরাও সব মিথ্যাবাদী।" তখন তাদেরকে বলা হবে– "আচ্ছা, তাহলে তোমরা শপথ কর।" তারা তখন শপথ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মূক বা বোবা করে দিবেন এবং তাদের হাত ও পা তাদের দুষ্কার্যাবলীর সাক্ষ্য দেবে। ফলে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে।"[৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট হাযির ছিলাম এমন সময় তিনি হেসে ওঠেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি?" আমরা উত্তরে বললামঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন। তিনি তখন বলেন, কিয়ামতের দিন বান্দা প্রতিপালকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম হতে বিরত রাখেননি?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ "হ্যাঁ।" সে বলবেঃ "আচ্ছা, আজ আমি যে সাক্ষীকে সত্যবাদীরূপে মেনে নিবো তার সাক্ষ্যই আমার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং ঐ সাক্ষী আমি নিজেই, আর কেউ নয়।" আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ

---

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) স্বীয় তাফসীরে এটা বর্ণনা করেছেন।

"আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী থাকো।" অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে প্রশ্ন করা হবে, আর ওগুলো তার সবকিছুই প্রকাশ করে দেবে। সে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবেঃ "তোমরা ধ্বংস হও। তোমাদের পক্ষ থেকেই তো আমি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম।"[১]

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি নিজেই তোমার মন্দ কার্যাবলীর সাক্ষী। তোমার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তুমি এর খেয়াল রাখবে। তুমি প্রকাশ্য কার্যে ও গোপনীয় কার্যে আল্লাহকে ভয় করবে। আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। অন্ধকার তাঁর সামনে আলোকময় থাকে এবং গোপনীয় বিষয় থাকে তাঁর কাছে প্রকাশমান। আল্লাহর সাথে ভাল ধারণা রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনই ক্ষমতা নেই।

এখানে 'দ্বীন' দ্বারা 'হিসাব' বুঝানো হয়েছে। জমহূরের কিরআতে حَقَّ -এর উপর যবর রয়েছে, কেননা, ওটা دِيْن-এর صِفَت বা বিশেষণ। মুজাহিদ (রঃ) حَقُّ পড়েছেন। এই হিসেবে اَللّٰهُ এর صِفَت হবে। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মাসহাফে পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ الْحَقُّ دِيْنَهُمْ -এই রূপ পড়াও বর্ণিত আছে।

ঐ সময় মানুষ জানতে পারবে যে, আল্লাহর ওয়াদা অঙ্গীকার ও ভীতি-প্রদর্শন সবই সত্য। হিসাব গ্রহণে তিনি ন্যায়বান এবং যুলুম হতে তিনি বহুদূরে। হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনি বান্দার উপর তিল পরিমাণও যুলুম করবেন না।

٢٦- اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ ع

২৬। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্যে; লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্যে আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এইরূপ মন্দ কথা মন্দ লোকদের জন্যেই শোভা পায়। ভাল কথা ভাল লোকদের জন্যেই শোভনীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মুনাফিকরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উপর যে অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর সম্পর্কে যে জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছে তার যোগ্য তারাই। কেননা, তারাই অশ্লীল ও ম্লেচ্ছ। হযরত আয়েশা (রাঃ) সতী-সাধ্বী বলে তিনি পবিত্র কথারই যোগ্য। এ আয়াতটিও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আয়াতটির পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ), যিনি সব দিক দিয়েই পবিত্র, তাঁর বিবাহে যে আল্লাহ তা'আলা অসতী ও ম্লেচ্ছা নারী প্রদান করবেন এটা অসম্ভব। কলুষিতা নারী কলুষিত পুরুষের জন্যে শোভনীয়। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ লোকে যা বলে তারা তা হতে পবিত্র। এই দুষ্ট লোকদের মন্দ ও ঘৃণ্য কথায় তারা যে দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছে এটাও ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা লাভের কারণ। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী বলে জান্নাতে আদনে তাঁর সাথেই থাকবে।

একদা হযরত উসায়েদ ইবনে জাবির (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেন– "আজ আমি ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাঃ)-এর এক অতি মূল্যবান ও উত্তম কথা শুনেছি।" তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "ঠিকই বটে। মুমিনের অন্তরে একটি কথা আসে। তারপরে ওটা তার বক্ষের উপর চলে আসে এবং এরপর সে ওটা মুখ দ্বারা প্রকাশ করে। কথাটি ভাল বলে ভাল কথা শ্রবণকারী ওটাকে নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয়। অনুরূপভাবে মন্দ কথা মন্দ লোকদের অন্তর হতে বক্ষের উপর এবং বক্ষ হতে জিহ্বা পর্যন্ত চলে আসে। মন্দ লোক ওটাকে শোনা মাত্রই নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয়।" অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ... الخ -এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি বহু কিছু কথা শোনার পর ওগুলোর মধ্যে যে কথা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওটাই বর্ণনা করে তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তি যে কোন বকরীর মালিকের কাছে একটি বকরী চাইলো। তখন বকরীর মালিক তাকে বললোঃ "তুমি বকরীর যুথ বা খোয়াড়ে গিয়ে তোমার ইচ্ছামত একটি বকরী নিয়ে নাও।" তার কথামত সে যুথে গিয়ে বকরীর (প্রহরী) কুকুরের কান ধরে নিয়ে আসলো।"[২] অন্য হাদীসে রয়েছেঃ "জ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। সে ওটা যেখানেই পাবে নিয়ে নিবে।"

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٢٧- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

২৭। হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না; এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢٨- فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৮। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়; যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষে অবহিত।

٢٩- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

২৯। যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্যে দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

এখানে শরীয়ত সম্মত আদব বা ভদ্রতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ঘোষিত হচ্ছে—কারো বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা কর। অনুমতি পেলে প্রবেশ কর। প্রথমে সালাম বল। প্রথমবারের অনুমতি প্রার্থনায় যদি অনুমতি না মিলে তবে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাও। এবারেও অনুমতি না পেলে তৃতীয়বার

অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি এই তৃতীয়বারেও অনুমতি না পাও তবে ফিরে যাও। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। তিনবার তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চান। যখন কেউই তাঁকে ডাকলেন না তখন তিনি ফিরে আসলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত উমার (রাঃ) লোকদেরকে বললেনঃ "দেখো তো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) ভিতরে আসতে চাচ্ছেন। তাঁকে ভিতরে ডেকে নাও।" এক লোক বাইরে এসে দেখে যে, তিনি ফিরে গেছেন। লোকটি গিয়ে হযরত উমার (রাঃ)-কে এ খবর দিলো। পরে হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি ফিরে গিয়েছিলেন কেন?" উত্তরে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ এই যে, তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরেও অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে। আপনার ওখানে গিয়ে আমি ভিতরে প্রবেশের জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে হাদীসের উপর আমল করে ফিরে এসেছি।" হযরত উমার (রাঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "আপনি এ হাদীসের পক্ষে সাক্ষী আনয়ন করুন, অন্যথায় আমি আপনাকে শাস্তি প্রদান করবো।" এই কথা অনুযায়ী হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ফিরে এসে আনসারের এক সমাবেশে হাযির হন এবং তাঁদের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ "আপনাদের মধ্যে কেউ এই হাদীসটি শুনে থাকলে তিনি যেন আমার সাথে গিয়ে হযরত উমারের সামনে এটা বর্ণনা করেন।" আনসারগণ বলেনঃ "এটা তো সাধারণ মাসআলা। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন এবং আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে অল্প বয়সী ছেলেটিকেই আপনার সাথে পাঠাচ্ছি। সেই সাক্ষ্য দিয়ে আসবে।" অতঃপর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) গেলেন এবং হযরত উমার (রাঃ)-কে বললেনঃ "আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একথা শুনেছি।" ঐ সময় হযরত উমার (রাঃ) আফসোস করে বলেনঃ "বাজারের আদান-প্রদান আমাকে এই মাসআলা থেকে উদাসীন রেখেছে।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর কাছে (তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলেন। কিন্তু তিনি এমন স্বরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুনতে পাননি। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার সালাম দেন এবং তিনবারই একই অবস্থা ঘটে। তিনি সালাম করেন এবং হযরত সা'দ

জবাবও দেন। কিন্তু তিনি শুনতে পান না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান থেকে ফিরে আসতে শুরু করেন। এ দেখে হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁর পিছনে দৌড় দেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার প্রত্যেক সালামের শব্দই আমার কানে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়েছি, কিন্তু আপনার দু'আ ও বরকত বেশী প্রাপ্তির আশায় এমন স্বরে সালামের জবাব দিয়েছি যেন আপনার কানে না পৌঁছে। সুতরাং মেহেরবানী করে এখন আমার বাড়ী ফিরে চলুন।" তাঁর একথায় রাসূলল্লাহ (সঃ) তাঁর (হযরত সা'দের রাঃ) বাড়ীতে ফিরে আসেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করেন। তিনি তা খেয়ে নিয়ে বলেনঃ "তোমার এ খাদ্য সৎ লোকে খেয়েছেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী তোমার প্রতি রহমতের জন্যে প্রার্থনা করেছেন। তোমার এ খাদ্য দ্বারা রোযাদারগণ রোযার ইফতার করেছেন।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালাম বলেন এবং হযরত সাদ (রাঃ) নিম্নস্বরে জবাব দেন তখন তাঁর পুত্র হযরত কায়েস (রাঃ) তাঁর পিতাকে বলেনঃ "আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি কেন দিচ্ছেন না?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "চুপ থাকো, দেখো, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার সালাম দিবেন এবং দ্বিতীয়বার আমরা তাঁর দু'আ পাবো।" ঐ রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) গোসল করেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁর সামনে যাফরান বা ওয়ারসের রঙে রঞ্জিত একখানা চাদর পেশ করেন যেটা তিনি নিজের দেহ মুবারকে জড়িয়ে নেন। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর জন্যে দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ! সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর বংশধরের উপর দরূদ ও রহমত বর্ষণ করুন!" অতঃপর তিনি সেখানে আহার করেন। তিনি সেখান থেকে বিদায় হওয়ার ইচ্ছা করলে হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁর গাধার পিঠে গদি কষে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁর ছেলে কায়েস (রাঃ)-কে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাথে যাও।" তিনি তখন তাঁর সাথে সাথে চললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত কায়েস (রাঃ)-কে বললেনঃ "কায়েস (রাঃ)! তুমিও সওয়ার হয়ে যাও।" হযরত কায়েস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "দুটোর মধ্যে একটা তোমাকে অবশ্যই করতে হবে। সওয়ার হও, না হয় ফিরে যাও।" তখন হযরত কায়েস (রাঃ) ফিরে আসাই স্বীকার করেন।

(১) এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে দরযার সামনে দাঁড়ানো চলবে না। বরং তাকে ডানে বা বামে একটু সরে দাঁড়াতে হবে। কেননা, সুনানে আবি দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারো বাড়ীতে যেতেন তখন তিনি তার বাড়ীর দরযার ঠিক সামনে দাঁড়াতেন না। বরং এদিক-ওদিক একটু সরে দাঁড়াতেন। আর তিনি উচ্চস্বরে সালাম বলতেন। তখন পর্যন্ত দরযার উপর পর্দা লটকানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না।

রাসূলুলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীর দরযার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে শিক্ষা দিবার জন্যে বলেনঃ "(স্ত্রীলোকের প্রতি) দৃষ্টি যেন না পড়ে এজন্যেই তো অনুমতি প্রার্থনার ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাহলে দরযার সামনে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনার কি অর্থ হতে পারে? হয় এদিকে একটু সরে দাঁড়াবে, না হয় ওদিকে একটু সরে দাঁড়াবে।"

অন্য একটি হাদীসে রয়েছেঃ "কেউ যদি তোমার বাড়ীতে তোমার অনুমতি ছাড়াই উঁকি মারতে শুরু করে এবং তুমি তাকে কংকর মেরে দাও আর এর ফলে তার চক্ষু বিদীর্ণ হয়ে যায় হবে তোমার কোন অপরাধ হবে না।"[১]

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জাবির (রাঃ) তাঁর পিতার ঋণ আদায়ের চিন্তায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হন। তিনি দরযায় করাঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "কে?" হযরত জাবির (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আমি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি, আমি?" তিনি যেন 'আমি' বলাকে অপছন্দ করলেন। কেননা, 'আমি' বলাতে ঐ ব্যক্তি কে তা জানা যায় না যে পর্যন্ত না নাম বা কুনিয়াত বলা হবে। 'আমি' তো প্রত্যেকেই নিজের জন্যে বলতে পারে। কাজেই এর দ্বারা প্রকৃত অনুমতি প্রার্থনাকারীর পরিচয় লাভ করা যেতে পারে না।

اِسْتِئْذَانٌ এবং اِسْتِئْنَاسٌ একই কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, تَسْتَأْنِسُوْا কথাটি লেখকদের ভুল। تَسْتَأْذِنُوْا বলা উচিত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআত এটাই ছিল। আর হযরত উবাই ইবনে কাবেরও (রাঃ) কিরআত এটাই। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল উক্তি। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর মাসহাফে حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا وَتَسْتَاْذِنُوْا -এইরূপ রয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর একদা কিলদাহ্ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সময় উপত্যকার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। কিলদাহ্ ইবনে হাম্বল (রাঃ) সালাম প্রদান ও অনুমতি প্রার্থনা ছাড়াই তাঁর নিকট পৌঁছে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "ফিরে যাও এবং বল—আসসালামু আলাইকুম। আমি আসতে পারি কি?"[১]

বর্ণিত আছে যে, বানু আমির গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। সে বলেঃ "আমি ভিতরে আসতে পারি কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক গোলামকে বলেনঃ "তুমি বাইরে গিয়ে তাকে অনুমতি প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিখিয়ে এসো। সে যেন প্রথমে সালাম দেয় এবং পরে অনুমতি প্রার্থনা করে।" লোকটি তাঁর একথা শুনে নেয় এবং ঐভাবেই সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে অনুমতি দেন এবং সে ভিতরে প্রবেশ করে।"[২]

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি লোক এসে সালাম না দিয়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রওযাহ্ নাম্নী তাঁর একটি দাসীকে বলেনঃ "লোকটি অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি ভালরূপে অবগত নয়। তুমি উঠে গিয়ে তাকে বল যে, সে যেন আসসালামু আলাইকুম বলার পর বলে—'আমি প্রবেশ করতে পারি কি?" লোকটি এ কথা শুনে নেয় এবং ঐ ভাবেই সে সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কথা বলার পূর্বে সালাম রয়েছে।"[৩]

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) একদা হাজত পুরো করে আসছিলেন। কিন্তু রৌদ্রের তাপ সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি এক কুরাইশীর কুটিরের নিকট এসে বলেনঃ "আসসালামু

১. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রাঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটি দুর্বল হাদীস।

আলাইকুম। আমি ভিতরে আসতে পারি কি?" কুরাইশী বলেঃ "শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আসুন!" তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। লোকটি ঐ একই উত্তর দেয়। তাঁর পা পুড়ে যাচ্ছিল। কখনো তিনি আশ্রয় নিচ্ছিলেন এই পায়ের উপর কখনো ঐ পায়ের উপর। তিনি তাকে বলেনঃ বল– 'আসুন'। সে তখন বলেঃ " আসুন।" এরপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন।

হযরত উম্মে আইয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা চারজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে বলি–আমরা ভিতরে আসতে পারি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "না, তোমাদের মধ্যে অনুমতি প্রার্থনা করার পদ্ধতি যার জানা আছে তাকে অনুমতি প্রার্থনা করতে বলো।" তখন আমাদের মধ্যে একজন মহিলা সালাম বলে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন এবং يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ الخ -এই আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন।[১]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা তোমাদের মা ও ভগ্নীর নিকট প্রবেশের সময়ও অনুমতি প্রার্থনা করবে।"

হযরত আদী ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে– "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন কোন সময় আমি বাড়ীতে এমন অবস্থায় থাকি যে, ঐ সময় আমার কাছে আমি আমার পিতা ও পুত্রের আগমনও পছন্দ করি না। কেননা, ঐ সময় আমি এমন অবস্থায় থাকি না যে তাদের দৃষ্টি আমার উপর পড়া আমি অপছন্দ না করি। এমতাবস্থায় পরিবারের কোন লোক এসেই পড়ে (সুতরাং কি করা যায়?)।" ঐ সময় يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا الخ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনটি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলোর আমল মানুষ পরিত্যাগ করেছে। একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু।" অথচ লোকদের ধারণায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ঐ ব্যক্তি যার বাড়ী বড় (এবং যে সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী)। আর আদব ও ভদ্রতার আয়াতগুলোর উপর আমলও মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। হযরত আতা (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমার

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বাড়ীতে আমার পিতৃহীন বোনেরা রয়েছে, যারা একই বাড়ীতে থাকে এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আমারই উপর ন্যস্ত রয়েছে। তাদের কাছে গেলেও কি আমাকে অনুমতি নিতে হবে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে।" হযরত আতা (রঃ) দ্বিতীয়বার তাঁকে ঐ প্রশ্নই করেন যে, হয় তো কোন ছুটির সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এবারও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর?" তিনি জবাবে বলেনঃ "না।" তিনি বললেনঃ "তাহলে অবশ্যই তোমাকে অনুমতি নিতে হবে।" হযরত আতা (রঃ) তৃতীয়বার ঐ প্রশ্নই করেন। তিনি জবাবে বলেনঃ "তুমি কি আল্লাহর হুকুম মানবে না?" তিনি উত্তর দেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই মানবো।" তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে খবর না দিয়ে তুমি তাদের পাশেও যাবে না।"

হযরত তাঊস (রঃ) বলেনঃ "যাদের সাথে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদেরকে আমি তাদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলি এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আমার কাছে আর কিছুই নেই।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "সংবাদ না দিয়ে তোমার মায়ের কাছেও যেয়ো না।"

হযরত আতা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "অনুমতি না নিয়ে কি স্ত্রীর কাছেও যাওয়া চলবে না?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এখানে অনুমতির প্রয়োজন নেই।" এই উক্তিরও ভাবার্থ এই যে, স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু তাকেও সংবাদ অবশ্যই দিতে হবে। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ঐ সময় হয় তো স্ত্রী এমন অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থায় তার স্বামী তাকে দেখুক এটাও সে পছন্দ করে না।

হযরত যয়নব (রাঃ) বলেনঃ "আমার স্বামী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ঘরে যখন আমার কাছে আসতেন তখন তিনি গলা খাঁকড়াতেন। কখনো কখনো তিনি দরযার বাইরে কারো সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলতেন যাতে বাড়ীর লোকেরা তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পারে।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) تَسْتَأْنِسُوْا -এর অর্থও এটাই করেন যে, এটা হলো গলা খাঁকড়ানো, থুথু ফেলা ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তার বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন তার বাইরে থেকে গলা খাঁকড়ানি দেয়া বা জুতার শব্দ শুনিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

একটি হাদীসে এসেছে যে, সফর হতে ফিরে এসে রাত্রিকালে পূর্বে না জানিয়ে আকস্মিকভাবে বাড়ীতে প্রবেশ করতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন।

কেননা, এটা যেন গোপনীয়ভাবে বাড়ীর লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান নেয়া।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) সকালে সফর হতে ফিরে আসেন। তখন তিনি সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন বস্তির পাশে অবতরণ করেন যাতে মদীনায় তাঁদের আগমন সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায়। আর সন্ধ্যার সময় যেন তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। যাতে এই অবসরে মহিলারা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দররূপে সাজিয়ে নিতে পারে।

আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "সালাম তো আমরা জানি, কিন্তু اِسْتِيْنَاس-এর পদ্ধতি কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "উচ্চ স্বরে সুবহানাল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার বলা কিংবা গলা খাঁকড়ানো, যাতে বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে যে, অমুক আসছে।"

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "তিনবার অনুমতি প্রার্থনা এই জন্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, প্রথমবারে বাড়ীর লোকেরা জানতে পারবে যে, এ ব্যক্তি অমুক। কাজেই তারা নিজেদেরকে সামলিয়ে নিবে ও সতর্ক হয়ে যাবে। আর তৃতীয়বারে ইচ্ছা হলে তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবে, না হলে ফিরিয়ে দেবে। অনুমতি না পেয়ে দরযার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বদভ্যাস। কোন কোন সময় মানুষের কাজ ও ব্যস্ততা এতো বেশী হয় যে, ঐ সময় তারা অনুমতি দিতে পারে না।"

মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রাঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে সালামের কোন প্রচলন ছিল না। একে অপরের সাথে মিলিত হতো, কিন্তু তাদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হতো না। কেউ কারো বাড়ী গেলে অনুমতি নিতো না, এমনিতেই প্রবেশ করতো। প্রবেশ করার পরে বলতোঃ "আমি এসে গেছি।" এর ফলে কোন কোন সময় বাড়ীর লোকদের বড়ই অসুবিধা হতো। এমনও হতো যে, বাড়ীতে তারা এমন অবস্থায় থাকতো যে অবস্থায় তারা কারো প্রবেশকে খুবই খারাপ ভাবতো। আল্লাহ তা'আলা এই কু-প্রথাগুলো সুন্দর আদব-কায়াদা শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দূর করে দেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। এতে আগমনকারী ও বাড়ীর লোক উভয়ের জন্যেই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে। এগুলো তোমাদের জন্যে উপদেশ ও শুভাকাঙ্ক্ষা।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। কেননা, এটা হলো অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা, যা বৈধ নয়। বাড়ীর মালিকের এ অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছা হলে সে অনুমতি দেবে, না হলে দেবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। বরং এটা তো বড়ই উত্তম পন্থা।

কোন কোন মুহাজির (রাঃ) দুঃখ করে বলতেনঃ "আমাদের জীবনে এই আয়াতের উপর আমল করার সুযোগ হলো না। যদি কেউ আমাদেরকে বলতো, ফিরে যাও, তবে আমরা এই আয়াতের উপর আমল করতঃ ফিরে যেতাম!"

অনুমতি না পেলে দরযার উপর দাঁড়িয়ে থাকতেও নিষেধ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের দ্রব্য-সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই। এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত হতে বিশিষ্ট। এতে ঐ ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অবকাশ রয়েছে যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং ওর মধ্যে কারো কোন আসবাবপত্র থাকে। যেমন অতিথিশালা ইত্যাদি। এখানে প্রবেশের একবার যখন অনুমতি পাওয়া যাবে তখন বারবার আর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাহলে এ আয়াতটি যেন পূর্ববর্তী আয়াত হতে স্বতন্ত্র। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা ব্যবসায়িকদের ঘর বুঝানো হয়েছে। যেমন গুদাম ঘর, মুসাফিরখানা ইত্যাদি। প্রথম কথাটি বেশী প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা কবিতার ঘরকে বুঝানো হয়েছে।

৩০। মুমিনদেরকে বলঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্যে উত্তম; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।

٣٠- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেনঃ যেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমি হারাম করেছি ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নীচু করে নাও। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তবে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি ফেলো না।

হযরত জারীর ইবনে আবদিল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নেবে।"[১] দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, এদিক ওদিক দেখতে শুরু না করা, আল্লাহর হারামকৃত জিনিসগুলোকে না দেখা এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্যে ক্ষমার্হ, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্যে ক্ষমার যোগ্য নয়।"[২]

সহীহ হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পথের উপর বসা হতে তোমরা বেঁচে থাকো।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাজ কর্মের জন্যে এটা তো জরুরী?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, তাহলে পথের হক আদায় কর।" সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পথের হক কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ "দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, কাউকেও কষ্ট না দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা।"

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "তোমরা ছ'টি জিনিসের দায়িত্ব নিয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি। ছ'টি জিনিস হলোঃ কথা বলার সময় মিথ্যা বলো না, আমানতের খিয়ানত করো না, ওয়াদা ভঙ্গ করো না, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, হাতকে যুলুম করা হতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের (রক্ষার) দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নেবো।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি আবুল কাসেম আল বাগাভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উবাইদাহ (রাঃ) বলেন যে, যে কাজের পরিণাম হলো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ওটাই কবীরা গুনাহ।

দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে ফাসাদ সৃষ্টি হয় বলেই লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার জন্যে দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টিও ইবলীসের তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। সুতরাং ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকা জরুরী এবং দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখাও জরুরী। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত কর, তোমার পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া (সবারই সংস্পর্শ থেকে)।"[১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এটাই তাদের জন্যে উত্তম। অর্থাৎ তাদের অন্তর পবিত্র রাখার ব্যাপারে এটাই উত্তম পন্থা। যেমন বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি স্বীয় দৃষ্টিকে হারাম জিনিসের উপর নিক্ষেপ করে না, আল্লাহ তার চক্ষু জ্যোতির্ময় করে তোলেন এবং তার অন্তরও আলোকময় করে দেন।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার দৃষ্টি কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি পতিত হয়, অতঃপর দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে এমন এক ইবাদত দান করেন যার মজা বা স্বাদ সে তার অন্তরেই উপভোগ করে।"[২]

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হয় তোমরা তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখবে এবং মুখমণ্ডলকে সোজা রাখবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা বদলিয়ে দিবেন।"[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দৃষ্টি শয়তানী তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরে এমন ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যে, সে ওর মজা উপভোগ করে থাকে।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদগুলো দুর্বল বটে কিন্তু এটা উৎসাহ প্রদানের হাদীস। এসব হাদীসের সনদের প্রতি তেমন বেশী লক্ষ্য রাখা হয় না।

৩. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটিও ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। তাদের কোন কাজ তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন রহস্যের খবরও রাখেন।

সহীহ হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইবনে আদমের যিম্মায় ব্যভিচারের অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, সে অবশ্যই তা পাবে। চোখের ব্যভিচার হলো দেখা, মুখের ব্যভিচার বলা, কানের ব্যভিচার শুনা, হাতের ব্যভিচার ধরা এবং পায়ের ব্যভিচার চলা। অন্তর কামনা ও বাসনা রাখে। অতঃপর যৌন অঙ্গ এ সবগুলোক সত্যবাদী করে অথবা সবগুলোকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেয়।"[১] পূর্বযুগীয় অনেক মনীষী বালকদের ঘোরা ফেরাকেও নিষেধ করতেন। সুফী ইমামদের অনেকেই এই ব্যাপারে বহু কিছু কঠোরতা করেছেন। আহলে ইলম এটাকে সাধারণভাবে হারাম বলেছেন। আর কেউ কেউ এটাকে কবীরা গুনাহ বলেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চোখই কাঁদবে, শুধুমাত্র ঐ চোখ কাঁদবে না যেই চোখ আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত জিনিস না দেখে বন্ধ থেকেছে, আর ঐ চোখ যা আল্লাহর পথে জেগে থেকেছে এবং ঐ চোখ যা আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে, যদিও এ চোখের অশ্রু মাছির মাথার সমানও হয়।"[২]

৩১। ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে বল–তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা

٣١- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ

১. ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি তা'লীকরূপে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে, হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে হুকুম করছেন যাতে মর্যাদাশীল পুরুষদের মনে সান্ত্বনা আসে এবং অজ্ঞতাযুগের জঘন্য প্রথার অবসান ঘটে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা বিনতে মুরসিদ (রাঃ)-এর বাড়ীটি বানু হারিসার মহল্লায় ছিল। তার কাছে স্ত্রীলোকেরা আগমন করতো এবং তখনকার প্রথা অনুযায়ী তাদের পায়ের অলংকারাদি এবং বক্ষ ও চুল খুলে রাখা অবস্থায় আসতো। হযরত আসমা (রাঃ) বলেনঃ "এটা কতই না জঘন্য প্রথা!" ঐ সময় এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

সুতরাং নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান নারীদেরকেও তাদের চক্ষু নিম্নমুখী রাখতে হবে। স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে কাম-দৃষ্টিতে তাকানো চলবে না। অপরিচিত লোকের দিকে তো তাকানোই চলবে না, কাম-দৃষ্টিতেই হোক অথবা এমনিই হোক।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এবং হযরত মায়মূনা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) তথায় আগমন করেন। এটা ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমরা পর্দা কর।" তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উনি তো অন্ধ লোক। তিনি আমাদেরকে দেখতেও পাবেন না এবং চিনতেও পারবেন না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা তো অন্ধ নও যে তাকে দেখতে পাবে না?"[১] তবে কোন কোন আলেম বলেন যে, কাম-দৃষ্টি ছাড়া তাকানো হারাম নয়। তাঁদের দলীল হলো ঐ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, ঈদের দিন হাবশী লোকেরা অস্ত্রের খেলা দেখাচ্ছিল। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি তাদের খেলা দেখছিলেন এবং মনভরে দেখার পর ক্লান্ত হয়ে চলে আসেন।

স্ত্রীলোকদেরকেও সতীত্ব রক্ষা করে চলতে হবে। নিজেদের আভরণ কারো সামনে প্রকাশ করা যাবে না। পর পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের কোন অংশই প্রকাশ করা যাবে না। হ্যাঁ, তবে যেটা ঢেকে রাখা সম্ভব নয় সেটা অন্য কথা। যেমন চাদর ও উপরের কাপড় ইত্যাদি। এগুলোকে গোপন রাখা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি এবং আংটিকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হতে পারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সৌন্দর্যের স্থান যেটা প্রকাশ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে'-এর অর্থ হলোঃ তারা যেন তাদের বালি, হার, পায়ের অলংকার ইত্যাদি প্রদর্শন না করে।

বর্ণিত আছে যে, আভরণ অর্থাৎ অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক দুই প্রকারের রয়েছে। এক তো হলো ওটাই যা শুধু স্বামীই দেখে। যেমন আংটি ও কংকন। আর দ্বিতীয় আভরণ হলো ওটাই যা অপরও দেখে থাকে। যেমন উপরের কাপড়।

যুহরী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে যেসব আত্মীয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাদের সামনে কংকন, দোপাট্টা এবং বালি প্রকাশিত হয়ে গেলে কোন দোষ নেই। আর অপর লোকদের সামনে যদি শুধু আংটি প্রকাশ পায় তবেও কোন দোষ হবে না। অন্য রিওয়াইয়াতে আংটির সাথে পায়ের মলেরও উল্লেখ রয়েছে। হতে পারে যে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

গুরুজন মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি করেছেন। যেমন সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, একদা হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তিনি পাতলা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। তাঁকে এভাবে আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ "নারী যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যায় তখন ওটা এবং ওটা ছাড়া অর্থাৎ চেহারা ও হাতের কব্জি ছাড়া তার আর কোন অঙ্গ দেখানো উচিত নয়।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। এর ফলে বক্ষ ও গলার অলংকার ঢাকা থাকবে। অজ্ঞতার যুগে তাদের এ অভ্যাস ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাদের বক্ষের উপর কিছুই দিতো না। মাঝে মাঝে গ্রীবা, চুল, বালি ইত্যাদি সবই পরিষ্কারভাবে দেখা যেতো। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল– তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়; এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"

خُمُر শব্দটি خِمَار শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক ঐ জিনিসকে خِمَار বলা হয় যা ঢেকে ফেলে। দো-পাট্টা মাথাকে ঢেকে ফেলে বলে ওটাকেও خِمَار বলা হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তারা যেন নিজেদের ওড়না দিয়ে বা অন্য কোন কাপড় দিয়ে তাদের গ্রীবা ও বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ স্ত্রীলোকদের উপর রহম করুন যারা প্রথম প্রথম হিজরত করেছিল। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তারা নিজেদের চাদর ফেড়ে দো-পাট্টা বানিয়েছিল। কেউ কেউ নিজের তহবন্দের পার্শ্ব কেটে নিয়ে ওটা দ্বারা মাথা ঢেকে নেয়।

একবার স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে কুরায়েশ মহিলাদের ফযীলত বর্ণনা করতে শুরু করলে তিনি বলেনঃ "তাদের ফযীলত আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আনসার মহিলাদের অপেক্ষা বেশী ফযীলত আমি কোন মহিলার দেখিনি। তাদের অন্তরে আল্লাহর কিতাবের সত্যতা ও ওর উপর পূর্ণ ঈমান যে রয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সূরায়ে নূরের

১. এ হাদীসটি মুরসাল। খালেদ ইবনে দারীক এটা হযরত আয়েশা রোঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর হযরত আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া প্রমাণিত নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ যখন অবতীর্ণ হয় এবং তাদের পুরুষ লোকেরা তাদেরকে এটা শুনিয়ে দেয় তখন ঐ মুহূর্তে তারা ঐ আয়াতের উপর আমল করে। ফজরের নামাযে তারা হাযির হলে দেখা যায় যে, সবারই মাথায় দো-পাট্টা বিদ্যমান রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর বালতি রাখা আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ পুরুষ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের সামনে নারীরা থাকতে পারে। খুব সাজসজ্জা ছাড়া লজ্জাবনতা অবস্থায় তাদের সামনে তারা যাতায়াত করতে পারে। যদিও বাহ্যিক কোন আভরণের উপর তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় তবে এতে কোন অপরাধ হবে না। তবে স্বামী এর ব্যতিক্রম। কেননা নারী তার সামনে পূর্ণ সাজসজ্জার সাথে থাকতে পারবে। চাচা ও মামার সাথেও বিবাহ নিষিদ্ধ, তথাপি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি, এর কারণ এই যে, তারা হয়তো তাদের ছেলেদের সামনে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। এজন্যেই তাদের সামনেও দো-পাট্টা বাঁধা ছাড়া আসা উচিত নয়।

এ আয়াতে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমান নারীরা পরস্পরের সামনে নিজেদের আভরণ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারী তার আভরণ প্রকাশ করতে পারে না। এর কারণ এই যে, খুব সম্ভব ঐ অমুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদের সামনে ঐ মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও এই আংশকা আছে বটে, কিন্তু শরীয়ত এটা হারাম করে দিয়েছে বলে তারা এরূপ করতে পারে না। কিন্তু অমুসলিম নারীকে এর থেকে বাধা দিবে কিসে?

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন নারীর জন্যে বৈধ নয় যে, সে অন্য নারীর সাথে মিলিত হয়ে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা তার স্বামীর সামনে এমনভাবে দেয় যেন তার স্বামী ঐ নারীকে স্বয়ং দেখতে রয়েছে।"[১]

হযরত হাসির ইবনে কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ)-কে লিখেনঃ "আমি অবগত হয়েছি যে, কোন কোন মুসলিম নারী গোসল খানায় যায় এবং তাদের সাথে মুশরিকা নারীরাও থাকে। কোন মুসলিম নারীর জন্যে বৈধ নয় যে, সে নিজের দেহ কোন অমুসলিম নারীকে প্রদর্শন করে।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২. এটা সাঈদ ইবনে মানসূর (রঃ) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুজাহিদও (রাঃ) أَوْ نِسَآئِهِنَّ -এর তাফসীরে বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ঐ আভরণ প্রকাশ করা যাবে যা মুহরিম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ গ্রীবা, বালি এবং হার। অতএব, মুসলিম নারীর জন্যে উলঙ্গ মাথায় মুশরিকা মহিলার সামনে থাকা বৈধ নয়।

হযরত আতা (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেন তখন স্ত্রীদের ধাত্রী তো ইয়াহূদী ও খৃষ্টান মহিলারাই ছিল। যদি এটা প্রমাণিত হয় তবে বুঝতে হবে যে, এটা প্রয়োজন বশতঃ ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে মুশরিকা নারীদের মধ্যে যারা বাঁদী বা দাসী তারা এই হুকুম বহির্ভূত। কেউ কেউ বলেন যে, গোলামদেরও হুকুম এটাই।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে দেয়ার জন্যে একটি গোলামকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। গোলামটিকে দেখে হযরত ফাতিমা (রাঃ) নিজেকে তাঁর দো-পাট্টার মাঝে আবৃত করতে থাকেন। কিন্তু ওটা ছোট ছিল বলে মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকছিল এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকছিল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এতো কষ্ট করছো কেন? আমি তো তোমার আব্বা এবং এতো তোমার গোলাম?"[১] ইবনে আসাকির (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ গোলামটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসআদাহ আল ফাযারী। তার দেহের রঙ ছিল খুবই কালো। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাকে লালন-পালন করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। সিফফীনের যুদ্ধে সে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর চরম বিরোধী ছিল।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা স্ত্রীলোকদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যার মুকাতাব গোলাম রয়েছে, যার সাথে এ শর্ত হয়েছে যে, সে যদি এতো টাকা দিতে পারে তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর তার কাছে ঐ পরিমাণ টাকা যোগাড়ও হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের ঐ গোলাম থেকে পর্দা করা উচিত।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন-কামনা রহিত তাদের সামনেও আভরণ প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ কাজ কামকারী নওকর চাকরদের মধ্যে যাদের পুরুষত্ব নেই, স্ত্রীলোকদের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই তাদের হুকুম মুহরিম আত্মীয় পুরুষদের মতই। অর্থাৎ এসব আভরণ তাদের সামনে প্রকাশ করা চলবে। কিন্তু সেই খোজা, যার মুখের ভাষা খারাপ এবং সদা মন্দ কথা ছড়িয়ে বেড়ায় সে এই হুকুম বহির্ভূত।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন খোজা লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে আসে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই আয়াতের মর্মানুযায়ী লোকটিকে আসতে নিষেধ করেননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে পড়েন। ঐ সময় সে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর ভাই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলছিলঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন তায়েফ জয় করাবেন তখন আমি তোমাকে গায়লানের মেয়ে দেখাবো। সে যখন আসে তখন তার পেটের উপর চারটি ভাঁজ পড়ে এবং যখন ফিরে যায় তখন আটটি ভাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়।" তার এ কথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সাবধান! এরূপ লোককে কখনো আসতে দিবে না।" অতঃপর তাকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সে তখন বায়দা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। প্রতি শুক্রবারে সে আসতো এবং লোকদের কাছ থেকে পানাহারের কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেতো।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের সামনে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা এখনো স্ত্রীলোকদের বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। স্ত্রীলোকদের প্রতি যাদের লোলুপ দৃষ্টি এখনো পতিত হয় না। হ্যাঁ, তবে যদি তারা এমন বয়সে পৌঁছে যায় যে, স্ত্রীলোকদের সুশ্রী হওয়া বা বিশ্রী হওয়ার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে এবং তাদের সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ হয়ে যায় তবে তাদের থেকেও পর্দা করতে হবে। যদিও তারা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ না করে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট প্রবেশ করা হতে বেঁচে থাকো।" প্রশ্ন করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দেবর ও ভাসুর সম্পর্কে আপনার মত কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "দেবর ও ভাসুর তো মৃত্যু (সমতুল্য)।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। অজ্ঞতার যুগে এরূপ প্রায় হতো যে, স্ত্রীলোকেরা চলার সময় যমীনের উপর সজোরে পা ফেলতো যাতে পায়ের অলংকার বেজে উঠে। ইসলামে এরূপ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং

নারীদেরকে প্রতিটি এমন কাজ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয় যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই তার জন্যে আতর ও সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও নিষিদ্ধ।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক চক্ষু ব্যভিচারী, যখন নারী আতর মেখে, ফুল পরে, সুগন্ধি ছড়িয়ে পুরুষদের কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে তখন সে এরূপ এরূপ (অর্থাৎ ব্যভিচারিণী)।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে চলছিল। অমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কি মসজিদ হতে আসছো? সে উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ।" পুনরায় আমি তাকে প্রশ্ন করলামঃ তুমি কি সুগন্ধি মেখেছো? জবাবে সে বললোঃ "হ্যাঁ।" আমি তখন বললামঃ আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ এমন স্ত্রীলোকের নামায কবূল করেন না যে এই মসজিদে আসার জন্যে সুগন্ধি মেখেছে, যে পর্যন্ত না সে ফিরে গিয়ে অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে।"[২]

হযরত মায়মূনা বিনতে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশকারিণী নারী কিয়ামতের দিনের ঐ অন্ধকারের মত যেখানে কোন আলো নেই।"[৩]

হযরত আবূ উসাইদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পথে পুরুষ ও নারীদেরকে একত্রে মিলে মিশে চলতে দেখে বলেনঃ "হে নারীরা! তোমরা এদিকে ওদিকে হয়ে যাও। মাঝপথ দিয়ে চলা তোমাদের জন্যে শোভনীয় নয়।" তাঁর এ কথা শুনে নারীরা দেয়াল ঘেঁষে চলতে শুরু করে। এমনকি দেয়ালের সাথে তাদের কাপড়ের ঘর্ষণ লাগছিল।[৪]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার বাতলানো গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যাও। অজ্ঞতার যুগের বদভ্যাসগুলো পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٣٢- وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৩২। তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা স্ত্রী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও; তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٣٣- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৩। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে; তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٤- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৩৪। আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বহু কিছু হুকুম বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন।

আলেম জামাআতের খেয়াল এই যে, যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব। দলীল হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের বাণীটি গ্রহণ করেছেনঃ "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে। বিয়ে হলো দৃষ্টিকে নিম্নমুখীকারী এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষাকারী। আর যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। এটাই তার জন্যে হলো অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া।"[১]

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যেসব স্ত্রীলোক হতে অধিক সন্তান লাভের আশা আছে তোমরা ঐ সব স্ত্রীলোককে বিয়ে কর, যেন তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। আমি তোমাদের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের মধ্যে ফখর করবো।"[২]

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এমন কি অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে যাওয়া (গর্ভপাত হওয়া) শিশুর সংখ্যা গণনা দ্বারাও আমি ফখর করবো।"

اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ শব্দের বহু বচন। জাওহারী (রঃ) বলেন যে, ভাষাবিদদের মতে বিপত্নীক পুরুষ ও বিধবা নারীকে اَيِّمٌ বলা হয়। সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে বলেনঃ যদি সে দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী বানিয়ে দিবেন। সে আযাদই হোক অথবা গোলামই হোক।

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।
২. এ হাদীসটি সুনানে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ "বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ মেনে চল, তাহলে তিনি তোমাদের কৃত ওয়াদা পুরো করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ অর্থাৎ "যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দিবেন।"[১]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বিবাহে তোমরা ঐশ্বর্য অনুসন্ধান কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তারা দরিদ্র হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা হলো–বিবাহকারী, যে ব্যভিচার হতে বাঁচবার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে থাকে, ঐ মুকাতাব গোলাম, যে তার চুক্তিকৃত টাকা আদায় করার ইচ্ছা রাখে এবং আল্লাহর পথের গাযী।"[২]

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যক্তির বিবাহ একটি স্ত্রীলোকের সাথে দিয়ে দেন যার কাছে তার একটি মাত্র লুঙ্গী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমনকি তার কাছে একটি লোহার আংটিও ছিল না। তার এতো অভাব ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার বিয়ে দিয়ে দেন এবং তার মহর এই ধার্য করেন যে, তার কুরআন কারীম হতে যা কিছু মুখস্থ আছে তাই সে তার স্ত্রীকে মুখস্থ করিয়ে দেবে। এটা একমাত্র এরই উপর ভিত্তি করে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাকে এমন জীবিকা দান করবেন যা তার ও তার স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট হবে।

অধিকাংশ লোক একটি হাদীস আনয়ন করে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা দারিদ্রের অবস্থাতেও বিয়ে কর, আল্লাহ তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন।"[৩]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও বর্ণনা করেছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ সবল সনদে বা দুর্বল সনদেও এ হাদীসটি আমার চোখে পড়েনি। আর এই বিষয়ে এরূপ ঠিকানা বিহীন হাদীসের আমাদের কোন প্রয়োজনও নেই। কেননা, কুরআন কারীমের এই আয়াতে এবং উপরোক্ত হাদীসসমূহে এটা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে এবং এটাই তার জন্যে খাসসী হওয়া (অণ্ডকোষ কর্তিত হওয়া)।" এই আয়াতটি সাধারণ। সূরায়ে নিসার আয়াতটি এর থেকে খাস বা বিশিষ্ট। ঐ আয়াতটি হলোঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ হতে وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ পর্যন্ত।

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারীকে বিয়ে করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান, সুতরাং তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয় তাদেরকে তাদের মহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দিবে। বিবাহিতা হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্যে; ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্যে মঙ্গল।" (৪ঃ ২৫) সুতরাং দাসীদেরকে বিয়ে করা অপেক্ষা ধৈর্যধারণই শ্রেয়। কেননা, এই অবস্থায় সন্তানদের উপর দাসত্বের দাগ পড়ে যায়।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, যে পুরুষ লোক স্ত্রীলোককে দেখে এবং দেখার পর তার অন্তরে কাম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়, যদি তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে। আর যদি তার স্ত্রী না থাকে তবে সে যেন আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্যধারণ করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গোলামদের মালিকদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের দাসদাসীদের কেউ যদি তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায় তবে তারা যেন তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যদি তারা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পায়। গোলাম তার উপার্জনের মাধ্যমে ঐ মাল জমা করতঃ মনিবকে দিয়ে দেবে এবং এই ভাবে তারা আযাদ বা মুক্ত হয়ে যাবে।

অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এ হুকুম জরুরী নয়। এটা ফরযও নয় এবং ওয়াজিবও নয়, বরং মুস্তাহাব। মনিবের এ অধিকার আছে যে, তার গোলাম কোন শিল্পকার্য জানলে যদি তাকে বলে যে, তাকে সে এতো এতো টাকা দিবে এবং এর বিনিময়ে সে তাকে আযাদ করে দিবে। তবে এটা মনিবের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে সে তার সাথে চুক্তি করবে এবং না হলে না করবে। আলেমদের একটি জামাআত আয়াতের বাহ্যিক শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন যে, গোলাম যদি তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায় তবে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া তার মনিবের উপর ওয়াজিব।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগে হযরত আনাস (রাঃ)-এর সীরীন নামক একজন সম্পদশালী গোলাম তাঁর কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন তার সাথে তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন গোলামটি হযরত উমার (রাঃ)-এর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। হযরত উমার (রাঃ) তখন হযরত আনাস (রাঃ)-কে ডেকে গোলামের সাথে চুক্তি করতে নির্দেশ দেন। এবারেও হযরত আনাস (রাঃ) অস্বীকৃতি জানান। তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে চাবুক মারেন এবং গোলামের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি তাঁর সামনে তিলাওয়াত করেন।[১]

হযরত আতা (রঃ) হতে দু'টি উক্তিই বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর প্রথম উক্তি এটাই ছিল। কিন্তু তাঁর নতুন উক্তি এই যে, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মনিবের উপর ওয়াজিব নয়।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেনঃ "গোলাম তার মনিবকে তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে আবেদন জানালে ঐ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মনিবের উপর ওয়াজিব নয়। কোন ইমাম যে কোন মনিবকে গোলামের মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছেন এটা আমি শুনিনি। আল্লাহ তা'আলার এ হুকুম অনুমতি হিসেবে, ওয়াজিব হিসেবে নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের এটাই উক্তি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে ওয়াজিব হওয়াই পছন্দনীয় উক্তি।

১. এটা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

خَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং মাল উপার্জন করার ক্ষমতা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের যেসব গোলাম তাদের মুক্তির জন্যে তোমাদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে তাহলে তোমরা দেখো যে, তাদের মধ্যে মাল উপার্জনের যোগ্যতা আছে কি না। যদি তাদের মধ্যে তা দেখতে পাও তবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। আর তা দেখতে না পেলে নয়। কেননা, এমতাবস্থায় তারা নিজেদের বোঝা লোকদের উপর চাপিয়ে দেবে।" অর্থাৎ অর্থ যোগাড় করার জন্যে তাদের কাছে ভিক্ষা করবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। অর্থাৎ তার নিকট হতে যে অর্থ আদায়ের চুক্তি হয়েছে তা হতে কিছু ক্ষমা করে দেবে। তা এক চতুর্থাংশ হোক বা এক তৃতীয়াংশ হোক বা অর্ধাংশ হোক অথবা কিছু অংশ হোক। নিম্নরূপ ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছেঃ তাদেরকে যাকাতের মাল হতে সাহায্য কর। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের মনিব এবং অন্যান্য মুসলমান যাকাতের মাল থেকে সাহায্য করবে যাতে তারা চুক্তির অর্থ পূর্ণ করে আযাদ হয়ে যেতে পারে।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, যে তিন প্রকারের লোককে সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে এটাও এক প্রকার। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই প্রসিদ্ধতম উক্তি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর গোলাম আবূ উমাইয়া তাঁর সাথে মুক্তির চুক্তি করেছিল। সে যখন তার প্রথম কিস্তির অর্থ নিয়ে হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে তখন তিনি তাকে বলেনঃ "যাও তুমি তোমার চুক্তির এ অর্থ পূরণে অন্যদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা কর।" তাঁর এ কথা শুনে গোলামটি বলেঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! শেষ কিস্তি পর্যন্ত তো আমাকেই পরিশ্রম করতে দিন!" জবাবে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "না, আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয়তো আমি আল্লাহ তা'আলার 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে' এই নির্দেশকে ছেড়ে দেবো।" সুতরাং এটা ছিল প্রথম কিস্তী যা ইসলামে আদায় করা হয়।[১]

১. এটা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) চুক্তিকৃত গোলামকে প্রথম কিস্তির সময় নিজেও কিছু দিতেন না এবং কিছু মাফও করতেন না, এই ভয়ে যে, সে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই অর্থ আদায় করতে পারবে না, কাজেই তাঁর প্রদত্ত সাদকা তাঁকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তবে শেষ কিস্তির সময় তিনি ইচ্ছামত মাফ করে দিতেন।[১]

আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না।

অজ্ঞতা যুগের জঘন্য পন্থাসমূহের মধ্যে একটি পন্থা এও ছিল যে, তাদের দাসীরা যেন ব্যভিচার করে অর্থ উপার্জন করতঃ ঐ অর্থ মনিবদেরকে প্রদান করে এ কাজে তারা তাদেরকে বাধ্য করতো। ইসলাম এসে এই কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে।

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সে এ কাজই করতো। তার দাসীর নাম ছিল মুআযাহ। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তার নাম ছিল মুসাইকাহ। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর সে এ কাজে অস্বীকৃতি জানায়। অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা এ কাজ চলতো। এমনকি তার অবৈধ সন্তানাদিও জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সে এ কাজ করতে অস্বীকার করে। তখন ঐ মুনাফিক তার উপর জোর জবরদস্তি করে। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

বর্ণিত আছে যে, বদরের এক কুরায়েশী বন্দী আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নিকট ছিল। সে তার দাসী মুআযার সাথে অবৈধভাবে মিলিত হতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুআযা ইসলাম গ্রহণের কারণে এই অবৈধ কাজ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এরও ইচ্ছা ছিল যে, তার ঐ দাসীটি যেন ঐ কুরায়েশী বন্দীর সাথে অবৈধভাবে মিলিত হয়। এ ব্যাপারে সে তার উপর জোর জবরদস্তি ও মারপিট করতো। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, মুনাফিকদের এই নেতা তার ঐ দাসীটিকে তার অতিথিদের সেবার কার্যে পাঠিয়ে দিতো। দাসীটির ইসলাম গ্রহণের পর তাকে আবার এই কাজে পাঠাবার ইচ্ছা করলে সে প্রকাশ্যভাবে

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা মুসনাদে আবদির রাযযাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

অস্বীকার করে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে তার এ বিপদের কথা বর্ণনা করে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে এ খবর পৌঁছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিষেধ করে দেন যে, সে যেন তার ঐ দাসীকে সেখানে না পাঠায়। ঐ মুনাফিক তখন জনগণের মধ্যে এই গুজব রটিয়ে দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তার দাসীকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। তার ঐ কথার প্রতিবাদে এই আসমানী হুকুম নাযিল হয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, মুসাইকাহ ও মুআযাহ এ দু'জন দু'ব্যক্তির দাসী ছিল। তারা তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করতো। ইসলাম গ্রহণের পর মুসাইকা এবং তার মাতা এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এটা যে বলা হয়েছে যে, যদি এ দাসীরা সততা রক্ষা করার ইচ্ছা করে, এর দ্বারা ভাবার্থ এটা নেয়া চলবে না যে, যদি তাদের সততা রক্ষার ইচ্ছা না হয় তবে এতে কোন দোষ নেই। কেননা, ঐ সময় ঘটনা এটাই ছিল। এ জন্যেই এইরূপ বলা হয়েছে। এটা কোন সীমাবদ্ধতা ও শর্ত হিসেবে বলা হয়নি। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধন-সম্পদ লাভ করা। আর এ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং ঐ সন্তানদেরকে তারা তাদের দাসদাসী হিসেবে ব্যবহার করবে।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সিংগা লাগানোর মজুরী, ব্যভিচারের মজুরী এবং গণকের মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ব্যভিচারের খরচা, সিঙ্গা লাগানো দ্বারা উপার্জন এবং কুকুরের মূল্য কলুষতাপূর্ণ।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি দাসীদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করে, আল্লাহ ঐ দাসীদেরকে তাদের প্রতি জবরদস্তি করার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তাদের যে মনিবরা তাদের উপর জোর জবরদস্তি করেছে তাদেরকে তিনি কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। এই অবস্থায় তারাই গুনাহগার হবে। এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর কিরআতে رَحِيْمٌ-এর পরে وَاِثْمُهُنَّ عَلٰى مَنْ اَكْرَهَهُنَّ রয়েছে। অর্থাৎ "ঐ দাসীদের গুনাহ পতিত হবে ঐ লোকদের উপর যারা তাদেরকে বাধ্য করেছে।"

মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং যে কাজের উপর তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে এগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার পাক কালাম কুরআন কারীমের এই উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট আয়াত তোমাদের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলীও তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে যে, সত্যের ঐ বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম কি হয়েছে এবং কেমন হয়েছে! ওটাকে একটি কাহিনী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী লোকদের জন্যে ওটাকে একটা শিক্ষা ও উপদেশমূলক ঘটনা করে দেয়া হয়েছে। যাতে আল্লাহভীরু লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ হতে বেঁচে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "কুরআন কারীমে তোমাদের মতভেদের ফায়সালা বিদ্যমান রয়েছে। এতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সংবাদ এবং পরে সংঘটিত হবে এরূপ বিষয়ের অবস্থার বর্ণনা। এগুলো বাজে কথা নয়। এগুলোকে যে বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দিবে তাকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করবেন এবং যে এটা ছাড়া অন্য কিতাব খোঁজ করবে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

৩৫। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৩৫- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের পথ-প্রদর্শক। তিনিই এ দু'টোর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজীর ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর নূর হলো হিদায়াত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেও অবলম্বন করেছেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, 'তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত'-এর ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর নূর ধারণকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার বক্ষে ঈমান ও কুরআন রয়েছে তার দৃষ্টান্ত। এর উপমা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি নিজের নূরের বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর মুমিনের জ্যোতির বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীর জ্যোতির উপমা বর্ণনা করেছেন। এমনকি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তো مَثَلُ نُوْرِ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ -এরূপ পড়তেন। অর্থাৎ যে তাঁর উপর ঈমান এনেছে তার জ্যোতির উপমা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নিম্নরূপ পড়াও বর্ণিত আছেঃ كَذٰلِكَ نُوْرُ مَّنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ "এরূপই জ্যোতি ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।" কারো কারো কিরআতে اَللّٰهُ نَوَّرَ রয়েছে। অর্থাৎ "আল্লাহ আসমান ও যমীনকে জ্যোতির্ময় বানিয়েছেন।" সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ "তাঁরই জ্যোতিতে আসমান ও যমীন উজ্জ্বল রয়েছে।" সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, যেই দিন তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খুবই কষ্ট দিয়েছিল ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দু'আয় বলেছিলেনঃ

اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَّحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَنْزِلُ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থাৎ "আপনার চেহারার জ্যোতির মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয় এবং যার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের উপযুক্ততা নির্ভরশীল। যদি আমার উপর আপনার গযব পতিত হয় বা আমার উপর আপনার ক্রোধ নাযিল হয় তবে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো যে পর্যন্ত না আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ হতে ফিরা যাবে না এবং ইবাদত করার ক্ষমতা হবে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে যখন তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন তখন তিনি বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবগুলোরই জ্যোতি।"[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট রাত ও দিন নেই। তাঁর চেহারার জ্যোতিতেই তাঁর আরশ জ্যোতির্ময়।"

কারো কারো মতে نُوْرِه -এর 'ه' সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ আল্লাহর হিদায়াত যা মুমিনের অন্তরে রয়েছে ওর উপমা এইরূপ। আবার কারো মতে ه সর্বনামটি মুমিনের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ মুমিনের অন্তরের জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি দীপাধার। সুতরাং মুমিনের অন্তরের পরিচ্ছন্নতাকে প্রদীপের কাঁচের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআন ও শরীয়ত দ্বারা যে সাহায্য সে পেয়ে থাকে ওটার উপমা দেয়া হয়েছে যয়তূনের ঐ তেলের সাথে যা স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চকমকে ও উজ্জ্বল। অতএব, দীপাধার এবং দীপাধারের মধ্যে প্রদীপ এবং প্রদীপটিও উজ্জ্বল। ইয়াহূদীরা প্রতিবাদ করে বলেছিলঃ আল্লাহর জ্যোতি কিরূপে আকাশকে ভেদ করতে পারে? তাদের এ কথার উত্তর তাদেরকে উপমা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যেমন প্রদীপের চিমনির মধ্য হতে আলো পাওয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার জ্যোতিও আকাশ ভেদ করে আসে। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।

مِشْكٰوة -এর অর্থ হলো ঘরের তাক। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্যের উপমা দিয়েছেন এবং নিজের আনুগত্যকে তিনি নূর বা জ্যোতি বলেছেন। এর আরো বহু নাম রয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হাব্‌শের ভাষায় এটাকে তাক বলা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, এটা এমন তাককে বলা হয় যার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকে না ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, ওর মধ্যে প্রদীপ রাখা হয়। প্রথমটিই সবল উক্তি। অর্থাৎ প্রদীপ রাখার স্থান। কুরআন কারীমেও এ কথাই রয়েছে যে, তাতে প্রদীপ রয়েছে। সুতরাং مِصْبَاح দ্বারা নূর বা জ্যোতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও ঈমান যা মুসলমানের অন্তরে থাকে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা প্রদীপ উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হচ্ছেঃ প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে এবং কাঁচের আবরণটিও উজ্জ্বল। এটা হলো মুমিনের অন্তরের উপমা। কাঁচের আবরণটি মণি-মুক্তা সদৃশ, যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র। دُرِّيٌّ-এর অন্য কিরআত دُرِّيءٌ

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এবং دِرِّىٌّ-ও রয়েছে। এটা دَرْ হতে গৃহীত, যার অর্থ হলো দূর করা। তারকা যখন ছিটকে পড়ে তখন ওটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। আর যে তারকা অপরিচিত ওটাকেও আরবের লোকেরা دَرَارِىٌّ বলে থাকে। ভাবার্থ হচ্ছে চমকিত ও উজ্জ্বল তারকা, যা খুব প্রকাশমান ও বড় হয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই প্রদীপকে প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। زَيْتُوْنَةٌ শব্দটি بَدَل বা عَطْف بَيَان হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ঐ যয়তূন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে ওর উপর রৌদ্র এসে পড়বে না এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ওর উপর হতে ছায়া সরে যাবে। বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই ওর তেলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ঐ বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে রয়েছে। কোন গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোন জিনিস ওকে আড়াল করে না। এ কারণেই ঐ গাছের তেল খুবই পরিষ্কার হয়।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, খোলা বায়ু এবং পরিষ্কার রৌদ্র ওতে পৌঁছে থাকে। কেননা, ওটা খোলা মাঠের মধ্যস্থলে থাকে। আর এ কারণেই ওর তেল অত্যন্ত পাক-সাফ, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়। ওটাকে প্রাচ্যেরও গাছ বলা যাবে না এবং প্রতীচ্যেরও নয়। এরূপ গাছ খুবই তরু-তাজা ও সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ বৃক্ষ যেমন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মুমিনও ফিৎনা-ফাসাদ থেকে রক্ষিত থাকে। যদি সে ফিৎনার কোন পরীক্ষায় পড়েও যায় তবুও আল্লাহ পাক তাকে ঈমানের উপর স্থির ও অটল রাখেন।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাকে চারটি গুণের অধিকারী করেন। ওগুলো হলোঃ কথায় সত্যবাদিতা, বিচারে ন্যায়-পরায়ণতা, বিপদে ধৈর্যধারণ এবং নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। তাই সে অন্যান্য সমস্ত মানুষের মধ্যে এমনই হয় যেমন মৃতদের মধ্যে কোন জীবিত মানুষ।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এই বৃক্ষটি যদি দুনিয়ার মাটিতে থাকতো তবে তো অবশ্যই ওটা প্রাচ্যের হতো অথবা প্রতীচ্যের হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহর জ্যোতির উপমা!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো ভাল লোকের দৃষ্টান্ত যে ইয়াহূদীও নয় এবং খৃষ্টানও নয়। এসব উক্তির মধ্যে সর্বোত্তম হলো

প্রথম উক্তিটি যে, ওটা যমীনের মধ্যভাগে রয়েছে। সকাল ও সন্ধ্যায় বিনা বাধায় সেখানে রৌদ্র পৌঁছে থাকে। কেননা, ওর চারদিকে কোন গাছ নেই। কাজেই এরূপ গাছের তেল নিঃসন্দেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাতলা এবং উজ্জ্বল হবে। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, এটা প্রজ্বলিত করা হয়েছে পূত-পবিত্র যয়তূন তেল দ্বারা। ওটা এমনই উজ্জ্বল যে, ওকে অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। সুতরাং এটা জ্যোতির উপর জ্যোতি। সুতরাং মুমিন পাঁচটি নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে। তার কথা জ্যোতি, তার আমল জ্যোতি, তার আসা জ্যোতি, তার যাওয়া জ্যোতি এবং তার শেষ ঠিকানাও জ্যোতি অর্থাৎ জান্নাত।

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টান্ত। তাঁর নবুওয়াত জনগণের উপর এমনভাবে প্রকাশমান যে, তিনি মুখে না বললেও জনগণের উপর তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন এই যয়তূন তেল যে, ওকে না জ্বালালেও নিজেই উজ্জ্বল। তাহলে এখানে দু'টো জ্যোতি একত্রিত হয়েছে। একটি যয়তূনের এবং অপরটি আগুনের। এ দু'টি যৌথভাবে আলো দেয়। অনুরূপভাবে কুরআনের জ্যোতি ও ঈমানের জ্যোতি একত্রিত হয় এবং মুমিনের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবকে এক অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি ঐ দিন তাদের উপর নিজের জ্যোতি নিক্ষেপ করেন। সুতরাং ঐ দিন যে তাঁর ঐ নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে সে সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে। আর যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি যে, আল্লাহর কলম তাঁর ইলম মুতাবেক চলার পর শুকিয়ে গেছে।"[১]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তরের হিদায়াতের উপমা নূর বা জ্যোতির সাথে দেয়ার পর বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই দৃষ্টান্তসমূহ মানুষের উপদেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইলমেও তাঁর মত কেউ নেই। কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত তা তিনি খুব ভালরূপই জানেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অন্তর চার প্রকার। প্রথম হলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, দ্বিতীয় আবরণীর

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

মধ্যে আবদ্ধ, তৃতীয় উল্টোমুখী এবং চতুর্থ হলো উল্টো সোজা । প্রথম অন্তর হলো মুমিনের অন্তর। দ্বিতীয় অন্তর হলো কাফিরের অন্তর। তৃতীয় হলো মুনাফিকের অন্তর যে, সে জানে ও অজানা হয়ে যায় এবং চিনে ও বুঝে, আবার অস্বীকার করে এবং চতুর্থ অন্তর হলো ঐ অন্তর যাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। এতে ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো তরকারীর গাছ, যে ভাল পানি ওকে বাড়িয়ে তোলে। এতে নিফাকের দৃষ্টান্ত হলো ফোড়া, রক্ত ও পূঁজ ওকে উত্তেজিত করে। যেটা জয়যুক্ত হয় সেটা ঐ অন্তরের উপর ছেয়ে যায়।

৩৬। সেই সব গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

٣٦- فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

৩৭। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

٣٧- رِجَالٌ لَّا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِیْتَآءِ الزَّكٰوةِ یَخَافُوْنَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝

৩৮। যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

٣٨- لِیَجْزِیَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَیَزِیْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝

মুমিনের অন্তরের এবং ওর মধ্যে যে হিদায়াত ও ইলম রয়েছে ওর দৃষ্টান্ত উপরের আয়াতে ঐ উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে দেয়া হয়েছে যা স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে রয়েছে এবং পরিষ্কার যয়তূনের উজ্জ্বল তেল দ্বারা জ্বলতে থাকে। এ জন্যে এখানে ওর স্থানের বর্ণনা মহান আল্লাহ দিচ্ছেন যে, ওটা আবার রয়েছে ঐসব গৃহে অর্থাৎ মসজিদে, যা সবচেয়ে উত্তম জায়গা এবং আল্লাহর প্রিয় স্থান। যেখানে তাঁর ইবাদত করা হয় এবং তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দেয়া হয়। যার রক্ষণাবেক্ষণ করা, পাক-সাফ রাখা এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, اَنْ تُرْفَعَ-এর অর্থ হলো সেখানে অশ্লীল ও বাজে কাজ না করা। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মসজিদগুলো যেগুলো নির্মাণ করা, আবাদ করা ও পবিত্র রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে।

হযরত কা'ব (রঃ) বলতেনঃ তাওরাতে লিখিত আছে– যমীনে আমার ঘর হলো মসজিদসমূহ। যে কেউ অযু করে আমার ঘরে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে আমি তার সম্মান করবো।

যে কেউ কারো বাড়ীতে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তার কর্তব্য হলো তার সম্মান করা।[১]

মসজিদ নির্মাণ করা, ওর আদব ও সম্মান করা এবং ওকে সুগন্ধময় ও পাক-সাফ রাখার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে, যেগুলোকে আমি একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখানেও অল্প বিস্তর আনয়ন করছি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদের তাঁর উপরই ভরসা।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে ওর মত ঘর নির্মাণ করবেন।"[২]

১. এটা তাফসীরে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করে যাতে আল্লাহর নাম যিকর করা হয়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং ওটাকে পাক-পবিত্র ও সুগন্ধময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২]

হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা লোকদের জন্যে মসজিদ নির্মাণ কর যেখানেই জায়গা পাও। কিন্তু লাল ও হলদে রঙ থেকে বেঁচে থাকো, যাতে মানুষ ফিৎনায় না পড়ে।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন কওমের আমল কখনো খারাপ হয় না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মসজিদগুলোকে রঙিন, নকশা বিশিষ্ট ও চাকচিক্যময় করে।"[৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মসজিদগুলোকে উচ্চ ও পাকা করে নির্মাণ করতে আমি আদিষ্ট হইনি।"[৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে সুন্দর চাকচিক্যময় ও নকশা বিশিষ্ট বানাবে যেমন ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বানিয়েছিল (অর্থাৎ তাদের অনুকরণ করা ঠিক নয়)।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না লোকেরা মসজিদগুলোর ব্যাপারে পরস্পর একে অপরের উপর ফখর ও গর্ব প্রকাশ করবে।"[৬]

---

১. এহাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করছেন। কিন্তু এর সনদ দুর্বল।

৫. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।

৬. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহ্লে সুনান বর্ণনা করেছেন।

হযরত বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক তার হারানো উট খুঁজতে মসজিদে এসে বলে– "আমার একটি লাল বর্ণের হারানো উটের কেউ কোন খোঁজ-খবর দিতে পারে কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "তুমি যেন তা না পাও। মসজিদকে যে কাজের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে ওটা ঐ কাজেই ব্যবহৃত হবে (তোমার উট খোঁজ করার জায়গা হিসেবে নয়)।"[১]

হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে মসজিদে বেচা-কেনা করছে তখন তোমরা বলবে, আল্লাহ তোমাকে তোমার ব্যবসায়ে লাভবান না করুন! আর যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে তার হারানো জন্তু মসজিদে খোঁজ করছে তখন তোমরা বলবে– আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জন্তু ফিরিয়ে না দেন!"[৩]

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত অছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কতকগুলো অভ্যাস বা কাজ রয়েছে সেগুলো মসজিদের পক্ষে সমীচীন নয়। যেমন, মসজিদকে রাস্তা বানানো চলবে না, সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসা চলবে না, সেখানে তীর, কামান ব্যবহার করা চলবে না, কাঁচা গোশত সেখানে আনা যাবে না, সেখানে হদ মারা যাবে না, গল্প-গুজব ও কাহিনী বলা সেখানে চলবে না এবং ওটাকে বাজার বানানো যাবে না।"[৪]

হযরত ওয়ায়েলা ইবনে আসফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা মসজিদগুলো হতে তোমাদের নাবালক ছেলেদেরকে, পাগলদেরকে, বেচা-কেনাকে, ঝগড়া-বিবাদকে, উচ্চ স্বরে কথা বলাকে, হদ জারী করাকে এবং তরবারী উন্মুক্ত করাকে দূরে রাখবে। মসজিদের দরযাগুলোর উপর তোমরা অযু ইত্যাদির স্থান বানিয়ে নিবে এবং জুমআর দিনে ওগুলোকে সুগন্ধময় করে রাখবে।"[৫]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং আহ্লে সুনান বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বর্ণনা করেছেন।

৫. এটাও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

কোন কোন আলেম কঠিন প্রয়োজন ছাড়া মসজিদকে যাতায়াতের স্থান বানানো মাকরূহ বলেছেন। একটি আসারে আছে যে, ফেরেশতামণ্ডলী ঐ লোককে দেখে বিস্মিত হন যে ঐ মসজিদের মধ্য দিয়ে গমন করে যেখানে সে নামায পড়ে না। অস্ত্র-শস্ত্র ও তীর-বল্লম নিয়ে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, সেখানে বহু লোক একত্রিত হয়। কাজেই কারো গায়ে লেগে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তীর-বল্লম নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে তবে যেন তীরের ফলাটি নিজের হাতে রাখে যাতে কাউকেও কোন কষ্ট না পৌঁছে। আর কাঁচা গোশত নিয়ে মসজিদে আগমন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, ওর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণেই ঋতুবতী নারীরও মসজিদে আগমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মসজিদে হদ লাগানো ও কেসাস নেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, হয়তো সে মসজিদকে ময়লা বা বিষ্ঠা দ্বারা অপবিত্র করে দেবে। মসজিদকে বাজারে পরিণত করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, বাজার হলো ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান আর মসজিদে এ দু'টো কাজ করা নিষিদ্ধ। কেননা, মসজিদ হলো আল্লাহর যিকর করা ও নামায আদায় করার জায়গা। যেমন একজন বেদুঈন মসজিদের এক প্রান্তে প্রস্রাব করে দিলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “মসজিদ এ কাজের জন্যে নির্মাণ করা হয়নি, বরং মসজিদ হলো আল্লাহর যিকর ও নামায পড়ার জায়গা।” অতঃপর তিনি তার প্রস্রাবের উপর বড় এক বালতি পানি বইয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ “তোমরা নাবালক ছেলেদেরকে মসজিদ হতে দূরে রাখবে। কেননা, খেল-তামাশাই তাদের কাজ। অথচ মসজিদে এটা মোটেই উচিত নয়।” হযরত উমার ফারুক (রাঃ) যখন কোন ছোট ছেলেকে মসজিদে খেলতে দেখতেন তখন তিনি তাকে চাবুক মারতেন এবং এশার নামাযের পরে কাউকেও মসজিদে থাকতে দিতেন না।

পাগলদেরকেও মসজিদে আসতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, তাদের জ্ঞান থাকে না। কাজেই তারা মানুষের হাসি-তামাসার পাত্র হয়। আর মসজিদে তামাশা করা উচিত নয়। তাছাড়া তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ দু'টো আল্লাহর যিক্‌রের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মসজিদে ঝগড়া করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তাতে শব্দ উচ্চ হয় এবং ঝগড়াকারীদের মুখ দিয়ে এমন কথাও বেরিয়ে যায় যা মসজিদের আদবের পরিপন্থী। আধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, মসজিদে বিচার সালিস করা চলবে না। এ জন্যেই এই বাক্যর পরে মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত সাইব ইবনে কান্দী (রঃ) বলেন, আমি একদা মসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ কে আমায় কংকর নিক্ষেপ করে। আমি ফিরে দেখি যে, তিনি হযরত উমার (রাঃ)। তিনি আমাকে বলেনঃ "যাও, ঐ দু'টি লোককে আমার নিকট ধরে নিয়ে এসো।" আমি ঐ দু'জনকে তাঁর কাছে ধরে আনলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কে?" অথবা প্রশ্ন করেনঃ "তোমরা কোথাকার লোক?" তারা উত্তরে বলেঃ "আমরা তায়েফের অধিবাসী।" তিনি তখন বলেনঃ "তোমরা যদি এখানকার অধিবাসী হতে তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা মসজিদে নববীতে (সঃ) উচ্চ স্বরে কথা বলছো?"[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) মসজিদে (নববীতে সঃ) উচ্চ স্বরে একটি লোককে কথা বলতে শুনে বলেনঃ "তুমি কোথায় রয়েছ তা জান কি?"[২]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদের দরযার উপর অযু ও পবিত্রতা লাভের স্থান বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মসজিদে নববী (সঃ)-এর নিকটেই পানির কূপ ছিল। লোকেরা সেখান থেকে পানি উঠিয়ে নিয়ে পান করতেন, অযু করতেন এবং পবিত্রতা হাসিল করতেন।

আর জুমআর দিন মসজিদকে সুগন্ধময় বানাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, ঐ দিন বহু লোক মসজিদে একত্রিত হন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) প্রত্যেক জুমআর দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মসজিদকে সুগন্ধময় করতেন।[৩]

---

১. এটা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা সুনানে নাসাঈতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

৩. এটা হাফিয আবূ ইয়ালা মূসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ হাসান। এতে কোন দোষ নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষ যে নামায একাকী বাড়ীতে পড়ে অথবা দোকানে পড়ে ঐ নামাযের উপর জামাআতের নামাযের সওয়াব পঁচিশগুণ বেশী দেয়া হয়। এটা এই কারণে যে, যখন সে ভালরূপে অযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন তার উঠানো প্রতিটি পদক্ষেপে একটা মরতবা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়। তারপর নামায শেষে যতক্ষণ সে তার নামাযের জায়গায় বসে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার উপর দু'আ পাঠাতে থাকেন। তাঁরা বলেনঃ "হে আল্লাহ! তার উপর আপনি করুণা অবতীর্ণ করুণ! হে আল্লাহ! তার উপর আপনি দয়া করুন!" আর যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পেতে থাকে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে ছাড়া (শুদ্ধ) হয় না।"[২]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেনঃ "অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদেরকে শুভ সংবাদ শুনিয়ে দাও যে, কিয়ামতের দিন তারা পূর্ণ আলো প্রাপ্ত হবে।"[৩]

মসজিদে প্রবেশকারীর জন্যে এটা মুসতাহাব যে, সে যেন মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখে এবং এই দু'আ পাঠ করে যা হাদীসে এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

অর্থাৎ "মহান, সম্মানিত চেহারার অধিকারী এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যের অধিপতি আল্লাহর নিকট আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তিনি বলেন, যখন কেউ এটা বলে তখন শয়তান বলে– "সে সারা দিনের তরে আমার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।"[৪]

হযরত আবূ হুমাইদ (রাঃ) অথবা হযরত উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন যেন সে বলে– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জন্যে

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম দারকুতনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি সুনানে বর্ণিত হয়েছে।
৪. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

আপনি আপনার রহমতের দরযা খুলে দিন! আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন যেন বলে– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্যে আপনার অনুগ্রহের দরযা খুলে দিন।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন নবী (সঃ)-এর উপর সালাম দেয় এবং যেন বলে– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ এবং যখন বের হবে তখন যেন বলে– اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করুন!"[২]

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম বলতেন, তারপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্যে আপনার রহমতের দরযা খুলে দিন!" আর যখন বের হতেন তখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম বলতেন, অতঃপর বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করুন এবং আমার জন্যে আপনার অনুগ্রহের দরযা উন্মুক্ত করে দিন!"[৩]

মোটকথা, এ ধরনের বহু হাদীস এই আয়াত সম্পর্কে রয়েছে এবং ঐগুলো মসজিদের নির্দেশাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "তোমরা মসজিদে নিজেদের মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং আন্তরিকতার সাথে শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকতে থাকো।" আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ "নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্যে।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন মসজিদে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে কুযাইমা (রঃ) ও ইবনে হিব্বান (রঃ) এটা তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান এবং এর ইসনাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, হযরত হুসাইনের কন্যা ছোট ফাতিমা (রাঃ) বড় ফাতিমা (রাঃ)-কে পাননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমের যেখানেই 'তাসবীহ' শব্দ রয়েছে সেখানেই ওর দ্বারা নামাযকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফজর ও আসরের নামায। প্রথম প্রথম এই দুই ওয়াক্ত নামাযই ফরয হয়েছিল। সুতরাং এখানে এই দুই ওয়াক্ত নামাযকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরআতে يُسَبَّحُ রয়েছে। অর্থাৎ ب অক্ষরের উপর فَتْحَهْ বা যবর আছে। এই পঠনে اٰصَال-এর উপর وَقْف করা হয়েছে এবং رِجَال দ্বারা অন্য বাক্য শুরু করা হয়েছে। এটা যেন উহ্য কর্তার জন্যে মুফাসসির। তাহলে যেন বলা হয়েছেঃ সেখানে কে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? জবাবে যেন বলা হয়েছেঃ এইরূপ লোকেরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। يُسَبِّحُ পড়া হলে رِجَالٌ فَاعِل বা কর্তা হবে। তাহলে وَقْف হওয়া উচিত فَاعِل -এর বর্ণনার পর।

رِجَال বলার দ্বারা তাদের ভাল উদ্দেশ্য, সৎ নিয়ত এবং বড় কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা আল্লাহর ঘরের আবাদকারী, তাঁর ইবাদতের স্থান তাদের দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত হয় এবং তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ الخ অর্থাৎ "মুমিনদের মধ্যে কতকগুলো লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদাকৃত কথাকে সত্য করে দেখিয়েছে (শেষ পর্যন্ত)।" (৩৩ ঃ ২৩)

হ্যাঁ, তবে স্ত্রীলোকদের জন্যে মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা বাড়ীতে নামায পড়াই উত্তম। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "স্ত্রীলোকদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের কোণা।"[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুওয়ায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন যে, তাঁর ফুফু উম্মে হুমায়েদ (রাঃ) আবূ হুমায়েদ সায়েদ (রাঃ)-এর স্ত্রী নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালবাসি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালবাস। কিন্তু জেনে রেখো যে, তোমার নামায তোমার হুজরায় (ক্ষুদ্র কক্ষে) পড়া অপেক্ষা তোমার ঘরে পড়া উত্তম। তোমার বাড়ীতে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার হুজরায় নামায পড়া উত্তম। তোমার মহল্লার মসজিদে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নামায পড়ার চেয়ে তোমার বাড়ীতে নামায পড়া উত্তম এবং আমার এই মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়াই উত্তম।” বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি নামাযের জায়গা বানিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর শপথ! মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ওখানেই নামায পড়তে থাকেন।[১]

অবশ্যই মসজিদে পুরুষ লোকদের সাথে স্ত্রীলোকদেরও নামায পড়া জায়েয যদি তারা তাদের সৌন্দর্য পুরুষদের উপর প্রকাশ না করে এবং সুগন্ধি মেখে বের না হয়। যেমন সহীহ্ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে তাঁর মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না বা নিষেধ করো না।”[২]

আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোকদের জন্যে তাদের ঘরই উত্তম।[৩] অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ যদি মসজিদে হাযির হতে ইচ্ছা করে তবে সে যেন খোশবু বা সুগন্ধি স্পর্শ না করে।”[৪]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “মুমিনা নারীরা ফজরের নামাযে হাযির হতো। অতঃপর তারা নিজেদেরকে চাদরে জড়িয়ে ফিরে আসতো এবং কিছুটা অন্ধকার থাকতো বলে তাদেরকে চিনতে পারা যেতো না।”[৫]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “স্ত্রীলোকেরা এই যে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে এটা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) জানতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেমন বানী ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।”[৬]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত আছে।
৪. সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।
৫. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।
৬. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ভুলিয়ে রাখে না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে।" (৬৩ ঃ ৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্যে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।" (৬২ ঃ ৯) ভাবার্থ এই যে, সৎ লোকদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন রাখতে পারে না। তাদের আখিরাত ও আখিরাতের নিয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা ওটাকে অবিনশ্বর মনে করে। আর দুনিয়ার সবকিছুকে তারা অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বলে বিশ্বাস করে থাকে। এ জন্যেই তারা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেয়। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে, তাঁর মহব্বতকে এবং তাঁর হুকুমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদা ব্যবসায়িক লোকদেরকে আযান শুনে তাদের কাজ কারবার ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে যেতে দেখে এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "এ লোকগুলো ওদেরই অন্তর্ভুক্ত।" হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলেনঃ "আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করবো। যদি প্রত্যহ আমি তিনশ' স্বর্ণমুদ্রা লাভ করি তবুও নামাযের সময় হলেই আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবো। ব্যবসা যে হারাম এটা ভাবার্থ কখনো নয়। বরং ভাবার্থ এটাই যে, আমাদের মধ্যে এই বিশেষণ থাকতে হবে যা এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত সালিম ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) একদা নামাযের জন্যে যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পান যে, মদীনার ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন

তিনি رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ "এই লোকদেরই প্রশংসা এই আয়াতে করা হয়েছে।"

মাতারুল অরাক (রঃ) বলেন যে, তাঁরা বেচাকেনা করতেন, নিক্তি হয়তো তাঁদের হাতে থাকতো এমতাবস্থায় আযান তাঁদের কানে আসলে তাঁরা নিক্তি ফেলে দিয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতেন। জামাআতের সাথে নামায পড়ার প্রতি তাঁদের খুবই আসক্তি ছিল। তাঁরা নামাযের সময়, রুকন এবং আদবের ফিহাযতসহ নামাযের পাবন্দ ছিলেন। এটা এ কারণে যে, তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এ ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল যে, সেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই তো তাঁরা থাকতেন সদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে– শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।"

এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ "আল্লাহ অণুপরিমাণ যুলুম করেন না।" (৪ঃ ৪০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করে তার জন্যে ওর দশগুণ পুণ্য রয়েছে।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেনঃ "কে এমন আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে পারে?" আরো বলেনঃ "তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন (পুণ্য) বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে দুধ আনয়ন করা হয়। তিনি তাঁর মজলিসের সব লোককেই তা পান করাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সবাই রোযার অবস্থায় ছিলেন বলে পুনরায় দুধের পাত্রটি তাঁর কাছেই

ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনি তা পান করেন, যেহেতু তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর তিনি يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ -এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন যখন প্রথম ও শেষ সবকেই একত্রিত করা হবে তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে বলবেন, ফলে ঘোষণাকারী খুবই উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবেন যা হাশরের একত্রিত লোকদের সবাই শুনতে পাবে। ঘোষণায় বলা হবে- আজ সবাই জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত কে? অতঃপর বলবেনঃ যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণ হতে ভুলিয়ে রাখতে পারতো না তারা যেন দাঁড়িয়ে যায়। তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সংখ্যায় খুবই অল্প হবে। তারপর সমস্ত মাখলূকের হিসাব গ্রহণ করা হবে।”

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (৩৫ ঃ ৩০) (তিনি তাদেরকে পূর্ণভাবে তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং প্রাপ্যের অধিক দিবেন)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তাদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। আর তাদের প্রাপ্যের অধিক দিবেন, এর ভাবার্থ এই যে, যারা তাদের প্রতি ইহসান করেছিল এবং তারা শাফাআতের হকদারও বটে, তাদের জন্যে শাফাআত করার অধিকার এরা লাভ করবে।”[২]

৩৯। যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয় এবং সে পাবে সেথায় আল্লাহকে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন; আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٣٩- وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

---

১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۠

৪০। অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না; আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতি নেই।

আরো দু'প্রকার কাফিরের এ দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে বাকারার শুরুতে দু'শ্রেণীর দু'টি উপমা বর্ণনা করা হয়েছে, একটি আগুনের উপমা এবং একটি পানির উপমা। আর যেমন সূরায়ে রা'দে মানুষের অন্তরে স্থান ধারণকারী ইলম ও হিদায়াতের এরূপই আগুন ও পানির দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দু'টি সূরায় ঐ আয়াতগুলোর পূর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করে থাকে এবং মনে করে যে, তারা হিদায়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু ওটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত তো হলো এরূপ যেমন কোন পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং ওকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে।

قِيْعَةٍ শব্দটি قَاعٌ শব্দের বহুবচন, যেমন جَارٌ শব্দটির বহুবচন হলো جِيْرَةٌ, এবং قَاعٌ শব্দের বহুবচন قِيْعَانٌ ও এসে থাকে, যেমন جَارٌ শব্দের বহুবচন جِيْرَانٌ ও আসে। قَاعٌ শব্দের অর্থ হলো জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দুপুরের সময় এরূপই মনে হয় যে, পানির প্রশস্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোন লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মত পানির খোঁজে ফিরতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, সেখানে এক ফোঁটা পানিরও কোন নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফিররাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভাল কাজই করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে যে,

তাদের কাছে একটা পুণ্যও নেই। হয়তো তাদের পুণ্য তাদের বদ নিয়তের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শরীয়ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। মোটকথা, সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করছেন এবং ঐ কাফিরদের একটি আমলও পুণ্যের যোগ্যরূপে পাওয়া যাচ্ছে না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবেঃ "আমরা আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোন পুত্র নেই।" তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না (ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন)?" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে ওদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌঁছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এটা দৃষ্টান্ত হলো অনুসৃত লোকদের। এখন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে অনুসরণকারী লোকদের, যারা মোটেই জ্ঞান রাখতো না। তারা পূর্ব বর্ণিত কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ করতো। যাদের উপমা দেয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের সাথে, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফিরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফিরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। যাদের তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনে না। তারা ন্যায়ের উপর আছে কি অন্যায়ের উপর আছে সেটাও তারা জানে না। তারা তাদের পিছনে চলতে রয়েছে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোন একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" উত্তরে সে বলেঃ "আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি।" আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়ঃ "এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে?" জবাবে সে বলেঃ "তা তো আমি জানি না।" যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে তেমনই এই কাফিরের কানে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ

তাদের অন্তরের উপর ও কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন (শেষ পর্যন্ত)।” অন্য আয়াতে রয়েছে –

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً

অর্থাৎ “তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ তাকে জ্ঞানের উপর পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কানের উপর ও অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ও তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন?।” (৪৫ঃ ২৩)

হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং পরিণাম অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা যাকে হিদায়াতের জ্যোতি দান না করেন সে হিদায়াত শূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ অর্থাৎ “আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন হিদায়াতকারী নেই।” (৭ঃ ১৮৬) এটা ওরই মুকাবিলায় বলা হয়েছে যা মুমিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটাকে খুবই বড় ও বেশী করেন।

৪১। তুমি কি দেখো না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।	٤١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

٤٢- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "সপ্ত আকাশ ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে। (শেষ পর্যন্ত)।"

উড্ডীয়মান পক্ষীকুলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে থাকে। এ সবগুলোর জন্যে যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ইবাদতের বিভিন্ন পন্থাও তিনি তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও যমীনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাযির হতে হবে। তিনি যা চাইবেন তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারী করে দিবেন। মন্দ লোক মন্দ বিনিময় পাবে এবং ভাল লোক ভাল বিনিময় লাভ করবে। সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত হাকেম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যোগ্য।

৪৩। তুমি কি দেখো না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দ্বারা

٤٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ

بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ○

তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

٤٤- يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○

৪৪। আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ওগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ওগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, যমীনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

এই বাক্যে প্রথম مِنْ টি اِبْتِدَاء غَايَتْ -এর জন্যে, দ্বিতীয়টি تَبْعِيْض -এর জন্যে এবং তৃতীয়টি جِنْس -এর বর্ণনার জন্যে। এটা এই তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবেঃ শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جَبَل বা 'পাহাড়' শব্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় مِنْ টিও اِبْتِدَاء غَايَتْ -এর জন্যে এসেছে। কিন্তু ওটা প্রথম হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছেঃ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানী করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ওটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিন ছোট করেন ও রাত্রি বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন। এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। এগুলো মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে।" (৩ ঃ ১৯০)

৪৫। আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

٤٥- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِیْ عَلٰی بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِیْ عَلٰۤی اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলূক বা সৃষ্টজীব সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, ওগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা কখনো হয় না।

৪৬। আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করেন।

٤٦- لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰیٰتٍ مُّبَیِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِیْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ○

এই নৈপুণ্যপূর্ণ আহকাম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ এই কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে বুঝবার তাওফীক দিয়েছেন। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করেন।

٤٧- وَيَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৭। তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম, কিন্তু এর পর তাদের এক দল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়।

٤٨- وَاِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৪৮। আর যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবার জন্যে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٩- وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ؕ○

৪৯। আর যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল (সঃ)-এর নিকট ছুটে আসে।

٥٠- اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ ع

৫০। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) তাদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।

৫১। মুমিনদের উক্তি তো এই- যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবার জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলেঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম।

٥١- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৫২। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

٥٢- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

আল্লাহ্ তা'আল মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা মুখে তো ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ তারা ঈমানদার নয়। হাদীসে আছে যে, যাকে বাদশাহ্র সামনে হাযির হওয়ার জন্যে আহ্বান করা হয় এবং সে ঐ আহ্বানে সাড়া দেয় না সে যালিম। সে অন্যায়ের উপর রয়েছে।"[১]

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবার জন্যে, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহবান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয় তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

হতে رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا পর্যন্ত।

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) হযরত সামুরা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও ওটা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূল (সঃ)-এর দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" (৪ ঃ ৬০-৬১)

ঘোষিত হচ্ছেঃ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল (সঃ)-এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরীয়তের ফায়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল (সঃ)-এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরয়ী ফায়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং এইরূপ লোক পাকা কাফির। কেননা, তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোন একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়তো তাদের অন্তরে বে-ঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা হয়তো তারা আল্লাহর দ্বীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা হয়তো তারা এই ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি যুলুম করেন। এই তিনটাই কুফরীর অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে এই লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে এরূপ কাফিরের সংখ্যা অনেক ছিল যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। যখন তারা দেখতো যে, কুরআন ও হাদীসমূলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে তখন তারা নবী (সঃ)-এর খিদমতে তাদের মুকদ্দমা পেশ করতো। আর যখন দেখতো যে, তাদের প্রতিপক্ষের অনুকূলে রায় যাবে তখন নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন বিবাদ হয় এবং তাদেরকে ইসলামী হুকুম অনুযায়ী ফায়সালার দিকে আহ্বান করা হয়, আর তারা তা অস্বীকার করে তবে তারা যালিম এবং তারা অন্যায়ের উপর রয়েছে।"[১]

১. এ হাদীসটি গারীব ও মুরসাল।

এরপর সঠিক ও খাঁটি মুমিনের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তো কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলোর ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে থাকেঃ আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরা উদ্দেশ্যে সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ), যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক, মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জানাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রাঃ)-কে বলেনঃ "তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার কি উপকারী তাকি আমি তোমাকে বলে দেবো না?" তিনি জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ বলুন।" তখন তিনি বললেনঃ "তোমার কর্তব্য হলো (ধর্মীয় উপদেশ) শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবে না। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতার হুকুম করে তবে তা কখনো মানবে না। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু বলে তবে তা কখনো স্বীকার করবে না। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে।"

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামাআতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তদীয় রাসূল (সঃ), মুসলমানদের খলীফা এবং সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গল কামনার মধ্যে।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হলো আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের বাদশাহদের আনুগত্য স্বীকার করা।

আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর এবং মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আসার এসেছে সেগুলোর সংখ্যা এতো বেশী যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপকার্য করে ফেলেছে তার জন্যে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐ সব পাপকার্য হতে বিরত থাকবে সে সমুদয় কল্যাণ জমাকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

৫৩। তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা বের হবেই; তুমি বলঃ শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য; তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫৩- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৫৪। বলঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।

٥٤- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে করে বলতো যে, তারা জিহাদে গমনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ী ও ছেলে মেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ “তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, মুখে এক কথা। সুতরাং তোমাদের শপথের হাকীকত আমার অজানা নয়। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন তোমাদের অন্তর ততটা কাফির। তোমাদের এই শপথগুলো শুধু মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্যে। হে মুমিনগণ! এই মুনাফিকরা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। তারা যে শুধু তোমাদের সামনে কসম করছে তা নয়, বরং কাফিরদের সামনেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বনের ও তাদের সাহায্য সহযোগিতার কসম

খেয়ে থাকে। কিন্তু তারা এতো ভীরু ও কাপুরুষ যে, তাদের সাথেও তারা থাকতে পারে না।

এর ভাবার্থ এও হতে পারেঃ "হে মুনাফিকরা! তোমাদের জ্ঞানসম্মত ও পছন্দনীয় আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল, এভাবে শপথ করা মোটেই শোভনীয় নয়। তোমাদের সামনে মুসলমানরা বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তারা না শপথ করছে, না বেড়ে বেড়ে কথা বলছে, বরং কাজের সময় তারা সবারই আগে বেরিয়ে পড়ছে। বেশী কথা না বলে কাজই তারা বেশী করছে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের কোন কাজই তাঁর কাছে গোপন নেই। প্রত্যেক অবাধ্য ও অনুগত তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রত্যেকের ভিতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাইরের খবর। তোমরা বাইরে যা কিছুই প্রকাশ কর না কেন, তিনি তোমাদের অন্তরের লুক্কায়িত খবরও পূর্ণমাত্রায় রাখেন।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো যে, তোমাদের এই অপরাধের শাস্তি নবী (সঃ)-এর উপর পতিত হবে না। তার কাজ তো শুধু আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূল (সঃ)-এর কথা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করা ইত্যাদি। হিদায়াত শুধু রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা, সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই। এই সরল সোজা পথ ঐ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে যাঁর রাজত্ব সমস্ত যমীন ও আসমানব্যাপী। রাসূল (সঃ)-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। সবারই হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর। যেমন তিনি বলেনঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ - لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ -

অর্থাৎ "অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।" (৮৮ ঃ ২১-২২)

অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে হযরত শাইয়া (আঃ) নামক একজন নবীর নিকট অহী করেনঃ "তুমি বানী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখ দিয়ে যা

বের করার বের করবো।” আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশক্রমেই হযরত শাইয়া (আঃ) দাঁড়িয়ে যান। তখন আল্লাহর হুকুমে তাঁর মুখ দিয়ে নিম্ন লিখিত ভাষণ বের হয়ঃ

“হে আকাশ! শুন, এবং হে যমীন! চুপ থাকো। আল্লাহ তা'আলা একটা শান বা মাহাত্ম্য পূর্ণ করতে এবং একটা বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ইচ্ছা করেন। ওটা তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি চান যে, জঙ্গলকে বাসযোগ্য করবেন, জনহীন মরুপ্রান্তরকে করবেন জনবসতিপূর্ণ, বালুকায়ময় মরুভূমিকে করবেন শ্যামল-সবুজ, দরিদ্রদেরকে করবেন সম্পদশালী এবং রাখালদেরকে তিনি বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। তিনি অশিক্ষিতদের মধ্য হতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী করে পাঠাবেন, যিনি চরিত্রহীন হবেন না এবং কর্কশ ভাষীও হবেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল ও গোলমাল করবেন না। তিনি এতো বিনয়ী ও নম্র হবেন যে, তাঁর বস্ত্রের অঞ্চলের বাতাসে ঐ প্রদীপ নির্বাপিত হবে না যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি গমন করবেন। তিনি যদি শুষ্ক বাঁশের উপর পা রেখেও চলেন তবুও ঐ বাঁশের চড়চড়ি শব্দ কারো কানে পৌঁছবে না। আমি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠাবো। তাঁর মুখের ভাষা হবে মধুর ও পবিত্র। তাঁর আবির্ভাবের ফলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং বধির ফিরে পাবে শ্রবণশক্তি। তাঁর বরকতে মোহরযুক্ত অন্তর খুলে যাবে। সমস্ত ভাল কাজ দ্বারা আমি তাঁকে শোভনীয় করবো। তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে মধুর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করবো। সাকীনা বা চিত্ত প্রশান্তি হবে তাঁর পোশাক। পুণ্য হবে তাঁর রীতি-নীতি এবং তাঁর অন্তর হবে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা হবে জ্ঞানপূর্ণ এবং সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা-পালন হবে তাঁর স্বভাব। তাঁর অভ্যাস ও প্রকৃতি হবে মার্জনা ও ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা। হক ও সত্য হবে তার শরীয়ত এবং আদল ও ইনসাফ হবে তাঁর চরিত্র। হিদায়াত হবে তাঁর ইমাম এবং ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। তাঁর নাম হবে আহমাদ (সঃ)। তাঁর কারণে আমি পথভ্রষ্টতার পরে হিদায়াত ছড়িয়ে দিবো। অজ্ঞতার পরে জ্ঞান বিকশিত হবে। তাঁর কারণে অবনতির পরে উন্নতি হবে। তাঁর মাধ্যমে অজানা জানার সাথে পরিবর্তিত হবে। স্বল্পতা আধিক্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাঁরই কারণে আমি দারিদ্রকে পরিবর্তিত করবো ঐশ্বর্যে। যারা পরস্পর পৃথক পৃথক রয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরস্পর মিলিত করবো। তাঁর মাধ্যমে আমি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করবো। তাদের পরস্পরের মতানৈক্যের পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে মতৈক্যে পৌঁছিয়ে দিবো। তাঁর মাধ্যমে আমি পৃথক পৃথক হৃদয়কে এক হৃদয়ে

পরিণত করবো। অর্থাৎ তারা পরস্পর শত্রুতা ভুলে গিয়ে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন একই হৃদয়। আল্লাহর অসংখ্য বান্দা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাঁর উম্মতকে আমি সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করবো, যারা জনগণের জন্যে উপকারী হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে। তারা হবে একত্ববাদী খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তা'আলার যতগুলো রাসূল আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যত কিছু এনেছেন, এই শেষ নবী (সঃ) তাঁদের সকলকেই স্বীকার করবেন, কাউকেও অস্বীকার করবেন না।

৫৫। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীতি করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।

৫৫- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۠ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মতকে যমীনের মালিক বানিয়ে দিবেন, তাদেরকে তিনি লোকদের নেতা করবেন এবং দেশ তাদের দ্বারা জনবসতিপূর্ণ হবে। আল্লাহর

বান্দারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আজ জনগণ লোকদের থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে, কাল তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। হুকুমত তাদের হবে এবং তারাই হবে সাম্রাজ্যের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, হয়েছেও তাই। মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, আরব উপদ্বীপ এবং ইয়ামন তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগেই বিজিত হয়েছিল। হিজরের মাজূসীরা জিযিয়া কর দিতে স্বীকৃত হয়ে মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। সিরিয়ার কোন কোন অংশেরও এই অবস্থাই হয়। রোমক সম্রাট কায়সার উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। মিসরের গভর্নরও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপঢৌকন পাঠায়। ইসকানদারিয়ার বাদশাহ মাকুকাস এবং আম্মানের বাদশাহরাও এটাই করেন এবং এইভাবে নিজেদের আনুগত্য প্রমাণ করেন। হাবশের বাদশাহ নাজ্জাসী (রঃ) তো মুসলমানই হয়ে যান যিনি আসহামার পরে হাবশের বাদশাহ হয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পারস্য অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ক্রমান্বয়ে বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং কুফরীর গাছগুলোকে কেটে ফেলে চতুর্দিকে ইসলামের চারা রোপণ করেন। হযরত আবূ উবাদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সেনাবাহিনীর অধীনে ইসলামের বীর সৈনিকদেরকে সিরিয়ার রাজ্যগুলোর দিকে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা সেখানে মুহাম্মাদী (সঃ) পতাকা উত্তোলন করেন এবং ক্রুশ চিহ্নযুক্ত পতাকাগুলোকে উল্টোমুখে নিক্ষেপ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী মিসরের দিকে প্রেরিত হয়। বসরা, দামেশ্‌ক, আম্মান প্রভৃতি রাজ্য বিজয়ের পর হযরত আবূ বকরও (রাঃ) মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মহান আল্লাহর ইঙ্গিতক্রমে হযরত উমার (রাঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। এটা সত্য কথা যে, আকাশের নীচে কোন নবীর পরে হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগের মত যুগ আর আসেনি। তাঁর স্বভাবগত শক্তি, তাঁর পুণ্য, তাঁর চরিত্র, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় তাঁর পরে অনুসন্ধান করা বৃথা কালক্ষেপণ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র সিরিয়া ও মিসর এবং পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর খিলাফতের আমলে বিজিত হয়। পারস্য সম্রাট কিসরার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। স্বয়ং সম্রাটের মাথা লুকাবার কোন জায়গা থাকে না। তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় পালিয়ে বেড়াতে হয়। রোমক সম্রাট কায়সারকেও সাম্রাজ্যচ্যুত করা হয়। সিরিয়া সাম্রাজ্য তার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং

কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর বহু বছরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। আল্লাহর এই সৎ ও মধুর চরিত্রের অধিকারী বান্দাদের মধ্যে এগুলো বন্টন করা হয়। এইভাবে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ ওয়াদা পূর্ণ করেন যা তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে করেছিলেন।

অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগ আসে এবং পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সেনাবাহিনী একদিকে পূর্ব দিকের শেষ প্রান্ত এবং অপরদিকে পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ইসলামী মুজাহিদদের উন্মুক্ত তরবারী আল্লাহর তাওহীদকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন। স্পেন, কিবরাস এমন কি সুদূর চীন পর্যন্ত হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগে বিজিত হয়। পারস্য সম্রাট কিসরা নিহত হয়। তার সাম্রাজ্যের নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। অগ্নি উপাসকদের হাজার হাজার বছরের উপাসনালয় নির্বাপিত হয় এবং প্রত্যেকটি উঁচু টিলা হতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। অপরদিকে মাদায়েন, ইরাক, খোরাসান, আহওয়ায ইত্যাদি সাম্রাজ্য জয় করা হয়। তুর্কীদের সাথে বিশাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তাদের বড় বাদশাহ খাকান মাটির সাথে মিশে যায়। সে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয় এবং যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর দরবারে খাজনা পৌঁছতে থাকে। সত্য কথা তো এটাই যে, মুসলিম বীর পুরুষদের এই জীবন মরণ সংগ্রামের মূলে ছিল হযরত উসমান (রাঃ)-এর তিলাওয়াতে কুরআনের বরকত। কুরআন কারীমের প্রতি তাঁর যে আসক্তি ও অনুরাগ ছিল তা বর্ণনাতীত। কুরআনকে একত্রিতকরণ ও মুখস্থকরণ এবং প্রচার ও প্রসারকরণে তিনি যে খিদমত আঞ্জাম দেন তার তুলনা মিলে না। তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছিলেনঃ "আমার জন্যে যমীনকে এক জায়গায় একত্রিত ও জড় করা হয়, এমনকি আমি পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক দেখে নিই। আমার উম্মতের সাম্রাজ্য ঐখান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখান পর্যন্ত আমাকে দেখানো হয়েছিল।" এখন আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমানের প্রার্থনা করছি এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আমরা তাঁর কাছে তাওফীক চাচ্ছি।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– "মুসলমানদের কাজ উত্তমরূপে চালু থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বারো জন খলীফা হবে।" অতঃপর তিনি একটি বাক্য আস্তে বলেন যা আমার কর্ণগোচর হয়নি। আমি ওটা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথাটি আস্তে বলেছিলেন তাহলোঃ "এদের সবাই কুরায়েশী হবে।"[১] রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথাটি ঐদিনের সন্ধ্যায় বলেছিলেন যেই দিন হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ)-কে রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং জানা গেল যে, এই বারোজন খলীফা অবশ্যই হবেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই বারো জন খলীফা তারা নয় যাদেরকে শিয়া সম্প্রদায় ধারণা করছে। কেননা শিয়াদের ইমামদের মধ্যে এমন বহু ইমামও রয়েছে যারা খিলাফত ও সালতানাতের কোন অংশ সারা জীবনেও লাভ করেনি। এই বারো জন খলীফা সবাই হবেন কুরায়েশ বংশের। তাঁরা হবেন ন্যায়ের সাথে ফায়সালাকারী। তাঁদের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও রয়েছে। এটা শর্ত নয় যে, এই বারো জন খলীফা পর্যায়ক্রমে ও ক্রমিকভাবে হবেন। বরং হতে পারে যে, তারা বিভিন্ন যুগে হবেন। চার জন খলীফা তো ক্রমিকভাবেই হয়েছেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)। তাঁদের পর ক্রম কেটে গেছে। পরে এরূপ খলীফা গত হয়েছেন এবং পরবর্তীতেও কোন কোন খলীফার আগমন ঘটতে পারে। সঠিক যুগের অবগতি একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত কথা যে, ইমাম মেহেদীও এই বারো জনের একজন হবেন যাঁর নাম ও কুনিয়াত হবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাম ও কুনিয়াত মুতাবেক। তিনি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আদল ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন, যখন সারা দুনিয়া অন্যায় ও অত্যাচারে ছেয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুক্ত দাস হযরত সাফীনা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার (ইন্তেকালের) পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত থাকবে, তারপর দন্তকর্তিত রাজ্য হয়ে যাবে।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবুল আলিয়া (রঃ) আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, (ইসলামের আবির্ভাবের পর) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সহচরবর্গ দশ বছরের মত মক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তাঁরা দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাযিল হয়নি। মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোন সময়ই বিপদ শূন্য ছিল না। সকাল সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। একজন সাহাবী একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের জীবনের একটা মুহূর্তও কি শান্তিতে কাটবে না? হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ক্ষণেকের জন্যেও কি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়ে তৃপ্তি ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারবো না?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দেনঃ "আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর এমন শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, মানুষ ভরা মজলিসে আরামে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, একজনের কাছে কেন, কারো কাছেই কোন অস্ত্র থাকবে না।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

অতঃপর আল্লাহর নবী (সঃ) আরব উপদ্বীপের উপর বিজয় লাভ করেন। আরবে কোন কাফির থাকলো না। সুতরাং মুসলমানদের অন্তর ভয়শূন্য হয়ে গেল। আর সদা-সর্বদা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত থাকার কোন প্রয়োজন থাকলো না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরেও তিনজন খলীফার যুগ পর্যন্ত সর্বত্র ঐ শান্তি ও নিরাপত্তাই বিরাজ করে। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত। এরপর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কাজেই আবার তাঁদের মধ্যে ভয় এসে পড়ে এবং প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাতি নিযুক্ত করতে হয়। মুসলমানরা যখন নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে তখন তাদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের সত্যতার ব্যাপারে এই আয়াতটিকে পেশ করেছেন।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেনঃ "যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা অত্যন্ত ভয় ও দুর্ভাবনার অবস্থায় ছিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ "তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প এবং ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো।" (৮ ঃ ২৬) অর্থাৎ পদে পদে তোমরা ভীত ও শংকিত থাকতে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন এবং তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন। আর তিনি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেন ঃ

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ "এটা খুবই নিকটে যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।" (৭ঃ ১২৯) অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَنُرِيدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ "আমি চাই যে, ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে দুর্বল জ্ঞান করা হতো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো।" (২৮ঃ ৫)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) যখন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছো?" উত্তরে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেনঃ "জ্বী না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দ্বীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দিবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে তাওয়াফ কার্য সম্পন্ন করতঃ ফিরে আসবে। সে না কাউকেও ভয় করবে এবং না কারো আশ্রয়ে থাকবে। জেনে রেখো যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হুরমুযের কোষাগার বিজিত হবে।" হযরত আদী (রাঃ)

বিস্ময়ের সুরে বলেনঃ "ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগার মুসলমানরা জয় করবেন!" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেউ থাকবে না।" হযরত আদী (রাঃ) বলেনঃ "দেখুন, বাস্তবিকই স্ত্রীলোকেরা হীরা হতে কারো আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও আমার চোখের সামনে পুরো হয়েছে। কিসরার ধনভাণ্ডার জয়কারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা, এটাও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এরই ভবিষ্যদ্বাণী।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই উম্মতকে ভূ-পৃষ্ঠে উন্নতি, উচ্চ মর্যাদা, দ্বীনের প্রসার ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে তার জানা উচিত যে, পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।"[১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের (উটের গদীর) শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না (অর্থাৎ আমি নবী (সঃ)-এর খুবই সংলগ্ন ছিলাম)। তখন তিনি বললেনঃ "হে মুআয (রাঃ)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক! অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সঃ) সামনে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। আবার তিনি বললেনঃ "হে মুআয (রাঃ)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। পুনরায় তিনি বললেনঃ "হে মুআয (রাঃ)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক! তিনি (এবার) বললেনঃ "বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) অধিকতর ভাল জানেন ও অবগত আছেন। তিনি বললেনঃ "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে এতটুকুও শরীক করবে না।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে গেলেন এবং আবার বললেনঃ "হে মুআয! (রাঃ)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লাব্বায়েক ওয়া সাদায়েক!

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বললেনঃ "আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না।"[১]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে সে আমার হুকুম অমান্য করলো এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় পাপ।

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যেই যুগে ইসলামের শক্তি বেশী থেকেছে সেই যুগে তিনি সাহায্যও বেশী করেছেন। সাহাবীগণ ঈমানে অগ্রগামী ছিলেন, কাজেই তাঁরা বিজয় লাভের ব্যাপারেও সবারই অগ্রে থেকেছেন। যেমন ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেয় তেমন পার্থিব অবস্থা, রাজত্ব এবং শান-শওকতও নীচে নেমে গেছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকবে।" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই দলটিই সর্বশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একটি হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ পর্যন্ত এই লোকগুলো কাফিরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। এই সব রিওয়াইয়াত বিশুদ্ধ এবং সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

৫৬। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।

٥٦- وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৫৭। তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না; তাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

٥٧- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ع

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের সহীহ গ্রন্থে এটা তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ তাঁরই জন্যে তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাথে সাথে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র এবং মিসকীনদের খবরাখবর নিতে থাকো। মালের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ যাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করতে থাকো। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো। জেনে রেখো যে, আল্লাহর রহমত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ "ওরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ সত্বরই করুণা বর্ষণ করবেন।" (৯ ঃ ৭১)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি ধারণা করো না যে, তোমাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি যা বাসের পক্ষে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

---

৫৮ – يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ الْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا

৫৮। হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর, এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে ও

عَلَيۡهِمۡ جُنَاحٌۢ بَعۡدَهُنَّ طَوّٰفُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ بَعۡضُكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ○

তাদের জন্যে কোন দোষ নেই; তোমাদের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٥٩- وَاِذَا بَلَغَ الۡاَطۡفَالُ مِنۡكُمُ الۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَاۡذِنُوۡا كَمَا اسۡتَاۡذَنَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ○

৫৯। এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা; এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٦٠- وَالۡقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىۡ لَا يَرۡجُوۡنَ نِكَاحًا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ اَنۡ يَّضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيۡنَةٍ وَاَنۡ يَّسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ○

৬০। আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্যে অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পর পুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্যে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ

দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হলোঃ ফজরের নামাযের পূর্বে। কেননা, এটা হলো ঘুমানোর সময়। দ্বিতীয় হলো দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণতঃ কিছুটা বিশ্রামের জন্যে কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। আর তৃতীয় হলো এশার নামাযের সময়। কেননা, ওটাই হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে শয়নের সময়। সুতরাং এই তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। তবে এই তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ঘরে যাতায়াত জরুরী। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্যে এবং বাড়ীর লোকদের জন্যেও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। এ জন্যেই নবী (সঃ) বলেছেনঃ "বিড়াল অপবিত্র নয়। ওটা তো তোমাদের বাড়ীতে তোমাদের আশে পাশে সদা ঘোরাফেরা করেই থাকে।"[১] হুকুম তো এটাই, কিন্তু এর উপর আমল খুব কমই হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "তিনটি আয়াতের উপর আমল মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। একটি এই আয়াতটি। দ্বিতীয় হলো সূরায়ে নিসার وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى ..... الخ (৪ঃ ৮) এই আয়াতটি এবং তৃতীয়টি হলো সূরায়ে হুজুরাতের اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ...... الخ (৪৯ঃ ১৩) এই আয়াতটি। শয়তান লোকদের উপর ছেয়ে গেছে এবং সে তাদেরকে এই আয়াতগুলোর উপর আমল করা হতে উদাসীন রেখেছে, যেন তাদের এ আয়াতগুলোর উপর ঈমান নেই। আমি তো আমার দাসটিকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এই তিন সময়ে বিনা অনুমতিতে কখনো না আসে।" প্রথম আয়াতটিতে দাস-দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে ওয়ারিসদের মধ্যে মাল বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিকসীন এসে গেলে তাদেকেও কিছু দেয়া ও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার হুকুম করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বংশ ও আভিজাত্যের উপর গর্ব না করা, বরং আল্লাহভীরু লোককেই সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য মনে করার বর্ণনা রয়েছে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন।

মূসা ইবনে আবি আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শা'বী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ...... الخ -এই আয়াতটি কি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "না, রহিত হয়নি।" তখন পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেনঃ "জনগণ এর প্রতি আমল ছেড়ে দিয়েছে যে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "(এই আয়াতের প্রতি আমল করার জন্যে) আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।"

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দু'জন লোক কুরআন কারীমে বর্ণিত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "এই আয়াতের উপর আমল্ ছেড়ে দেয়ার একটি বড় কারণ হলো লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও প্রশস্ততা। পূর্বে জনগণের আর্থিক অবস্থা এমন ভাল ছিল না যে, তারা ঘরের দরযার উপর পর্দা লটকাবে বা কয়েকটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বড় ঘর নির্মাণ করবে। বরং তাদের একটিমাত্র ঘর থাকতো এবং অনেক সময় দাস্-দাসীরা তাদের অজ্ঞাতে ঘরে প্রবেশ করতো। ঐ সময় স্বামী স্ত্রী হয়তো ঘরে একত্রে থাকতো, ফলে তারা খুবই লজ্জিত হতো এবং বাড়ীর লোকেরাও এতে কঠিনভাবে অস্বস্তিবোধ করতো। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করলেন এবং তারা পৃথক পৃথক কক্ষ বানিয়ে নিলো ও দরযার উপর পর্দা লটকিয়ে দিলো তখন তারা রক্ষিত হয়ে গেল। আর এর ফলে যে যৌক্তিকতায় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেল। তাই জনগণ এই হুকুমের পাবন্দী ছেড়ে দিলো এবং তারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করলো।"[১]

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই তিনটি এমন সময় যখন মানুষ কিছুটা অবসর পায় এবং বাড়ীতেই অবস্থান করে। আল্লাহ জানেন তারা তখন কি অবস্থায় থাকে। এজন্যেই দাস-দাসীদেরও অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, সাধারণতঃ ঐ সময়েই মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, যেন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে বের হতে পারে এবং নামাযে শরীক হতে পারে।

মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে মুরসিদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে কিছু খাদ্য তৈরী করেন। লোকেরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখন

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটাতো খুবই জঘন্য প্রথা যে, স্বামী স্ত্রী একই কাপড়ে রয়েছে এমতাবস্থায় তাদের গোলাম ঘরে প্রবেশ করে।" ঐ সময় يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمْ ..... الخ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াত যে মানসূখ বা রহিত নয়, শেষের শব্দগুলো তার ইঙ্গিত বহন করছে। ঘোষিত হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ "এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" হ্যাঁ, তবে যখন ছেলেরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে তখন তাদেরকে এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। যে তিন সময়ের কথা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই তিন সময়ে ছোট ছেলেকেও তার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পর সব সময়েই অনুমতি চাইতে হবে যেমন অন্যান্য বড় মানুষ অনুমতি চেয়ে থাকে, তারা নিজস্ব লোকই হোক অথবা অপর লোকই হোক।

ঘোষিত হচ্ছেঃ বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ তারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্যে অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মত তাদের পর্দার দরকার নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটি وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ..... الخ (২৪ ঃ ৩১) এই আয়াতটি হতে স্বতন্ত্র।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্যে বুরকা এবং চাদর নামিয়ে দিয়ে শুধু দো-পাট্টা এবং জামা ও পায়জামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কিরআতও اَنْ يَّضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ এরূপই বটে। এর দ্বারা দো-পাট্টার উপরের চাদরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুড়ী স্ত্রীলোকেরা যখন মোটা, চওড়া দো-পাট্টা পরে থাকবে তখন ওর উপরে অন্য চাদর রাখা জরুরী নয়। কিন্তু এর দ্বারাও যেন সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়।

স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এই ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ তোমাদের জন্যে সাজ-সজ্জা অবশ্যই বৈধ, কিন্তু এটা যেন অপর পুরুষদের চক্ষু ঠাণ্ডা করার জন্যে না হয়।"

হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর স্ত্রী খুবই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর গোলামের দ্বারা তাঁর মাথায় মেহেদী লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ "আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার পুরুষদের প্রতি কোন আকর্ষণই নেই।"

শেষে মহান আল্লাহ বলেনঃ (চাদর না নেয়া তো এরূপ বুড়ী স্ত্রীলোকদের জন্যে জায়েয বটে, কিন্তু) এটা হতে তাদের বিরত থাকাই (অর্থাৎ বুরকা ও চাদর ব্যবহার করাই) তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬১। অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রুগ্নের জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতৃগৃহে, মাতৃগৃহে, ভ্রাতাদের গৃহে, ভগ্নিদের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা ঐ সব গৃহে যার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর

٦١- لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً

নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র; এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।	مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

এই আয়াতে যে দোষ না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত আতা (রঃ) প্রমুখ গুরুজনতো বলেন যে, এর দ্বারা অন্ধ ও খোঁড়াদের জিহাদে যোগদান না করা বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরায়ে আল-ফাত্হ্তে রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের লোক যদি জিহাদে গমন না করে তবে তাদের শরীয়ত সম্মত ওজর থাকার কারণে তাদের কোন অপরাধ হবে না। সূরায়ে বারাআতে রয়েছেঃ "যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসলে তুমি বলেছিলেঃ তোমাদের জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্য জনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" তাহলে এই আয়াতে তাদের জন্যে অনুমতি রইলো যে, তাদের কোন অপরাধ নেই।

কতকগুলো লোক ঘৃণা করে তাদের সাথে খেতে বসতো না। শরীয়ত এসব অজ্ঞতাপূর্ণ অভ্যাস উঠিয়ে দেয়। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ এইরূপ লোকদেরকে নিজেদের পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয়দের নিকট পৌঁছিয়ে দিতো, যেন তারা সেখানে আহার করে। এ লোকগুলো এটাকে দূষণীয় মনে করতো যে, তাদেরকে অপরের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তার ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির বাড়ী যেতো এবং স্ত্রীলোকেরা কোন খাদ্য তার সামনে হাযির করতো তখন সে তা খেতো না এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ীর মালিক তো নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেয়ার অনুমতি দেন। এটা যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের জন্যেও কোন দোষ নেই, এটা তো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলোর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এই হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ীর হুকুমও এটাই, যদিও শব্দে এর বর্ণনা

দেয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এই আয়াত দ্বারাই দলীল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, পুত্রের মাল পিতার মালেরই স্থলবর্তী। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার (-ই মালিকানাধীন)।" আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একের খাওয়া পরা অপরের উপর ওয়াজিব। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই।

আল্লাহ্ পাকের 'যার চাবী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' -এই উক্তি দ্বারা গোলাম ও প্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের মাল হতে প্রয়োজন হিসেবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন জিহাদে গমন করতেন তখন প্রত্যেকেরই মনের বাসনা এটা হতো যে, সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যদি যেতে পেতো! যাওয়ার সময় তারা নিজেদের বিশিষ্ট বন্ধুদেরকে চাবি দিয়ে যেতো এবং তাদেরকে বলে যেতোঃ "প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের মাল থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম।" কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে আমানতদার মনে করে এবং এই মনে করে যে, তারা হয়তো খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। পানাহারের কোন জিনিসকে তারা স্পর্শই করতো না। তখন এই হুকুম নাযিল হয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যখন তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবে না এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবে না। কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ীতে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়াই তুমি তার খাদ্য হতে খেতে পারবে।"

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" (৪ঃ ২৯) এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করেনঃ "পানাহারের জিনিসগুলোও তো মাল, সুতরাং এটাও আমাদের জন্যে

হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে আহার করি।" কাজেই তাঁরা ওটা থেকেও বিরত হন। ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তাঁরা খারাপ মনে করতেন। কেউ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খেতেন না। এজন্যে আল্লাহ পাক এই হুকুমের মধ্যে দুটোরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতেও এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। বানু কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকতো, তথাপি সঙ্গে কাউকেও না পাওয়া পর্যন্ত খেতো না। সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতাযুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশী বরকতও রয়েছে।

ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না (এর কারণ কি?)।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ " সম্ভবতঃ তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাকো। তোমরা খাদ্যের উপর একত্রিত হও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বরকত দেয়া হবে।"[১]

হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সবাই একত্রিতভাবে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা, বরকত জামাআতের উপর রয়েছে।"[২]

এরপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছেঃ যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ "যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলার শেখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে।"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইবনে তাঊস (রঃ) বলেনঃ "তোমাদের যে কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে যেন বাড়ীর লোকদেরকে সালাম দেয়।"

হযরত আতা (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "এটা কি ওয়াজিব?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "কেউ যে এটাকে ওয়াজিব বলেছেন তা আমার জানা নেই। তবে আমি এটা খুবই পছন্দ করি যে, যখনই তোমরা বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তো এটা কখনো ছাড়িনি। তবে কোন সময় ভুলে গিয়ে থাকি। সেটা অন্য কথা।"

মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ "যখন মসজিদে যাবে তখন বলবেঃ اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যখন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে সালাম দিবে এবং যখন এমন কোন বাড়ীতে যাবে যেখানে কেউই নেই তখন বলবেঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ 'আমাদের উপর ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এটাই হুকুম দেয়া হচ্ছে। এইরূপ সময়ে তোমাদের সালামের জবাব আল্লাহর ফেরেশতারা দিয়ে থাকেন।"

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "হে আনাস (রাঃ)! তুমি পূর্ণভাবে অযু কর, তোমার বয়স বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকেই সালাম দেবে, এর ফলে তোমার পুণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোককে সালাম দেবে, তাহলে তোমার বাড়ীর কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। চাশতের নামায পড়তে থাকবে, তোমাদের পূর্ববর্তী দ্বীনদার লোকদের এই নীতিই ছিল। হে আনাস (রাঃ)! ছোটদেরকে স্নেহ করবে এবং বড়দেরকে সম্মান করবে, তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ ও পবিত্র। অর্থাৎ এটা হলো দু'আয়ে খায়ের যা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা কল্যাণময় ও পবিত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি তাশাহহুদ তো আল্লাহর কিতাব হতেই গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছিঃ

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" সুতরাং নামাযের তাশাহ্হুদ হলোঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ 'কল্যাণময় অভিবাদন ও পবিত্র সালাত আল্লাহর জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (হে নবী সঃ)! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর নামাযী ব্যক্তি নিজের জন্যে দু'আ করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।"[১] আবার সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই মারফূ'রূপে যা বর্ণিত আছে তা এর বিপরীত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং জ্ঞান লাভ কর।

٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

৬২। তারাই মুমিন যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনে এবং রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ এবং তাঁর

১. এটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

রাসূল (সঃ)-এ বিশ্বাসী; অতএব, তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আরো একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাকো, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করো। বিশেষ করে যখন কোন সমাবেশ হবে এবং কোন জরুরী বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন জুমআর নামায, ঈদের নামায, কোন জামাআত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এদিক-ওদিক যাবে না। পূর্ণ মুমিনের এটাও একটা নিদর্শন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে যাবে তখন সে যেন মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে তখনো যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।

٦٣- لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩। রাসূল (সঃ)-এর আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি।

হযরত যহহাক (রঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)!' এবং 'হে আবুল কাসেম (সঃ)!' বলে আহ্বান করতো, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বেআদবী হতে নিষেধ করে দেন। তাদেরকে তিনি বলেনঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাম ধরে ডাকো না। বরং 'হে আল্লাহর নবী (সঃ)!' বা 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)!' এই বলে ডাকবে। তাহলে তাঁর বুযর্গী, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও এই আয়াতের মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ!" রাইনা (হে নির্বোধ) বলো না, এবং 'উনযুর না' (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন!) বলো, আর শুনে রেখো, কাফিরদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (২ ঃ ১০৪) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ - اِنَّ الَّذِيْنَ

يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল তার সাথে সেইরূপ উচ্চ স্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যে পরিশোধিত করেছেন; তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো তবে তাই তাদের জন্যে উত্তম হতো; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম, দয়ালু।" (৪৯ঃ ২-৫)

সুতরাং এসব দ্বারা মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিখানো হয়েছে যে, তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি পূর্বে তো তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সাদকা করার হুকুম ছিল। এই আয়াতের একটি ভাবার্থতো এই হলো। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলোঃ রাসূল (সঃ)-এর দু'আকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দু'আর মত মনে করো না। তাঁর দু'আতো কবূল হবেই। সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নবী (সঃ)-কে কষ্ট দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বদদু'আ যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর পূর্ববর্তী বাক্যের তাফসীরে মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, জুমআর দিন খুৎবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই ভারী বোধ হতো। আর মসজিদে এসে যাওয়া এবং খুৎবা শুরু হয়ে যাবার পর কেউ নবী (সঃ)-এর অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারতো না। কারো বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন

হয়ে পড়লে সে নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইতো এবং তিনি তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা, খুৎবার সময় কথা বললে জুমআ বাতিল হয়ে যায়। তখন এই মুনাফিক আড়ে আড়েই দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়তো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, জামাআতে যখন এই মুনাফিক থাকতো তখন একে অপরের আড়ালে হয়ে পালিয়ে যেতো। আল্লাহর নবী (সঃ) হতে এবং তার কিতাব হতে সরে যেতো। জামাআতের সারি হতে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যেতো।

যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর আদেশের, তাঁর সুন্নাতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো তা ভাল। আর যদি সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য।"[১] প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেউই শরীয়তে মুহাম্মাদীর (সঃ) বিপরীত করে, তার অন্তরে কুফরী, নিফাক, বিদাআত ও মন্দের বীজ বপন করে দেয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়, হয়তো দুনিয়াতেই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করলো, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগলো। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরাবার চেষ্টা করলো, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।"[২]

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিমও (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

٦٤- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْاؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

৬৪। জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন; যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করতো; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের মালিক, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কার্যাবলীর জ্ঞাতা একমাত্র আল্লাহ। قَدْ يَعْلَمُ -এর قَدْ শব্দটি তাহকীক বা নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্যে এসেছে। যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছেঃ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا অন্য জায়গায় আছেঃ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ (৩৩ ঃ ১৮) আর এক আয়াতে রয়েছেঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ (৫৮ঃ ১) অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (৬ ঃ ৩৩) আর এক জায়গায় বলেছেনঃ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ الخ (২ঃ ১৪৪) ইত্যাদি। এই সমুদয় স্থানে قَدْ এসেছে فِعْل বা ক্রিয়ার تَحْقِيْق বা নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্যে। যেমন মুআযযিন বলে থাকেন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এখানেও قَدْ শব্দটি নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্যেই এসেছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যাতে ব্যাপৃত রয়েছো তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থাতেই থাকো না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাকো না কেন সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। বান্দাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ তিনি পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকো অথবা গোপনে গোপনে কিছু করো না কেন, আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। চুপি চুপি কথা এবং

উচ্চ স্বরের কথা সবই তাঁর কানে পৌঁছে যায়। সমস্ত প্রাণীর রিযকদাতা তিনিই। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অবস্থার খবর তিনিই রাখেন। প্রথম থেকেই সব কিছু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। জলে ও স্থলে অবস্থানরত সব কিছুর খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে সেটাও তাঁর অজানা থাকে না। যমীনের অন্ধকারের মধ্যে কোন দানা নেই এবং শুষ্ক ও সিক্ত এমন কোন জিনিস নেই যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এই বিষয়ের বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। যখন সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, ঐ সময় তাদের সামনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও পাপ পেশ করা হবে। তারা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত আমল দেখতে পাবে। আমলনামা তারা ভীত ও কম্পিতভাবে দেখবে এবং ওর মধ্যে তাদের সারা জীবনের কার্যাবলী দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সুরে বলবেঃ "এটা কেমন কিতাব যে, এতে বড় তো বড়ই এমনকি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন কিছুও বাদ পড়েনি!" যে যা করেছে তার সবই সেখানে বিদ্যমান পাবে। যেমন মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ

অর্থাৎ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে।" (৭৫ঃ ১৩) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থাৎ "আর হাযির করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; রবং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে হাযির পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না।" (১৮ ঃ ৪৯)

এজন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করতো। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা ঃ নূর এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ ফুরকান, মাক্কী   سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৭৭, রুকূ 'ঃ ৬)   (اٰيَاتُهَا : ٧٧، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًاۙ ○

১। কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে!

٢- الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ○

২। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত বা করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যাতে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব জনগণের উপর প্রকাশিত হয়। তাঁর এই করুণা এই যে, তিনি তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন কারীমকে স্বীয় বান্দা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।

সূরায়ে কাহাফের শুরুতেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা এই বিশেষণ দ্বারাই বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি নিজের সত্তাকে কল্যাণময় বলে বর্ণনা করেছেন।

এখানে মহান আল্লাহ نَزَّلَ ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বার বার বেশী বেশী করে অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ "যে কিতাব তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর এবং যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে ইতিপূর্বে।" (৪ ঃ ১৩৬) সুতরাং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে اَنْزَلَ এবং এই শেষ কিতাবকে (কুরআনকে) نَزَّلَ দ্বারা বর্ণনা

করেছেন। এটা এ কারণেই যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো এক সাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কুরআন কারীম প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে। কখনো কয়েকটি আয়াত, কখনো কয়েকটি সূরা এবং কখনো কিছু আহকাম অবতীর্ণ হতে থাকে। এতে বড় এক নিপুণতা এই ছিল যে, লোকের উপর ওর প্রতি আমল কঠিন ও কষ্টকর না হয়। তারা যেন ওগুলো ভালভাবে মনে রাখতে পারে। আর মেনে নেয়ার জন্যে যেন তাদের অন্তর খুলে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যেই বলেনঃ "কাফিররা বলে– সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মযবূত করবার জন্যে এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি। তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।" এখানে এই আয়াতে এর নাম ফুরকান রাখার কারণ এই যে. এটা সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্যকারী। এর দ্বারা ভাল ও মন্দ এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়।

কুরআন কারীমের এই পবিত্র বিশেষণ বর্ণনা করার পর যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি বিশিষ্টভাবে তাঁরই ইবাদতে লেগে থাকেন। তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। এটাই হলো সবচেয়ে বড় গুণ। এজন্যেই বড় বড় নিয়ামতের বর্ণনার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই বিশেষণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মি'রাজ সম্পর্কীয় ঘটনায় তিনি বলেনঃ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا

অর্থাৎ "পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।" (১৭ ঃ ১) অন্য জায়গায় দু'আর স্থলে বলেনঃ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ। অর্থাৎ "এবং যখন আল্লাহর বান্দা (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) ইবাদতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়।" (৭২ঃ ১৯) এই বিশেষণই কুরআন কারীমের অবতরণ এবং নবী (সঃ)-এর নিকট বুযর্গ ফেরেশতার আগমনের মর্যাদার বর্ণনার সময় বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ এই পবিত্র গ্রন্থ মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ **করেছেন** যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন। এটা এমন **একটি কিতাব** যা সরাসরি হিকমত ও হিদায়াতে পূর্ণ। এই কিতাব বিশ্লেষিত

মর্যাদা সম্পন্ন, স্পষ্টভাবে বর্ণিত ও সুদৃঢ়। বাতিল এর আশে পাশেও আসতে পারে না। এটা বিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা দুনিয়ায় এর প্রচার চালিয়ে যান। তিনি প্রত্যেক লাল ও সাদাকে এবং দূরের ও কাছের লোকদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করেন। যারাই আকাশের নীচে ও পৃথিবীর উপরে রয়েছে তাদের সবারই তিনি রাসূল। যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি সমস্ত লাল ও সাদা মানুষের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" তিনি আরো বলেনঃ "আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলো আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। ওগুলোর মধ্যে একটি এই যে, আমার পূর্ববর্তী এক একজন নবী নিজ নিজ কওমের নিকট প্রেরিত হতেন। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছি। স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।" (৭ ঃ ১৫৮) অর্থাৎ আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণকারী এবং আমার উপর পবিত্র কিতাব অবতীর্ণকারী হলেন ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনের একক মালিক। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন– হও, আর তখনই তা হয়ে যায়। তিনিই মারেন, তিনিই জীবিত রাখেন। তাঁর কোন সন্তান নেই, কোন অংশীদার নেই। সবকিছুই তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই অধীনে লালিত পালিত। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, রূযীদাতা, মা'বূদ এবং প্রতিপালক তিনিই। তিনিই প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

৩– وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ○

৩। আর তারা তাঁর পরিবর্তে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করবার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

এখানে মুশরিকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ক্ষমতাবান এবং স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ মহান আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ইবাদত করছে যারা একটা মশাও সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাও আল্লাহর সৃষ্ট। তারা নিজেদেরও লাভ এবং ক্ষতির অধিকার রাখে না, অপরের লাভ ক্ষতি করা তো দূরের কথা। তারা নিজেদের জীবন মৃত্যুর মালিক নয় এবং পুনরায় জীবন লাভেরও ক্ষমতা রাখে না। তাহলে যারা তাদের উপাসনা করছে তাদের এগুলোর মালিক তারা কি করে হতে পারে? প্রকৃত কথা এটাই যে, এই সমুদয় কাজের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মারেন। তিনিই কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলূককে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। এ কাজ তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়। একজনকে সৃষ্টি করা ও সকলকে সৃষ্টি করা, একজনকে মৃত্যুর পরে জীবিত করা এবং সকলকে জীবিত করা তাঁর কাছে সমান। চোখের পলকে তাঁর হুকুম পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ-فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ-

অর্থাৎ "ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, এর সাথে সাথেই সমস্ত মৃত মাখলূক জীবিত হয়ে তাঁর সামনে এক বিরাট ময়দানে দাঁড়িয়ে যাবে।" (৭৯ ঃ ১৩-১৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ-

অর্থাৎ "এটা তো শুধু এক বিকট আওয়াজ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।" (৩৭ ঃ ১৯) আল্লাহ তা'আলা আরো এক জায়গায় বলেনঃ

اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ-

অর্থাৎ "এটা তো হবে শুধু এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।" (৩৬ ঃ ৫৩) সুতরাং তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত কামনা করি না। কারণ তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি এমনই যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, সমকক্ষ নেই, স্থলাভিষিক্ত নেই, উযীর নেই এবং তুলনা নেই। বরং তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ

৪। কাফিররা বলেঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; এইরূপে তারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।

٥- وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৫। তারা বলেঃ এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।

٦- قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৬। বলঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুশরিকদের একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন যা তার সত্তা সম্পর্কে ছিল। এখানে তিনি তাদের অন্য একটি অজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারা নবী (সঃ)-কে বলে- তুমি এই কুরআনকে অন্যদের সাহায্যবলে নিজেই বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এটা তাদের অত্যাচার ও মিথ্যামূলক কথা যা তারা নিজেরাও জানে। কিন্তু তাদের জানা কথারও বিপরীত কথা তারা বলছে।

কখনো কখনো তারা গলা উঁচু করে বলে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কাহিনীগুলো তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন এবং ঐগুলোই সকাল সন্ধ্যায় তাঁর মজলিসে পঠিত হয়। তাদের এটাও এমন একটা মিথ্যা কথা যে, এটা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা, শুধু মক্কাবাসী নয়, বরং দুনিয়া জানে যে, আমাদের নবী (সঃ) নিরক্ষর ছিলেন। না তিনি লিখতে জানতেন না পড়তে জানতেন। নবুওয়াতের পূর্বের চল্লিশ বছরের জীবন তিনি মক্কাবাসীদের

মধ্যেই কাটিয়েছেন। তাঁর এ জীবন তাদের মধ্যে এমনভাবে কেটেছে যে, তাঁর এ দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন একটিও ঘটনা ঘটেনি যার ফলে তাঁর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করা যেতে পারে। মক্কাবাসী তাঁর এক একটি গুণের উপর পাগল ছিল। তাঁর মধুর চরিত্র এবং উত্তম ব্যবহারে তারা এমনভাবে মুগ্ধ ছিল যে, তাঁকে তারা মুহাম্মাদ আমীন (সঃ) বলে অত্যন্ত স্নেহের সুরে আহ্বান করতো। কোন এমন অন্তর ছিল যাতে তিনি বাসা বাঁধেননি? কোন এমন চক্ষু ছিল যাতে তাঁর মর্যাদা প্রকাশিত হয়নি? কোন এমন সমাবেশ ছিল যেখানে তাঁর সম্পর্কে উত্তম আলোচনা হয়নি? কোন এমন লোক ছিল যে তাঁর বুযর্গী, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্থতা ও সততার উক্তিকারী ছিল না? অতঃপর তাঁকেই যখন মহান আল্লাহ উচ্চতম সম্মানে সম্মানিত করলেন, আসমানী অহীর তাঁকে আমীন বানানো হলো, তখন শুধু বাপ-দাদার রীতি-নীতি ও কু-প্রথা উঠে যেতে দেখে ঐ নির্বোধের দল তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে দেয় এবং তাঁর প্রতি নানারূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাঁর সম্পর্কে তারা নানারূপ মন্তব্য করে। কেউ তাঁকে কবি বলে, কেউ বলে যাদুকর এবং কেউ বলে পাগল। কি করে তারা তাদের বাপ-দাদাদের অজ্ঞতাপূর্ণ রীতি-নীতি ও কু-প্রথা ঠিক রাখতে পারে এই চিন্তাতেই তারা সদা নিমগ্ন থাকে। তারা এ চিন্তাও করতে থাকে যে, কোনক্রমেই যেন তাদের মিথ্যা ও বাজে উপাস্যদের পতাকা উল্টোমুখে পতিত না হয় এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ দুনিয়া আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় না হয়। এখন তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব দেয়া হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– এই কুরআন তো তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। যার থেকে এক অণু-পরিমাণ জিনিসও লুক্কায়িত নয়। এতে অতীতের যেসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তার সবই সত্য। ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবার বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলোও সত্য। যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা কিছু হবে সবই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি অদৃশ্যকে ঐ ভাবেই জানেন যেমন তিনি জানেন দৃশ্যকে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তাঁর এ কথা বলার কারণ হলো যাতে মানুষ তাঁর থেকে নিরাশ না হয়ে যায়। তারা যেন এ আশা করতে পারে যে, তারা যত কিছু অন্যায় ও দুষ্কার্য করুক না কেন, পরে যদি তারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ হতে তাওবা করতঃ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তিনি তাদের পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। এরূপ আশা পেয়ে হয়তো তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে এবং মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানী হবে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কতই না মহান ও দয়ালু যে, যারা তাঁর চরম অবাধ্য ও শত্রু, যারা তাঁর প্রিয় রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছে, তাদেরকেও তিনি নিজের সাধারণ করুণার দিকে আহ্বান করছেন! যারা তাঁকে মন্দ বলছে, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে খারাপ বলছে তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন এবং তাদের সামনে ইসলাম ও হিদায়াত পেশ করছেন! নিজের উত্তম কথাগুলো তাদেরকে বুঝাতে রয়েছেন! যেমন অন্য আয়াতে তিনি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদিতার বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করতঃ বলেন−

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ـ

অর্থাৎ "তারা কি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৫ঃ ৭৪) তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী নর-নারীদের বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।" (৮৫ ঃ ১০)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর এই দয়া ও দানের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, যারা তাঁর বন্ধুদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তাদেরকে তিনি তাওবা ও রহমতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। (এটা কত বড় দয়া ও সহনশীলতার পরিচায়ক)!"

৭। তারা বলেঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সতর্ককারীরূপে?

٧− وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

৮- اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○

৮। তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? সীমা-লংঘকারীরা আরো বলেঃ তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।

৯- اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ○ع

৯। দেখো, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।

১০- تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ○

১০। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু– উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

১১- بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۣ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ○ج

১১। কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি।

১২- اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ○

১২। দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার।

১৩- وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ○ط

১৩। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে।

১৪। তাদেরকে বলা হবে– আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো।	١٤- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ○

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আরো বোকামির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাতের অস্বীকার করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে– তিনি পানাহারের মুখাপেক্ষী কেন? কেনই বা তিনি ব্যবসা ও লেনদেনের জন্যে বাজারে গমনাগমন করেন? তাঁর সাথে কোন ফেরেশতাকে কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? তাহলে তিনি তাঁকে সত্যায়িত করতেন, জনগণকে তাঁর দ্বীনের দিকে আহ্বান করতেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে সতর্ক করতেন?

ফিরাউনও একথাই বলেছিলঃ

فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ-

অর্থাৎ “তার উপর সোনার কংকন কেন নিক্ষেপ করা হয়নি? কিংবা তার সাহায্যের জন্যে আকাশ থেকে কেন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়নি?” (৪৩ ঃ ৫৩)

সমস্ত কাফিরের অন্তর একই বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগের কাফিররাও বলেছিল– তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? নিশ্চয়ই এ সবকিছু প্রদান করা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ। কিন্তু সাথে সাথে এগুলো না দেয়ার মধ্যে নিপুণতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে।

এই যালিমরা মুসলমানদেরকেও বিভ্রান্ত করতো। তারা তাদেরকে বলতোঃ ‘তোমরা এমন একজন লোকের অনুসরণ করছো যার উপর কেউ যাদু করেছে।’ তারা কতই না ভিত্তিহীন কথা বলছে! কোন একটি কথার উপর তারা স্থির থাকতে পারছে না। তারা কথাকে এদিক-ওদিক নিয়ে যাচ্ছে। কখনো বলছে যে, কেউ তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনো তাঁকে যাদুকর বলছে, কখনো বলছে যে, তিনি একজন কবি, কখনো বলছে যে, তাঁর উপর জ্বিনের আসর হয়েছে, কখনো তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছে, আবার কখনো বলছে যে, তিনি একজন পাগল। অথচ তাদের এসবই বাজে ও ভিত্তিহীন কথা। আর তারা যে ভুল কথা বলছে এটা এর দ্বারাও প্রকাশমান যে, স্বয়ং তাদের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী কথা রয়েছে। কোন

একটি কথার উপর মুশরিকদের আস্থা নেই। তারা একবার একটি কথা বানিয়ে বলছে, তারপর ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আর একটি কথা বানাচ্ছে এবং আবার ওটাকেও ছাড়ছে। একটি কথার উপর তারা অটল থাকতে পারছে না। সঠিক ও সত্য তো এটাই হয় যে, এ ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু– উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ।

পাথর দ্বারা নির্মিত ঘরকে আরবের লোকেরা قَصْرٌ বলে থাকে, তা বড়ই হোক বা ছোটই হোক।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়েছিলঃ "তুমি যদি চাও তবে যমীনের ধন-ভাণ্ডার এবং এর চাবী আমি তোমাকে দিয়ে দিই। আর তোমাকে দুনিয়ার এত বড় মালিক করে দিই যে, এত বড় মালিকানা আমি তোমার পূর্বে কোন নবীকে দিইনি এবং তোমার পরে আর কাউকেও প্রদান করবো না। সাথে সাথে তোমার পারলৌকিক সমস্ত নিয়ামত ঠিকমতই থাকবে।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "সব কিছু আমার জন্যে আখিরাতেই জমা করা হোক (দুনিয়ায় আমার এগুলোর দরকার নেই)।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ এরা এসব যা কিছু বলছে তা শুধু গর্ব, অবাধ্যতা, জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েই বলছে। এ নয় যে, তারা যা কিছু বলছে তা হয়ে গেলে তারা মুসলমান হয়ে যাবে। বরং এরপরেও তারা কোন কৌশল বের করবে। তাদের অন্তরে তো এটা বদ্ধমূল রয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবেই না। আর এরূপ লোকদের জন্যেই আমি জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। এটা তাদের সহ্যের বাইরে। দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার। জাহান্নাম ঐ দুষ্ট লোকদেরকে দেখে ক্রোধে দাঁতে আঙ্গুন কাটবে এবং ভীষণ গর্জন ও চীৎকার করবে যে, কখন সে ঐ কাফিরদেরকে গ্রাস করবে। আর কখন সে ঐ যালিমদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

১. এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হাবীব ইবনে আবি সাবিত (রঃ) হতে এবং তিনি খাইসুমা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

إِذَآ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ تَفُورُ- تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ

অর্থাৎ "যখন তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে।" (৬৭ঃ৭-৮)

নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার নাম দিয়ে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজের পিতা-মাতা বলে, যে গোলাম নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিজের মনিব বলে পরিচয় দেয় তারা যেন জাহান্নামের দুই চক্ষুর মাঝে নিজেদের বাসস্থান ঠিক করে নেয়।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জাহান্নামেরও কি দুই চক্ষু রয়েছে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "তুমি কি আল্লাহর কালামের নিম্নের আয়াতটি শুননি?"

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيدٍ

অর্থাৎ "যখন ওটা (জাহান্নাম) তাদেরকে দূর স্থান হতে দেখবে।"[১]

হযরত আবূ ওয়ায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে বের হই। আমাদের সাথে হযরত রাবী ইবনে খাইসুমও (রাঃ) ছিলেন। পথে একটি কামারের দোকান দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে যান। সেখানে লোহাকে আগুনে গরম করা হচ্ছিল তাই তিনি দেখতে ছিলেন। হযরত রাবী (রাঃ)-এর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আল্লাহর শাস্তির ছবি তাঁর চোখের সামনে প্রকাশিত হলো। তাঁর অবস্থা এমনই হলো যে, যেন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। এরপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ফুরাতের তীরে গেলেন। সেখানে তিনি একটি চুল্লী দেখলেন যার মধ্যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيدٍ الخ (অর্থাৎ দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাঁরা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার)। এটা শোনামাত্রই হযরত রাবী (রাঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। খাটের উপর উঠিয়ে নিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পার্শ্বে বসে থাকেন এবং তাঁকে দেখা শোনা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরেনি।"[২]

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামের দিকে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নাম ভীষণ চীৎকার করবে এবং ক্রোধে এমনভাবে ফেটে পড়বে যে হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতা সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, কোন কোন লোককে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নাম জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে যাবে। তখন রহমান (দয়ালু আল্লাহ) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমার কি হলো?" উত্তরে জাহান্নাম বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! এ তো দু'আয় আপনার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতো এবং আজও সে আশ্রয় প্রার্থনা করতে রয়েছে।" একথা শুনে তার প্রতি আল্লাহর দয়া হবে এবং তিনি নির্দেশ দিবেনঃ "তাকে ছেড়ে দাও।" আরও কতক লোককে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সম্পর্কে তো এরূপ ধারণা আমাদের ছিল না।" আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমাদের কিরূপ ধারণা ছিল?" তারা উত্তরে বলবেঃ "আমাদের ধারণা এটাই ছিল যে, আপনার রহমত আমাদেরকে ঢেকে নেবে, আপনার করুণা আমাদের অবস্থার অনুকূলে হবে এবং আপনার প্রশস্ত রহমত আমাদেরকে স্বীয় আঁচলে জড়িয়ে ফেলবে।" আল্লাহ তা'আলা তাদের আশাও পুরো করবেন এবং (ফেরেশ্তাদেরকে) নির্দেশ দিবেনঃ "আমার এই বান্দাদেরকেও ছেড়ে দাও।"

আরো কিছু লোককে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসা হবে। তাদেরকে দেখা মাত্রই জাহান্নাম ক্রোধে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসবে এবং এমনভাবে ক্রোধে ফেটে পড়বে যে, হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতা ভীষণভাবে আতংকিত হবে।

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নাম যখন ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং ভীষণ চীৎকার শুরু করে দেবে ও কঠিন উত্তেজিত হয়ে উঠবে তখন সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা এবং মর্যাদা সম্পন্ন নবীগণ কম্পিত হবেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম খলীলও (আঃ) হাঁটুর ভরে পড়ে যাবেন এবং বলতে থাকবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আজ আমি আপনার কাছে শুধু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করছি। আর কিছুই চাচ্ছি না।"

এই লোকদেরকে জাহান্নামের অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান দিয়ে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হবে যেমনভাবে বর্শাকে ছিদ্রে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। অন্য রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং তাঁর নিম্নরূপ কথা বলা বর্ণিত আছেঃ "যেমনভাবে পেরেককে দেয়ালে অতি কষ্টে গেড়ে দেয়া হয়

তেমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ঠুসিয়ে দেয়া হবে।" ঐ সময় তারা শৃংখলিত অবস্থায় থাকবে এবং ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করবে। তাদেরকে তখন বলা হবে– আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না, বরং বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বপ্রথম ইবলীসকে জাহান্নামের পোশাক পরানো হবে। সে ওটা তার কপালের উপর রাখবে এবং পিছন হতে তার সন্তানদেরকে টানতে টানতে নিয়ে চলবে, আর মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতঃ ফিরতে থাকবে। তার সাথে সাথে তার সন্তানরাও হায়! হায়! করবে এবং ধ্বংস ও মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে– "আজ তোমরা একবারের জন্যে ধ্বংস কামনা করো না, বরং বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাকো।"[১]

ثُبُوْر শব্দের ভাবার্থ হলো মৃত্যু, ধ্বংস, ক্ষতি, দুর্ভাগ্য ইত্যাদি। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেছিলেনঃ

وَاِنِّیْ لَاَ ظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا

অর্থাৎ "হে ফিরাউন! আমি তো মনে করি যে, তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তই হবে।" (১৭:১০২)

১৫। তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল।

١٥- قُلْ اَذٰلِكَ خَیْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِیْرًا ○

১৬। সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে, এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

١٦- لَهُمْ فِیْهَا مَا یَشَآءُوْنَ خٰلِدِیْنَ ؕ كَانَ عَلٰی رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ○

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঐ দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টেনে আনা হবে এবং মাথার ভরে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে। ঐ সময় তারা শৃংখলিত থাকবে। তারা থাকবে অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে, যেখান থেকে না তারা ছুটতে পারবে, না নড়তে পারবে, না পালাতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর– এটাই কি শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত শ্রেয়, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা পাপকর্ম হতে বেঁচে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখেছে, আজ তারা ওর বিনিময়ে প্রকৃত বাসস্থানে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ জান্নাতে। সেখানে রয়েছে তাদের চাহিদামত নিয়ামতরাজি, চিরস্থায়ী ভোগ্যবস্তু এবং এমন আনন্দের জিনিস যা কখনো শেষ হবার নয়। তথায় আছে সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য, উত্তম বিছানাপত্র, ভাল ভাল যানবাহন, সুন্দর সুন্দর পোশাক, চমৎকার বাসস্থান, সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিতা সুলোচনা হূরগণ এবং আরাম ও শান্তিদায়ক দৃশ্য। এগুলো চোখে দেখা তো দূরের কথা, কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। এগুলো কমে যাবার, খারাপ হওয়ার, ভেঙ্গে যাবার এবং শেষ হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। তারা সেখান হতে কখনো বহিষ্কৃত হবে না। তারা সেখানে চিরন্তন উত্তম জীবন, সীমাহীন রহমত এবং চিরস্থায়ী সম্পদ লাভ করবে। এ সবগুলো হলো প্রতিপালকের ইহসান ও ইনআম, যা তারা লাভ করেছে এবং যেগুলো তাদের প্রাপ্য ছিল। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি যা তিনি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এটা পূর্ণ হবেই। এটা পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব এবং এটা ভুল হওয়াও সম্ভব নয়। তাঁর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যে প্রার্থনা কর। তাঁর কাছে জান্নাত চাও এবং তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দাও। এটাও তাঁর অনুগ্রহ যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার মুমিন বান্দাদের সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করুন এবং তাদেরকে জান্নাতে আদনে প্রবেশ করিয়ে দিন।" কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দারা বলবেনঃ "হে বিশ্বপ্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে আমল করেছিলাম। আজ আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।"

এখানে প্রথমে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর প্রার্থনার পরে জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরায়ে সফফাতে জান্নাতীদের

সম্পর্কে আলোচনা করতঃ প্রার্থনার পরে জাহান্নামীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ "আপ্যায়নের জন্যে এটাই শ্রেয়, না যাককূম বৃক্ষ? যালিমদের জন্যে আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

১৭। এবং যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে, তিনি সেদিন জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

١٧- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَانْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

১৮। তারা বলবেঃ আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না; আপনিই তো এদেরকে ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ- সম্ভার দিয়েছিলেন; পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।

١٨- قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

১৯। আল্লাহ (মুশরিকদেরকে) বলবেনঃ তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাবো।

١٩- فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ○

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যেসব মা'বূদের ইবাদত করতো, কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের সামনে শাস্তি প্রদান ছাড়াও মৌখিকভাবেও তিরস্কার করা হবে, যাতে তারা লজ্জিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ), হযরত উযায়ের (আঃ) এবং ফেরেশতামণ্ডলী, যাদের যাদের উপাসনা করা হতো তাঁরা সবাই সেদিন বিদ্যমান থাকবেন এবং সমাবেশে ইবাদতকারীরাও হাযির থাকবে। ঐ সময় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ উপাস্যদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনা করতে বলেছিলে, না তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই তোমাদের ইবাদত করতে শুরু করে দিয়েছিল?" হযরত ঈসা (আঃ)-কেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে– তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর? সে বলবেঃ আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার আমার অধিকার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; আপনি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। (শেষ পর্যন্ত)।"

তদ্রূপ এসব উপাস্য যাঁদের মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করতো এবং তাঁরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট, উত্তরে বলবেনঃ "কোন

মাখলূকের, আমাদের ও তাদের জন্যে এটা শোভনীয় ছিল না যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কখনো তাদেরকে শিরকের শিক্ষা দিইনি। তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই অন্যদের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। আমরা তাদের থেকে এবং তাদের উপাসনা থেকে অসন্তুষ্ট। আমরা তাদের ঐ শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমরা তো নিজেরাই আপনার উপাসনাকারী। সুতরাং আমাদের পক্ষে উপাস্যের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া কী করে সম্ভব? আমরা তো মোটেই এর যোগ্যতা রাখতাম না। আপনার সত্তা এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র যে, কেউ আপনার অংশীদার হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰؤُلَاۤءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ـ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ـ

অর্থাৎ "যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন– এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো? তারা বলবে– আমরা আপনার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" (৩৪ ঃ ৪০-৪১)

نَتَّخِذَ-এর দ্বিতীয় পঠন نُتَّخَذَ-ও রয়েছে। অর্থাৎ 'আমাদের জন্যে এটা উপযুক্ত ছিল না যে, লোকেরা আমাদের উপাসনা করতে শুরু করে দেয় এবং আপনার ইবাদত পরিত্যাগ করে। কেননা, আমরা তো আপনার দ্বারের ভিখারী।' দুই অবস্থাতেই ভাবার্থ কাছাকাছি একই।

তাদের বিভ্রান্তির কারণ আমরা এটাই বুঝি যে, তারা বয়স পেয়েছিল, তারা পানাহারের বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করেছিল, কাজেই তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি রাসূলদের মাধ্যমে যে উপদেশাবলী তাদের নিকট পৌঁছেছিল সেগুলোও তারা ভুলে বসেছিল। তারা আপনার উপাসনা ও তাওহীদ হতে সরে পড়েছিল। তারা এসব হতে ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। তাই তারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের সর্বনাশ ঘটে। بُوْرًا শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্তই বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে বলবেনঃ এখন তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তোমরা তো তাদেরকে

নিজের মনে করে এই বিশ্বাস রেখে তাদের উপাসনা শুরু করে দিয়েছিলে যে, তাদের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। কিন্তু আজ তো তারা তোমাদেরকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তোমাদের থেকে পৃথক হচ্ছে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ـ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহ ব্যতীত এমন মা'বূদকে আহবান করে যে কিয়ামতের দিন তার আহ্বানে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান হতে উদাসীন থাকবে। যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা (উপাস্যরা) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের উপাসনাকে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করবে।" (৪৬ঃ ৫-৬) সুতরাং কিয়ামতের দিন এই মুশরিকরা না নিজেদের থেকে আল্লাহর শাস্তি দূর করতে পারবে, না নিজেদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে, না কাউকেও নিজেদের সাহায্যকারীরূপে প্রাপ্ত হবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাবো।

২০। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করতো ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করতো। হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ

٢٠- وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ط وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط

اَتَصۡبِرُوۡنَ ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيۡرًا ۝ ع

করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কাফিররা যে এ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, নবী-রাসূলদের পানাহার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কি প্রয়োজন? তাদের একথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেনঃ পূর্ববর্তী সব নবীই মনুষ্যজনিত প্রয়োজন রাখতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুই করতেন। এগুলো নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। হ্যাঁ, তবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাঁদেরকে ঐ পবিত্র গুণাবলী, উত্তম চরিত্র, ভাল কথা, পছন্দনীয় কাজ, প্রকাশ্য দলীল এবং উন্নতমানের মু'জিযা দান করেন যেগুলো দেখে প্রত্যেক জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাঁদের নবুওয়াত ও সত্যবাদিতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত আরো রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡقُرٰی

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যত নবী পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই শহরবাসী মানুষই ছিল।" (১২ ঃ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا جَعَلۡنٰهُمۡ جَسَدًا لَّا یَاۡكُلُوۡنَ الطَّعَامَ

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট বানাইনি যে, তারা খাদ্য খাবে না।" (২১ ঃ ৮)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি যাতে অনুগত ও অবাধ্যের পার্থক্য প্রকাশিত হয় এবং ধৈর্যশীল ও অধৈর্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তোমার প্রতিপালক সবকিছুই দেখেন এবং সবকিছু জানেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। যেমন তিনি বলেনঃ

اَللّٰهُ اَعۡلَمُ حَیۡثُ یَجۡعَلُ رِسَالَتَهٗ

অর্থাৎ "রিসালাত প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তি কে তা আল্লাহই খুব ভাল জানেন।" (৬ ঃ ১২৪) হিদায়াতের হকদার কে সেটাও তাঁরই জানা আছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো বান্দাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। এই জন্যেই নবীদেরকে

তিনি সাধারণ অবস্থায় রাখেন। অন্যথায় যদি তাঁদেরকে তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করতেন তবে ধন-মালের লোভে বহু লোক তাঁর অনুগামী হয়ে যেতো, ফলে তখন সত্য ও মিথ্যা এবং খাঁটি ও নকল মিশ্রিত হয়ে যেতো।

সহীহ মুসলিমে হযরত আইয়াম ইবনে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি স্বয়ং তোমাকে এবং তোমার কারণে অন্যান্য লোকদেরকে পরীক্ষাকারী।"

মুসনাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি চাইলে আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বত চালাতেন।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-কে রাসূল ও বাদশাহ হওয়ার অথবা রাসূল ও বান্দা হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াই পছন্দ করেন।

অষ্টাদশ পারা সমাপ্ত

২১। যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলেঃ আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।

٢١- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰۤئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ○

২২। যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবেঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর।

٢٢- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰۤئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○

২৩। আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করবো।

٢٣- وَقَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا ○

২৪। সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

٢٤- اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ○

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বলে– আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন? অর্থাৎ রিসালাত দিয়ে ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হয় না যেমন নবীদের উপর

অবতীর্ণ করা হয়েছিল? যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ "তারা বলে– আমরা কখনো ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না আমাদেরকে দেয়া হবে যা দেয়া হয়েছিল রাসূলদেরকে।" (৬ ঃ ১২৪) আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰۤئِكَةُ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ আমরা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চাই, তাহলে তাঁরা আমাদেরকে সংবাদ দেবেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। যেমন তাদের উক্তিঃ

اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ قَبِيْلًا

অর্থাৎ "অথবা তুমি আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।" (১৭ ঃ ৯২) সূরায়ে সুবহানাল্লাযীতে এর তাফসীর গত হয়েছে।

এ জন্যেই তারা বলেঃ অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।" (৬ঃ ১১১)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবেঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। অর্থাৎ যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না সেদিনই তাদের জন্যে উত্তম। আর যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন তাদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না। এটা বাস্তবে রূপলাভ করবে কিয়ামতের দিনে হাযিরীর

সময়, যখন ফেরেশতামণ্ডলী তাদেরকে জাহান্নাম ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধের সুসংবাদ প্রদান করবেন। ঐ সময় ফেরেশতারা কাফিরকে তার প্রাণবায়ু বের হবার সময় বলবেনঃ "হে কলুষিত দেহের মধ্যে অবস্থিত কলুষিত আত্মা! তুমি বের হয়ে এসো! বের হয়ে এসো অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানির দিকে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রছায়ার দিকে।" তখন ঐ আত্মা বের হতে অস্বীকার করবে এবং দেহের মধ্যে লুকাতে থাকবে। সুতরাং তারা ওকে প্রহার করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ "যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের মৃত্যু ঘটাবে তখন তারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করবে।" (৮ ঃ ৫০) তিনি আর এক আয়াতে বলেনঃ

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ "যদি তুমি দেখতে যখন যালিমরা মৃত্যুর কাঠিন্যের মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বিস্তারকারী হবে।" (৬ ঃ ৯৩) অর্থাৎ হাত বিস্তার করে তাঁরা তাদেরকে মারতে থাকবেন। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কারীমায় বলেনঃ সেদিন অপরাধীদের জন্যে সুসংবাদ থাকবে না।

এটা মুমিনদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদেরকে সেই দিন ফেরেশতারা কল্যাণের ও আনন্দ লাভের সুসংবাদ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ـ نَحْنُ أَوْلِيٰؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ـ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ـ

অর্থাৎ "যারা বলে– আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে– তোমরা ভীত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও।

আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।" (৪১ ঃ ৩০-৩২)

সহীহ হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতারা মুমিনের আত্মাকে বলেনঃ "পবিত্র দেহের মধ্যে অবস্থিত হে পবিত্র আত্মা! বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও এমন প্রতিপালকের দিকে যিনি রাগান্বিত নন।" সূরায়ে ইবরাহীমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ঐ উক্তির তাফসীরে বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ ـ

অর্থাৎ "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"(১৪ ঃ ২৭) অন্যেরা বলেছেন যে, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰۤئِكَةَ لَا بُشْرٰى দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রঃ), যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেছেন। তবে এ কথা এবং পূর্বের কথা পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ এই দুই দিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন ও কিয়ামতের দিন মুমিন ও কাফিরদের জন্যে তো জাজ্বল্যমান হবে। ফেরেশতারা মুমিনদেরকে করুণা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিবেন এবং কাফিরদেরকে সংবাদ দিবেন ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততার। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই দিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর সেই দিন তারা বলবেঃ রক্ষা কর, রক্ষা কর। অর্থাৎ ফেরেশতারা কাফিরদেরকে বলবেনঃ আজকে তোমাদের জন্যে মুক্তি ও পরিত্রাণ হারাম করে দেয়া হয়েছে। حَجْرٌ শব্দের মূল হচ্ছে مَنْعٌ অর্থাৎ নিষেধ করা বা বিরত রাখা। এর থেকেই বলা হয় حَجَرَ الْقَاضِىْ عَلٰى فُلَانٍ অর্থাৎ অমুকের উপর বিচারক **নিষিদ্ধ** করেছেন, যখন তিনি তার উপর খরচ নিষিদ্ধ করেন, হয়তো বা দারিদ্রের **কারণে** অথবা নির্বুদ্ধিতার কারণে বা বাল্যাবস্থার কারণে অথবা এ ধরনের অন্য **কোন** কারণে। আর এটা হতেই বায়তুল্লাহ শরীফের (কালো) পাথরের নাম حَجْرٌ

(أَسْوَدُ) রাখা হয়েছে। কেননা, ওর মধ্যে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ওর পিছন দিয়ে তাওয়াফ করার নির্দেশ রয়েছে। এই একই কারণে عَقْل (জ্ঞান)-কে حَجَر বলা হয়। কেননা, এই জ্ঞান জ্ঞানীকে এমন কিছু গ্রহণ করা হতে বিরত রাখে যা তার পক্ষে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মোটকথা, يَقُوْلُوْنَ-এর মধ্যে যে ضَمِيْر বা সর্বনাম রয়েছে ওটা مَلٰئِكَة (ফেরেশতাগণ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এটা মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রাঃ), হাসান (রঃ), যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ), আতিয়্যা আওফী (রঃ), আতা খুরাসানী (রঃ) এবং খাসীফ (রঃ)-এর উক্তি। ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে পছন্দ করেছেন।

وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا-এই উক্তি সম্পর্কে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, মুত্তাকীদেরকে যে জিনিসের সুসংবাদ দেয়া হবে সে জিনিসের সুসংবাদ কাফির ও অপরাধীদেরকে দেয়া হারাম করে দেয়া হবে, এর অর্থ এটাই।[১]

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ইবনে জুরায়েজ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ এটা হবে মুশরিকদের কথা। মহান আল্লাহ বলেনঃ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ (যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে), অর্থাৎ তারা ফেরেশতাদের হতে আশ্রয় কামনা করবে। আরববাসীদের এটা নিয়ম ছিল যে, যখন তাদের কারো উপর কোন বিপদ আসতো বা তারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতো তখন তারা حِجْرًا مَّحْجُوْرًا একথা বলতো। একথা বলার কারণ ও যৌক্তিকতা থাকলেও এটা বাকরীতি ও রচনাভঙ্গীর বিপরীত কথা। তা ছাড়া জমহূর উলামা এর বিপক্ষে দলীল এনেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করবো। এটা কিয়ামতের দিন হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ভালমন্দ কার্যের হিসাব গ্রহণ করবেন। ঐ সময় তিনি খবর দিবেন যে, এই মুশরিকরা তাদের যে কৃতকর্মগুলোকে তাদের মুক্তির মাধ্যম মনে করেছিল সেগুলো সবই বিফলে গেছে। আজ ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবে না। এটা এই কারণে যে,

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ওগুলো শরীয়তের শর্তকে হারিয়ে ফেলেছে। শর্ত ছিল যে, ওগুলোতে আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়তের অনুগামী হতে হবে। সুতরাং যে আমলে আন্তরিকতা থাকবে না এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী যে আমল হবে না তা বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে। কাফিরদের আমলে এ দু'টির কোনটাই নেই। কাজেই তা কবূল হওয়া সুদূর পরাহত। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেনঃ আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করবো।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে هَبَاءً مَّنثُورًا -এর অর্থ হলো সূর্যের কিরণ যা দেয়ালের ছিদ্রে প্রবেশ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে।

হযরত উবায়েদ ইবনে ইয়ালা (রঃ) বলেন যে, هَبَآءً হলো ঐ ভস্ম যাকে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ফলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মোটকথা, এসব হচ্ছে সতর্কতামূলক কথা যে, কাফির ও মুশরিকরা তাদের কৃত আমলগুলোকে নাজাতের মাধ্যম মনে করে নিয়েছে বটে, কিন্তু যখন ওগুলোকে মহাবিজ্ঞানময় ও ন্যায় বিচারক আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে তখন তারা দেখবে যে, সবগুলোই বিফলে গেছে। ওগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ-

অর্থাৎ "যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি।" (১৪ ঃ ১৮) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ

رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে থাকে, এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত ওকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না।" (২ ঃ ২৬৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

অর্থাৎ "যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়।" (২৪ঃ ৩৯) এ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে সবকিছু বর্ণনা গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যেই।

আল্লাহ পাক বলেনঃ সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَا يَسْتَوِيْۤ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -

অর্থাৎ "জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।" (৫৯ ঃ ২০) ওটা এই যে, জান্নাত বাসীরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং শান্তি ও আরামদায়ক কক্ষে অবস্থান করবে। তারা থাকবে নিরাপদ স্থানে যা সুদৃশ্য ও মনোরম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

অর্থাৎ "সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কতই না উৎকৃষ্ট।" (২৫ ঃ ৭৬) পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীরা অতি জঘন্য ও নিকৃষ্ট স্থানে

অবস্থান করবে, হা-হুতাম করবে এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

অর্থাৎ "আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কতই না নিকৃষ্ট!" (২৫ ঃ ৬৬) অর্থাৎ তাদের অবতরণ স্থল দেখতে কতই না খারাপ এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে ওটা কতই না জঘন্য! এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম। অর্থাৎ তারা যে গ্রহণীয় আমল করেছে তার বিনিময়ে তারা যা পাওয়ার তা পেয়েছে এবং যে স্থানে অবস্থান করার সে স্থানে অবস্থান করেছে। কিন্তু জাহান্নামীদের অবস্থা এর বিপরীত। কারণ তাদের একটি আমলও এমন নেই যার মাধ্যমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবানদের অবস্থা দ্বারা হতভাগ্যের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, তাদের নিকট কোনই কল্যাণ নেই। হযরত যহ্হাক (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওটা এমন এক সময় যে সময়ে আল্লাহর ওলীরা সিংহাসনের উপর সুলোচনা হূরদের সাথে অবস্থান করবে। আর আল্লাহর শত্রুরা তাদের শয়তান সঙ্গীদের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় বসবাস করবে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, দিনের অর্ধভাগে আল্লাহ তা'আলা হিসাব হতে ফারেগ হবেন। অতঃপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে বিশ্রাম নেবে।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেনঃ ঐ সময় আমার জানা আছে যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন দুনিয়া দিবসের প্রথম অংশের উঁচুতে অবস্থান করবে (দিনের প্রথম ভাগে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে যাবে)। যেই সময় মানুষ দুপুরের বিশ্রামের সময় তাদের পরিবারের (স্ত্রীদের) নিকট গমন করে থাকে। সুতরাং ঐ সময় জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে গমন করবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কাজেই তাদের দুপুরের বিশ্রামস্থল হবে জান্নাত। সেখানে তাদেরকে মাছের কলিজা আহার করানো হবে এবং তারা সবাই তাতে পরিতৃপ্ত হবে। এর উপর ভিত্তি করেই

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ অর্ধ দিন হবে না যে পর্যন্ত না এরা এবং ওরা বিশ্রামস্থল গ্রহণ করবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ ..... الخ-এ আয়াতটি এবং পরে পাঠ করেন ঃ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ-এ আয়াতটি। "আর তাদের (জাহান্নামীদের) গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।" (৩৭ ঃ ৬৮)

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ ... الخ -এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতের কক্ষসমূহ বুঝানো হয়েছে। যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে একবার পেশ করা হবে তখন তাদের হিসাব খুবই সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا-

অর্থাৎ "যাকে তার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। আর সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে।" (৮৪ঃ ৮–৯) কাতাদা (রঃ) বলেন যে, خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আশ্রয়স্থল ও অবতরণস্থল।

সাফওয়ান ইবনে মুহরিম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন এমন দু'জন লোককে আনয়ন করা হবে যাদের একজন দুনিয়ায় লাল-সাদাদের নিকট বাদশাহ রূপে ছিল। তার হিসাব গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সে এমনই এক বান্দা যে, জীবনে কখনো সে একটি সৎ কাজও করেনি। সুতরাং তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। আর অপর লোকটি এতো দরিদ্র ছিল যে, পরিধেয় বস্ত্রটি ছিল তার একমাত্র সম্বল। তার হিসাব গ্রহণ করা হলে সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি এমন কিছু দেননি যার হিসেব আমার কাছে নিবেন।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। সুতরাং (হে আমার ফেরেশতামণ্ডলী)! তোমরা তাকে পাঠিয়ে দাও।" অতঃপর

তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর আল্লাহ যতদিন চাবেন তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন। এরপর তিনি জাহান্নামবাসী লোকটিকে ডেকে পাঠাবেন। সে মহান আল্লাহর সামনে হাযির হলে দেখা যাবে যে, সে অত্যন্ত কালো কয়লার মত হয়ে গেছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তুমি কেমন বিশ্রামস্থল পেয়েছো?" উত্তরে সে বলবেঃ "আমার বিশ্রামস্থল অত্যন্ত জঘন্য।" তখন তাকে বলা হবেঃ "তুমি (সেখানেই) ফিরে যাও।" অতঃপর জান্নাতবাসী ঐ লোকটিকে ডাকা হবে। তার চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমার বাসস্থান তুমি কেমন পেয়েছো?" উত্তরে সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি উত্তম বাসস্থান পেয়েছি।" তাকে তখন বলা হবেঃ "তুমি (তোমার ঐ জায়গাতেই) ফিরে যাও।"[১]

হযরত সাঈদ আস্ সওয়াফ (রঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিনটি মুমিনের নিকট খুবই ছোট অনুভূত হবে। এমনকি তাদের মনে হবে যে, ওটা আসর হতে মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। তারা জান্নাতের বাগানে ঘোরাফেরা করবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তির তাৎপর্য এটাই যে, সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

২৫। যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জ সহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে।

٢٥- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

২৬। সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্যে সেই দিন হবে কঠিন।

٢٦- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ﹰالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○

২৭। যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে

٢٧- وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

يَقُولُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ○

করতে বলবেঃ হায়, আমি যদি রাসূল (সঃ)-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।

٢٨- يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ○

২৮। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

٢٩- لَقَدْ اَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا ○

২৯। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছবার পর; শয়তান তো মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক।

কিয়ামতের দিন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যেসব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই সংবাদ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি যেমনঃ আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হওয়া এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া। সেই দিন ফেরেশতারা একত্রিত হওয়ার স্থানে সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। অতঃপর মহা কল্যাণময় প্রতিপালক বিচার-ফায়সালার জন্যে আগমন করবেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তাদের নিকট মেঘের ছায়ার মধ্যে আগমন করবেন তারা শুধু এরই অপেক্ষা করছে।" (২ঃ ২১০)

আল্লাহ পাকের يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيلًا -এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা দানব, মানব, পশু-পাখী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবকে একই মাটিতে একত্রিত করবেন। অতঃপর দুনিয়ার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং এই আকাশের অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে যাদের সংখ্যা দানব, মানব ও সমুদয় সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে।

সুতরাং তারা দানব, মানব এবং সমুদয় মাখলূককে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এরপর দ্বিতীয় আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে। তারা তাদের পূর্বে অবতণকারী ফেরেশতাদেরকে ও জ্বিন, মানুষ এবং সমস্ত মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। আর এই দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীদের সংখ্যা হবে দুনিয়ার আকাশের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী। তারপর তৃতীয় আকাশ ফেটে যাবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে অবতরণ করবে। তারা সংখ্যায় দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসী, দুনিয়ার আকাশের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা অধিক হবে। তারা তাদের পূর্বে অবতারিত ফেরেশতাসমূহ, দানব, মানব এবং সমুদয় মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। অতঃপর অনুরূপভাবে প্রত্যেক আকাশই ফেটে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সপ্তম আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে যাদের সংখ্যা ছয় আকাশের অধিবাসী, দানব, মানব এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে। তারা তাদের পূর্বে অবতারিত আকাশসমূহের অধিবাসী, জ্বিন, মানুষ এবং সমস্ত মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। আর আমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক মেঘমালার ছায়ায় অবতরণ করবেন এবং তাঁর চতুর্দিকে তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ থাকবেন যাঁদের সংখ্যা সপ্ত আকাশের অধিবাসী দানব, মানব ও সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে। বর্শার ফলকের গিঁটের মত তাঁদের শিং থাকবে। তাঁরা আরশের নীচে অবস্থান করবেন। তাঁরা মহামহিমান্বিত আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল পাঠে এবং তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় লিপ্ত থাকবেন। তাঁদের পায়ের পাতা ও পায়ের গিঁটের মধ্যকার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। পায়ের গিঁট ও হাঁটুর মধ্যকার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। হাঁটু হতে কোমর পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। কোমর থেকে নিয়ে বুকের উপরের অস্থি পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। বক্ষের উপরোস্থিত অস্থি হতে কানের লতি পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ বছরের পথ। আর সেখান থেকে উপরের শেষাংশ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। জাহান্নাম এর অনুভূতি স্থল।"[১]

ইউসুফ ইবনে মাহরান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ এই আকাশ যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন

১. এভাবে এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা হতে ফেরেশতারা অবতরণ করবেন যাঁদের সংখ্যা মানব ও দানব হতে বেশী হবে। ওটা হলো কিয়ামতের দিন, যেই দিন আসমানের অধিবাসী ও যমীনের অধিবাসীরা মিলিত হবে। তখন যমীনবাসীরা জিজ্ঞেস করবেঃ "আমাদের প্রতিপালক এসেছেন কি?" তাঁরা উত্তরে বলবেনঃ "তিনি এখনো আসেননি, তবে আসবেন।" অতঃপর দ্বিতীয় আকাশ ফেটে যাবে। তারপর পর্যায়ক্রমে আকাশগুলো ফাটতে থাকবে। অবশেষে সপ্তম আকাশ ফেটে পড়বে। তখন ওর থেকে ফেরেশতারা নীচে অবতরণ করবেন যাঁদের সংখ্যা পূর্বে আকাশসমূহ হতে অবতারিত সমুদয় ফেরেশতা হতে এবং সমস্ত দানব ও মানব হতে বেশী হবে। তারপর নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাগণ অবতরণ করবেন। অতঃপর আমাদের প্রতিপালক আটজন ফেরেশতা দ্বারা বহনকৃত আরশে চড়ে আসবেন। ঐ আটজন ফেরেশতার প্রত্যেকের পায়ের গিঁট হতে কাঁধ পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের রাস্তা। ঐ ফেরেশতারা একে অপরের মুখের দিকে তাকাবেন না। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাথা নিজ নিজ হস্তদ্বয়ের মাঝে রেখে বলতে থাকবেনঃ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ অর্থাৎ "মহান ও পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।" তাঁদের মাথার উপর তীরের ন্যায় কিছু থাকবে এবং ওর উপর আরশ থাকবে।[১] প্রসিদ্ধ সূরের (শিঙ্গার) হাদীসে প্রায় এরূপই বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ-وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ-وَّالْمَلَكُ عَلٰى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ

অর্থাৎ "সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেই দিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।" (৬৯ঃ ১৫-১৭)

---

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি খুবই দুর্বল এবং এতে কঠিন অস্বীকৃতি রয়েছে।

শাহর ইবনে হাউশিব (রঃ) বলেন যে, আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করবেন। তাঁদের মধ্যে চারজন বলতে থাকবেনঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনার জানার পরেও আপনার সহনশীলতার জন্যে প্রশংসা আপনার।” আর তাঁদের অবশিষ্ট চারজন বলবেনঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার মহিমা ঘোষণা করছি। আপনার ক্ষমতার পরেও আপনার ক্ষমার কারণে প্রশংসা আপনারই জন্যে।”[১]

আবূ বকর ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেন যে, যমীনবাসী যখন আরশের দিকে তাকাবে তখন তাদের চক্ষু স্থির ও বিস্ফারিত হয়ে যাবে এবং প্রাণ হয়ে যাবে কণ্ঠাগত।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ ‘সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের।’ যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থাৎ “আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহর জন্যে, যিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত।” (৪০ঃ ১৬)

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে ডান হাতে এবং যমীনসমূহকে বাম হাতে ধারণ পূর্বক বললেনঃ “আমি বাদশাহ এবং আমি মহাবিচারক। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? কোথায় শক্তিশালীরা? অহংকারীরা কোথায়?” আর এক জায়গায় তাঁর উক্তি রয়েছেঃ

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

অর্থাৎ “ঐ দিন কাফিরদের উপর কঠিন হবে।” (২৫ঃ ২৬) কেননা, ওটা হবে ন্যায়বিচার ও ফায়সালার দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ - عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ-

অর্থাৎ "ওটা সেই দিন হবে কঠিন দিন। কাফিরদের উপর তা সহজ নয়।" (৭৪ঃ ৯-১০) সুতরাং এই দিন এটা হবে কাফিরদের অবস্থা। পক্ষান্তরে মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

অর্থাৎ "বড় ভয়-বিহ্বলতা তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না।" (২১ঃ ১০৩)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'ওটা এমন একদিন যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান' এই দিন কতই না দীর্ঘ হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! অবশ্যই ওটা মুমিনের উপর হালকা করা হবে। এমনকি ওটা তার উপর দুনিয়ার ফরয নামাযের চেয়েও হালকা হবে।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করবে। এই উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐ যালিমের অনুতাপের সংবাদ দিচ্ছেন যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তিনি যে সুস্পষ্ট সত্য জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয় এসেছেন তা থেকে সরে পড়েছে, আর রাসূল (সঃ)-এর বাতলানো পথের বিপরীত পথে চলেছে। সুতরাং যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং শোকে ও দুঃখে স্বীয় হস্ত কামড়াতে থাকবে। কিন্তু ঐ সময় এতে কোনই উপকার সে লাভ করতে পারবে না। এ আয়াতটি উকবা ইবনে আবি মুঈত এবং অন্যান্য দুষ্ট শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও প্রত্যেক যালিমের ব্যাপারে এটা সাধারণ এবং সমানভাবে প্রযোজ্য। অতএব কিয়ামতের দিন প্রত্যেক যালিমই অত্যন্ত লজ্জিত হবে এবং স্বীয় হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবেঃ "হায়! আমি যদি রাসূল (সঃ)-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!" অর্থাৎ যে তাকে হিদায়াতের পথ হতে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল তার কথা মান্য করার কারণে সে এরূপ আক্ষেপ করবে। এটা উমাইয়া ইবনে খালফ অথবা তার ভাই উবাই ইবনে খালফ বা অন্যান্য সমস্ত যালিমের ব্যাপারেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ অর্থাৎ কুরআন পৌঁছার পর।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'শয়তান তো মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক।' অর্থাৎ সে প্রতারণা করে মানুষকে সত্য পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ও বাতিলের পথে নিয়ে যায়। আর সে তাকে ঐ দিকে আহ্বান করে।

৩০। রাসূল (সঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।

٣٠- وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

৩১। (আল্লাহ বলেনঃ) এই ভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। তোমার জন্যে তোমার প্রতিপালকই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্য কারীরূপে যথেষ্ট।

٣١- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, নবী (সঃ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরঅনকে পরিত্যাজ্য মনে করে। এটা এভাবে যে, মুশরিকরা কুরআন কারীম শ্রবণ করতো না এবং তাতে কর্ণপাত করতো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ "কাফিররা বলে—তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং ওটা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি করো যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।" (৪১ঃ ২৬) কাফিরদের সামনে যখন কুরআন কারীম পাঠ করা হতো তখন তারা হট্টগোল ও গোলমাল করতো এবং আজে বাজে কথা বলতো যাতে তারা কুরআন শুনতে না পায়। এটাই হলো তাদের কুরআন পরিত্যাগ করা ও ওর প্রতি ঈমান না আনা।

কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করার অর্থও হলো ওটা পরিত্যাগ করা। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা পরিত্যাগ করাও হলো কুরআনকে পরিত্যাগ করা। কুরআন অনুযায়ী আমল, ওর নির্দেশাবলী প্রতিপালন এবং ওর নিষেধাবলী থেকে পরহেযগারী অবলম্বন পরিত্যাগ করাও হলো কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করা। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কবিতা, গান এবং খেল-তামাশার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও হলো ওকে পরিত্যাজ্য মনে করা। সুতরাং অনুগ্রহশীল ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এমন জিনিস হতে পরিত্রাণ দান করেন যার উপর তাঁর ক্রোধ পতিত হয় এবং যেন তিনি আমাদেরকে এমন জিনিসের আমলকারী বানিয়ে দেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। যেমন তাঁর কিতাব হিফয করা, ওটা অনুধাবন করা এবং দিন রাত ওর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু ও দাতা।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই ভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার কওম যেমন কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করছে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতেরাও তেমনই ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক নবীরই শত্রু করেছেন অপরাধীদেরকে। তারা মানুষকে তাদের বিভ্রান্তির দিকে ও তাদের কুফরীর দিকে আহ্বান করতো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

অর্থাৎ "এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম মানব ও দানব শয়তানদেরকে।" (৬ঃ১১২) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ তোমার জন্যে তোমার প্রতিপালকই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। অর্থাৎ যে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর কিতাবের উপর ঈমান আনবে এবং ওর সত্যতা স্বীকার করতঃ ওর অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ হবেন তার পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী। পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা লোকদেরকে কুরআনের অনুসরণ হতে বাধা প্রদান করতো, যাতে কেউই এর দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে না পারে এবং তাদের পন্থা যেন কুরআনের পন্থার উপর জয়যুক্ত হয়। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি অপরাধীদেরকে (শেষ পর্যন্ত)।

৩২। কাফিররা বলেঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মজবুত করবার জন্যে এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○

৩৩। তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।

٣٣- وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۜ○

৩৪। যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

٣٤- اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ○ ع

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অত্যধিক প্রতিবাদ, হঠকারিতা এবং নিরর্থক কথার খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ 'সমগ্র কুরআন তার উপর (মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) একবারে অবতীর্ণ হলো না কেন?' এ কথা তারা বলেছিল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর যে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে তা একযোগেই কেন অবতীর্ণ হয়নি যেমন তাঁর পূর্বে আসমানী কিতাবসমূহ একযোগে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ইত্যাদি? তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি কুরআনকে ক্রমান্বয়ে তেইশ

বছরে ঘটনাবলী ও প্রয়োজনীয় বিধান অনুপাতে অবতীর্ণ করেছেন যাতে এর দ্বারা মুমিনদের হৃদয় মজবুত হয়। এজন্যেই তিনি বলেনঃ এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মজবুত করবার জন্যে এবং আমি ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তারা তোমার কাছে যে কোন সমস্যা উপস্থিত করেছে তারই সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করেছি। কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর দোষ-ত্রুটি বের করার উদ্দেশ্যে কাফির ও মুশরিকরা যখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের ঐ প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত আয়াত নিয়ে হাযির হয়েছেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বড় মর্যাদা যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট হতে সকাল-সন্ধ্যায়, দিনে-রাত্রে, সফরে ও বাড়ীতে তাঁর অহী আসতে থেকেছে। প্রত্যেকবারই ফেরেশতা তাঁর কাছে কুরআন নিয়ে এসেছেন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার এই পদ্ধতি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির বিপরীত ছিল। এর দ্বারা সমস্ত নবীর উপর এ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং কুরআন হলো আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের মধ্যে একই সাথে দু'টি বিশেষণ একত্রিত করেছেন। ঊর্ধ্ব জগতের লাওহে মাহফূয হতে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইযযায় একযোগে এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর ঘটনার অনুপাতে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে থেকেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "কদরের রাত্রে কুরআন কারীম দুনিয়ার আকাশে একযোগে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর বিশ বছরে অল্প অল্প করে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হতে থেকেছে।"[১]

১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

অর্থাৎ "তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا -

অর্থাৎ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি ওটা ক্রমশঃ অবতীর্ণ করেছি।" (১৭ ঃ ১০৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দুরবস্থা, কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় ও নিকৃষ্ট বিশেষণে তাদের জাহান্নামে একত্রিত হওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

সহীহ হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন কাফিরকে কিভাবে মুখের ভরে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই যিনি তাকে পায়ের ভরে চালিয়ে থাকেন তিনিই তাকে মুখের ভরে চালাতেও সক্ষম।" মুজাহিদ (রঃ), হাসান (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং আরো বহু মুফাসসির এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝ۚۖ

৩৫। আমি তো মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভ্রাতা হারূনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম।

٣٦- فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ

৩৬। এবং বলেছিলামঃ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝

যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম।

٣٧- وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚۖ ۝

৩৭। আর নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম; যালিমদের জন্যে আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

٣٨- وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

৩৮। আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামূদ, রাস্‌সবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও।

٣٩- وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

৩৯। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

٤٠- وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا

৪০। তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি

তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।	يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ○

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে তাঁর কওমের মুশরিক ও বিরোধী লোকেরা যে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে তিনি তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন এবং অতীতের উম্মতদের যারা তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল তাদেরকে যেমন তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে মক্কার এই মুশরিকদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন। হযরত মূসা (আঃ) থেকেই তিনি শুরু করছেন। তাঁকে তিনি কিতাব দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনকে তিনি ফিরাউন ও তার অধীনস্থ লোকদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁদেরকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং কাফিরদের জন্যে রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ ব্যবহার হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের সাথেও করেছিলেন যখন তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল। যারা একজন রাসূলকে অবিশ্বাস করে তাদের সমস্ত রাসূলকেই অবিশ্বাস করা হয়। কারণ রাসূলদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে সমস্ত রাসূলকেও প্রেরণ করতেন তবে তারা সকলকেই অবিশ্বাস করতো। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো (শেষ পর্যন্ত)। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট শুধুমাত্র হযরত নূহ (আঃ)-কেই নবীরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে সাড়ে নয়শ বছর অবস্থান করেছিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তাঁর উপর কেউ ঈমান আনেনি। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই নিমজ্জিত করেছিলেন এবং তাদের কাউকেও বাকী রাখেননি। হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার আরোহীগণ ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে তিনি কোন আদম সন্তানকে জীবিত ছাড়েননি।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাদেরকে আমি মানব জাতির জন্যে নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম। অর্থাৎ তাদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় করলাম যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ-لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ـ

অর্থাৎ "যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।" (৬৯ঃ ১১-১২) অর্থাৎ তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিয়ে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করলাম যাতে তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং তোমাদের ভাবী বংশধরদের এটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে গেল যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারা এভাবে মুক্তি পাবে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ

আদ ও সামূদের ঘটনা অন্য সূরায়, যেমন সূরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তাদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে রাস্সবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা সামূদ সম্প্রদায়ের গ্রামসমূহের একটি গ্রামের অধিবাসী। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আসহাবুস রাস্স হলো ফালজের অধিবাসী এবং তারা হলো আসহাবে ইয়াস।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফালজ হচ্ছে ইয়ামামার গ্রামসমূহের একটি গ্রাম। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্স হচ্ছে আযারবাইজানের একটি কূপ। সাওরী (রঃ) আবূ বকর (রঃ) হতে এবং তিনি ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্স হলো একটি কূপ যাতে ওর মালিকরা তাদের নবী (আঃ)-কে দাফন করেছিল।

ইবনে ইসহাক (রঃ) মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে যে লোকটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হলো কালো দাস। ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এক গ্রামবাসীর নিকট একজন নবী প্রেরণ করেন। ঐ কালো দাসটি ছাড়া ঐ গ্রামের আর কেউই তাঁর উপর ঈমান আনেনি। গ্রামবাসী নবীর সাথে শত্রুতা করতে শুরু করলো। তারা তাঁর জন্যে একটা কূপ খনন করলো। অতঃপর তারা তাঁকে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে কঠিন ভারী পাথর দ্বারা ওর মুখ বন্ধ করে দিলো। ঐ দাসটি বনে গিয়ে কাঠ কাটতো এবং কাঠ পিঠে বহন করে এনে বাজারে বিক্রী করতো। ঐ মূল্য দ্বারা সে খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করতো। তারপর ঐগুলো সে ঐ কূপটির নিকট নিয়ে আসতো। অতঃপর সে কূপের মুখ হতে ঐ শক্ত পাথরটি উঠিয়ে নিতো এবং ওটা ওঠাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করতেন। তারপর তার খাদ্য ও পানীয় সে ঐ কূপের মধ্যে নামিয়ে দিতো এবং পরে ওর মুখ পূর্বের ন্যায় বন্ধ করে দিতো। আল্লাহ যতদিন চাইলেন ঐরূপ হতে থাকলো।

এরপর একদিন সে অভ্যাসমত কাঠ কাটতে গেল এবং কাঠ কেটে বোঝা বাঁধলো। অতঃপর বোঝাটি বহন করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু তন্দ্রা এসে যাওয়ায় সে শুয়ে পড়লো এবং অবশেষে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ সাত বছর রাখলেন। অতঃপর সে জেগে উঠলো এবং গা মোচড় দিয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করলো। আবার আল্লাহ তাকে সাত বছর ঘুমিয়ে রাখলেন। অতঃপর সে জেগে উঠলো এবং কাঠের বোঝাটি বহন করে নিয়ে চললো। সে ধারণা করলো যে, সে দিনের এক ঘন্টাকাল ঘুমিয়েছে। সে গ্রামে আসলো এবং তার কাঠের বোঝাটি বিক্রী করলো। তা দিয়ে সে খাদ্য ও পানীয় কিনলো যেমন সে ইতিপূর্বে করতো। তারপর যে জায়গায় কূপটি ছিল তা সে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু জায়গাটি সে পেলো না। তার ঘুমের অবস্থায় তাদের কওমের শুভজ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাই কূপের মধ্য হতে তারা তাদের নবীকে বের করেছিল এবং তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "ঐ কালো দাসটির কি হয়েছে বা সে কোথায় গেছে?" তারা উত্তরে বলেছিলঃ "আমরা তার সম্পর্কে কিছুই জানি না বা বলতে

পারবো না।" অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ঐ নবীর রূহ কবয করে নেন। এরপর ঐ কালো দাসটি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লহ (সঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই ঐ কালো দাসটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ এ লোকগুলোকে ঐ আসহাবুর রাস্‌স-এর উপর স্থাপন করা বৈধ নয় যাদের বর্ণনা কুরআন কারীমে দেয়া হয়েছে। কেননা, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। বরং এরা হলো ওরাই যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধ্বংসের পর তাদের নবীর উপর ঈমান এনেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ মতটি পছন্দনীয় মনে করেছেন যে, আসহাবুর রাস্‌স দ্বারা ঐ আসহাবুল উখদূদ (কুণ্ডের অধিপতিদের) -কে বুঝানো হয়েছে যাদের ঘটনা কুরআন কারীমের সূরায়ে বুরূজে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ (আমি ধ্বংস করেছিলাম) তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। قَرْنٌ -এর অর্থ হলো সম্প্রদায় বা জাতি। যেমন তিনি বলেনঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ

অর্থাৎ "তাদের পরে আমি সৃষ্টি করেছি অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়সমূহকে।" (২৩ ঃ ৪২) কারো কারো মতে قَرْنٌ -এর সীমা হলো একশ বিশ বছর। কেউ কেউ একশ বছরও বলেছেন। কারো মতে আশি বছর। আবার কারো কারো উক্তি চল্লিশ বছরও রয়েছে। কারো কারো এগুলো ছাড়া অন্য উক্তিও আছে। প্রকাশমান উক্তি এই যে, قَرْنٌ বলা হয় পরস্পর একই যুগে বসবাসকারী জাতি বা সম্প্রদায়সমূহকে। অতঃপর যখন তারা বিদায় গ্রহণ করে এবং ছেড়ে যায় তাদের পিছনে তাদের বংশধরকে, তখন সেটা হয় অপর যুগ। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছেঃ "আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। তারপর উত্তম হলো ওর নিকটবর্তী যুগ এবং তারপর ওর নিকটবর্তী যুগ।"

১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা এভাবে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বড়ই অস্বাভাবিকতা ও অস্বীকৃতি রয়েছে এবং সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে একটির মধ্যে অপরটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। অর্থাৎ হযরত লূত (আঃ)-এর কওমের গ্রাম, যেটাকে সুদূম বলা হয়, যাকে আল্লাহ উল্টিয়ে দেয়া এবং প্রস্তর-কংকর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি ছিল অকল্যাণকর।" (২৭ঃ ৫৮) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ـ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাকো সকালে ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" (৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ তবে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করলে ঐ লোকদের তাদের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তার দ্বারা এই লোকগুলো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না। অর্থাৎ এই কাফিরদের যারা ঐ জনপদ দিয়ে গমনাগমন করে তারা ঐ লোকদের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। কেননা, তারা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে বিশ্বাসই করে না।

৪১। তারা যখন তোমাকে দেখে তখন শুধু তোমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে– এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

٤١- وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ○

٤٢- اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ لَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৪২। সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম; যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

٤٣- اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○

৪৩। তুমি কি দেখো না তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?

٤٤- اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○ ع

৪৪। তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা আরো অধম।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখে তখন তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে। যেমন তিনি বলেনঃ "যখন কাফিররা তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে।" অর্থাৎ তারা তাঁকে দোষ-ত্রুটির সাথে বিশেষিত করে। এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে– এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাঁকে খাটো করার জন্যে একথা বলে। তাই আল্লাহ তাদের দুষ্কৃতি ও বদভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ

অর্থাৎ "তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল।" (৬ঃ ১০)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিতো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তারা বলে– 'আমরা আমাদের দেবতাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সে তো আমাদেরকে তাদের ইবাদত হতে সরিয়ে দিতো।' আল্লাহ তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির সুরে বলেনঃ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দেন যে, যার তকদীরে আল্লাহ দুর্ভোগ ও পথভ্রষ্টতা লিখে দিয়েছেন তাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সুপথ প্রদর্শন করতে পারে না। তাই তিনি বলেনঃ তুমি কি দেখো না তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? অর্থাৎ যে প্রবৃত্তির দাস এবং প্রবৃত্তি যা চায় তাই যে ভাল মনে করে, সেটাই তার দ্বীন ও মাযহাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ "তবে কি যে ব্যক্তির খারাপ কাজ তার জন্যে শোভনীয় করা হয়েছে, অতঃপর সে ওটাকে উত্তম দেখে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।" (৩৫ ঃ ৮) এ জন্যেই তিনি এখানে বলেনঃ তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে একজন লোক কিছুকাল যাবত সাদা পাথরের ইবাদত করতো। অতঃপর যখন দেখতো যে, ওটার চেয়ে অন্যটি উৎকৃষ্টতর, তখন পূর্বটির পূজা ছেড়ে দিয়ে ঐ দ্বিতীয়টির পূজা শুরু করে দিতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তুমি কি দেখো না যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মত; তারা আরো অধম। অর্থাৎ তাদের অবস্থা বিচরণকারী পশুর চেয়েও খারাপ। কারণ পশুরা ঐ কাজই করে যে কাজের জন্যে ওগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদতের জন্যে। কিন্তু তারা তা পালন করেনি। বরং তারা

তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে এবং তাদের কাছে দলীল প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাদের নিকট রাসূলদেরকে প্রেরণ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে।

٤٥- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ○

৪৫। তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।

٤٦- ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

৪৬। অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

٤٧- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

৪৭। এবং তিনিই তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্যে তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্যে দিয়েছেন দিবস।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে স্বীয় অস্তিত্ব ও বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টি করার উপর পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেনঃ 'তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন?' ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে উমার (রাঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), আবূ মালিক (রঃ), মাসরূক (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), নাখঈ (রঃ), যহহাক (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে ফজর প্রকাশিত হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির অর্থাৎ স্থায়ী ও সদা বিরাজমান রাখতে পারতেন। যেমন তিনি বলেনঃ

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا -

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও—তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাত্রিকে স্থির ও চিরস্থায়ী করতেন।" (২৮ঃ৭১)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অর্থাৎ যদি সূর্য উদিত না হতো তবে দিবস ও রজনীর পরিচয় পাওয়া যেতো না। কেননা, বিপরীতকে বিপরীতের মাধ্যমেই চেনা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর আমি এটাকে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। অর্থাৎ সহজে গুটিয়ে আনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) يَسِيْرًا অর্থ করেছেন سَرِيْعًا অর্থাৎ তাড়াতাড়ি। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো গোপন করা। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, قَبْضًا يَّسِيْرًا -এর অর্থ হলো গোপনীয়ভাবে গুটিয়ে নেয়া। শেষ পর্যন্ত ছাদের নীচে ও গাছের নীচে ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের অন্য কোন জায়গায় ছায়া থাকবে না। সূর্য ছায়া দেবে যা ওর উপরে রয়েছে। আইয়ুব ইবনে মূসা (রঃ) বলেন যে, قَبْضًا يَّسِيْرًا -এর অর্থ হলো অল্প অল্প করে গুটিয়ে নেয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনিই তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ। অর্থাৎ রাত্রি আবরণ দ্বারা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى

অর্থাৎ "শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে।" (৯২ ঃ ১)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ বিশ্রামের জন্যে তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা। অর্থাৎ দেহের বিশ্রামের জন্যে গতিশীলতা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দিনের বেলায় জীবিকা উপার্জনের জন্যে গতিশীল থাকে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাত্রি আসে তখন গতিশীলতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেহ আরাম পায়। আর এর ফলে ঘুম এসে যায় এবং এতে একই সাথে দেহ ও আত্মা শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে।

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আর তিনি সমুত্থানের জন্যে দিয়েছেন দিবস। অর্থাৎ দিনের বেলায় মানুষ জীবিকা ও জীবনের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্তে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ “এটাও আল্লাহর একটা অনুগ্রহ ও করুণা যে, তিনি তোমাদের জন্যে রাত্রি ও দিবস বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে শান্তি পাও এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর।” (২৮ ঃ ৭৩)

৪৮। তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

٤٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۙ

৪৯। যদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।

٤٩- لِّنُحْـِۧيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا

৫০। আর আমি এটা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

٥٠- وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

এটাও আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার পরিচায়ক যে, তিনি মেঘের আগমনের সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন।

এরপরে ঘোষিত হচ্ছেঃ আর আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। طَهُوْر -এর অর্থ হলো অতি পবিত্র এবং যা অন্য কিছুকেও পবিত্র করে থাকে।

সাবিত আল বানানী (রঃ) বলেনঃ "আমি একদা বর্ষার দিনে আবুল আলিয়া (রঃ)-এর সাথে চলতে থাকি। ঐ সময় বসরার পথগুলো ময়লাযুক্ত থাকতো। তিনি নামায পড়লেন। তখন আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ 'আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।' সুতরাং আকাশ হতে বর্ষিত পানি এগুলোকে পবিত্র করেছে (কাজেই এখানে নামায পড়াতে কোন দোষ নেই)।"[১]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেনঃ "আল্লাহ্ এই পানিকে পবিত্ররূপে বর্ষণ করেছেন। এটাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।"

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা বুযাআর কূপের পানিতে অযু করতে পারি কি? এটা এমন একটি কূপ, যার মধ্যে পচা-সড়া জিনিস এবং কুকুরের মাংস নিক্ষেপ করা হয়।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "নিশ্চয়ই পানি পবিত্র, ওকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।"[২]

হযরত খালিদ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় জনগণ পানি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। তখন আমি বলি, এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা আকাশ হতে বর্ষিত হয়। আর এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা সমুদ্র হতে উত্থিত মেঘমালা পান করিয়ে থাকে। সমুদ্রের পানি উদ্ভিদ জন্মায় না, বরং আকাশ হতে বর্ষিত পানি উদ্ভিদের জন্ম দেয়।"[৩]

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষণ করেন তখনই যমীনে উদ্ভিদের জন্ম হয় অথবা সমুদ্রে মণিমুক্তা জন্ম হয়। অন্য কেউ বলেন যে, স্থলে গম ও সমুদ্রে মুক্তার সৃষ্টি হয়।

---

১. এটা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ওর দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি। অর্থাৎ যে ভূমি দীর্ঘদিন যাবত পানির জন্যে অপেক্ষমান ছিল এবং পানি না হওয়ার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাতে না ছিল কোন গাছ-পালা, না ছিল কোন তরু-লতা, অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন তখন সেই মৃত প্রায় ভূমি নব-জীবন লাভ করলো এবং তাতে বৃক্ষ ও তরু-লতার জন্ম হলো ও সেগুলো ফলে-ফুলে ভরে উঠলো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ -

অর্থাৎ "যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি তখন তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।" (৪১ঃ৩৯)

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীব-জন্তু ও মানুষকে ঐ পানি আমি পান করাই। অর্থাৎ সেই পানি বিভিন্ন জীব-জন্তু ও মানুষ পান করে থাকে যারা ঐ পানির বড়ই মুখাপেক্ষী। মানুষ সেই পানি নিজেরা পান করে এবং তাদের ফসলের জমিতে তা সেচন করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا

অর্থাৎ "তারা নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই (আল্লাহই) তাদের উপর বারি বর্ষণ করে থাকেন।" (৪২ঃ ২৮) আর এক স্থানে বলেনঃ

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থাৎ "তুমি আল্লাহর করুণার লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তিনি যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পরসঞ্জীবিত করেন।" (৩০ঃ ৫০)

ঘোষিত হচ্ছেঃ আমি এটা (এই পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। অর্থাৎ আমি এই ভূমিতে পানি বর্ষণ করি এবং ঐ ভূমিতে বর্ষণ করি না। মেঘমালা এক ভূমি অতিক্রম করে অন্য ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং যে ভূমিকে অতিক্রম করে যায় ওর উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষণ করে না। এর মধ্যে পূর্ণ কৌশল ও নিপুণতা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এক বছরে অন্য বছর অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হয় না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা যেভাবে চান বিতরণ করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা–

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

অর্থাৎ "আমি ওটা (ঐ পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করে থাকি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।" অর্থাৎ তারা যেন স্মরণ করে যে, যে আল্লাহ মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম, সে আল্লাহ মৃতকে ও গলিত অস্থিকে পুনর্জীবন দান করতেও নিঃসন্দেহে সক্ষম। অথবা সে যেন স্মরণ করে যে, তার পাপের কারণে যদি আল্লাহ তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন তবে সে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটা স্মরণ করে যেন সে পাপকার্য হতে বিরত থাকে।

উকবা (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম উমার (রাঃ) বলেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) জানাযার জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় নবী (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! আমি মেঘের বিষয়টি অবগত হতে পছন্দ করি।" তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনি মেঘের উপর নিযুক্ত এই ফেরেশতাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।" এ কথা শুনে মেঘের উপর নিযুক্ত ফেরেশতা বললেন, আমাদের কাছে মোহরকৃত একটা নির্দেশনামা আসে। তাতে নির্দেশ দেয়া থাকে– "অমুক অমুক শহরে পানি পান করাও। অমুক অমুক জায়গায় পানির ফোঁটা পৌঁছিয়ে দাও।"[১]

আল্লাহ পাক বলেনঃ কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃজ্ঞতাই প্রকাশ করে থাকে। ইকারামা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বলে– "অমুক অমুক নক্ষত্রের আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।" যেমন একদা রাত্রিকালে বৃষ্টিপাত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মুরসাল।

বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরূপে সকাল করে এবং কেউ সকাল করে আমাকে অস্বীকারকারীরূপে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে– 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে– 'অমুক অমুক তারকার আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।"

٥١- وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝

৫১। আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।

٥٢- فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

৫২। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

٥٣- وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

৫৩। তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

٥٤- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

৫৪। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমাদের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে প্রতিটি জনপদে একজন ভয়-প্রদর্শক প্রেরণ করতে পারতাম যে জনগণকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে আহ্বান করতো। কিন্তু হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তোমাকে সারা যমীনবাসীর নিকট প্রেরণের সাথে বিশিষ্ট করেছি এবং তোমাকে আমি আদেশ করেছি যে, তুমি তাদের কাছে এই কুরআনের বাণী পৌঁছিয়ে দেবে। যেমন নবী (সঃ)-কে বলতে বলা হয়েছেঃ "যাতে আমি তোমাদেরকে এর দ্বারা ভয় প্রদর্শন করি।" আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ "দলসমূহের মধ্যে যে এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার প্রতিশ্রুত জায়গা হলো জাহান্নাম।" (১১ ঃ ১৭) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (৭ঃ১৫৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি রক্তিম (বর্ণের লোক) এবং কৃষ্ণ (বর্ণের লোক)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছি।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অন্য নবীকে তাঁর কওমের নিকট বিশিষ্টভাবে প্রেরণ করা হতো, কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।" এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি ওর সাহায্যে অর্থাৎ কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। যেমন তিনি বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (৬৬ ঃ ৯)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, **একটি** মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর। অর্থাৎ তিনি পানি দুই প্রকারের

করে দিয়েছেন। একটি মিষ্ট ও অপরটি লবণাক্ত। নদী, প্রস্রবণ ও কূপের পানি সাধারণতঃ মিষ্ট, স্বচ্ছ এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। কতকগুলো স্থির সমুদ্রের পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার এই নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি মিষ্ট পানি চতুর্দিকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন যাতে লোকদের গোসল করা, সবকিছু ধৌত করা এবং ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছিয়ে দেয়া সহজসাধ্য হয়। পূর্বে ও পশ্চিমে তিনি লবণাক্ত পানিবিশিষ্ট প্রশান্ত মহাসাগর প্রবাহিত করেছেন যা স্থির রয়েছে এবং এদিক ওদিকে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু ওটা তরঙ্গায়িত হচ্ছে। কোন কোন সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। প্রতি মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে তাতে বর্ধন ও প্রবাহ থাকে। অতঃপর চন্দ্রের হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে ওটাও হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত ওটা স্বীয় অবস্থায় এসে পড়ে। তারপর আবার চন্দ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ওটাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চাঁদের সাথে বাড়তেই থাকে। তারপর আবার কমতে শুরু করে। এই সমুদয় সমুদ্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তিনি পূর্ণ ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। লবণাক্ত ও গরম পানি পান কার্যে ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু ঐ পানি বায়ুকে নির্মল করে যার ফলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয় না। তাতে যে জন্তু মরে যায় ওর দুর্গন্ধে মানুষ কষ্ট পায় না। লবণাক্ত পানির কারণে ওর বাতাস স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় এবং ওর স্বাদ পবিত্র ও উত্তম হয়। এজন্যেই যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আমরা সমুদ্রের পানিতে অযু করতে পারি কি?" তখন তিনি উত্তর দেনঃ "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং ওর মৃত হালাল।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মিষ্ট ও লবণাক্ত পানির মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতা যে, তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে মিষ্ট ও লবণাক্ত পানিকে পৃথক পৃথক রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্ট পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, না মিষ্ট পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। যেমন তিনি বলেছেনঃ

১. ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং আহলে সুনান এটা রিওয়াইয়াত করেছেন এবং এর ইসনাদও সঠিক ও উত্তম।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

অর্থাৎ "তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (৫৫ঃ ১৯-২১) আর এক আয়াতে রয়েছেঃ কে তিনি যিনি যমীনকে নিরাপদ স্থল বানিয়েছেন এবং তাতে স্থানে স্থানে সমুদ্র প্রবাহিত করে দিয়েছেন, পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, আর দুই সমুদ্রের মাঝে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়? আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য রয়েছে কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐ মুশরিকদের অধিকাংশ লোকই জ্ঞান রাখে না।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে দুর্বল শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে ঠিকঠাক করেছেন এবং তাকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে নর ও নারী বানিয়েছেন। কিছুদিন পরে বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

৫৫। তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যারা তাদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না, কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী।

٥٥- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○

৫৬। আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।

٥٦- وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৫৭ - قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

৫৭। বল ঃ আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

৫৮ - وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○ۚۛ

৫৮। তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

৫৯ - الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ○

৫৯। তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনিই রহমান, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

৬০ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ○ ۩ السجدة ع ٥ ١٦ ٣

৬০। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ সিজদাবনত হও 'রহমান'-এর প্রতি, তখন তারা বলেঃ রহমান আবার কে? তুমি কাউকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করবো? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অজ্ঞতার খবর দিচ্ছেন যে, তারা বিনা দলীল প্রমাণে প্রতিমাগুলোর পূজা করছে যারা তাদের উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। শুধু পূর্বপুরুষদের দেখাদেখি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাদের প্রেম-প্রীতি তারা নিজেদের অন্তরে জমিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

(সঃ)-এর বিরোধিতা করছে। তারা শয়তানের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছে এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীর বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। তারা এই আশায় পড়ে রয়েছে যে, এই মিথ্যা ও বাজে মা'বূদরা তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তারা অযথা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মুমিনদের পরিণামই ভাল হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সাহায্য করবেন। এই কাফিরদেরকে তো শয়তান শুধু আল্লাহর বিরোধিতার উপর উত্তেজিত করছে। সে তাদের অন্তরে সত্য আল্লাহর শত্রুতা সৃষ্টি করে দিচ্ছে এবং শিরকের মহব্বত পয়দা করছে। তাই তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। যারা আল্লাহর আনুগত্যকারী তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দেবে এবং যারা তাঁর অবাধ্য তাদেরকে তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবে। জনগণের মধ্যে তুমি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেবে– আমি তোমাদের কাছে আমার এই প্রচারকার্যের জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমি শুধু এটাই চাই যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসতে চায় তার সামনে সঠিক রাস্তা প্রকাশ করে দেবো।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে আরো বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি প্রতিটি কাজে ঐ আল্লাহর উপর নির্ভর করবে যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। যিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। যিনি চিরজীবিত ও চির বিরাজমান। যিনি প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক ও প্রতিপালক। তাঁকেই তুমি তোমার প্রকৃত আশ্রয়স্থল মনে করবে। তাঁর সত্তা এমনই যে, তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত এবং ভীতি-বিহ্বলতার সময় তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়া কর্তব্য। সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। মানুষের উচিত তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি (জনগণের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি এটা না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আল্লাহ তোমাকে লোকদের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন।" (৫ ঃ ৬৭)

শহর ইবনে হাওশিব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা কোন এক গলিতে নবী (সঃ)-এর সাথে হযরত সালমান (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে সিজদা করতে উদ্যত হন। তখন নবী (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে সালমান (রাঃ)! তুমি আমাকে সিজদা করো না, বরং সিজদা করো সেই সত্তাকে যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।"[১]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ 'তুমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) মহান আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তিনি বলতেনঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।" মহান আল্লাহর এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ইবাদত শুধু আল্লাহরই করবে এবং শুধু তাঁর সত্তার উপরই ভরসা করবে। যেমন তিনি বলেনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ـ

অর্থাৎ "পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক তিনিই, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তাঁকেই কর্মবিধায়ক বানিয়ে নাও।" (৭৩ ঃ ৯) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ "সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই উপর নির্ভর করো।" (১১ ঃ ১২৩) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও– তিনিই রহমান (পরম দয়ালু), আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি।" (৬৭ ঃ ২৯)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। অর্থাৎ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁর সামনে প্রকাশমান। অণু পরিমাণ কাজও তাঁর কাছে গোপন নয়।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুরসাল।

তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি। তিনিই সব কিছুর আহার্যদাতা। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমান যমীনের ন্যায় বিরাট মাখলূককে মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। কার্যাবলীর তদবীর ও ফলাফল তাঁরই পক্ষ হতে এবং তাঁরই হুকুম ও তদবীরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাঁর ফায়সালা সত্য, সঠিক ও উত্তমই হয়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখো।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এরই ছিল যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সাধারণভাবে সমস্ত আদম সন্তানের নেতা ছিলেন। একটি কথাও তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলেননি। বরং তিনি যা কিছু বলতেন আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়েই বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যে গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোর সবই সত্য। তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সবই সঠিক। প্রকৃত ও সত্য ইমাম তিনিই। সমস্ত বিবাদের মীমাংসা তাঁরই নির্দেশক্রমে করা যেতে পারে। যে তাঁর কথা বলে সে সত্যবাদী। আর যে তাঁর বিপরীত কথা বলে সে মিথ্যাবাদী এবং তার কথা প্রত্যাখ্যাত হবে। সে যে কেউই হোক না কেন। আল্লাহর ফরমান অবশ্যই পালনীয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ "কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও।" (৪ ঃ ৫৯) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ "যে ব্যাপারেই তোমরা মতানৈক্য কর, ওর ফায়সালা আল্লাহর নিকট রয়েছে।" (৪২ ঃ ১০) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا-

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের কথা যা খবরের ব্যাপারে সত্য ও ফায়সালা হিসেবে ন্যায়, পূর্ণ হয়ে গেছে।" (৬ ঃ ১১৬) এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সিজদা করতো। তাদেরকে যখন 'রহমান'কে সিজদা করার কথা বলা হতো তখন তারা বলতোঃ আমরা

রহমানকে চিনি না। আল্লাহর নাম যে 'রহমান' এটা তারা অস্বীকার করতো। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লেখককে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখতে বলেন তখন মুশরিকরা বলে ওঠেঃ "আমরা রহমানকে চিনি না এবং রহীমকেও না। বরং আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখুন।" তাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّاتَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও– তোমরা আল্লাহকে ডাকো অথবা রহমানকে ডাকো, যে নামেই ইচ্ছা তাঁকে ডাকো, তাঁর বহু উত্তম নাম রয়েছে।" (১৭ ঃ ১১০)

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ এবং তিনিই রহমান।

কাফিররা বলতোঃ তুমি কাউকেও সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করবো? মোটকথা, এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুমিনরা আল্লাহর ইবাদত করে যিনি রহমান এবং রাহীম। তাঁরা তাঁকেই ইবাদতের যোগ্য মনে করে এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই সিজদা করে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূরায়ে ফুরকানের এই আয়াতটির পাঠক ও শ্রোতার উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়া শরীয়তের বিধান। যেমন ওর স্থলে ওর ব্যাখ্যা বিদ্যমান। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

٦١- تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬১। কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র!

٦٢- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

৬২। এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপক ক্ষমতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা বলছেন যে, তিনি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় তারকাও হতে পারে, আবার পাহারা দেয়ার বুরূজও হতে পারে। প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। বড় বড় তারকা দ্বারাও এই বুরূজই উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা।" (৬৭ ঃ ৫) سِرَاجٌ দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে যা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করতে থাকে। এটা প্রদীপের মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا অর্থাৎ "আমি উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি।" (৭৮ ঃ ১৩) এর দ্বারা সূর্যকেই বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্যোতির্ময় চন্দ্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল ও আলোকময় করেছি সূর্যের আলো ছাড়া অন্যের আলো দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا

অর্থাৎ "তিনি এমনই যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়।" (১০ ঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا-

অর্থাৎ "তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।" (৭১ ঃ ১৫-১৬)

যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে। এটা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর ব্যবস্থাপনা যে, দিবস ও রজনী একের পরে এক আসছে ও যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ -

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে একে অপরের অনুগামীরূপে বানিয়েছেন।" (১৪ ঃ ৩৩) আরো বলেনঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

অর্থাৎ "রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি ওকে কামনা করে।" (৭ ঃ ৫৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা।" (৩৬ ঃ ৪০)

এর মাধ্যমেই আল্লাহর বান্দারা তাঁর ইবাদতের সময় জানতে পারে এবং রাত্রির ছুটে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ দিনে সমাপ্ত করতে ও দিনের অসমাপ্ত কাজ রাত্রে সমাপ্ত করতে পারে।

সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে দিনের পাপীরা তাওবা করতে পারে এবং দিনে তিনি স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করেন যাতে রাত্রের পাপীরা তাওবা করার সুযোগ পায়।

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) চাশতের নামাযে খুবই বিলম্ব করেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "রাত্রের কিছু অযীফা আমার বাকী থেকে গিয়েছিল, ওটাই এখন আদায় করলাম।" অতঃপর وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ-এ আয়াতটি তিনি পাঠ করেন।[১]

خِلْفَةً-এর অর্থ কেউ مُخْتَلِف ও করেছেন। অর্থাৎ দিন উজ্জ্বল ও রাত্রি অন্ধকার। এতে ঔজ্জ্বল্য এবং ওতে অন্ধকার। এটা আলোকময় এবং ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

৬৩। 'রহমান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ 'সালাম'।

٦٣- وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا ○

১. এটা আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤- وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○

৬৪। এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।

٦٥- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○ ۖ

৬৫। এবং তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

٦٦- إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

৬৬। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট!

٦٧- وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

৬৭। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।

এখানে আল্লাহর মুমিন বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। তারা গর্ব-অহংকার, ঝগড়া-ফাসাদ এবং যুলুম-অত্যাচার করে না। যেমন হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেঃ

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا

অর্থাৎ "তুমি ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না।" (৩১ঃ ১৮) কৃত্রিমভাবে কোমর ঝুঁকিয়ে রুগ্ন ব্যক্তির মত পায়ে পায়ে চলা এখানে উদ্দেশ্য কখনই নয়। এটা তো রিয়াকারদের কাজ। তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্যে এবং দুনিয়ার দৃষ্টি তাদের দিকে উঠিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এরূপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এমনভাবে চলতেন যে, মনে হতো যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হতে নীচে নামছেন এবং যেন যমীনকে তাঁর জন্যে জড়িয়ে নেয়া হচ্ছে। পূর্বযুগীয় মনীষীরা রুগ্ন লোকদের মত কষ্টকর চলনকে

অপছন্দ করতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) একটি লোককে খুবই ধীরে ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি কি অসুস্থ?” উত্তরে লোকটি বলেঃ “না।” তিনি প্রশ্ন করেনঃ “তাহলে এরূপভাবে চলছো কেন? সাবধান! এরপরে যদি এরূপভাবে চল তবে তোমাকে চাবুক মারা হবে। শক্তির সাথে তাড়াতাড়ি চলবে।”

সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে ভদ্রভাবে চলা, দুর্বলতা ও অসুস্থতার ঢঙ্গে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা নামাযের জন্যে আসো তখন দৌড়িয়ে এসো না, বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে এসো। জামাআতের সাথে যা পাবে তা আদায় করে নাও এবং যা ছুটে যাবে তা (পরে) পুরো করে নাও।” এই আয়াতের তফসীরে হযরত হাসান বসরী (রঃ) খুবই চমৎকার কথা বলেছেন। তা হলোঃ মুমিনদের চক্ষু, কর্ণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নত হয়ে থাকে, তাই অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা তাদেরকে অসুস্থ মনে করে। অথচ তারা অসুস্থ বা রুগ্ন নয়। বরং আল্লাহর ভয়ে তারা নত হয়ে থাকে। তারা পূর্ণভাবে সুস্থ-সবল রয়েছে, কিন্তু অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। পরকালের জ্ঞান দুনিয়ার কামনা-বাসনা এবং ওর জাঁকজমক থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিয়ামতের দিন তারা বলবেঃ “ঐ আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের থেকে চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।” এতে কেউ যেন মনে না করে যে, দুনিয়ার খাওয়া, পরা ইত্যাদির চিন্তা তাদের লেগেই থাকতো। না, না। আল্লাহর শপথ! দুনিয়ার কোন দুঃখ ও চিন্তা তাদের কাছেও আসতো না। হ্যাঁ, তবে আখিরাতের ভয় ও চিন্তা সদা তাদের লেগেই থাকতো। জান্নাতের কোন কাজকে তারা ভারী মনে করতো না, কিন্তু জাহান্নামের ভয় তাদেরকে কাঁদাতে থাকতো। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় দেখানোর পরেও ভয় পায় না তার নফ্স দুঃখ ও আফ্সোসের মালিক (অর্থাৎ পরে তাকে আফসোসই করতে হবে)। যে ব্যক্তি শুধু পানাহারকেই আল্লাহর নিয়ামত মনে করে তার জ্ঞান কম। সে শাস্তির শিকার হয়ে আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মূর্খ লোকেরা যখন তাদের সাথে মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে তখন তারা এই মূর্খদের সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে না। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। মন্দ কথার প্রতিউত্তরে তারা কখনো মুখে মন্দ কথা উচ্চারণ করে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস এই ছিল যে, কোন লোক যতই তাঁকে কড়া কথা বলতো ততই তিনি তাকে নরম কথা বলতেন। কুরআন কারীমের এই আয়াতে এই গুণেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ

অর্থাৎ "যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের কথা শুনে তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (২৮ ঃ ৫৫)

নু'মান ইবনে মাকরান আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একটি লোক অন্য একটি লোককে গালি দেয়। কিন্তু ঐ লোকটি উত্তরে বলে– "তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বলেনঃ তোমাদের দু'জনের মাঝে ফেরেশতা বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তোমার পক্ষ হতে গালিদাতাকে উত্তর দিচ্ছিলেন। সে তোমাকে যে গালি দিচ্ছিল, ফেরেশতা বলছিলেনঃ "এ নয়, বরং তুমি।" আর তুমি যখন বলছিলেঃ "তোমার উপর সালাম বর্ষিত হোক" তখন ফেরেশতা বলছিলেনঃ "তার উপর নয়, বরং তোমারই উপর (শান্তি বর্ষিত হোক)। শান্তি ও নিরাপত্তার হকদার তুমিই।"[১] তাই বলা হয়েছে যে, মুমিনরা তাদের মুখে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে না। অকথ্য ভাষা প্রয়োগকারীর প্রতি তারা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে না। ভাল কথা ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে মন্দ কথা বের হয় না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর বান্দাদের দিনগুলো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে কড়া কথা বলে এবং তারা তা সহ্য করে নেয়। তাদের রাত্রি যেভাবে অতিবাহিত হয় তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। তারা বিছানা হতে পৃথক হয়ে যায়। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। তারা আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। তাই তারা তাঁর ইবাদতে রাত্রি কাটিয়ে দেয়।

তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন! ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। যেমন কবি বলেনঃ

اِنْ يُّعَذِّبْ يَكُنْ غَرَامًا وَاِنْ يُعْ * طِ جَزِيْلًا فَاِنَّهٗ لَا يُبَالِىْ

অর্থাৎ "যদি তিনি শাস্তি দেন তবে তাঁর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ ও অত্যন্ত কঠিন এবং চিরস্থায়ী, আর যদি তিনি দান করেন তবে তা তো অসংখ্য এবং বে-হিসাব।"

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

যে জিনিস আসে ও চলে যায় তা غَرَامٌ নয়। غَرَامٌ হলো ওটাই যা আসার পরে যাওয়ার নাম করে না বা সরে যায় না। আবার এ অর্থও করা হয়েছে যে, জাহান্নামের শাস্তি হচ্ছে ক্ষতিপূরণ যা নিয়ামতের অস্বীকারকারীদের নিকট হতে নেয়া হবে। তারা আল্লাহ্র দেয়া জিনিস তাঁর পথে ব্যয় করেনি। কাজেই আজ ওর ক্ষতিপূরণ এই হবে যে, তারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেবে। ওটা হলো নিকৃষ্ট জায়গা, কুদৃশ্য, কষ্টদায়ক এবং বিপদ সংকুল স্থান।

মালিক ইবনে হারিস (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন সে কতকাল পর্যন্ত যে নীচে যেতেই থাকবে তা আল্লাহ পাকই জানেন। এরপর জাহান্নামের একটি দরজার উপর তাকে থামিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবেঃ 'এখন তুমি খুবই পিপাসার্ত হয়ে পড়েছো। সুতরাং এক পেয়ালা পানি পান করে নাও।' এ কথা বলে কালো সাপ ও বিষাক্ত বৃশ্চিকের বিষের এক পেয়ালা তাকে পান করানো হবে। ওটা পান করা মাত্রই তার দেহ হতে চামড়া খসে পড়বে, শিরাগুলো পৃথক হয়ে যাবে এবং অস্থিগুলো পৃথক হয়ে পড়বে।

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের মধ্যে কূপের মত গর্ত রয়েছে যার মধ্যে উটের মত বড় বড় সাপ রয়েছে এবং খচ্চরের মত বিরাট বিরাট বিচ্ছু রয়েছে। কোন জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তখন ওগুলো বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে এবং তার ওষ্ঠে, মাথায় এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কামড় দেয়। ফলে তার সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো মাথার চামড়া বিষের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে খ'সে পড়ে। তারপর ঐ সাপ ও বিচ্ছু চলে যায়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামী এক হাজার বছর পর্যন্ত 'ইয়া হান্নানু', 'ইয়া মান্নানু' বলে চীৎকার করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বলবেনঃ "যাও এবং দেখো, আমার এ বান্দা কি বলছে।" হযরত জিবরাঈল তখন আসবেন এবং দেখবেন যে, জাহান্নামবাসীরা সবাই খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে এবং মাথা ঝুঁকিয়ে তারা কান্নাকাটি করছে। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে মহামহিমান্বিত আল্লাহকে এই খবর দিবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেনঃ "তুমি আবার যাও এবং অমুক জায়গায় আমার এক বান্দা রয়েছে, তাকে নিয়ে এসো।" মহান আল্লাহর এই নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ)

যাবেন এবং লোকটিকে নিয়ে এসে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে আমার বান্দা! তুমি তোমার জায়গা কেমন পেয়েছো?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার অবস্থানের জায়গাও নিকৃষ্ট এবং শয়নের জায়গাও মন্দ।" তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেনঃ "তাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" লোকটি তখন কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে আরয করবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যখন আমার ঐ স্থান থেকে বের করেছেন তখন আপনার সত্তা এরূপ নয় যে, আমাকে পুনরায় তাতে প্রবিষ্ট করবেন। আপনার করুণার আমি পূর্ণ আশা রাখি। সুতরাং হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রতি দয়া করুন! আপনি যখন আমাকে জাহান্নাম হতে বের করেছেন এবং আমি খুশী হয়েছি তখন আর আমাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে।" তার এ কথায় পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর তার প্রতি দয়া হবে এবং তিনি নির্দেশ দিবেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার এ বান্দাকে ছেড়ে দাও।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। তারা এরূপ করে না যে, দান খয়রাত মোটেই করে না, সবই গচ্ছিত ও জমা রাখে। আবার এরূপও করে না যে, নিজের পরিবারবর্গকে বঞ্চিত রেখে সবই দান করে ফেলে। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ এ হুকুমই দিয়েছেনঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

অর্থাৎ "তোমার হাতটি তুমি তোমার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং সম্পূর্ণরূপে ছেড়েও দিয়ো না।" (১৭ঃ ২৯)

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি (জীবন যাপনে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো দরিদ্র হয় না।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য ও ইবাদতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম জিনিস!"[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর পথে যত ইচ্ছা খরচ কর, ওটা ইসরাফ বা অপব্যয় নয়।"

হযরত আইয়াস ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ "যেখানেই তুমি আল্লাহর হুকুমের আগে বেড়ে যাবে ওটাই ইসরাফ হবে।" আর বুযর্গদের উক্তি এই যে, আল্লাহর নাফরমানীতে খরচ করা হলো ইসরাফ।

٦٨- وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ

৬৮। এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।

٦٩- يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ ق

৬৯। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।

٧٠- اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

৭০। তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧١- وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا

৭১। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয়।

১. এটা হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেঃ "তারপর কোনটি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাদ্য খাবে।" পুনরায় লোকটি প্রশ্ন করেঃ "তারপর কোন পাপটি সবচেয়ে বড়?" তিনি উত্তর দেন ঃ "ঐ পাপটি এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়।" হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .... الخ-এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ উক্তিকে সত্যায়িত করা হয়েছে।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হন। আমিও তাঁর পিছন ধরি। তিনি একটি উঁচু জায়গায় বসে পড়েন। আমি তাঁর নীচে বসি। আমি তাঁর সাথে এই নির্জন অবস্থানকে বাক্যালাপের অতি উত্তম সময় মনে করে তাঁকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করি।"

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা চারটি গুনাহ হতে বহু দূরে থাকবে। সেগুলো হলোঃ তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং চুরি করবে না।"[২]

হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা তার সাহাবীদেরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যভিচারের ব্যাপারে তোমরা কি বল?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) ওটা হারাম করেছেন এবং ওটা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "জেনে রেখো যে, মানুষের তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অন্য দশ জন নারীর সাথে ব্যভিচার করা অপেক্ষাও জঘন্যতম।" আবার তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করেনঃ "চুরি সম্পর্কে তোমরা কি বল?" তাঁরা জবাব দেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এটা হারাম করেছেন, সুতরাং এটা হারাম।" তাহলে অনুরূপভাবে জেনে রেখো যে, দশটি বাড়ীতে চুরি করা ততো মন্দ নয়, প্রতিবেশীর একটি বাড়ীতে চুরি করা যতো মন্দ।"[৩]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হায়সাম ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "শিরকের পরে এর চেয়ে বড় পাপ আর নেই যে, মানুষ তার বীর্য এমন রেহেমে বা গর্ভাশয়ে নিক্ষেপ করে যা তার জন্যে হালাল নয়।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকদের কতকগুলো লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকার্য ও ব্যভিচার করেছিল। তারা বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি যা কিছু বলছেন এবং যে দিকে আহ্বান করছেন তার সবই উত্তম ও সত্য। কিন্তু আমরা যেসব পাপকার্য করেছি সেগুলোর ক্ষমা আছে কি?" ঐ সময় وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ....الخ এবং قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ..... الخ (৩৯ঃ ৫৩) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ ফাখতাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলেনঃ "তুমি সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টের উপাসনা করবে এটা থেকে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে নিষেধ করেছেন। আর তুমি তোমার কুকুরকে প্রতিপালন করবে এবং তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এটা থেকেও আল্লাহ তোমাকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তোমাকে এ কাজেও নিষেধ করেছেন যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করবে।"[২]

ঘোষিত হচ্ছেঃ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا অর্থাৎ "যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।"

اَثَام জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এটা হলো ঐ উপত্যকা, যার মধ্যে ব্যভিচারীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এর অর্থ শাস্তিও এসে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি ব্যভিচার হতে বেঁচে থাকবে। কেননা ওর শুরুতেও ভয়, শেষেও ভয়।"

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে মাওকূফ রূপে এবং মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, غَىّ ও اَثَام জাহান্নামের দু'টি কূপ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে এ দুটো হতে রক্ষা করুন! সুদ্দী (রঃ) اَثَام-এর অর্থ 'প্রতিফল' বলেছেন। প্রকাশ্য আয়াতের সাথে এটাই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তী আয়াত যেন এই প্রতিফল ও শাস্তিরই তাফসীর যে, কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।

১. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আবিদ্ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা নয় যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হত্যাকারীর তাওবাও গ্রহণযোগ্য। সূরায়ে নিসায় যে রয়েছে- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ..... الخ (৪ ঃ ৯৩) এ আয়াতটি এর বিপরীত নয়, যদিও এটা মাদানী আয়াত। কেননা, এটা সাধারণ কথা। কাজেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাদের এ কাজ হতে তাওবা করেনি। আর এখানকার এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঐ হত্যাকারীদের উপর যারা তাওবা করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ক্ষমা না করার কথা ঘোষণা করেছেন। আর সহীহ হাদীস দ্বারাও হত্যাকারীর তাওবা কবূল হওয়া প্রমাণিত। যেমন ঐ লোকটির ঘটনা যে একশ' জন লোককে হত্যা করেছিল এবং তারপর তাওবা করেছিল, আর তার তাওবা কবূলও হয়েছিল ইত্যাদি।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এরা ঐসব লোক যারা ইসলাম কবূল করার পূর্বে পাপ কাজ করেছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর পুণ্যের কাজ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাপ কার্যের পরিবর্তে পুণ্যের কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন।

আতা (রঃ) বলেন যে, এটা হলো দুনিয়ার বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে মানুষের বদভ্যাসকে ভাল অভ্যাসে পরিবর্তিত করে থাকেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, মানুষ প্রতিমা পূজার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার তাওফীক লাভ করেছে। মুমিনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তারা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেছে। তারা মুশরিকা নারীদেরকে বিয়ে করার পরিবর্তে মুমিনা নারীদেরকে বিয়ে করেছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, পাপের পরিবর্তে তারা পুণ্যের আমল করতে শুরু করেছে। শিরকের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাওহীদ ও আন্তরিকতা এবং দুষ্কর্মের পরিবর্তে লাভ করেছে পুণ্যশীলতা। একটি অর্থ তো হলো এটা। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাদের তাওবা আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল বলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ খুশী হয়ে তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করেছেন। কেননা, তাওবার পরে যখনই তাদের পূর্বের পাপকর্মগুলোর কথা স্মরণ হতো তখনই তারা লজ্জিত হতো। ঐ সময় তারা দুঃখিত হতো ও ক্ষমা প্রার্থনা

করতো। এ জন্যেই তাদের পাপ আনুগত্যের সাথে বদলে যায়। যদিও ওগুলো আমলনামায় গুনাহরূপে লিখিত হয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন সবই নেকী হয়ে যাবে। এটা হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম হতে বের হবে এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে আমি চিনি। সে হবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে আনয়ন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দিবেনঃ "তার বড় বড় পাপগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট পাপগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ কর।" সুতরাং তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ "অমুক দিন কি তুমি অমুক কাজ করেছিলে? অমুক অমুক পাপ তুমি করেছিলে কি?" সে একটিও অস্বীকার করতে পারবে না, বরং সবটাই স্বীকার করে নিবে। শেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেনঃ "আমি তোমাকে তোমার প্রতিটি পাপের বিনিময়ে পুণ্য দান করেছি।" তখন সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি আরো কতকগুলো কাজ করেছিলাম যেগুলো এখানে দেখছি না?" বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে ওঠেন, এমনকি তাঁর দাঁতের মাড়ী দেখতে পাওয়া যায়।[১]

আবূ মালিক আল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আদম সন্তান যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ফেরেশতা শয়তানকে বলেনঃ "তোমার সহীফাটি (পুস্তিকাটি) আমাকে দাও।" তখন সে ওটা তাঁকে দিয়ে দেয়। তিনি তখন তার এক একটি পুণ্যের বিনিময়ে তার সহীফা হতে দশ দশটি পাপ মুছে ফেলেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউই যখন ঘুমাবার ইচ্ছা করবে তখন যেন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলে নেয়। এগুলো মিলে মোট একশ' বার হবে।[২]

হযরত সালমান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে আমলনামা দেয়া হবে। সে পড়তে শুরু করে দিবে। উপরে তার পাপগুলো লিপিবদ্ধ দেখে সে কিছুটা নিরাশ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি নীচের দিকে পড়বে। সেখানে সে তার পুণ্যগুলো লিপিবদ্ধ দেখবে। ফলে তার মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হবে। অতঃপর পুনরায় সে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে যে তার পাপগুলোও পুণ্যে পরিবর্তিত হয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "বহু লোক আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির হবে যাদের কিছু পাপ থাকবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "তারা কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওরা তারাই যাদের পাপগুলোকে আল্লাহ্ পুণ্যে পরিবর্তিত করবেন।"

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেনঃ "চার প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে। প্রথম হলো মুত্তাকীন বা পরহেযগারী অবলম্বনকারী। দ্বিতীয় হলো শুক্রগুযার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তৃতীয় হচ্ছে আল্লাহকে ভয়কারী এবং চতুর্থ হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "তাদেরকে আসহাবুল ইয়ামীন কেন বলা হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "কেননা, তারা পাপ ও পুণ্য সবই করেছিল। তাদের আমলনামা তারা ডান হাতে পাবে। তারা তাদের পাপের এক একটি অক্ষর দেখে বলবেঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! এগুলোতো আমাদের পাপ, আমাদের পুণ্যগুলো কোথায় গেল?' ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা ঐ পাপগুলোকে মুছে ফেলবেন এবং ওগুলোর স্থলে পুণ্যসমূহ লিখে দিবেন। ওগুলো পড়ে তারা খুশী হবে এবং অন্যদেরকে বলবেঃ 'নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।' জান্নাতীদের অধিকাংশ এরাই হবে।"

যাইনুল আবেদীন আলী ইবনে হুসাইন (রঃ) বলেন যে, পাপকে পুণ্যে পরিবর্তনকরণ আখিরাতে হবে। মাকহূল (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং ওগুলোকে পুণ্যে পরিণত করবেন।

হযরত মাকহূল (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একজন অতি বৃদ্ধ লোক, যার ভ্রুগুলো চোখের উপর এসে গিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করেঃ "আমি এমন একটি লোক যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা, কোন পাপ এবং কোন দুষ্কার্য করতে বাকী রাখিনি। আমার পাপরাশি এতো বেড়ে গেছে যে, যদি সেগুলো সমস্ত মানুষের উপর বন্টন করে দেয়া হয় তবে সবাই আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমার পাপরাশির ক্ষমার কোন উপায় আছে কি? এখনো আমার তাওবা কবূল হতে পারে কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে উত্তরে বলেনঃ "তুমি মুসলমান হয়েছো কি?" লোকটি জবাবে বলেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদান নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি যা কিছু করেছিলে আল্লাহ সবই মাফ করে দিবেন এবং তোমার পাপগুলো পুণ্যে পরিবর্তিত করবেন। যতদিন তুমি এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” সে তখন বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলো (তিনি পুণ্যে পরিবর্তিত করবেন)?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও দুষ্কর্মগুলোই (আল্লাহ তা'আলা পুণ্যে পরিবর্তিত করে দিবেন)।” লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার ছোট-বড় সব পাপই কি মাফ হয়ে যাবে?” তিনি জবাবে বলেনঃ “হ্যাঁ, সবই মাফ হয়ে যাবে।” সে তখন আনন্দে আটখানা হয়ে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তে ফিরে গেল।[১]

হযরত আবূ ফারওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ “যদি একটি লোক শুধু পাপই করে থাকে এবং মনে যা হয়েছে তাই করে থাকে, তবে তারও কি তাওবা কবূল হতে পারে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি ইসলাম কবূল করেছো কি?” তিনি জবাব দেনঃ “হ্যাঁ।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তাহলে এখন থেকে পুণ্যের কাজ করতে থাকো ও পাপের কাজ হতে বিরত থাকো। এ কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পাপগুলোকেও পুণ্যে পরিবর্তিত করবেন।” তিনি বলেনঃ “আমার বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকর্মগুলোও (পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে)?” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যাঁ।” তিনি তখন তাকবীর ধ্বনি করতে করতে প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে এসে বলে—আমি ব্যভিচার করেছি, ওতে শিশুর জন্ম হয়েছে এবং ঐ শিশুকে মেরে ফেলেছি। এর পরেও আমার তাওবা কবূল হওয়ার কোন উপায় আছে কি?” আমি উত্তরে বললামঃ “না, তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে না এবং আল্লাহর নিকট তুমি মর্যাদাও লাভ করবে না। তোমার তাওবা কখনোই কবূল হতে পারে না। এ কথা শুনে মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ফজরের

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নামায আদায় করে আমি তাঁর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ "তুমি তাকে খুবই মন্দ কথা বলেছো। অতঃপর তিনি وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ হতে اِلَّا مَنْ تَابَ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করে আমাকে বললেনঃ "তুমি কি কুরআন কারীমের এ আয়াতগুলো পাঠ করনি।" এতে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং ঐ স্ত্রীলোকটির নিকট গমন করি ও তাকে আয়াতগুলো পাঠ করে শুনাই। তাতে সে খুবই খুশী হয় এবং তৎক্ষণাৎ সিজদায় পড়ে গিয়ে বলতে থাকেঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি আমার মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেছেন।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, মহিলাটি হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর প্রথম ফতওয়াটি শুনে আফসোস করে বলেঃ "হায়! এই সুন্দর আকৃতি কি জাহান্নামের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল?" তাতে এও রয়েছে যে, আবূ হুরাইরা (রাঃ) যখন নিজের ভুল জানতে পারেন তখন তিনি ঐ মহিলাটির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। মদীনার সমস্ত গলিতে তিনি তাকে খোঁজ করেন। কিন্তু কোথায়ও খুঁজে পাননি। ঘটনাক্রমে রাত্রে মহিলাটি আবার আসে। তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তাকে সঠিক মাসআলাটি বলে দেন। এটাও তাতে আছে যে, সে আল্লাহর প্রশংসা করে বলেঃ "তিনি এতই মহান যে, আমার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং আমার তাওবা কবূল হওয়ার কথা বলেছেন।" এ কথা বলে তার সাথে যে দাসীটি ছিল তাকে সে আযাদ করে দেয়। ঐ দাসীটির একটি কন্যাও ছিল। অতঃপর সে বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া, স্নেহ, অনুগ্রহ ও করুণার খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের দুষ্কর্মের কারণে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে বা নিজের নফসের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।" (৪ ঃ ১১০) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন।" (৯ ঃ ১০৪) আর এক আয়াতে আছেঃ

১. এ হাদীসটিও তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "আমার যে বান্দারা তাদের নফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছে (বহু পাপ করেছে) তাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হয়।" (৩৯ঃ ৫৩) অর্থাৎ যারা পাপ করার পর আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে তারা যেন তাঁর করুণা হতে নিরাশ না হয়।

৭২- وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ○

৭২। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।

৭৩- وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○

৭৩। এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।

৭৪- وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

৭৪। আর যারা প্রার্থনা করে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শ স্বরূপ করুন।

আল্লাহর সৎ বান্দাদের আরো বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না অর্থাৎ শিরক করে না, মূর্তিপূজা হতে তারা বেঁচে থাকে। তারা মিথ্যা কথা বলে না, পাপাচারে লিপ্ত হয় না, কুফরী করে না, অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে দূরে থাকে, গান শুনে না এবং মুশরিকদের আনন্দ-উৎসবে যোগদান করে না। তারা মদ্যপান করে না, মদ্যখানায় যায় না এবং ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যে আল্লাহর উপর ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ঐ দস্তরখানায় না বসে যেখানে মদচক্র চলতে থাকে। আবার ভাবার্থ এও হয় যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

হযরত আবূ বুকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের খবর দেবো না?" এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যাঁ (খবর দিন)।" তখন তিনি বললেনঃ "তাহলো আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" তখন পর্যন্ত তিনি বালিশে হেলান লাগিয়েছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেনঃ "আর মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" এ কথা তিনি বারবার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ মনে মনে বললেন যে, যদি তিনি নীরব হতেন![১] কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারা তো এ অর্থই বেশী প্রকাশমান যে, তারা মিথ্যার কাছেও যায় না। এ জন্যেই পরে বর্ণিত হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তারা তা পরিহার করে চলে।

ইবরাহীম ইবনে মাইসার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কোন খেলার পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। সেখানে তিনি না থেমে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদাবান হয়ে গেলেন।[২] আল্লাহ তা'আলার এই বুযর্গ বান্দাদের আর একটি গুণ এই যে, কুরআনের আয়াতগুলো শুনে তাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তাদের ঈমান এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কাফিরদের এরূপ হয় না। কুরআনের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় না। সুতরাং তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে না, কুফরী পরিত্যাগ করে না এবং ঔদ্ধত্যপনা, হঠকারিতা এবং অজ্ঞতা হতে বিরত হয় না। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের ব্যাধি আরো বেড়ে যায়। অতএব, কাফিররা আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে বধির ও অন্ধ হয়।

মুমিনদের অভ্যাস এর বিপরীত। তারা হক হতে বধিরও নয় এবং অন্ধও নয়। তারা শুনে ও বুঝে। আর এর দ্বারা তারা উপকার লাভ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধিত করে নেয়। বহু লোক এমন রয়েছে যারা পাঠ করে, অথচ নিজেদের বধিরতা ও অন্ধত্ব পরিত্যাগ করে না।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত শা'বী (রঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ "একটি লোক এসে দেখে যে, কতকগুলো লোক সিজদায় পড়ে রয়েছে, কিন্তু তারা কোন আয়াতটি পড়ে সিজদায় পড়েছে তা তার জানা নেই। এমতাবস্থায় লোকটি কি তাদের সাথে সিজদায় পড়ে যাবে?" তখন হযরত শা'বী (রঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। অর্থাৎ সে তাদের সাথে সিজদা করবে না। কেননা, সে সিজদার আয়াত পাঠ করেনি, শুনেনি এবং বুঝেনি। আর কোন কাজ অন্ধভাবে করা মুমিনের উচিত নয়। যখন পর্যন্ত তার সামনে কোন জিনিসের হাকীকত না থাকবে তখন পর্যন্ত তার তাতে শামিল হওয়া ঠিক নয়।

অতঃপর এই বুযর্গ বান্দাদের একটি দু'আর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর হয়। অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, তাদের সন্তান-সন্ততিও যেন তাদের মত একত্ববাদী হয় এবং মুশরিক না হয়, যাতে দুনিয়াতেও ঐ সুসন্তানদের কারণে তাদের অন্তর ঠাণ্ডা থাকে এবং আখিরাতেও তাদের ভাল অবস্থা দেখে তারা খুশী হতে পারে। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য তাদের দৈহিক সৌন্দর্য নয়, বরং সততা ও সুন্দর চরিত্রই উদ্দেশ্য। মুসলমানদের প্রকৃত আনন্দ এতেই রয়েছে যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে আল্লাহর অনুগত বান্দারূপে দেখতে পায়। তারা যেন যালিম না হয়, দুষ্কৃতিকারী না হয়, বরং খাঁটি মুসলমান হয়।

হযরত নুফায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আমরা একদা হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। সে বলেঃ "তাঁর দু'চক্ষুর জন্যে মুবারকবাদ, যে চক্ষুদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দর্শন করেছে! আপনি যেমন তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন তেমনই যদি আমরাও তাঁকে দেখতাম ও তাঁর সাহচর্য লাভ করতাম তবে আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য মনে করতাম!" তার এ কথা শুনে হযরত মিকদাদ (রাঃ) অসন্তুষ্ট হলেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, লোকটি তো মন্দ কথা বলেনি, অথচ তিনি অসন্তুষ্ট হলেন কেন! ইতিমধ্যে হযরত মিকদাদ (রাঃ) বললেনঃ "জনগণের কি হয়েছে যে, তারা এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে যা তাদের শক্তির বাইরে এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রদান করেননি? তারা ঐ

সময় থাকলে তবে তাদের অবস্থা কি হতো তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে তো ঐসব লোকও ছিল যারা না তাঁকে বিশ্বাস করেছে এবং না তাঁর আনুগত্য করেছে। ফলে তারা উল্টো মুখে জাহান্নামে চলে গেছে। তোমরা কি আল্লাহর এ অনুগ্রহ স্বীকার কর না যে, তিনি ইসলামে ও মুসলমান ঘরে তোমাদের জন্ম দিয়েছেন? ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই তোমাদের কানে আল্লাহর তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর রিসালাতের শব্দ পৌঁছেছে। আর ঐসব বিপদ-আপদ থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে যেগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এমন যুগে প্রেরণ করেন যখন দুনিয়ার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ঐ সময় দুনিয়াবাসীদের নিকট মূর্তিপূজা অপেক্ষা উত্তম ধর্ম আর কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফুরকান নিয়ে আসলেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করলো এবং এর ফলে পিতা ও পুত্র পৃথক পৃথক হয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে কুফরীর উপর দেখে তাদের উপর থেকে তাদের প্রেম-প্রীতি ও শ্রদ্ধা লোপ পায় এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সব জাহান্নামী। এ জন্যেই তাদের প্রার্থনা ছিলঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর হয়।" কেননা, কাফিরদেরকে দেখে তাদের চক্ষু ঠাণ্ডা হতো না। এই প্রার্থনার শেষে রয়েছেঃ 'আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শ স্বরূপ করুন।' আমরা যেন তাদেরকে পুণ্যকর্মের শিক্ষা দিতে পারি। তারা যেন ভাল কাজে আমাদের অনুসারী হয়। আমাদের সন্তানরা যেন আমাদের পথ অনুসরণ করে, যাতে পুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং তাদের পুণ্যের কারণও যেন আমরা হয়ে যাই।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। প্রথম হলো সুসন্তান, যে তার জন্যে প্রার্থনা করে, দ্বিতীয় হলো সেই ইল্ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় হলো সাদকায়ে জারিয়া (এগুলোর সওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেয়ে থাকে)।"[১]

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

٧٥- أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

৭৫। তাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

٧٦- خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

৭৬। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট।

٧٧- قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

৭৭। বলঃ তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না; তোমরা অস্বীকার করেছো, ফলে অচিরে নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।

মুমিনদের পবিত্র গুণাবলী, তাদের ভাল কথা ও কাজের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা জান্নাত লাভ করবে যা উচ্চতম স্থান। কারণ এই যে, তারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত ছিল। তাই সেখানে তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে।

তাদের জন্যে রয়েছে সেখানে শান্তি আর শান্তি। জান্নাতের প্রতিটি দরযা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের খিদমতে হাযির হবে এবং সালাম জানিয়ে বলবেঃ "তোমাদের পরিণাম ভাল হয়েছে। কেননা, তোমরা ধৈর্যশীল ছিলে।"

তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তারা সেখান হতে বের হবে না এবং তাদের বের করাও হবে না। তথাকার নিয়ামত কম হবে না এবং শান্তি ও আরামের সমাপ্তি আসবে না। তারা হবে বড়ই ভাগ্যবান। তাদের উঠা, বসা এবং বিশ্রামের জায়গা খুবই পাক, সাফ ও মনোরম। দেখতেও সুন্দর এবং বাসের পক্ষেও আরামদায়ক।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে তাঁর ইবাদত বন্দেগী এবং তাসবীহ ও তাহলীলের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। মাখলূক যদি এগুলো পালন না করে তবে সে আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য। ঈমান ছাড়া মানুষ একেবারে অকেজো। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তিনি কাফিরদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা তাঁর নিকট মোটেই গণ্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এসব কাফিরকে বলে দাও- তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করেছো। এখন হে কাফিরের দল! তোমরা মনে করো না যে, তোমাদের মুআ'মালা শেষ হয়ে গেল। জেনে রেখো যে, তোমাদের উপর অচিরে নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শাস্তি তোমাদেরকে জরিয়ে রয়েছে। বদরের দিনে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় পার্থিব শাস্তির একটি বড় প্রমাণ। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এটা বর্ণিত আছে। কিয়ামতের দিনের শাস্তি এখনো বাকী রয়েছে।

সূরাঃ ফুরকান এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ শুআ'রা, মাক্কী
سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াতঃ ২২৭, রুকূ'ঃ ১১)
(اٰيَاتُهَا: ٢٢٧، رُكُوْعَاتُهَا: ١١)

মালিক (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতকৃত তাফসীরে এই সূরার নাম দেয়া হয়েছে 'সূরায়ে জামেআহ'।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তোয়া-সীন-মীম।

١- طٰسٓمّٓ ○

২। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

৩। তারা মুমিন হচ্ছে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।

٣- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

৪। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়তো ওর প্রতি।

٤- اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ○

৫। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٥- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ○

৬। তারা তো মিথ্যা জেনেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।

٦- فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○

৭। তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃকপাত করে না? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।

٨- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

৮। নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

৯। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে গত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এগুলো হলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, যা খুবই স্পষ্ট, সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দের মধ্যে ফায়সালা ও পার্থক্যকারী।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ তারা ঈমান আনয়ন করছে না বলে তুমি দুঃখ করো না এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলো না। এভাবে তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অর্থাৎ "তারা ঈমান আনয়ন করছে না বলে তুমি দুঃখ করে নিজেকে ধ্বংস করো না।" (৩৫ঃ ৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ

অর্থাৎ "হয়তো তাদের পিছনে পড়ে তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।" (১৮ঃ৬)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়তো ওর প্রতি। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করার ইচ্ছা করলে আমি এমন জিনিস আকাশ হতে অবতীর্ণ করতাম যে, তা দেখে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হতো। কিন্তু

আমি তো তাদের ঈমান আনা বা না আনা তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সবাই অবশ্যই ঈমান আনয়ন করতো। তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়?" (১০ঃ ৯৯) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি সমস্ত মানুষকে একই উম্মত (দল) করতে পারতেন।" (১১ঃ ১১৮) দ্বীন ও মাযহাবের এই বিভিন্নতাও আল্লাহ তা'আলারই নির্ধারণকৃত এবং এটা তাঁর নিপুণতা প্রকাশকারী। তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন, অতঃপর তিনি মানুষকে ঈমান আনয়ন করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এখন যে পথে ইচ্ছা সে চলতে থাকুক।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ যখনই আকাশ হতে তাদের নিকট কোন কিতাব আসে তখনই অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "তুমি লালসা করলেও অধিকাংশ লোক মুমিন নয়।" (১২ঃ ১০৩) তিনি আরো বলেনঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ "পরিতাপ বান্দাদের জন্যে; তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।" (৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি, কিন্তু যখনই কোন উম্মতের কাছে তাদের রাসূল এসেছে, তারা তাকে অবিশ্বাসই করেছে।" (২৩ ঃ ৪৪) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ "তারা তো অস্বীকার করেছে; সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে।" যালিমরা অতিসত্বরই জানতে পারবে যে, তাদেরকে কোন পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের শান-শওকত, ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ যাঁর কথা এবং যাঁর দূতকে তোমরা অবিশ্বাস করছো তিনি এতো বড় ক্ষমতাবান ও চির বিরাজমান যে, তিনি একাই সারা যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেত, ফলমূল, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি সবই তাঁর সৃষ্ট।

হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, মানুষ যমীনের উৎপন্নদ্রব্য স্বরূপ। তাদের মধ্যে যারা জান্নাতী তারা শরীফ ও ভদ্র এবং যারা জাহান্নামী তারা ইতর ও ছোটলোক। এতে সৃষ্টিকর্তার বিরাট ক্ষমতার বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে যে, তিনি বিস্তৃত যমীন ও উঁচু আসমান সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। বরং উল্টো তারা নবীদেরকে প্রতারক বলে থাকে। আল্লাহর কিতাবসমূহকে তারা স্বীকার করে না, তাঁর হুকুমের তারা বিরোধিতা করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ করে থাকে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে তাঁর সৃষ্টজীব সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম। সাথে সাথে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণাময় ও অনুগ্রহশীল। তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাড়াতাড়ি করেন না, বরং শাস্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন, যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও তারা সৎ পথে ফিরে আসে না। তখন তিনি তাদেরকে অতি শক্তভাবে পাকড়াও করেন এবং তাদের থেকে পুরোপুরিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তবে যারা তাওবা করতঃ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যায়, তাদের প্রতি তিনি তাদের পিতা-মাতার চেয়েও বেশী দয়া করে থাকেন।

১০- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালকমূসা (আঃ)- কে ডেকে বললেনঃ তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও।

১১- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ○

১১। ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না?

১২- قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

১২। তখন সে বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

১৩- وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ○

১৩। এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নয়, সুতরাং হারূন (আঃ)-এর প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান।

১৪- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○

১৪। আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

১৫- قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ○

১৫। আল্লাহ্ বললেনঃ না, কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী।

১৬- فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬। অতএব তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট যাও এবং বল– আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

১৭। আর আমাদের সাথে যেতে দাও বানী ইসরাঈলকে।

١٧- اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ

১৮। ফিরাউন বললোঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছো।

١٨- قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ

১৯। তুমি তো তোমার কর্ম যা করবার তা করেছো; তুমি অকৃতজ্ঞ।

١٩- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২০। মূসা (আঃ) বললোঃ আমি তো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম।

٢٠- قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ؕ

২১। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম; তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন।

٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২২। আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছো, তা তো এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছো।

٢٢- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা এবং রাসূল হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়ের ডান দিক হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দেন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে নিজের রাসূল ও মনোনীত বান্দারূপে নির্বাচন করেন। তাঁকে তিনি ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করেন, যে ছিল চরম অত্যাচারী বাদশাহ। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় মোটেই ছিল না। হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট স্বীয় দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন এবং তা তাঁর পক্ষ থেকে দূর করে দেয়া হয়। যেমন সূরায়ে তোয়া–হায় তাঁর প্রার্থনার পরে বলা হয়ঃ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! তোমার প্রার্থিত জিনিস তোমাকে দিয়ে দেয়া হলো।" (২০ঃ ৩৬) এখানে তিনি তাঁর ওজর বর্ণনা করে বলেনঃ "আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আমার জিহ্বায় জড়তা রয়েছে। সুতরাং (আমার বড় ভাই) হারূন (আঃ)-কেও আমার সাথে নবী বানিয়ে দিন। আর আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন কিবতীকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিলাম। ঐ কারণে আমি মিসর ছেড়েছিলাম। তাই এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা হয়তো আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" জবাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বললেনঃ "ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার ভাইকে আমি তোমার সঙ্গী বানিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রদান করলাম। সুতরাং তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা জয়যুক্ত হবে। তোমরা আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে তার কাছে যাও এবং তাকে বুঝাতে থাকো। তোমাদের সাথে আমার সাহায্য রয়েছে। তোমাদের ও তাদের সব কথাই আমি শুনতে থাকবো এবং তোমাদের সবকিছুই আমি দেখতে থাকবো। আমার হিফাযত, সাহায্য-সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা তোমাদের সাথে রইলো। কাজেই তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে গিয়ে বল, আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূলরূপে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি।" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ অর্থাৎ "আমরা দু'জন তোমার প্রতিপালকের রাসূল।" (২০ঃ ৪৭) আল্লাহ তাদেরকে আরো বলতে বললেনঃ বানী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। তারা আল্লাহর মুমিন বান্দা। তুমি তাদেরকে তোমার দাস বানিয়ে রেখেছো এবং তাদের অবস্থা করেছো অত্যন্ত শোচনীয়। তুমি তাদের দ্বারা লাঞ্ছনার সাথে সেবার কাজ করিয়ে নিচ্ছ

এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিচ্ছ। এখন তুমি তাদেরকে আযাদ করে দিয়ে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।

হযরত মূসা (আঃ)-এর এ পয়গাম ফিরাউন অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞানে শুনলো এবং তাঁকে ধমকের সুরে বললোঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছো। আর তুমি আমাকে এর প্রতিদান এই দিয়েছো যে, আমাদের একটি লোককে হত্যা করেছো। তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ। তার একথার জবাবে হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ "আমি তো এটা করেছিলাম। তখন যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম এবং ওটা ছিল আমার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে مِنَ الضَّالِّيْنَ -এর স্থলে مِنَ الْجَاهِلِيْنَ রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ ঐ যুগ চলে গেছে, এখন অন্য যুগ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে রাসূল করে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। এখন যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও তবে তুমি শান্তি লাভ করবে। আর যদি আমাকে অবিশ্বাস কর তবে নিঃসন্দেহে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি যে ভুল করেছিলাম ওর পর তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার প্রতি আল্লাহ এই অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং এখন পুরাতন কথার উল্লেখ না করে আমার দাওয়াত কবূল করে নাও। জেনে রেখো যে, তুমি আমার একার প্রতি একটা অনুগ্রহ করেছিলে বটে, কিন্তু আমার কওমের উপর তুমি যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছো। তাদেরকে তুমি অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে রেখেছো। আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছো এবং আমার কওমের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করেছো দুটো কি সমান হবে?

২৩। ফিরাউন বললোঃ জগত সমূহের প্রতিপালক আবার কি?

٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ

২৪। মূসা (আঃ) বললোঃ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

২৫- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৫। ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বললোঃ তোমরা শুনছো তো!

২৬- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৬। মূসা (আঃ) বললোঃ তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

২৭- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৭। ফিরাউন বললোঃ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটিতো নিশ্চয়ই পাগল।

২৮- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৮। মূসা বললোঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতোদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে।

ফিরাউন তার প্রজাবর্গকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, পূজনীয় ও প্রতিপালক শুধু সেই, সে ছাড়া আর কেউই নয়। ফলে তাদের সবারই বিশ্বাস এটাই ছিল। হযরত মূসা (আঃ) যখন বললেন যে, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল তখন সে বললোঃ "জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি?" তার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, সে ছাড়া তো কোন প্রতিপালকই নেই। সুতরাং মূসা (আঃ) ভুল বলছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَامُوْسٰى অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! তোমাদের দু'জনের প্রতিপালক কে?" (২০ ঃ ৪৯) উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ-নির্দেশ করেছেন।" (২০ঃ ৫০)

এখানে এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ এখানে হোঁচট খেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ফিরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার মূল বা প্রকৃতি সম্পর্কে। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল ধারণা। কেননা, মূল সম্পর্কে সে তখনই প্রশ্ন করতো যখন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতো। সে তো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতো না। সে তার ঐ বিশ্বাসকেই প্রকাশ করতো এবং প্রত্যেককে এই বিশ্বাসই ঢোকের ঢোক পান করাতো যদিও ওর বিপরীত দলীল প্রমাণাদি তার সামনে খুলে গিয়েছিল। তাই সে যখন প্রশ্ন করলো যে, রাব্বুল আলামীন কে? তখন তিনি উত্তর দেন যে, যিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, সবারই মালিক এবং যিনি সব কিছুর উপরই সক্ষম তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনি একাই পূজনীয়, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। উর্ধ্বজগত আকাশ এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু নিম্নজগত পৃথিবী এবং ওর সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবারই তিনি সৃষ্টিকর্তা। এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস, যেমন বাতাস, পাখী ইত্যাদি সবই তাঁর সামনে নত এবং তাঁর ইবাদতে লিপ্ত। তিনি বলেনঃ "হে ফিরাউন! তোমার অন্তর যদি বিশ্বাসরূপ সম্পদ হতে শূন্য না হতো এবং তোমার চক্ষু যদি উজ্জ্বল হতো তবে তাঁর এসব বিশেষণ তাঁর সত্তাকে মানবার পক্ষে যথেষ্ট হতো।" হযরত মূসা (আঃ)-এর এ কথাগুলো শুনে ফিরাউন কোন উত্তর দিতে না পেরে কথাগুলোকে হাসি-তামাশা করে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললোঃ "দেখো, এ লোকটি আমাকে ছাড়া অন্যকে মা'বূদ বলে বিশ্বাস করছে, এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!" হযরত মূসা (আঃ) তার এ মনোযোগিতায় হতবুদ্ধি হলেন না, বরং তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের আরো দলীল প্রমাণ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ 'তিনিই তোমাদের সবারই এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মালিক ও প্রতিপালক।' তিনি ফিরাউনের লোকদেরকে বললেনঃ "তোমরা যদি ফিরাউনকে খোদা বলে স্বীকার করে নাও তবে একটু চিন্তা করে দেখো তো যে, ফিরাউনের পূর্বে জগতবাসীর খোদা কে ছিল? তার অস্তিত্বের পূর্বে তো আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব ছিল, তাহলে এগুলোর আবিষ্কারক কে ছিল? সুতরাং আল্লাহই আমার প্রতিপালক, তিনিই সারা জগতের প্রতিপালক। আমি তাঁরই প্রেরিত রাসূল।"

ফিরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর কথাগুলোর কোন উত্তর খুঁজে পেলো না। তাই সে মুখ না পেয়ে তার লোকদেরকে বললোঃ 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত

তোমাদের এ রাসূলটি তো নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে আমাকে ছাড়া অন্যকে কেন সে প্রতিপালক বলে স্বীকার করবে?' হযরত মূসা (আঃ) এর পরেও তাঁর দলীল বর্ণনার কাজ চালিয়ে গেলেন। তার বাজে কথায় কর্ণপাত না করে তিনি বললেনঃ "আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুরই প্রতিপালক। হে ফিরাউনের লোকেরা। ফিরাউন যদি তার খোদায়ী দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে এর বিপরীত দেখিয়ে দিক। অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বকে পূর্ব করেছেন এবং সেখান থেকে নক্ষত্রগুলো উদিত হয়। আর পশ্চিমকে তিনি পশ্চিম করেছেন এবং সেখানে তারকারাজি অস্তমিত হয়। সুতরাং ফিরাউন এগুলোর প্রতিপালক হলে সে এর বিপরীত করে দেখাক।" একথাই আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সময়ের বাদশাহকে তর্কে বলেছিলেন। প্রথমে তো তিনি আল্লাহর বিশেষণ বর্ণনা করেছিলেন যে, তিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু দান করে থাকেন। কিন্তু ঐ নির্বোধ যখন ঐ বিশেষণকে আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট করতে অস্বীকার করে এবং বলেঃ 'এ কাজ তো আমিও করতে পারি?' তখন তিনি ওর চেয়েও সুস্পষ্টতর দলীল তার সামনে পেশ করে বললেনঃ "আচ্ছা, আমার প্রতিপালক সূর্য পূর্ব দিক হতে উদিত করেন, তুমি ওটা পশ্চিম দিক হতে উদিত কর দেখি?" হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ কথা শুনে ঐ নির্বোধ বাদশাহ হতবাক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর মুখে ক্রমান্বয়ে এরূপ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল শুনে ফিরাউনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে, তার মত একটি লোক যদি হযরত মূসা (আঃ)-কে না মানে তবে কি আসে যায়? এসব স্পষ্ট দলীল প্রমাণ তো তার লোকদের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। এ জন্যেই সে নিজের কওমের প্রতি মনোযোগ দিলো এবং হযরত মূসা (সঃ)-কে ধমকাতে শুরু করলো, যেমন সামনে আসছে।

২৯। ফিরাউন বললোঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করবো।

٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

٣٠- قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ

৩০। মূসা (আঃ) বললোঃ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?

٣١- قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৩১। ফিরাউন বললোঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা উপস্থিত কর।

٣٢- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ

৩২। অতঃপর মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো।

٣٣- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ

৩৩। আর মূসা (আঃ) হাত বের করলো আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো।

٣٤- قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ

৩৪। ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বললোঃ এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।

٣٥- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ

৩৫। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার যাদুবলে বহিষ্কৃত করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল?

٣٦- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

৩৬। তারা বললোঃ তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।

৩৭। যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

٣٧- يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ○

ফিরাউন যখন বিতর্কে হেরে গেল, দলীল ও বর্ণনায় বিজয়ী হতে পারলো না, তখন সে ক্ষমতার দাপট প্রকাশ করতে লাগলো এবং গায়ের জোরে সত্যকে দাবিয়ে রাখার ইচ্ছা করলো। সে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আমাকে ছাড়া অন্যকে যদি তুমি মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর তবে জেলখানায় আমি তোমাকে বন্দী করবো এবং সেখানেই মড়িয়ে পচিয়ে তোমার জীবন শেষ করবো।" তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও কি তুমি বিশ্বাস করবে না?' ফিরাউন উত্তরে বললোঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন আনয়ন কর।'

হযরত মূসা (আঃ) তখন তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। মাটিতে পড়া মাত্রই লাঠিটি এক বিরাটাকার অজগর হয়ে গেল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) তাঁর হাতটি বের করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো। কিন্তু ফিরাউনের ভাগ্যে ঈমান ছিল না বলে এমন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখার পরেও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা পরিত্যাগ করলো না। সে তার পারিষদবর্গকে বললোঃ "এ লোকটি তো এক সুদক্ষ যাদুকর। এ তোমাদেরকে তার যাদুবলে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা আমাকে কি করতে বল?" আল্লাহ তা'আলার কি মাহাত্ম্য যে, তিনি ফিরাউনের লোকদের মুখ দিয়ে এমন কথা বের করালেন যার ফলে হযরত মূসা (আঃ) সাধারণভাবে তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেন এবং লোকদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পথ পরিষ্কার হলো। তা হলো যাদুকরদেরকে প্রতিযোগিতার জন্যে আহ্বান করা।

৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হলো।

٣٨- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○

٣٩- وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ○

৩৯। আর লোকদেরকে বলা হলোঃ তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?

٤٠- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ○

৪০। যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।

٤١- فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ○

৪১। অতঃপর যাদুকররা এসে ফিরাউনকে বললোঃ আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?

٤٢- قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

৪২। ফিরাউন বললোঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٤٣- قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ○

৪৩। মূসা (আঃ) তাদেরকে বললোঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার তা নিক্ষেপ কর।

٤٤- فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ○

৪৪। অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তারা বললোঃ ফিরাউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো।

٤٥- فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

৪৫। অতঃপর মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো।

٤٦- فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ۝

৪৬। তখন যাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়লো।

٤٧- قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝

৪৭। তারা বললোঃ আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি–

٤٨- رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۝

৪৮। যিনি মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এরও প্রতিপালক।

হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের মধ্যে যে মৌখিক তর্ক-বিতর্ক চলছিল তা শেষ হলো এবং এখন কার্যের বিতর্ক শুরু হলো। এই বিতর্কের আলোচনা সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে তোয়া-হা এবং এই সূরায় রয়েছে। কিবতীদের ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করা, আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল নূরকে ছড়িয়ে দেয়া। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা বিজয় লাভ করেছে। যেখানেই ঈমান ও কুফরীর মধ্যে মুকাবিলা হয়েছে সেখানেই ঈমান কুফরীর উপর বিজয়ী হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ হককে বাতিলের উপর জয়যুক্ত করে থাকেন। বাতিলের মস্তক চূর্ণ হয় এবং লোকদের বাতিল ইচ্ছা বাতাসে উড়ে যায়। সত্য এসে পড়ে এবং মিথ্যা পালিয়ে যায়। এখানেও এটাই হলো। প্রতিটি শহরে পুলিশ পাঠিয়ে দেয়া হয়। চতুর্দিক থেকে বড় বড় খ্যাতনামা যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। কথিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার বা পনেরো হাজার অথবা সতেরো হাজার বা উনিশ হাজার অথবা আশি হাজার কিংবা এর চেয়ে কিছু কম বা বেশী। সঠিক সংখ্যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এই যাদুকরদের গুরু ও নেতা ছিল চারজন। তাদের নাম ছিল সা'বূর, আ'যূর, হাতহাত এবং মুসাফ্ফা। দেশের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল বলে নির্ধারিত দিনের পূর্বেই চতুর্দিক হতে দলে দলে লোক এসে মিসরে জমা হয়ে যায়। এটা একটা সুপরিচিত নীতি যে, প্রজারা তাদের বাদশাহর মাযহাবের উপর থাকে, তাই সবারই মুখ দিয়ে একটি কথা বের হচ্ছিলঃ 'যাদুকরদের বিজয় লাভের পর আমরা তাদেরই অনুসারী হয়ে যাবো।' এ কথা কারো মুখ দিয়ে বের হয়নিঃ 'হক যে দিকে হবে আমরাও সেই দিকে হয়ে যাবো।' যথাস্থানে ফিরাউন আমীর-ওমরাহকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গমন করলো। সাথে

সৈন্য-সামন্তও ছিল। যাদুকরদেরকে সে তার সামনে ডাকিয়ে নিলো। যাদুকররা ফিরাউনকে বললোঃ 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?' ফিরাউন জবাবে বললোঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুধু পুরস্কার নয়, বরং তোমরা আমার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

তারা তখন আনন্দে আটখানা হয়ে ময়দানের দিকে চললো। সেখানে গিয়ে তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললোঃ "তুমি প্রথমে উস্তাদী দেখাবে, না আমরাই প্রথমে দেখাবো?" হযরত মূসা (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "তোমরাই প্রথমে দেখাও।" অতঃপর যাদুকররা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং বললোঃ "ফিরাউনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো।" যেমন সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা যখন কোন কাজ করে তখন বলেঃ "এটা অমুকের পুণ্যের কারণে হয়েছে।" সূরায়ে আ'রাফে রয়েছে যে, যাদুকররা মানুষের চোখে যাদু করে দেয় এবং তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে ও বড় রকমের যাদু প্রকাশ করে। সূরায়ে তোয়া-হায় আছে যে, তাদের লাঠিগুলো ও তাদের রজ্জুগুলো তাদের যাদুর কারণে নড়ছে বলে অনুভূত হতে তাকে (শেষপর্যন্ত)।

এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তিনি ময়দানে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে ওটা বিরাট অজগর হয়ে যায় এবং ময়দানে যাদুকরদের যতগুলো নযরবন্দীর জিনিস ছিল সবগুলোকেই খেয়ে ফেলে। সুতরাং হক বিজয়ী হয় এবং বাতিল পরাভূত হয়। যাদুকরদের সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। এ দেখে যাদুকররা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, একটি মাত্র লোক যাদু বিদ্যায় পারদর্শী বহু লোকের সাথে মুকাবিলা করে বিজয়ী হয়ে গেল এটা কোন সাধারণ লোক হতে পারে না। যাদু যাদুই বটে। আর এ লোকটির কাছে যা রয়েছে তা কখনো যাদু হতে পারে না, বরং এটা আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা। তারা সেখানেই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়ে এবং সমবেত লোকদের সামনে নিজেদের আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা ঘোষণা করে। তারা বলেঃ "আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।" অতঃপর নিজেদের কথাকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্যে বলেঃ "জগতসমূহের প্রতিপালক বলতে আমরা তাঁকেই বুঝাচ্ছি যাঁকে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) তাঁদের প্রতিপালক বলছেন।"

এতো বড় পরিবর্তন ফিরাউন স্বচক্ষে দেখলো, কিন্তু ঐ অভিশপ্তের ভাগ্যে ঈমান লিখিত ছিল না বলে তখনও তার চোখ খুললো না, বরং সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর আরো বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। স্বীয় ক্ষমতাবলে সে সত্যকে দূর করে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। সে যাদুকরদেরকে বললোঃ "আমি বুঝতে পেরেছি যে, মূসা (আঃ) তোমাদের সবারই উস্তাদ ছিল। তোমরা বুদ্ধি করে তাকে প্রথমে পাঠিয়েছিলে। তারপর বাহ্যতঃ মুকাবিলা করার জন্যে নিজেরা ময়দানে নেমেছিলে। অতঃপর গোপন পরামর্শ অনুযায়ী তার কাছে পরাজয়বরণ করে নিলে এবং তাকে মেনে নিলে। কাজেই তোমাদের প্রতারণা আমার কাছে আর গোপন নেই।"

৪৯। ফিরাউন বললোঃ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে; আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করবো এবং তোমাদের সবকে শূলবিদ্ধ করবই।

٤٩- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৫০। তারা বললোঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।

٥٠- قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

৫১। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের

٥١- اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

خَطِيْنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।

যাদুকরদের ঈমানের পরিপক্কতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তারা তো সবেমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করেছে, অথচ তাদের ধৈর্য ও অটলতা এমনই যে, ফিরাউনের মত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর সম্রাট তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ধমকাচ্ছে, আর তারা নির্ভীক হয়ে তার মুখের সামনে তার ইচ্ছার বিপরীত জবাব দিচ্ছে। কুফরীর পর্দা তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে। তাই তারা বুক ফুলিয়ে ফিরাউনের সাথে মুকাবিলায় লেগে পড়েছে। তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা রয়েছে, এটা অর্জিত যাদু নয়। সুতরাং তারা সত্যকে কবূল করে নিয়েছে। ফিরাউন তাদের উপর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে এবং তাদেরকে বলেছেঃ "তোমরা আমাকে কিছুই মনে করলে না? বরং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মূসা (আঃ)-কে মেনে নিলে? আমার নিকট অনুমতিও প্রার্থনা করলে না?" একথা বলার পর সে চিন্তা করলো যে, না জানি হয় তো যাদুকরদের পরাজিত হওয়া ও তাদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার প্রভাব তথায় সমবেত লোকদের উপর পড়ে যাবে, তাই একটি কথা বানিয়ে নিয়ে বললোঃ "আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা সবাই মূসা (আঃ)-এর শিষ্য এবং সে তোমাদের গুরু। সেই তোমাদের সবকে যাদু শিখিয়েছে।"এটা ছিল ফিরাউনের সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমানী ও প্রতারণামূলক কথা। ইতিপূর্বে যাদুকররা না হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখেছিল, না হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে চিনতেন। আল্লাহর পয়গম্বর তো নিজেই যাদু জানতেন না, সুতরাং অপরকে তিনি তা শিখাবেন কি করে? বুদ্ধির বিপরীত একথা বলে ফিরাউন যাদুকরদের ধমকাতে শুরু করলো এবং নিজের অত্যাচারমূলক নীতিতে নেমে আসলো। সে যাদুকরদেরকে বললোঃ "আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করবো। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করে ছাড়বো।" যাদুকরদের সবাই সমস্বরে জবাব দিলোঃ "এতে কোন ক্ষতি নেই। তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার। এটাকে আমরা মোটেই পরোয়া করি না। আমাদেরকে তো

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে যেতেই হবে। আমরা তাঁরই নিকট আমাদের কাজের প্রতিদান চাই। যত কষ্ট তুমি আমাদেরকে দেবে ততই পুণ্য আমরা তাঁর নিকট লাভ করবো। সত্যের উপর বিপদ-আপদ সহ্য করা তো সাধারণ ব্যাপার, যাকে আমরা মোটেই ভয় করি না। আমাদের তো এখন কামনা এটাই যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করবেন। তাঁর নবী (আঃ)-এর সাথে যে মুকাবিলা তুমি আমাদের দ্বারা করিয়ে নিয়েছো তার শাস্তি আমাদের উপর পতিত হবে না। এ জন্যে আমাদের নিকট এছাড়া কোন মাধ্যম নেই যে, আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছি।" যাদুকরদের এ উত্তর শুনে ফিরাউন আরো চটে গেল এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেললো।

٥٢- وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

৫২। আমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি অহী করেছিলাম এই মর্মেঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও; তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

٥٣- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ○

৫৩। অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠালো,

٥٤- اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیْلُوْنَ ○

৫৪। এই বলেঃ এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল।

٥٥- وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ○

৫৫। তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।

٥٦- وَاِنَّا لَجَمِیْعٌ حٰذِرُوْنَ ○

৫৬। এবং আমরা তো একদল সদা সতর্ক।

٥٧- فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ○

৫৭। পরিণামে আমি ফিরাউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে।

৫৮। এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।	٥٨- وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ
৫৯। এইরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।	٥٩- كَذٰلِكَ ؕ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ؕ

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর নবুওয়াতের বহু যুগ ফিরাউন ও তার লোকদের মধ্যে কাটিয়ে দেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী ও দলীল প্রমাণাদি তাদের উপর খুলে দেন। কিন্তু তবুও তাদের মাথা নীচু হলো না, অহংকার কমলো না এবং বদদেমাগীর মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা দিলো না। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেল যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ার আর কিছুই বাকী থাকলো না। এমতাবস্থার মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অহী করলেনঃ "আমার নির্দেশ মোতাবেক তুমি বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর হতে বেরিয়ে পড়।" এই সময় বানী ইসরাঈল কিবতীদের নিকট হতে বহু অলংকার ধার স্বরূপ গ্রহণ করে এবং চাঁদ ওঠার সময় তারা চুপচাপ মিসর হতে প্রস্থান করে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ঐ রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) পথে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবর কোথায় আছে?" একজন বৃদ্ধা তাঁর কবরটি দেখিয়ে দেয়। হযরত মূসা (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর তাবূতটি (শবাধারটি) সাথে নেন। কথিত আছে যে, স্বয়ং তিনিই তাবূতটি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অসিয়ত ছিল যে, বানী ইসরাঈল এখান দিয়ে গমনের সময় যেন তাঁর তাবূতটি সাথে নিয়ে যায়।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন বেদুঈনের বাড়ীতে অতিথি হন। সে তাঁর খুব খাতির সম্মান করে। ফিরবার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "মদীনায় গেলে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।" কিছুদিন পর ঐ বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "কিছু চাও।" সে বললোঃ "হাওদাসহ আমাকে একটি উষ্ট্রী দিন এবং দুগ্ধবতী একটি ছাগী দিন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে

বলেনঃ "বড়ই আফ্সোস যে, তুমি বানী ইসরাঈলের বুড়ীর মত চাওনি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বানী ইসরাঈলের বুড়ীর ঘটনাটি কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যখন হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পথ চলছিলেন তখন তিনি পথ ভুলে যান। বহু চেষ্টা করেও তিনি পথ ঠিক করতে পারলেন না। তিনি তখন লোকদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি? আমরা পথ ভুল করলাম কেন?" বানী ইসরাঈলের আলেমগণ তখন বললেনঃ "ব্যাপার এই যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় আমাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন আমরা মিসর হতে চলে যাবো তখন যেন তাঁর তাবূতটিও (শবাধারটিও) এখান থেকে আমাদের সাথে নিয়ে যাই।" হযরত মূসা (আঃ) তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ "হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবর কোথায় আছে তা তোমাদের কার জানা আছে?" সবাই উত্তরে বললোঃ "আমরা কেউ এটা জানি না। আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন বুড়ী এটা জানে।" হযরত মূসা (আঃ) তখন লোক মারফত বুড়ীকে বলে পাঠালেন যে, সে যেন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবরটি তাঁকে দেখিয়ে দেয়। বুড়ী বললোঃ "হ্যাঁ, আমি দেখিয়ে দিতে পারি, তবে প্রথমে আমার প্রাপ্য আমাকে দিতে হবে।" হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ "তুমি কি চাও?" সে উত্তরে বললোঃ "জান্নাতে আমি আপনার সাথে থাকতে চাই।" হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে বুড়ীর এই দাবী খুবই ভারীবোধ হয়। তৎক্ষণাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে অহী আসলোঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি ঐ বুড়ীর শর্ত মেনে নাও।" বুড়ী হযরত মূসা (আঃ)-কে একটি বিলের নিকট নিয়ে গেল যার পানির রঙ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বুড়ী বললোঃ "এর পানি উঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দিন।" তার কথামত বিলের পানি বের করে দেয়া হলে মাটি দেখা গেল। বুড়ী তখন বললোঃ "এ জায়গা খনন করতে বলুন।" মাটি খনন করলে কবরটি প্রকাশিত হয়ে পড়লো। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাবূতটি সঙ্গে নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। এবার রাস্তা পরিষ্কারভাবে দেখা গেল এবং তিনি সঠিক পথ পেয়ে গেলেন।"[১]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল। সত্যের কাছাকাছি এটাই যে, হাদীসটি মাওকূফ, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথাই এটা নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ লোকগুলো তো তাদের পথে চলতে থাকলো। আর ওদিকে ফিরাউন ও তার লোকেরা সকালে দেখলো যে, চৌকিদার, গোলাম ইত্যাদি কেউই নেই। সুতরাং তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল এবং রাগে লাল হয়ে গেল। যখন তারা জানতে পারলো যে, রাতে বানী ইসরাঈলের সবাই পালিয়ে গেছে তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। ফিরাউন তৎক্ষণাৎ সৈন্য জমা করতে লাগলো। সকলকে একত্রিত করে সে তাদেরকে বললোঃ "বানী ইসরাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল। তারা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। সদা-সর্বদা তারা আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিতে রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। حَاذِرُوْنَ -এর কিরআতে এই অর্থ হবে। পূর্বযুগীয় গুরুজনদের একটি দল حَذِرُوْنَ পড়েছেন। তখন অর্থ হবেঃ "আমরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রয়েছি এবং ইচ্ছা করেছি যে, তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার স্বাদ গ্রহণ করাবো। তাদের সকলকে এক সাথে ঘিরে ফেলে কচুকাটা করবো।" আল্লাহর কি মহিমা যে, এটা তাদের উপরই ফিরে আসলো। ফিরাউন তার কওম ও লোক-লশ্‌করসহ একই সময়ে ধ্বংস হয়ে গেল। (তার উপর ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক)।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ পরিণামে আমি ফিরাউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও ধন-ভাণ্ডার হতে এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। তাদের ব্যাপারে এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি এ সমুদয়ের অধিকারী করেছিলাম। যারা অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হতো তাদেরকে আমি চরম সম্মানিত বানিয়ে দিলাম। এরূপ করারই আমার ইচ্ছা ছিল এবং আমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করলাম।

৬০। তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়লো।

٦٠- فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝

৬১। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখলো তখন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা বললোঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

٦١- فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝

٦٢- قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

৬২। মূসা (আঃ) বললো ঃ কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক, সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন।

٦٣- فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

৬৩। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি অহী করলামঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।

٦٤- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ۝

৬৪। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।

٦٥- وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

৬৫। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা (আঃ) ও তার সঙ্গী সকলকে।

٦٦- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝

৬৬। তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।

٦٧- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

৬৭। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

٦٨- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ ع

৬৮। তোমার প্রতিপালক- তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ফিরাউন তার সমস্ত লোক-লশ্‌কর, সমস্ত প্রজা এবং মিসরের ভিতরের ও মিসরের বাইরের লোক, নিজস্ব লোক ও নিজের কওমের লোকদেরকে নিয়ে

বড়ই আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে তচনচ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন যে, তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। তাদের মধ্যে এক লক্ষ তো শুধু কালো রঙের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। এটা হলো আহলে কিতাবের খবর, যে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আট লক্ষ লোক এরূপ ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। আমাদের ধারণা তো এই যে, এসব হলো বানী ইসরাঈলেরঅতিরঞ্জিত কথা। কুরআন কারীমে এটুকু রয়েছে যে, ফিরাউন তার গোটা দল নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি। এটা জেনে আমাদের কোন লাভও নেই।

সূর্য উদয়ের সময় ফিরাউন তার দলবলসহ বানী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছে যায়। কাফিররা মুমিনদেরকে এবং মুমিনরা কাফিরদেরকে দেখতে পায়। হঠাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ "হে মূসা (আঃ) ! বলুন, এখন উপায় কি? আমরা তো ধরা পড়ে যাবো। সামনে রয়েছে লোহিত সাগর এবং পিছনে রয়েছে ফিরাউনের অসংখ্য সৈন্য। কাজেই আমাদের এখন উভয় সংকট!" এটা স্পষ্ট কথা যে, নবী ও গায়ের নবী কখনো সমান হয় না। হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত শান্ত মনে জবাব দিলেনঃ "ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমাদের উপর কোন বিপদ আসতে পারে না। আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাদেরকে নিয়ে বের হইনি, বরং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে বের হয়েছি। তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।" তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হযরত হারূন (আঃ)! তাঁর সাথেই হযরত ইউশা ইবনে নূন ছিলেন অথবা ফিরাউনের বংশের কোন একজন মুমিন লোক ছিল। আর হযরত মূসা (আঃ) সেনাবাহিনীর শেষাংশে ছিলেন। ভয় ও পথ না পাওয়ার কারণে বানী ইসরাঈলের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়ায় এবং উদ্বেগের সাথে হযরত মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "এই পথে চলারই কি আল্লাহর নির্দেশ ছিল?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ।" ইতিমধ্যে ফিরাউনের সেনাবাহিনী তাদের একেবারে মাথার কাছেই এসে পড়ে। তৎক্ষণাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহর অহী আসেঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার লাঠি দ্বারা তুমি সমুদ্রে আঘাত কর। তারপর আমার ক্ষমতার নিদর্শন দেখে নাও। তিনি তখন সমুদ্রে তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। আঘাত করা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে পানি ফেটে গেল। ঐ

উদ্বেগের অবস্থায় তিনি নিম্নরূপ দু'আ করেন যা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত আছেঃ

يَا مَنْ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ الْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْ لَنَا مَخْرَجًا

অর্থাৎ "হে ঐ সত্তা যিনি প্রত্যেক জিনিসের পূর্বে ছিলেন এবং প্রত্যেক জিনিসের পরে থাকবেন, আমাদের জন্যে বের হওয়ার স্থান তৈরী করে দিন।"

হযরত মূসা (আঃ)-এর মুখে এ দু'আ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই তাঁর উপর সমুদ্রে লাঠি মারার অহী এসে পড়ে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ঐ রাত্রে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই সমুদ্রের প্রতি অহী করেছিলেনঃ "আমার নবী মূসা (আঃ) যখন আসবে এবং তোমার উপর তার লাঠি দ্বারা আঘাত করবে তখন তুমি তার কথা শুনবে ও মানবে।" ঐ রাত্রে সমুদ্রের অবস্থা চিল অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। সমুদ্র এদিক-ওদিক তরঙ্গায়িত হচ্ছিল যে, না জানি হযরত মূসা (আঃ) কখন এবং কোন দিক হতে লাঠি মারবেন এবং সে হয়তো খবর রাখবে না ও তাঁর নির্দেশ পালন করতে পারবে না। যখন তাঁরা একেবারে তীরে পৌঁছে যান তখন তাঁর সঙ্গী হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আপনার উপর আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ রয়েছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমার উপর এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমি যেন সমুদ্রের উপর আমার লাঠি দ্বারা আঘাত করি।" হযরত ইউশা (আঃ) তখন বলেনঃ "তাহলে আর বিলম্ব কেন?" তাঁর এ কথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) সমুদ্রে লাঠি দ্বারা আঘাত করেন এবং বলেনঃ "আল্লাহর হুকুমে তুমি ফেটে যাও এবং আমার জন্যে রাস্তা করে দাও।" তৎক্ষণাৎ সমুদ্র ফেটে যায় এবং ওর মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে রাস্তা দেখা যায়। ওর আশে পাশে পাহাড়ের মত হয়ে পানি খাড়া হয়ে যায়। তাতে বারোটি পথ বের হয়। বানী ইসরাঈলও বারোটি গোত্রেই বিভক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহর কুদরতে প্রতি দু'দলের মাঝে যে পাহাড় প্রতিবন্ধকরূপে ছিল তাতে তাক বা খিলান নির্মিত হয়ে যায়, যাতে প্রত্যেকে একে অপরকে নিরাপদে আসতে যেতে দেখতে পায়। পানি প্রাচীরের মত হয়ে যায়। আর বাতাসকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সে যেন মধ্য থেকে পানি ও মাটিকে শুকিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দেয়। সুতরাং ঐ শুষ্ক পথ ধরে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কওমসহ নির্ভয়ে চলতে শুরু করেন। তারপর ফিরাউন ও তার

দলবলকে সমুদ্রের নিকটবর্তী করে দেয়া হয়। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও বানী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের একজনও ডুবে যাওয়া হতে রেহাই পায়নি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ফিরাউন যখন বানী ইসরাঈলের পলায়নের খবর জানতে পারে তখন সে একটি বকরী যবাহ্ করে এবং বলেঃ "এর চামড়া ছাড়িয়ে নেয়ার পূর্বেই আমার সামনে ছয় লক্ষ সৈন্য জমা হওয়া চাই।" হযরত মূসা (আঃ) পালিয়ে গিয়ে যখন সমুদ্রের ধারে পৌঁছেন তখন তিনি সমুদ্রকে বলেনঃ "তুমি ফেটে যাও এবং সরে গিয়ে আমাদের জন্যে জায়গা করে দাও।" সমুদ্র উত্তরে বলেঃ "আপনি যে অহংকারের ভঙ্গীতে কথা বলছেন! ইতিপূর্বে কি আমি কখনো ফেটেছি ও সরে গিয়ে কোন মানুষকে জায়গা করে দিয়েছে যে, আপনাকে জায়গা করে দেবো?" তাঁর সাথে যে বুযর্গ ব্যক্তিটি ছিলেন তিনি তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! এটাই কি আল্লাহর বলে দেয়া রাস্তা ও জায়গা?" জবাবে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, এটাই।" তখন ঐ বুযর্গ লোকটি বললেনঃ "আপনি মিথ্যাবাদীও নন এবং আপনাকে ভুল কথাও বলা হয়নি।" হযরত মূসা (আঃ) দ্বিতীয়বারও সমুদ্রকে ঐ কথাই বললেন, কিন্তু তখনো কিছুই হলো না। ঐ বুযর্গ লোকটি পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন করেন, একই জবাব পান এবং তিনি আবার ঐ একই কথা বলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর উপর অহী করা হয়ঃ "সমুদ্রের উপর তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর।" এবার তাঁর একথা স্মরণ হয়ে যায় এবং তিনি সমুদ্রের উপর লাঠির আঘাত করেন। আঘাত করা মাত্রই সমুদ্র রাস্তা করে দেয়। বারোটি রাস্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ রাস্তা চিনে নেয়। তারপর তারা নিজ নিজ পথ ধরে চলতে থাকে এবং একে অপরকে দেখতে দেখতে নিরাপদে সবাই পার হয়ে যায়।

হযরত মূসা (আঃ) তো বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করলেন, আর ওদিকে ফিরাউন ও তার লোক-লশ্কর তাদের পশ্চাদ্ধাবনে সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়লো। হঠাৎ আল্লাহর নির্দেশক্রমে সমুদ্রের পানি যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল এবং তারা সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। যখন বানী ইসরাঈলের শেষ ব্যক্তি সমুদ্র হতে বের হলো এবং সর্বশেষ কিব্তী সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়লো, ঠিক ঐ সময় আল্লাহ পাকের হুকুমে সমুদ্রের পানি এক হয়ে গেল এবং

এক এক করে সমস্ত কিবতী পানিতে নিমজ্জিত হলো। এতে বড় রকমের নিদর্শন রয়েছে যে, কিভাবে গুনাহগার ধ্বংস হয় এবং নেককার পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তথাপিও অধিকাংশ লোক ঈমানরূপ সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৬৯। তাদের নিকট ইবরাহীম (আঃ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

٦٩- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ○

৭০। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা কিসের ইবাদত কর?

٧٠- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○

৭১। তারা বললোঃ আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় নিরত থাকবো।

٧١- قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○

৭২। সে বললোঃ তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?

٧٢- قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○

৭৩। অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?

٧٣- اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○

৭৪। তারা বললোঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।

٧٤- قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৭৫। সে বললোঃ তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো যার পূজা করছো?

٧٥- قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○

৭৬। তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা?

٧٦- اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○

৭৭। তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত।	٧٧- فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মতের সামনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন, যাতে তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর ইবাদত এবং শিরক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টিতে তাঁর অনুসরণ করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ তাওহীদের উপর কায়েম থাকেন।

তিনি তাঁর পিতাকে এবং কওমকে বলেনঃ "তোমরা এসব কিসের ইবাদত কর?" তারা উত্তরে বলেঃ "আমরা তো প্রাচীন যুগ থেকেই মূর্তি-পূজা করে আসছি।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের ভুল নীতি তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তাদের ভুল চাল–চলন পর্দাহীন করার জন্যে তাদের সামনে আর একটি বর্ণনা তুলে ধরে বলেনঃ "তোমরা তো তাদের কাছে প্রার্থনা করে থাকো এবং দূর থেকে ও নিকট থেকে তাদেরকে ডেকে থাকো, তারা তোমাদের ডাক শুনে থাকে কি? যখন তোমরা উপকার লাভের আশায় তাদেরকে ডাকো তখন তারা তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারে কি? কিংবা যদি তোমরা তাদের ইবাদত ছেড়ে দাও তবে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে কি?"

কওমের পক্ষ থেকে তিনি যে উত্তর পেলেন তাতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের ঐ মা'বূদগুলো এসব কাজের কোনটাই করতে সক্ষম নয়। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিলো যে, তারা শুধু তাদের বড়দের অনুকরণ করছে মাত্র। তাদের এ জবাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের প্রতি ও তাদের বাতিল মা'বূদদের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দিলেনঃ "তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা করতে রয়েছো তাদের সবারই প্রতি আমি চরম অসন্তুষ্ট। তারা সবাই আমার শত্রু। আমি শুধু জগতসমূহের সঠিক প্রতিপালকের পূজারী। আমি খাঁটি একত্ববাদী।

যাও, তোমরা ও তোমাদের মা'বূদরা আমার যে ক্ষতি করার ইচ্ছা কর করে নাও।"

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে একথাই বলেছিলেনঃ "তোমরা ও তোমাদের মা'বূদরা সব মিলিত হয়ে যদি আমার কিছু ক্ষতি করতে পার তবে করে নাও।" হযরত হূদও (আঃ) বলেছিলেনঃ "আমি আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর প্রতিই অসন্তুষ্ট। তোমরা সবাই যদি আমার কিছু ক্ষতি করতে সক্ষম হও তবে করতে পার। আমার প্রতিপালকের সত্তার উপর আমার ভরসা রয়েছে। সমস্ত প্রাণী তাঁর অধীনস্থ, তিনি সরল সোজা পথের উপর রয়েছেন।" অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কওমকে বললেনঃ "আমি তোমাদের মা'বূদদেরকে মোটেই ভয় করি না। বরং তোমাদেরই তো আমার প্রতিপালককে ভয় করা উচিত। যিনি সত্য আল্লাহ।" তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেনঃ "তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে শত্রুতা থাকবে যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন কর। হে আমার পিতা! আমি তোমার, তোমার কওম এবং তোমার মা'বূদদের হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমি শুধু আমার প্রতিপালকের উপরই আশা রাখি যে, তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।" ওটাকেই অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌কেই তিনি কালেমা বানিয়ে নেন।

৭৮। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন।

৭৮- الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝

৭৯। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

৭৯- وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ۝

৮০। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

৮০- وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

৮১। আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।

৮১- وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝

৮২। আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন।	٨٢- وَالَّذِىٓ اَطۡمَعُ اَنۡ يَّغۡفِرَ لِىۡ خَطِيۡٓـَٔتِىۡ يَوۡمَ الدِّيۡنِؕ

এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রতিপালকের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব গুণে গুণান্বিত প্রতিপালকেরই ইবাদত করি। তিনি ছাড়া আর কারো আমি ইবাদত করবো না। তাঁর প্রথম গুণ এই যে, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনিই হলেন প্রকৃত পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে চান তাঁর পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে চান ভুল পথে পরিচালিত করেন। আমার প্রতিপালকের তৃতীয় গুণ এই যে, তিনি হলেন সৃষ্টজীবের আহার্যদাতা। আসমান ও যমীনের সমস্ত উপকরণ তিনিই প্রস্তুত করেছেন। মেঘ উঠানো, ছড়ানো এবং তা হতে বৃষ্টি বর্ষানো, তা দ্বারা পৃথিবীকে সঞ্জীবিতকরণ এবং এরপর যমীন হতে ফসল উৎপাদন এসব তাঁরই কাজ। তিনিই সুপেয় ও পিপাসা নিবারণকারী পানি আমাদেরকে দান করেন এবং তাঁর অন্যান্য সৃষ্টজীবকেও দান করে থাকেন। মোটকথা, আহার্য ও পানীয় দানকারী তিনিই। সাথে সাথে আমাদেরকে সুস্থতা দানও তাঁরই কাজ। এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ ভদ্রতা রক্ষা করেছেন যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্বন্ধ তিনি নিজের দিকে করেছেন, আর রোগমুক্তির সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহ তা'আলার দিকে। অথচ রোগও তো তাঁরই নির্ধারণকৃত ও তৈরীকৃত জিনিস।

এই সৌন্দর্য ও নমনীয়তা সূরায়ে ফাতেহাতেও রয়েছে। ইনআম ও হিদায়াতের সম্বন্ধ রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দিকে। আর গযবের ফায়েল বা কর্তাকে লুপ্ত রাখা হয়েছে। সূরায়ে জ্বিনে জ্বিনদের উক্তিতেও এটাই পরিলক্ষিত হয়। এক জায়গায় তারা বলেছেঃ "আমরা জানি না জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।" এখানেও মঙ্গলের নিসবত বা সম্বন্ধ প্রতিপালকের দিকে করা হয়েছে এবং অমঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়নি। অনুরূপভাবে এই আয়াতেও রয়েছেঃ আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। ওষুধের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করা তাঁরই হাতে। মরণ ও জীবনের উপরও ক্ষমতাবান তিনিই। প্রথম এবং শেষ

তাঁরই হাতে। প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়বার তিনিই পুনরুত্থিত করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতের পাপরাশি মার্জনা করার ক্ষমতা তাঁরই। তিনি যা চান তাই করেন। ক্ষমাশীল ও দয়ালু তিনিই।

٨٣- رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِى بِالصّٰلِحِيْنَ

৮৩। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন।

٨٤- وَاجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْأٰخِرِيْنَ

৮৪। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন!

٨٥- وَاجْعَلْنِى مِن وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ

৮৫। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

٨٦- وَاغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ

৮৬। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٨٧- وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ

৮৭। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে।

٨٨- يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

৮৮। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না।

٨٩- إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

৮৯। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।

এটা হলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা যে, তাঁর প্রতিপালক যেন তাঁকে হুকুম দান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা (হুক্‌ম) হলো ইলম বা জ্ঞান। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো আকল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো কুরআন। আর সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো নবুওয়াত। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন যে, তিনি যেন তাঁকে এগুলো দান করে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ লোকদের সাথে মিলিত করেন। যেমন নবী (সঃ) জীবনের শেষ সময়ে বলেছিলেন– اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ "হে আল্লাহ! উচ্চ ও মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।" একথা তিনি তিন বার বলেছিলেন।"

হাদীসে নিম্নরূপে দু'আও রয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَامُبَدَّلِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমানরূপে জীবিত রাখুন, ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং সৎ লোকদের সাথে মিলিত করুন, এমন অবস্থায় যে, না হয় কোন অপমান এবং না হয় কোন পরিবর্তন।"

এরপর তিনি আরো দু'আ করেনঃ 'আমাকে আমার পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন। লোকেরা যেন আমার পরে আমাকে স্মরণ করে এবং কাজে কর্মে আমার অনুসরণ করে।' সত্যি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাঁর আলোচনা বাকী রাখেন। প্রত্যেকেই তাঁর উপর সালাম পাঠিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন সৎ বান্দার পুণ্য বৃথা যেতে দেন না। একটি জগত রয়েছে যার যবান তাঁর প্রশংসা কীর্তনে সদা সিক্ত থাকে। দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও কল্যাণ দান করেন। সাধারণতঃ প্রত্যেক মাযহাব ও মিল্লাতের লোক তাঁর সাথে মহব্বত রাখে।

তিনি আরো দু'আ করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আখিরাতে আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

তিনি আরো প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! আমার পথভ্রষ্ট পিতাকেও আপনি ক্ষমা করে দিন।" পিতার জন্যে এই ক্ষমা প্রার্থনা করা তাঁর একটি ওয়াদার কারণে ছিল। কিন্তু যখন তাঁর কাছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাঁর পিতা ছিল

আল্লাহর শত্রু এবং সে কুফরীর উপরই মৃত্যু বরণ করেছে তখন তার প্রতি তাঁর মহব্বত দূর হয়ে যায় এবং এরপর তিনি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাও ছেড়ে দেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন বড়ই পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী এবং খুবই সহনশীল। আমাদেরকেও যেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর রীতি নীতির উপর চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না।

এরপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনায় বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করবেন না।" অর্থাৎ যেই দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মাখলূককে জীবিত করে একই ময়দানে দাঁড় করানো হবে সেই দিন যেন তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা না হয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ হবে। তিনি দেখবেন যে, তাঁর পিতার চেহারা লাঞ্ছনায় ও ধূলো-বালিতে আচ্ছন্ন রয়েছে।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। ঐ সময় তিনি বলবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "জেনে রেখো যে, জান্নাত কাফিরদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে হারাম।"

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলবেনঃ "তুমি আমার নাফরমানী করো না একথা কি আমি তোমাকে বলেছিলাম না?" পিতা উত্তরে বলবেঃ "আচ্ছা, আর নাফরমানী করবো না।" তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করবেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এই দিন আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। কিন্তু আজ এর চেয়ে বড় অপমান আমার

১. ইমাম বুখারী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি আনয়ন করেছেন।

জন্যে আর কি হতে পারে যে, আমার পিতা আপনার রহমত হতে দূরে রয়েছে?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হে আমার বন্ধু! আমি তো জান্নাত কাফিরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছি।" অতঃপর তিনি বলবেনঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! দেখো তো, তোমার পায়ের নীচে কি?" তখন তিনি দেখবেন যে, এক কুৎসিত বেজি কাদাপানি মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ওটাই হবে তাঁর পিতা যার ঐরূপ আকৃতি করে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। ঐ দিন মানুষ যদি তার ক্ষতিপূরণ মাল-ধন দ্বারা আদায় করতে চায়, এমনকি যদি দুনিয়া ভর্তি সোনাও প্রদান করে তবুও তা নিষ্ফল হবে। ঐ দিন উপকার দানকারী হবে ঈমান, আন্তরিকতা এবং শিরক ও মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্টি। যাদের অন্তর পরিষ্কার হবে, অর্থাৎ অন্তর শিরক ও কুফরীর ময়লা আবর্জনা হতে পাক পবিত্র থাকবে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে সত্য জানবে, কিয়ামতকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করবে, পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখবে, আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, যাদের অন্তর কপটতা ইত্যাদি রোগ হতে মুক্ত থাকবে ও অন্তর ঈমান, ইখলাস ও নেক আকীদায় পূর্ণ থাকবে, যারা বিদআতকে ঘৃণা করবে এবং সুন্নাতের প্রতি মহব্বত রাখবে, সেই তারাই উপকৃত হবে।

৯০। মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত।	٩٠- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ
৯১। এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম	٩١- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۙ
৯২। তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়- তোমরা যাদের ইবাদত করতে	٩٢- وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ
৯৩। আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে	٩٣- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ هَلْ

يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۝

অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?

٩٤- فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝

৯৪। অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٩٥- وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝

৯৫। এবং ইবলীসের বাহিনীর সবকেও।

٩٦- قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝

৯৬। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে–

٩٧- تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৯৭। আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম।

٩٨- إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৯৮। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করতাম।

٩٩- وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝

৯৯। আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।

١٠٠- فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ۝

১০০। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।

١٠١- وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝

১০১। কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।

١٠٢- فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১০২। হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটতো তাহলে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

١٠٣- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

১০৩। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মুমিন নয়।

১০৪। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٠٤- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

যারা সৎ কাজ করেছিল, অসৎ কাজ হতে বিরত থেকেছিল, ঐ দিন জান্নাত তাদের পার্শ্বে ও তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নাম এরূপভাবেই অসৎ লোকদের সামনে প্রকাশিত হবে। ওর মধ্য হতে একটি গ্রীবা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যে পাপীদের দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবে এবং এমনভাবে চীৎকার শুরু করবে যে, প্রাণ উড়ে যাবে। মুশরিকদেরকে অত্যন্ত ধমকের সুরে বলা হবেঃ তোমরা যেসব বাতিল মা'বূদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে কি? অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম কি? না, না। বরং উপাসক ও উপাস্য সবাইকে আজ জাহান্নামে লটকিয়ে রাখা হয়েছে। তারা আজ জাহান্নামের আগুনে ভস্মিভূত হচ্ছে। অনুসারী ও অনুসৃত সকলকে সেদিন অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর সাথে সাথে ইবলীসের সেনাবাহিনীর সবকেও অনুরূপভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সেখানে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দুর্বল লোকেরা বড় লোকদের সাথে ঝগড়া করবে ও বলবেঃ "আমরা সারা জীবন তোমাদের কথামত চলেছি। সুতরাং আজ তোমরা আমাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করছো না কেন? সত্য কথা তো এই যে, আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। তোমাদের নির্দেশাবলীকে আমরা আল্লাহর নির্দেশাবলী মনে করে নিয়েছিলাম। বিশ্ব-প্রতিপালকের সাথে তোমাদেরও আমরা ইবাদত করেছিলাম। আমরা তোমাদেরকে যেন আমাদের প্রতিপালকের সমান মনে করেছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পাপীরা আমাদেরকে ঐ ভুল ও বিপজ্জনক পথে পরিচালিত করেছিল। এখন তো আমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী নেই।" তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ "আমাদের জন্যে সুপরিশ করবে এরূপ কোন সুপারিশকারী আছে কি? অথবা আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে কি? সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের পূর্বকৃত আমলের বিপরীত আমল করতাম! এখানে আমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারে এমন কাউকেও দেখছি না এবং কোন সত্যিকারের বন্ধুও পরিলক্ষিত হচ্ছে না যে, সে

আমাদের এই দুঃখের সময় সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।" কেননা তারা জানে যে, যদি কোন ভাল লোকের সাথে তাদের বন্ধুত্ব থাকতো তবে অবশ্যই তারা তাদের উপকার করতো এবং যদি তাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকতো তবে অবশ্যই তাদের সুপরিশের জন্যে সামনে এগিয়ে যেতো। আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে তারা তাদের দুষ্কর্ম সংশোধন করে নিতো। কিন্তু সত্য কথা তো এই যে, পুনরায় যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়া দেয়াও হয় তবুও তারা আবার ঐ দুষ্কর্মই করতে থাকবে। যেহেতু তারা হলো চরম হতভাগ্য। সূরায়ে صٓ এও আল্লাহ তা'আলা এই জাহান্নামীদের বিতর্কের কথা বর্ণনা করে বলেনঃ

إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

অর্থাৎ "এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।" (৩৮ঃ ৬৪)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের কওমের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন ও তাদেরকে তাওহীদের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন তাতে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর আল্লাহ হওয়ার উপর এবং তাঁর একাকীত্বের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তবুও অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না। স্বীয় নবী (সঃ)-কে মহান আল্লাহ সম্বোধন করে বলেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার প্রতিপালক মাহাপরাক্রমশালী এবং সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

১০৫। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

١٠٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ۚ

১০৬। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ (আঃ) তাদেরকে বললোঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٠٦- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ

১০৭। আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٠٧- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

১০৮। অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

١٠٨- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

১০৯। আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

١٠٩- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১১০। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١١٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যখন মূর্তি-পূজা শুরু হয় এবং জনগণ শয়তানী পথে চলতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের ক্রম হযরত নূহ (আঃ)-এর দ্বারা সূচনা করেন। তিনি জনগণকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু তবুও তারা তাদের দুষ্কর্ম হতে বিরত হলো না। গায়রুল্লাহর ইবাদত তারা পরিত্যাগ করলো না। বরং উল্টোভাবে হযরত নূহ্ (আঃ)-কেই তারা মিথ্যাবাদী বললো, তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং তাঁকে কষ্ট দিতে থাকলো। হযরত নূহ্ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করার অর্থ যেন সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করা। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নূহ (আঃ)-এর কওম রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ্ (আঃ) তাদেরকে বললো– তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো শুধু জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। সুতরাং তোমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা। আমার সত্যবাদিতা, আমার শুভাকাঙ্ক্ষা তোমাদের উপর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সাথে সাথে আমার বিশ্বস্ততাও তোমাদের কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশমান।

১১১। তারা বললোঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?

١١١- قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝

১১২। নূহ্ (আঃ) বললোঃ তারা কি করতো তা আমার জানা নেই।

١١٢- قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

১১৩। তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে।

١١٣- إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ

১১৪। মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।

١١٤- وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

১১৫। আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

١١٥- إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۗ

হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম তাঁর পয়গামের উত্তর দেয় যে, কতকগুলো ইতর শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, কাজেই তাঁর অনুসরণ তারা কি করে করতে পারে? তাদের একথার জবাবে আল্লহর নবী হযরত নূহ্ (আঃ) বলেনঃ আমার এটা দায়িত্ব নয় যে, যে আমার আহ্বানে সাড়া দেবে আমি তার পেশা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ রাখা এবং হিসাব গ্রহণ আল্লাহ তা'আলারই কাজ। বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার যে, তোমাদের বুদ্ধিটুকুও নেই! তোমাদের এ চাহিদা পূরণ করা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত। তা এই যে, আমার মজলিস হতে আমি মিসকীনদেরকে দূরে সরিয়ে দিই। মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। যে আমাকে মানবে সে-ই আমার লোক। আর যে আমাকে মানবে না তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। যে আমার দাওয়াত কবূল করবে সে আমার এবং আমি তার, সে ইতর হোক বা ভদ্রই হোক এবং ধনী হোক বা দরিদ্রই হোক।

১১৬। তারা বললোঃ হে নূহ্ (আঃ)! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١١٦- قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۗ

১১৭ – قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ۝

১১৭। নূহ্ (আঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে।

১১৮ – فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৮। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন!

১১৯ – فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

১১৯। অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌ-যানে।

১২০ – ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۝

১২০। তৎপর অবশিষ্ট সবকে নিমজ্জিত করলাম।

১২১ – اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১২১। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

১২২ – وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১২২। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু

দীর্ঘদিন ধরে হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে অবস্থান করেন। দিন-রাত তাদেরকে তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু যতই তিনি সৎ কর্মে বেড়ে চলেন ততই তারা মন্দ কর্মে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শক্তির দাপট দেখিয়ে বলেঃ "যদি তুমি আমাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া বন্ধ না কর তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো।" তিনিও তখন তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দেন। তিনি

বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন।" মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং মানুষ, জীবজন্তু ও আসবাব-পত্রে ভরপুর নৌকায় আরোহণের নির্দেশ দেন। এরপর আসমান ও যমীন হতে প্লাবন এসে পড়ে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত কাফিরের মূলোৎপাটিত হয়। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুমিন নয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, আবার সাথে সাথে তিনি পরম দয়ালুও বটে।

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ۝

১২৩। আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।

١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১২৪। যখন তাদের ভ্রাতা হূদ (আঃ) তাদেরকে বললোঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٢٥- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১২৫। আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১২৬। অতএব, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٢٧- وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২৭। আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

١٢٨- اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝

১২৮। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছো নিরর্থক?

১২৯। আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।

١٢٩- وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝

১৩০। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাকো কঠোরভাবে।

١٣٠- وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝

১৩১। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার আনুগত্য কর।

١٣١- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১৩২। ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমুদয় যা তোমরা জান।

١٣٢- وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝

১৩৩। তোমাদেরকে দিয়েছেন আনআ'ম ও সন্তান-সন্ততি।

١٣٣- أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝

১৩৪। উদ্যান ও প্রস্রবণ।

١٣٤- وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

১৩৫। আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তির।

١٣٥- إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

এখানে হযরত হূদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায় আ'দ জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তারা ছিল আহ্কাফের অধিবাসী। আহ্কাফ হলো ইয়ামন দেশের হায্রা মাউতের পার্শ্ববর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল। হযরত হূদ (আঃ)-এর যুগটি ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী যুগ। সূরায়ে আ'রাফেও তাঁর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আ'দ সম্প্রদায়কে হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করা হয় এবং তাদেরকে বেশ স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়। তারা ছিল সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। জমি-জমা, বাগ্-বাগীচা, ফলমূল, নদী-প্রস্রবণ ইত্যাদির প্রাচুর্য তাদের ছিল। মোটকথা, সুখের সামগ্রী তাদের সবই ছিল। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর নিয়ামতরাশির জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং

তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করেছিল। নবী (আঃ)-কে তারা অবিশ্বাস করেছিল। নবী তো ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর রাসূল হওয়ার কথা বলার পর তাঁর আনুগত্য করার এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করার দাওয়াত দেন, যেমন হযরত নূহ্ (আঃ) দাওয়াত দিয়েছিলেন।

তারা তাদের শক্তি ও ধনৈশ্বর্যের নিদর্শন রূপে উঁচু উঁচু প্রসিদ্ধ পাহাড়ের উপর উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে এভাবে মাল অপচয় করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, ওটা শুধু মাল অপচয় করা, সময় নষ্ট করা এবং কষ্ট উঠানো ছাড়া কিছুই ছিল না। ওতে না ছিল দ্বীনের কোন উপকার এবং না ছিল কোন উপকার দুনিয়ার। তাদের নবী হযরত হূদ (আঃ) তাই তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছো? তোমরা কি মনে করেছো যে, এখানে তোমরা চিরস্থায়ী হবে? দুনিয়া তোমাদেরকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। জেনে রোখো যে, তোমাদের এ মনোবাসনা নিরর্থক। দুনিয়া তো নশ্বর। তোমরা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। একটি কিরআতে كَاَنَّكُمْ خَالِدُوْنَ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মুসলমানরা গূতায় বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে ও সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরী করে তখন হযরত আবূদ দারদা (রাঃ) এসব দেখে মসজিদে দাঁড়িয়ে যান এবং উচ্চ স্বরে বলেনঃ "হে দামেস্কের অধিবাসী! তোমরা আমার কথা শুনো!" জনগণ সব একত্রিত হলে তিনি হাম্দ ও সানার পর বলেনঃ "তোমাদের কি লজ্জা হয় না, তোমরা কি এটা খেয়াল করছো না যে, তোমরা যা জমা করতে শুরু করেছো তা তোমরা খেতে পার না? তোমরা এমন ঘরবাড়ী তৈরী করতে শুরু করে দিয়েছো যেগুলো তোমাদের বসবাসের কাজে লাগবে না। তোমরা এমন দূরের আশা করতে শুরু করেছো যা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা ভুলে গেছো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বহু কিছু জমা করেছিল, বড় বড় ও উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, বড় রকমের আশা তারা পোষণ করেছিল, কিন্তু ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, তারা প্রতারিত হয়েছিল, তাদের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘরবাড়ী, দালান-কোঠা মূলোৎপাটিত হয়েছিল। আ'দ

সম্প্রদায়কে দেখো, আদ্‌ন হতে আম্মান পর্যন্ত তাদের ঘোড়া ও উট ছিল। কিন্তু তারা আজ কোথায়? এমন কোন নির্বোধ আছে কি যে আ'দ সম্প্রদায়ের মীরাসকে মাত্র দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে?

আল্লাহ্ তা'আলা আ'দ সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত ও ঘরবাড়ীর বর্ণনা দেয়ার পর তাদের বল ও শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা বড়ই উদ্ধত, অহংকারী ও পাষাণ হৃদয় ছিল। আল্লাহ্‌র নবী হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখালেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঐ সব নিয়ামতের কথা স্মরণ করালেন যেগুলো মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেছিলেন। যেমন চতুষ্পদ জন্তু, সন্তান-সন্ততি, উদ্যান এবং প্রস্রবণ। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনি তাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতের লোভ দেখান এবং জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সবই বিফলে যায়।

١٣٦- قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝

১৩৬। তারা বললোঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান।

١٣٧- اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৩৭। এটাতো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।

١٣٨- وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

১৩৮। আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।

١٣٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম, এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٤٠- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ (ع ٨ / ١١)

১৪০। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

হযরত হূদ (আঃ)-এর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এবং উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনযুক্ত ভাষণ তাঁর কওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলো না। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিলোঃ "(হে হূদ আঃ)! তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও আর না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। আমরা তোমার কথা মেনে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে পারি না। আমাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তোমাদের নিরাশ হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো না।" প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের অবস্থা এটাই। তাদেরকে বুঝানো ও উপদেশ দান বৃথা।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছিলেনঃ "যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর বা না-ই কর, উভয়ই তাদের জন্যে সমান, তারা ঈমান আনবে না।" আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনয়ন করবে না।"

خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ -এর দ্বিতীয় কিরআত خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ ও রয়েছে। অর্থাৎ 'হে হূদ (আঃ)! তুমি যে কথা আমাদেরকে বলছো এটা তো পূর্ববর্তীদের কথিত কথা।' যেমন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলঃ "এগুলো তো পূর্ববর্তীদের কাহিনী, যেগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তোমার সামনে পাঠ করা হয়।" আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "এটা একটা মিথ্যা অপবাদ যা তুমি নিজেই গড়িয়ে নিয়েছো এবং কিছু লোককে নিজের পক্ষে করে নিয়েছো।" প্রসিদ্ধ কিরআত হিসেবে অর্থ হবেঃ "যার উপর আমরা রয়েছি ওটাই আমাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাব। আমরা তো তাদের পথেই চলবো এবং তাদের রীতি-নীতিরই অনুসরণ করবো। আর এর উপরই আমরা মৃত্যু বরণ করবো। তুমি যা বলছো তা বাজে কথা। মৃত্যুর পরে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে এটা ঠিক নয়। আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না।" শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবিশ্বাস করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করে তাদেরকে মূলোৎপাটিত করা হয়। এরাই ছিল প্রথম আ'দ। এদেরকেই ইরামাযাতিল ইমাদ বলা হয়েছে। এরা ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর ছিল। তারা সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করতো। ইরাম ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর পৌত্রের নাম। ইরাম কোন শহরের নাম ছিল না। কেউ কেউ ইরামকে শহরের নামও বলেছেন বটে, কিন্তু এটা বানী ইসরাঈলের উক্তি। তাদের মুখ থেকে শুনে অন্যেরাও একথা বলে

দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এর কোন মযবূত দলীল নেই। এ কারণেই কুরআন কারীমে ইরামের উল্লেখের পরেই বলা হয়েছেঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ

অর্থাৎ "যার সমতুল্য কোন শহরে সৃষ্টি করা হয়নি।" (৮৯ঃ ৮) যদি ইরাম দ্বারা শহর উদ্দেশ্য হতো তবে বলা হতোঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ "কোন দেশ যার মত শহর নির্মাণ করা হয়নি।" কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ -

অর্থাৎ "আ'দ সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে এবং বলে—আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী? তারা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।" (৪১ ঃ ১৫)

এটা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, তাদের উপর শুধু বলদের নাক পরিমাণ বায়ু পাঠিয়েছিলেন। ঐ বায়ুই তাদের শহরগুলো এবং তাদের ঘরবাড়ীগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেখান দিয়েই ঐ বায়ু প্রবাহিত হয় সব সাফ করে দেয়। কওমের সবারই মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহর শাস্তিকে তারা বাতাসের আকারে দেখে দূর্গে, প্রাসাদে এবং সুরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গর্ত খনন করে তারা তাদের অর্ধেক দেহকে তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর শাস্তিকে কোন কিছু বাধা দিতে পারে কি? এ শাস্তি এক মিনিটের জন্যেও কাউকেও অবকাশ দেয় না। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদের এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ "আ'দ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।" মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়। আল্লাহ্ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

١٤١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

১৪১। সামূদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।

١٤٢- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ

১৪২। যখন তাদের ভ্রাতা সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললোঃ তোমরা সাবধান হবে না?

١٤٣- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

১৪৩। আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

১৪৪। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٤٥- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْـهِ مِنْ اَجْـرٍ ۚ اِنْ اَجْـرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

১৪৫। আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

আল্লাহ তা'অলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তাঁকে তাঁর কওম সামূদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা ছিল আরবীয় লোক। তারা হিজর নামক শহরে বাস করতো। ওটা ছিল দারুল কুরা ও শাম দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল কওমে হূদের (অর্থাৎ আ'দের) পরে এবং কওমে ইবরাহীমের পূর্বে। শাম অভিমুখে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এখান দিয়ে গমন করার কথা সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সামূদ সম্প্রদায়কে তাদের নবী হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে বলেনঃ 'আমি তোমাদের নিকট এক বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য স্বীকার করে নাও।' কিন্তু তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করলো এবং কুফরীর উপরই কায়েম থাকলো। তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করলো এবং তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা পরহেযগারী অবলম্বন করলো না। বিশ্বস্ত

রাসূলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা হিদায়াতের পথে আসলো না। অথচ নবী (আঃ) তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বললেনঃ 'আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।' তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন–

১৪৬- أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَا اٰمِنِينَ ۝

১৪৬। তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে, যা এখানে আছে তাতে–

১৪৭- فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ۝

১৪৭। উদ্যানে, প্রস্রবণে

১৪৮- وَّزُرُوعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۝

১৪৮। ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে?

১৪৯- وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فٰرِهِينَ ۝

১৪৯। তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো।

১৫০- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونِ ۝

১৫০। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৫১- وَلَا تُطِيعُوٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝

১৫১। এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না।

১৫২- الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

১৫২। যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।

হযরত সালেহ (আঃ) স্বীয় কওমের মধ্যে ওয়াজ করতে রয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেনঃ যিনি তোমাদের জীবিকায় প্রশস্ততা দান করেছেন, যিনি তোমাদের জন্যে বাগান, প্রস্রবণ, শস্যক্ষেত্র, ফলমূল ইত্যাদি সরবরাহ করেছেন,

শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যিনি তোমাদের জীবনের দিনগুলো পূর্ণ করতে রয়েছেন, তোমরা তাঁর অবাধ্যাচরণ করে এসব নিয়ামত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে কালাতিপাত করে যেতে পারবে এটা মনে করে নিয়েছো কি? আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এখন যে মযবূত দূর্গ, সুউচ্চ ও সুন্দর প্রাসাদে বাস করতে দিয়েছেন, তোমরা কি মনে করেছো যে, তাঁর নাফরমানীর পরেও এগুলোর সবই ঠিক থাকবে? বড়ই আফসোসের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতরাজির মর্যাদা দিলে না। তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো, কিন্তু তোমরা যে কাজ করতে রয়েছো তাতে এসব যে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এসব চাকচিক্যময় প্রাসাদ তোমরা তৈরী করছো শুধুমাত্র তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি প্রকাশ করার জন্যে। এতে কোনই লাভ নেই, বরং এর শাস্তি তোমাদের নিজেদেরকে ভোগ করতে হবে। সুতরাং তোমাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং আমার আনুগত্য করা উচিত। তোমাদের উচিত তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, আহার্যদাতা, নিয়ামতদাতা এবং অনুগ্রহকারীর ইবাদত করা এবং তাঁর হুকুম মান্য করা ও তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করে নেয়া। তাহলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সুফল প্রাপ্ত হবে। তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাসবীহ তাহলীল করা একান্ত কর্তব্য। সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের তাঁরই ইবাদত করা উচিত এবং তোমাদের বর্তমান নেতৃবর্গকে মান্য করা মোটেই উচিত নয়। তারা সীমালংঘন করেছে। তাওহীদের অনুসরণ করা তারা ভুলে গেছে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন না করে শুধু অশান্তিই সৃষ্টি করছে। তারা নিজেরা নাফরমানী, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং অন্যদেরকেও সেদিকে আহ্বান করছে। সত্যের আনুকূল্য করে নিজেদের সংশোধিত করার চেষ্টা তারা মোটেই করছে না।

১৫৩। তারা বললোঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।

١٥٣- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ○

১৫৪। তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।

١٥٤- مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১৫৫। সালেহ (আঃ) বললোঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক দিনে।

١٥٥- قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ

১৫৬। এবং তোমরা ওর কোন অনিষ্ট সাধন করো না; করলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

١٥٦- وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

১৫৭। কিন্তু তারা ওকে বধ করলো, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো।

١٥٧- فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ

১৫৮। অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٥٨- فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

১৫৯। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٥٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ع

সামূদ সম্প্রদায় তাদের নবীকে উত্তর দেয়ঃ 'তোমার উপর কেউ যাদু করেছে।' যদিও এর একটি অর্থ এও করা হয়েছেঃ তুমি তো সৃষ্টদের একজন এবং এর দলীল হিসেবে নিম্নের কবিতাংশটি পেশ করা হয়েছেঃ

فَاِنْ تَسْاَلِيْنَا فِيْمَ نَحْنُ فَاِنَّنَا * عَصَافِيْرُ مِنْ هٰذَ الْاَنَامِ الْمُسَحَّرِ

অর্থাৎ "তুমি যদি আমাদের সম্পর্কে প্রশ্ন কর তবে জেনে রেখো যে, আমরা এই সৃষ্ট মানব জাতির চড়ুই পাখী তুল্য।" কিন্তু প্রথম অর্থটি বেশী প্রকাশমান।

এর সাথে সাথেই তারা বললোঃ "তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, সুতরাং আমাদের মধ্যে আর কারো উপর অহী না এসে শুধু তোমার উপর অহী আসবে এটা অসম্ভব। এটা তোমার বানানো কথা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছো এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছো। আচ্ছা, আমরা এখন বলি যে, তুমি যদি সত্যিই নবী হও তবে কোন মু'জিযা দেখাও তো দেখি?" ঐ সময় তাদের ছোট বড় সবাই একত্রিত ছিল এবং একবাক্যে তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল। হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কি মু'জিযা দেখতে চাও?" তারা উত্তর দেয়ঃ "এই যে আমাদের সামনে বিরাট পাহাড়টি রয়েছে এটা ফাটিয়ে দিয়ে এর মধ্য হতে এরূপ এরূপ রংএর ও এরূপ আকৃতির একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের কর।" তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত মু'জিযাই আমার হাত দ্বারা দেখিয়ে দেন তবে তোমরা আমাকে নবী বলে স্বীকার করবে তো?" তারা তখন তাঁর কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলো যে, যদি তিনি এ মু'জিযা দেখাতে পারেন তবে তারা অবশ্যই আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে নেবে। হযরত সালেহ (আঃ) তৎক্ষণাৎ নামায শুরু করে দিলেন এবং ঐ মু'জিযার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। ঐ সময়ই ঐ পাহাড় ফেটে গেল এবং ওর মধ্য হতে ঐ ধরনেরই উষ্ট্রী বেরিয়ে আসলো। কিছু লোক তো তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী মুমিন হয়ে গেল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফিরই রয়ে গেল।

তিনি তাদেরকে বললেনঃ "দেখো, একদিন আমার এই উষ্ট্রীর পানি পান করার পালা এবং অপরদিন তোমাদের জন্তুগুলোর পানি পান করার পালা থাকলো। সাবধান! তোমরা আমার এ উষ্ট্রীর কোন প্রকার অনিষ্ট করবে না, নচেৎ কঠিন শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।" কিছুদিন পর্যন্ত তারা এটা মেনে চললো। উষ্ট্রীটি তাদের মধ্যেই অবস্থান করতে থাকলো। ওটা ঘাস-পাতা খেতো এবং ওর পালার দিন পানি পান করতো। ঐদিন তারা ওর দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হতো। কিন্তু কিছুকাল পর তাদের দুষ্কার্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের এক বড় অভিশপ্ত ব্যক্তি উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করলো এবং সমস্ত শহরবাসী তাকে সমর্থন করলো। অতঃপর ঐ দুরাচার উষ্ট্রীটির পা কেটে ফেলে ওকে হত্যা

করলো। যার ফলে তাদেরকে কঠিনভাবে লজ্জিত হতে হলো। আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হলো এবং তাদেরকে গ্রাস করলো। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এই ধ্বংসলীলা পরবর্তী লোকদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে গেল। এরূপ বড় বড় নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেও তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করেনি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ ۚ

১৬০। লূত (আঃ)-এর কওম রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।

١٦١- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ۚ

১৬১। যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বললোঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٦٢- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ ۙ

১৬২। আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ ۚ

১৬৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٦٤- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ط

১৬৪। আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত লূত (আঃ)-এর বর্ণনা দিচ্ছেন। তাঁর নাম ছিল লূত ইবনে হারান ইবনে আযর। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আঃ)-কে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির উম্মতের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ লোকগুলো সাদুম এবং ওর আশে পাশে বসবাস করতো। অবশেষে

তাদের দুষ্কর্মের কারণে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বসতিগুলোর জায়গাটি একটি ময়লাযুক্ত দুর্গন্ধময় পানির বিলে পরিণত হয়েছে। ওটা এখনো বেলাদে গাওর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং বেলাদে কারক ও শাওবাকের মধ্যভাগে অবস্থিত। ঐ লোকগুলোও আল্লাহর রাসূল হযরত লূত (আঃ)-কে অবিশ্বাস করে। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী পরিত্যাগ করার এবং তাঁর আনুগত্য করার উপদেশ দেন। তিনি যে তাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছে তা তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, তিনি ঐ কাজের জন্যে তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান না। তাঁর পুরস্কার তো রয়েছে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর নিকট। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের জঘন্য কাজ হতে বিরত থাকো অর্থাৎ নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে যেয়ো না। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানলো না, বরং তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করলো।

১৬৫। সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হও।

١٦٥- اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৬৬। আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাকো। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

١٦٦- وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

১৬৭। তারা বললোঃ হে লূত (আঃ)! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।

١٦٧- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۝

১৬৮। লূত বললোঃ আমি তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি।

١٦٨- قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۝

১৬৯। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর।

١٦٩- رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○

১৭০। অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সবকে রক্ষা করলাম।

١٧٠- فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○

১৭১। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٧١- إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَبِرِينَ ○

১৭২। অতঃপর অপর সবকে ধ্বংস করলাম।

١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ○

১৭৩। তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!

١٧٣- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ○

১৭৪। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٧٤- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ○

১৭৫। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٧٥- وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

হযরত লূত (আঃ) তাঁর কওমকে এই বিশেষ নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পুরুষদের নিকট যেয়ো না। বরং তোমরা তোমাদের হালাল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে

তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর, যাদেরকে মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।" তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কওমের লোকেরা তাঁকে বললোঃ 'হে লূত (আঃ)! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।' যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ -

অর্থাৎ "উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললোঃ তোমরা লূত (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, তারা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।" (২৭ঃ ৫৬) তাদের এ অবস্থা দেখে হযরত লূত (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'আমি তোমাদের এ জঘন্য কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি এ কাজ মোটেই পছন্দ করি না। আমি মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে এসব কাজ হতে মুক্তরূপে প্রকাশ করছি।'

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট বদদু'আ করেন এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্যে মুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কওমের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাই সেও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেমন সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হূদ এবং সূরায়ে হিজরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত লূত (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে ঐ জনপদ হতে সরে পড়লেন। নির্দেশ ছিল যে, তাঁদের সেখান হতে চলে যাওয়ার পরই তাঁর কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হবে, ঐ সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকানো যাবে না। অতঃপর তাদের সবারই উপর আযাব এসে পড়ে এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়। তাদের জন্যে এই প্রস্তর বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট! তাদের এ ঘটনাটিও একটি শিক্ষামূলক বিষয়। এতে সবারই জন্যে উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তবে আল্লাহ যে মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

١٧٦- كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৭৬। আয়কাবাসীরা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল।

١٧٧- اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ ج

১৭৭। যখন শুআইব (আঃ) তাদেরকে বলেছিলঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٧٨- اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ لا

১৭৮। আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٩- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ ج

১৭৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

١٨٠- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ط

১৮০। আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

এ লোকগুলো মাদইয়ানের অধিবাসী ছিল। হযরত শুআইবও (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁকে তাদের ভাই না বলার কারণ শুধু এই যে, তারা আয়কার পূজা করতো। আর এই আয়কার সাথেই তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আয়কা ছিল একটি গাছ। এ কারণেই অন্যান্য নবীদেরকে বংশগত সম্পর্কের কারণে যেমন তাঁদের উম্মতের ভাই বলা হয়েছে, হযরত শুআইব (আঃ)-কে তাঁর উম্মতের ভাই বলা হয়নি, যদিও বংশগত হিসেবে তিনিও তাদের ভাই ছিলেন। যাঁরা এই বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি তাঁরা বলেন যে, এ লোকগুলো হযরত শুআইব (আঃ)-এর কওম ছিল না বলেই তাঁকে তাদের ভাই বলা হয়নি। তারা অন্য কওম ছিল। হযরত শুআইব (আঃ)-কে তাঁর নিজের কওমের নিকটও পাঠানো হয়েছিল এবং ঐ কওমের নিকটও তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্য কেউ বলেন যে, তিনি তৃতীয় একটি কওমের নিকটও প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন নবীকে

আল্লাহ দুই বার প্রেরণ করেননি, শুধু হযরত শুআইব (আঃ)-কে ছাড়া। একবার তাঁকে মাদইয়ানবাসীর নিকট পাঠানো হয়। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। তখন বিকট চীৎকার দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার তাঁকে প্রেরণ করা হয় আয়কাবাসীর নিকট। তারাও তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি নেমে আসে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আসহাবে রস ও আসহাবে আয়কা হলো হযরত শুআইব (আঃ)-এর কওম। একজন বুযর্গ ব্যক্তির উক্তি এই যে, আসহাবে আয়কা ও আসহাবে মাদইয়ান একই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কওমে মাদইয়ান ও আসহাবে আয়কা দু'টি উম্মত, যাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী হযরত শুআইব (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন।"[১]

১৮১। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।	١٨١- اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ
১৮২। এবং তোমরা ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়।	١٨٢- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ
১৮৩। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।	١٨٣- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ
১৮৪। এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।	١٨٤- وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۭ

১. এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব এবং এর মারফূ' হওয়া সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। খুব সম্ভব এটা মাওকুফ হাদীস। আর সঠিক কথা এই যে, দুটো একই উম্মত।

হযরত শুআইব (আঃ) ওজন ও মাপ ঠিক করার হিদায়াত করছেন। মাপে ঘাটতি করতে তিনি নিষেধ করছেন। তিনি বলছেনঃ "যখন তোমরা কাউকে কোন জিনিস মেপে দেবে তখন পূর্ণমাত্রায় দেবে, তার প্রাপ্য হতে কম দেবে না। অনুরূপভাবে কারো নিকট থেকে যখন কোন জিনিস নেবে তখন বেশী নেয়ার চেষ্টা করো না। এটা কেমন বিচার যে, নেয়ার সময় বেশী নেবে এবং দেয়ার সময় কম দেবে? লেন-দেন ঠিকভাবে করবে। দাঁড়ি-পাল্লা সঠিক রাখবে যাতে ওজন সঠিক হয়। ন্যায়ের সাথে ওজন করবে, ডান্ডি মারবে না এবং কম দেবে না। কাউকেও তার জিনিস কম দেবে না। চুরি-ডাকাতি এবং লুটপাট করবে না। লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের মাল-ধন ছিনিয়ে নেবে না। ঐ আল্লাহর শাস্তিকে তোমরা ভয় করো যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোককে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তোমাদের ও তোমাদের বড়দের প্রতিপালক।" এ শব্দটিই وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا (৩৬ঃ ৬২) এই আয়াতেও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ "শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল।"

১৮৫। তারা বললোঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٥- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۙ

১৮৬। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٦- وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۚ

১৮৭। তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।

١٨٧- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ؕ

১৮৮। সে বললোঃ আমার প্রতিপালক ভাল জানেন যা তোমরা কর।

١٨٨- قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৮৯। অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো, পরে

١٨٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ

يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করলো; এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

١٩٠- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৯০। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٩١- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ ع

১৯১। এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সামূদ সম্প্রদায় তাদের নবীকে যে উত্তর দিয়েছিল ঐ উত্তরই এই লোকগুলোও তাদের নবীকে দিলো। তারাও নবী (আঃ)-কে বললোঃ "তোমাকে কেউ যাদু করেছে। তোমার জ্ঞান ঠিক নেই। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আর আমাদের তো বিশ্বাস যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেননি। আচ্ছা, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকো তবে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও দেখি? আসমানী শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো।"

যেমন কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলঃ "আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না তুমি আরবের এই বালুকাময় ভূমিতে নদী প্রবাহিত করবে।" এমনকি তারা এ কথাও বলেছিলঃ "অথবা তুমি আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে যেমন তুমি ধারণা করছো অথবা আল্লাহ কিংবা ফেরেশতাদেরকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।" অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ "তারা বলেছিল–হে আল্লাহ! যদি এটা তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ হতে একটা টুকরা আমাদের উপর নিক্ষেপ কর।" অনুরূপভাবে ঐ কাফির অজ্ঞ লোকেরা বলেছিলঃ "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।" নবী (আঃ) উত্তরে বলেনঃ তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা ভালরূপে অবগত আছেন। তোমরা যা

হওয়ার যোগ্য তিনি তোমাদেরকে তাই করবেন। যদি তোমরা তাঁর কাছে আসমানী শাস্তির যোগ্য হয়ে থাকো তবে তিনি অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর ঐ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। শেষ পর্যন্ত যে শাস্তি তারা কামনা করেছিল সেই শাস্তিই তাদের উপর এসে পড়ে। তারা কঠিন গরম অনুভব করে। সাত দিন পর্যন্ত যমীন যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। কোন জায়গায়, কোন ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শান্তি তারা প্রাপ্ত হয়নি। তারা চরম অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। সাত দিন পর তারা দেখতে পায় যে, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের নিকট চলে আসছে। ঐ মেঘখণ্ড এসে তাদের মাথার উপর ছেয়ে যায়। তারা গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঐ মেঘ দেখে তারা ওর নীচে বসে পড়ে। যখন সবাই ওর নীচে এসে যায় তখন ঐ মেঘ হতে অগ্নি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে যমীন প্রচণ্ডভাবে টান দিতে শুরু করে এবং এমন ভীষণ শব্দ করে যে, তাদের অন্তর ফেটে যায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ দিনের মহাপ্লাবন তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখেনি। সূরায়ে আ'রাফে রয়েছেঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।" (৭ঃ ৭৮) এটা এই কারণে যে, তারা বলেছিলঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا

অর্থাৎ "হে শুআইব (আঃ)! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমরা জনপদ হতে বহিষ্কার করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।" (৭ ঃ ৮৮) সূরায়ে হূদে রয়েছেঃ

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

অর্থাৎ "যারা সীমালংঘন করেছিল মহা-নাদ তাদেরকে আঘাত করলো।" (১১ঃ ৬৭) এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহর নবী (আঃ)-কে বিদ্রূপ করে বলেছিলঃ

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ـ

অর্থাৎ "তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।" (১১ঃ ৮৭)

আর এখানে রয়েছে যে, তারা বলেছিলঃ "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। অতঃপর তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করলো।" সুতরাং ঐ তিন জায়গায় তিন প্রকারের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনা জায়গার সম্পর্কের কারণেই দেয়া হয়েছে। সূরায়ে আ'রাফে তাদের এই খিয়ানতের উল্লেখ রয়েছে যে, তারা হযরত শুআইব (আঃ)-কে ধমকের সুরে বলেছিলঃ 'তুমি যদি আমাদের ধর্মে না আসো তবে আমরা তোমাকে ও তোমার সহচরদেরকে আমাদের শহর হতে বের করে দিবো।' যেহেতু সেখানে নবী (আঃ)-এর অন্তরকে কম্পিত করে তোলার বর্ণনা রয়েছে, সেই হেতু তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে ভূমিকম্প দ্বারা, যাতে তাদেরও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। সূরায়ে হূদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা তাদের নবী হযরত শুআইব (আঃ)-কে উপহাস করে বলেছিলঃ 'তুমি তো বড় সহিষ্ণু ও ভাল লোক।' এ কথার ভাবার্থ ছিলঃ 'তুমি বড়ই বাজে উক্তিকারী ও দুষ্ট লোক।' কাজেই সেখানে তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে মহা-নাদ দ্বারা। আর এখানে যেহেতু তাদের কামনা ছিল যে, যেন তাদের প্রতি আকাশের একটি খণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, সেই হেতু এখানে তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তিমূলক প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, সাত দিন পর্যন্ত তাদের উপর এই প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকে। কোন জায়গাতেই তারা একটু শান্তি ও শীতলতা লাভ করতে পারেনি। এরপর আকাশে একখণ্ড মেঘ তারা দেখতে পায়। একটি লোক ঐ মেঘের নীচে পৌঁছে এবং সেখানে শান্তি লাভ করে। তাই সে অন্যদেরকে সেখানে আহ্বান করে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়ে যায় তখন ঐ মেঘ ফেটে যায় এবং তা হতে অগ্নি বর্ষিত হয়।

এও বর্ণিত আছে যে, ছায়ারূপে যে মেঘমালা ছিল তা তাদের একত্রিত হওয়া মাত্রই সরে যায় এবং সূর্য হতে তাদের উপর অগ্নি বর্ষিত হয়। ফলে তারা সবাই দগ্ধীভূত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরতী (রঃ) বলেন যে, মাদইয়ানবাসীদের উপর তিনটি শাস্তিই আপতিত হয়েছিল। শহরে ভূমিকম্প শুরু হলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহর হতে বাইরে পালিয়ে যায় এবং বাইরে সবাই একত্রিত হয়। কিন্তু সেখানেও তাদের হতবুদ্ধিতা ও অস্বস্তিকর অবস্থা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং আবার তারা সেখান হতে পলায়ন করে। কিন্তু শহরে প্রবেশ করতে তারা ভয় পায়। এমতাবস্থায় এক জায়গায় তারা একখণ্ড মেঘ দেখতে পায়। একটি লোক ঐ মেঘখণ্ডের নীচে যায় এবং সেখানে ঠাণ্ডা ও শান্তি অনুভব করে সকলকে সেখানে আসতে বলে। তারা এ কথা শোনা মাত্র সবাই ঐ মেঘখণ্ডের নীচে একত্রিত হয়ে যায়। এমন সময় এক ভীষণ চীৎকারের শব্দ আসে, যার ফলে তাদের কলেজা ফেটে যায় এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বজ্রের ভীষণ গর্জন ও কঠিন গরম শুরু হয়, ফলে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তাদের অস্বস্তিকর অবস্থা সীমা ছাড়িয়ে যায়। হতবুদ্ধি হয়ে সবাই শহর ছেড়ে দিয়ে ময়দানে গিয়ে জমা হয়ে যায়। এখানে তারা মেঘখণ্ড দেখতে পায় এবং ঠাণ্ডা ও আরাম লাভ করার উদ্দেশ্যে ওর নীচে সবাই একত্রিত হয়। কিন্তু সেখানে অগ্নি বর্ষিত হয় এবং তারা সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন দিনের বড় শাস্তি যা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহাশক্তির একটি বড় নিদর্শন। তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী। কেউই তাঁর উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়। তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নেন।

১৯২। নিশ্চয়ই ওটা (আল কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতারিত।	١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ؕ
১৯৩। জিবরাঈল (আঃ) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে–	١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ۙ

১৯৪। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।

١٩٤- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۙ

১৯৫। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ؕ

সূরার শুরুতে কুরআন কারীমের বর্ণনা এসেছিল, ওরই বর্ণনা আবার বিস্তারিতভাবে দেয়া হচ্ছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। রূহুল আমীন দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। রূহুল আমীন দ্বারা যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) উদ্দেশ্য এটা পূর্বযুগীয় বহু গুরুজন হতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত আতিয়্যা (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) হযরত ইবনে জুরায়েজ (রঃ) প্রমুখ। হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতইঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

অর্থাৎ "বল—যে কেউ জিবরীল (আঃ)-এর শত্রু এই জন্যে যে, সে আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক।" (২ঃ ৯৭) এ ফেরেশতা এমন সম্মানিত যে, তাঁর শত্রু আল্লাহরও শত্রু। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, রূহুল আমীন (আঃ) যাঁর সাথে কথা বলেন তাঁকে যমীনে খায় না। মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! এই বুযর্গ ও মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা, যে ফেরেশতাদের নেতা, তোমার হৃদয়ে আল্লাহর ঐ পবিত্র ও উত্তম কথা অবতীর্ণ করে যা সর্ব প্রকারের ময়লা-মলিনতা, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বক্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, যেন তুমি পাপীদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচাবার পথ প্রদর্শন করতে পার। আর যাতে তুমি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিতে পার। এটা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতারিত যাতে সবাই এটা বুঝতে এবং পড়তে পারে, তাদের যেন ওজর কবার কিছুই

অবশিষ্ট না থাকে। আর যাতে এ কুরআন কারীম প্রত্যেকের উপর হুজ্জত হতে পারে।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা বাদলের দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদের সাথে ছিলেন এমন সময় তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মেঘের গুণাবলী বর্ণনা করেন। তখন একজন লোক তাঁকে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো সর্বাপেক্ষা বাকপটু ও প্রাঞ্জল ভাষী!" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমার ভাষা এরূপ পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত এবং প্রাঞ্জল হবে না কেন? কুরআন কারীমও তো আমার ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে।"[1]

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, অহী আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেক নবী তাঁর কওমের জন্যে তাদের ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিয়ামতের দিন সুরইয়ানী ভাষা হবে। আর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আরবী ভাষায় কথা বলবে।

১৯৬। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।

১৯৬- وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ ○

১৯৭। বানী ইসরাঈলের পণ্ডিতরা এটা অবগত আছে–এটা কি তাদের জন্যে নিদর্শন নয়?

১৯৭- اَوَلَمْ یَكُنْ لَّهُمْ اٰیَةً اَنْ یَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ ○

১৯৮। আমি যদি এটা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম,

১৯৮- وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰی بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ○

১৯৯। এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করতো, তবে তারা তাতে ঈমান আনতো না।

১৯৯- فَقَرَاَهٗ عَلَیْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِیْنَ ○

মহান আল্লাহ বলেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও এই শেষ পবিত্র কিতাব আল-কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, এর সত্যতা এবং বিশেষণ বিদ্যমান

১.এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীরাও এর সুসংবাদ দিয়েছেন, এমনকি এই সব নবী (আঃ)-এর শেষ নবী, যাঁর পরে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত আর কোন নবী ছিলেন না, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেনঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ-

অর্থাৎ “স্মরণ কর, যখন মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ) বলেছিলঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ (সঃ) নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।” (৬১ ঃ ৬)

زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ শব্দের বহুবচন। زَبُوْرٌ হযরত দাউদ (আঃ)-এর কিতাবের নাম। زبر শব্দটি এখানে কিতাবসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ অর্থাৎ “তারা যা কিছু করছে সবই কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৫৪ঃ ৫২)

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ যদি তারা বুঝে ও হঠকারিতা না করে তবে এটা কি কুরআন কারীমের সত্যতার কম বড় দলীল যে, স্বয়ং বানী ইসরাঈলের আলেমরা এটা মেনে থাকে? যারা সত্যবাদী ও যারা হঠকারী নয় তারা তাওরাতের ঐ আয়াতগুলো জনগণের সামনে প্রকাশ করছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেরিতত্ব, কুরআনের উল্লেখ এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতার সংবাদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এবং তাঁদের ন্যায় সত্য উক্তিকারী মহোদয়গণ দুনিয়ার সামনে তাওরাত ও ইঞ্জীলের ঐ সমুদয় আয়াত রেখে দেন যেগুলো নবী (সঃ)-এর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী প্রকাশকারী।

পরবর্তী আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি যদি এই কালাম কোন আজমীর উপর অবতীর্ণ করতাম এবং সে ওটা মুশরিকদের নিকট পাঠ করতো তবে তখনো তারা এতে ঈমান আনতো না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেনঃ “আমি যদি তাদের জন্যে আকাশের দরযাও খুলে দিতাম এবং তারা

আকাশে চড়েও যেতো তবুও তারা বলতো—আমাদেরকে নেশা পান করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে।" আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ "যদি তাদের কাছে ফেরেশতারাও এসে পড়তো এবং যদি মৃতরাও কথা বলে উঠতো তবুও তারা ঈমান আনতো না।" তাদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তাদের জন্যে হিদায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁরা ঈমান আনবে না।

٢٠٠- كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ۝

২০০। এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।

٢٠١- لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

২০১। তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

٢٠٢- فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

২০২। ফলে এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

٢٠٣- فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝

২০৩। তখন তারা বলবেঃ আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?

٢٠٤- اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

২০৪। তারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

٢٠٥- اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۝

২০৫। তুমি বল তোঃ যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই,

٢٠٦- ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

২০৬। এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে,

২০৭। তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?

٢٠٧- مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۝

২০৮। আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না।

٢٠٨- وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۝

২০৯। এটা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অন্যায়াচারী নই।

٢٠٩- ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ অবিশ্বাস, কুফরী, অস্বীকার ও অমান্যকরণ এই অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে। তারা যে পর্যন্ত না শাস্তি স্বচক্ষে দেখবে ঈমান আনবে না। ঐ সময় যদি তারা ঈমান আনয়ন করে তবে তা বিফলে যাবে। সেই সময় তারা অভিশপ্ত হয়েই যাবে। না অনুশোচনা করে কোন কাজ হবে, না ওজর করে কোন উপকার হবে। তাদের অজ্ঞাতে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আযাব চলে আসবে। ঐ সময় তারা কামনা করবে যে, যদি তাদেরকে ক্ষণেকের জন্যে অবকাশ দেয়া হতো তবে তারা সৎ হয়ে যেতো! শুধু তারা কেন, প্রত্যেক যালিম, পাপী, ফাসেক, কাফির ও বদকার শাস্তি প্রত্যক্ষ করা মাত্রই সোজা হয়ে যাবে এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে থাকবে, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْاۤ اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ـ

অর্থাৎ "যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবে–হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্যে অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদের

অনুসরণ করবো। (উত্তরে বলা হবে) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?" (১৪ ঃ ৪৪)

ফিরাউনের অবস্থা দেখা যায় যে, হযরত মূসা (আঃ) তার জন্যে বদদু'আ করেন এবং তা কবূল করা হয়। আল্লাহর শাস্তি দেখে ডুবন্ত অবস্থায় সে বলেঃ "এখন আমি মুসলমান হচ্ছি।" কিন্তু উত্তরে বলা হয় যে, এখন ঈমান আনয়নে কোনই লাভ হবে না। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "যখন তারা আমার শাস্তি দেখলো তখন বললো–আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম (শেষ পর্যন্ত)।"

এরপর তাদের আর একটি দুষ্কৃতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের নবীকে বলেছিলঃ 'তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।' মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিই এবং পরে তাদের উপর আমার ওয়াদাকৃত শাস্তি এসে পড়ে তবে ঐ সময় তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?" ঐ সময় তো এরূপই মনে হবে যে, সে হয়তো এক সকাল বা এক সন্ধ্যাই দুনিয়ায় অবস্থান করেছে। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ

অর্থাৎ "তাদের একজন এটা কামনা করে যে, যদি তাকে এক হাজার বছর আয়ু দেয়া হতো! যদি তাকে এই আয়ু দেয়াও হয় তবুও তা তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না।" (২ঃ ৯৬) এখানেও তিনি একথাই বলেন যে, তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সেদিন তাদের কোন উপকারে আসবে না। সেই দিন যখন তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের শক্তি ও দাপট সব হারিয়ে যাবে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কাফিরকে আনয়ন করা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে দেয়ার পর উঠানো হবে এবং বলা হবেঃ 'তুমি কখনো সুখ ও নিয়ামত পেয়েছিলে কি?' সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার শপথ! আমি কখনোই সুখ-শান্তি পাইনি।" অপর একটি লোককে আনয়ন করা হবে যে সারা জীবনে কখনো সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পায়নি, তাকে জান্নাতের বাতাসে ভ্রমণ করানোর পর জিজ্ঞেস করা হবেঃ

"তুমি জীবনে কখনো দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে কি?" সে জবাবে বলবেঃ "আপনার সত্তার কসম! আমি জীবনে কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি।" হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নের কবিতাংশটি পাঠ করতেনঃ

كَانَّكَ لَمْ تُوْثِرْ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةً * اِذَا اَنْتَ اَدْرَكْتَ الَّذِىْ اَنْتَ تَطْلُبُ

অর্থাৎ "যখন তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে গেলে তখন যেন তুমি কখনো দুঃখ-কষ্টের নামও শুননি।"

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিজের ন্যায়পরায়ণতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করেননি যার জন্যে তিনি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি। তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং সতর্ক করে থাকেন। এরপরেও যারা অমান্য করে তাদের উপর তিনি বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দেন। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ এরূপ কখনো হয়নি যে, নবীদেরকে প্রেরণ না করেই আমি কোন উম্মতের উপর শাস্তি পাঠিয়েছি। প্রথমে আমি ভয়-প্রদর্শক প্রেরণ করি এবং সে উম্মতকে ভয় প্রদর্শন করে ও উপদেশ দেয়। এভাবে আমি তাদের ওযর করবার কিছুই বাকী রাখি না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন তারা তাদের নবীকে অবিশ্বাস করে তখন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়।

যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ "আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না আমি রাসূল প্রেরণ করি।" (১৭ঃ ১৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ "তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত না তিনি জনপদগুলোর মূল জনপদে কোন রাসূল প্রেরণ করেন যে তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়।"

২১০। শয়তানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি।

٢١٠- وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ○

২১১। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না।

٢١١- وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○

২১২। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।	٢١٢- اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ○

মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা এমন এক পবিত্র কিতাব যার আশে পাশে মিথ্যা আসতে পারে না। কিতাব (আল-কুরআন) মহাবিজ্ঞানময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত। এটাকে শক্তিশালী ফেরেশতা রূহুল আমীন (হযরত জিবরাঈল আঃ) আনয়ন করেছেন, শয়তান আনয়ন করেনি।

অতঃপর শয়তান যে এটা আনয়ন করেনি তার তিনটি কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে এর যোগ্যতাই রাখে না। তার কাজ হলো মাখলূককে পথভ্রষ্ট করা, সরল-সঠিক পথে আনয়ন করা নয়। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য। অথচ শয়তান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কিতাব হলো জ্যোতি ও হিদায়াত এবং এটা হলো দলীল। আর শয়তানরা এই তিনটিরই উল্টো। তারা অন্ধকার-প্রিয়। তারা ভ্রান্তপথ প্রদর্শক এবং অজ্ঞতার পাগল। সুতরাং এই কিতাব ও শয়তানদের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। কোথায় তারা এবং কোথায় এই কিতাব! দ্বিতীয় কারণ এই যে, সে তো এটা বহন করার যোগ্যতাই রাখে না এবং তার মধ্যে এ শক্তিই নেই। এটা এমনই সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন বাণী যে, যদি এটা কোন বড় পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হয় তবে ওকে ফাটিয়ে চৌচির করে ফেলবে।

এরপর তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করার সময় শয়তানদেরকে তো সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা তো ওটা শুনতেই পায়নি। আকাশের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ছিল। শুনবার জন্যে যখনই তারা আকাশে উঠতে যাচ্ছিল তখনই তাদের প্রতি অগ্নি বর্ষিত হচ্ছিল। এর একটি অক্ষরও শুনবার ক্ষমতা তার ছিল না। এর ফলে আল্লাহর কালাম নিরাপদ ও সুরক্ষিত পন্থায় তাঁর নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর মাখলূকের কাছে এটা পৌঁছে। এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। যেমন তিনি স্বয়ং জ্বিনদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ـ وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ـ وَّاَنَّا لَا نَدْرِىْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ـ

অর্থাৎ "আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্যে বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।" (৭২ঃ ৮-১০)

٢١٣- فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ۚ

২১৩। অতএব তুমি অন্য কোন মা'বূদকে আল্লাহর সাথে ডেকো না, ডাকলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٢١٤- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

২১৪। তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।

٢١٥- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২১৫। এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সব মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।

٢١٦- فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۚ

২১৬। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তবে তুমি বলোঃ তোমরা যা কর তার জন্যে আমি দায়ী নই।

٢١٧- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ

২১৭। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর।

২১৮। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও (নামাযের জন্যে)।

٢١٨- الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○

২১৯। এবং দেখেন সিজদকারীদের সাথে তোমার উঠাবসা।

٢١٩- وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ○

২২০। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢٠- اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ তুমি শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। আর যে এরূপ করবে না অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে সে অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবে। তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিবে যে, ঈমান ছাড়া অন্য কিছুই মুক্তিদাতা নয়।

এরপর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেনঃ একত্ববাদী ও তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবে। আর যে কেউই আমার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে সে যে-ই হোক না কেন তার সাথে কোনই সম্পর্ক রাখবে না এবং তার প্রতি স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

বিশেষ লোককে এই ভয় প্রদর্শন সাধারণ লোককে ভয় প্রদর্শন করার বিপরীত নয়। কেননা, এটা তার একটা অংশ। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاۤءُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

অর্থাৎ "যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।" (৩৬ঃ ৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ "যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মূল জনপদকে এবং ওর আশে পাশের লোকদেরকে।"(৭ঃ ৪২) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ

অর্থাৎ "এর দ্বারা তুমি সতর্ক কর তাদেরকে যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত করা হবে।" (৬ঃ ৫১) আরো এক জায়গায় বলেনঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

অর্থাৎ "যাতে তুমি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দিতে ও উদ্ধতদেরকে সতর্ক করতে পার।"(১৯ঃ ৯৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ

অর্থাৎ "যাতে আমি এর দ্বারা ভয় প্রদর্শন করতে পারি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছে।" (৬ঃ ১৯)

সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উম্মতের মধ্যে যার কানে আমার খবর পৌঁছেছে, সে ইয়াহূদী হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, অতঃপর আমার উপর সে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আমরা ঐগুলো বর্ণনা করছিঃ

প্রথম হাদীস ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ-এই আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাফা পর্বতের উপর উঠে يَاصَبَاحَاهُ[১] বলে উচ্চ স্বরে ডাক দেন। এ শব্দ শুনে লোকেরা তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে যায়। যারা আসতে পারেনি তারা লোক পাটিয়ে দেয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ "হে বানী আবদিল মুত্তালিব! হে বানী ফাহর! হে বানী লুওয়াই! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে তোমাদের শত্রু- সেনাবাহিনী রয়েছে এবং তারা ওঁৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?" সবাই এক বাক্যে উত্তর দেয়ঃ "হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করবো।" তিনি তখন বলেনঃ "তাহলে

১. আকস্মিক কোন বিপদের সময় আরবের লোকেরা বিপদ সংকেত হিসেবে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই প্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করেছিলেন।

জেনে রেখো যে, সামনের কঠিন শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী।" তাঁর একথা শুনে আবূ লাহাব বলে ওঠে-"তুমি ধ্বংস হও। এটা শুনাবার জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে?" তার কথার প্রতিবাদে সূরায়ে 'তাব্বাত ইয়াদা' অবতীর্ণ হয়।[১]

দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)! হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সুফিয়া (রাঃ)! হে বানী আবদিল মুত্তালিব! জেনে রেখো যে, আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্যে কোন (উপকারের) অধিকার রাখবো না। হ্যাঁ, তবে আমার কাছে যে মাল আছে তা হতে তোমরা যা চাইবে তা আমি তোমাদেরকে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত আছি।"[২]

তৃতীয় হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরায়েশদেরকে আহ্বান করেন এবং এক এক করে ও সাধারণভাবে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে কুরায়েশের দল! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। হে কাবের বংশধরগণ! তোমরা নিজেদের জীবনকে আগুন হতে বাঁচাও। হে হাশেমের সন্তানগণ! তোমরা নিজেদের প্রাণকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরা! তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর। হে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)! নিজের জীবনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে কোন কিছুরই মালিক হতে পারবো না। তবে অবশ্যই আমার সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে যার পার্থিব সর্বপ্রকারের হক আদায় করতে আমি সদা প্রস্তুত আছি।"[৩]

সহীহ্ বুখারীতেও শব্দের কিছু পরিবর্তনের সাথে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ) এবং স্বীয়

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইমাম মুসলিম ও ইমম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে বলেন, তোমরা দু'জন নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নাও এবং জেনে রেখো যে, (কিয়ামতের দিন) আমি আল্লাহর সামনে তোমাদের কোন কাজে লাগবো না। অতঃপর বলেনঃ "হে বানী কুসাই! হে বানী হাশিম! এবং হে আবদে মানাফ! (মনে রেখো যে) আমি হলাম সতর্ককারী, আর মৃত্যু হচ্ছে পরিবর্তন আনয়নকারী এবং কিয়ামত হলো ওয়াদার স্থান।"

চতুর্থ হাদীসঃ হযরত কুবাইসা ইবনে মাখারিক (রাঃ) এবং হযরত যুহায়ের ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা দু'জন বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন যার চূড়ার উপর একটি পাথর ছিল। সেখান থেকে তিনি ডাক দিয়ে বলতে শুরু করেনঃ "হে বানী আবদে মানাফ! আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমার ও তোমাদের উপমা ঐ লোকটির মত যে শত্রু দেখলো এবং দৌড়িয়ে নিজের লোকদেরকে সতর্ক করতে আসলো যাতে তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দূর থেকেই সে চীৎকার করতে শুরু করে দিলো যাতে প্রথম থেকেই তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে।"[১]

পঞ্চম হাদীসঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় আহলে বায়েতকে একত্রিত করেন। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ত্রিশজন। তাঁদের পানাহার শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কে এমন আছে যে আমার কর্জ তার দায়িত্বে নিয়ে নেয় এবং আমার পরে আমার অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, অতঃপর জান্নাতে আমার সাথী হতে পারে ও আমার আহ্লের মধ্যে আমার খলীফা হতে পারে?" একটি লোক উত্তরে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো সমুদ্র (সদৃশ), সুতরাং কে আপনার সাথে দাঁড়াতে পারে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু কেউই ওর জন্যে প্রস্তুত হলো না। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এজন্যে আমিই প্রস্তুত আছি।[২]

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

এক সনদে এর চেয়েও বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু আবদিল মুত্তালিবের একটি বড় দলকে একত্রিত করেন যারা বড়ই পেটুক ছিল। তাদের এক একজন একটি বকরীর বাচ্চা ও একটি বড় পিয়ালাপূর্ণ দুধ পান করে ফেলতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের জন্যে শুধু তিন পোয়া পরিমাণ খাদ্য রান্না করিয়ে নেন। কিন্তু তাতে এতো বরকত দেয়া হয় যে, সবাই পেট পুরে পানাহার করে, অথচ না খাদ্য কিছু হ্রাস পায় এবং না পানীয় কিছু কমে যায়। এরপর নবী (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে বানী আবদিল মুত্তালিব! আমি তোমাদের নিকট বিশিষ্টভাবে এবং সমস্ত মানুষের নিকট সাধারণভাবে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই সময় তোমরা আমার একটি মু'জিযাও দেখলে। এখন তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, সে আমার হাতে আমার ভাই ও সাথী হওয়ার দীক্ষা গ্রহণ করে?" কিন্তু মজলিসের একটি লোকও দাঁড়ালো না। (হযরত আলী রাঃ বলেনঃ) আমি তখন দাঁড়িয়ে গেলাম আর মজলিসের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট। তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি বসে পড়।" তিনি তিনবার তাদেরকে ঐ কথা বলেন কিন্তু তিনবারই আমি ছাড়া আর কেউই দাঁড়ায়নি। তৃতীয়বারে তিনি আমার বায়আত গ্রহণ করেন।"

ইমাম বায়হাকী (রঃ) 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যদি আমার কওমের সামনে আমি এখনই এটা পেশ করি তবে তারা মানবে না এবং তারা এমন উত্তর দেবে যা আমার কাছে কঠিন ঠেকবে।" তাই তিনি নীরব হয়ে যান। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে পড়েন এবং বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনাকে যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালনে যদি আপনি বিলম্ব করেন তবে আপনার প্রতিপালক আপনাকে শাস্তি প্রদান করবেন।" তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করি। আমি মনে করলাম যে, আমি যদি তাড়াতাড়ি এ কাজে লেগে পড়ি তবে আমার কওম আমাকে মানবে না এবং আমাকে এমন উত্তর দেবে যাতে আমি মনে ব্যথা পাবো। তাই আমি নীরবতা অবলম্বন করি। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেনঃ "আপনি যদি আপনার প্রতিপালকের আদেশ পালনে বিলম্ব করেন তবে তিনি আপনাকে শাস্তি দিবেন।" সুতরাং হে

আলী (রাঃ)! তুমি একটি বকরী যবাহ কর, তিন সের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর এবং এক বাটি দুধও সংগ্রহ কর। অতঃপর বানী আবদিল মুত্তালিবকে একত্রিত কর। হযরত আলী (রাঃ) তাই করলেন এবং সবাইকে দাওয়াত দিলেন। তারা সংখ্যায় দু'এক কমবেশী চল্লিশ জন ছিল। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচারাও ছিলেন। তাঁরা হলেন আবূ তালিব, হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)। তাঁর কাফির ও খবীস চাচা আবূ লাহাবও ছিল। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তরকারী পেশ করলে তিনি তা হতে এক টুকরা নিয়ে কিছু খেলেন। অতঃপর তা হাঁড়িতে রেখে দিলেন। এরপর তিনি সকলকে বললেনঃ "তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর।" সবাই খেতে লাগলো এবং পেট পুরে খেলো। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম! হাঁড়িতে যা ছিল তাই থেকে গেল। গোশ্তে শুধু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অঙ্গুলীর দাগ ছিল, কিন্তু গোশত এতটুকু কমেনি। অথচ তাদের এক একজনই হাঁড়িতে রাখা সব গোশত খেয়ে নিতে পারতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেনঃ "হে আলী (রাঃ)! তাদেরকে এখন দুধ পান করিয়ে দাও।" আমি তখন দুধের ঐ বাটিটি আনলাম এবং তাদেরকে পান করতে বললাম। তারা পালাক্রমে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু দুধ মোটেই কমলো না। অথচ তাদের এক একজনই ঐ বাটির সম্পূর্ণ দুধ পান করে নিতে পারতো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আবূ লাহাব মজলিস হতে উঠে গেল এবং বলতে লাগলোঃ "তোমাদের এ লোকটির এ সবকিছুই যাদু।" তার দেখাদেখি সবাই মজলিস হতে উঠে গেল এবং নিজ নিজ পথ ধরলো। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে উপদেশ দেয়ার সুযোগ পেলেন না।"

পরের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ "হে আলী (রাঃ)! অনুরূপভাবে আজকেও আবার তাদেরকে দাওয়াত কর। কেননা, গতকাল তারা আমাকে কথা বলার কোন সুযোগই দেয়নি।" হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি পুনরায় ঐ প্রকারের ব্যবস্থা করলাম। সবকে দাওয়াত দিয়ে আসলাম। ঐদিনও আবূ লাহাব দাঁড়িয়ে গিয়ে পূর্বের ন্যায়ই কথা বললো এবং ঐভাবে মজলিসের লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তৃতীয় দিন আবার আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে সবকিছুরই ব্যবস্থা করলাম। খাওয়া দাওয়ার পর ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাড়াতাড়ি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহর

কসম! আরবের কোন যুবক তার কওমের কাছে এমন উত্তম কিছু নিয়ে আসেনি যা আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ আনয়ন করেছি।"

অন্য রিওয়াইয়াতে এরপর এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এখন তোমরা বল তো তোমাদের মধ্যে কে আমার আনুকূল্য করতে পারে এবং কে আমার সহচর হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করি। সুতরাং কে আমাকে এ কাজে সহায়তা করতে পারে এই শর্তে যে, সে আমার ভাই হয়ে যাবে এবং সে এরূপ এরূপ মর্যাদা লাভ করবে?" তাঁর একথা শুনে কওমের সবাই নীরব থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যদিও আমি তাদের মধ্যে বয়সে ছিলাম সবচেয়ে ছোট, দুঃখময় চক্ষু বিশিষ্ট, মোটা পেট বিশিষ্ট এবং ভারী পদনালী বিশিষ্ট, তথাপি আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনার আনুকূল্য করতে প্রস্তুত আছি। তিনি তখন আমার স্কন্ধে হাত রেখে বললেনঃ "এটা আমার ভাই এবং তার এরূপ এরূপ মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনো এবং তার আনুগত্য কর।" তাঁর এ কথা শুনে কওমের লোকেরা উঠে গেল এবং হেসে উঠলো ও আবূ তালিবকে বললোঃ "তুমিই তোমার ছেলের কথা শুনো ও তার আনুগত্য করতে থাকো (আমাদের দ্বারা এ কাজ হবে না।"[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই দাওয়াতে শুধুমাত্র বকরীর একটি পায়ের গোশ্ত ছিল। এতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ভাষণ দিতে শুরু করলেন তখন তারা হঠাৎ করে বলে ফেললোঃ "এরূপ যাদু তো ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি।" তখন তিনি নীরব হয়ে যান। তাঁর ভাষণ ছিলঃ "কে আছে, যে আমার ঋণ তার দায়িত্বে গ্রহণ করবে এবং আমার আহ্লের মধ্যে খলীফা হয়ে যাবে?" হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "ঐ মজলিসে হযরত আব্বাসও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। শুধু মাল-ধনের কার্পণ্যের কারণে তিনিও নীরব ছিলেন। তাঁকে নীরব থাকতে দেখে আমিও নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। এবারও চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে। এবার আমি আর

১. কিন্তু এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল গাফফার ইবনে কাসিব ইবনে আবি মারইয়াম পরিত্যাজ্য এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে শিয়াও বটে, ইবনে মাদনী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, সে হাদীস নিজে বানিয়ে নিতো। হাদীসের অন্যান্য ইমামগণও তাকে দুর্বল বলেছেন।

নীরব থাকতে পারলাম না, বরং উপরোক্ত কথা বলে ফেললাম। ঐ সময় আমি বয়সে ছিলাম সবচেয়ে ছোট এবং ছিলাম ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন, বড় পেট ও ভারী পদনালী বিশিষ্ট।" ঐ রিওয়াইয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ফরমান রয়েছেঃ "কে আমার ঋণ তার দায়িত্বে নিচ্ছে এবং আমার পর কে আমার আহ্লের হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করছে?" এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলঃ "আমি আমার এই দ্বীনের প্রচার চারদিকে ছড়িয়ে দিবো এবং লোকদের আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করবো। ফলে সবাই আমার শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং আমাকে হত্যা করে ফেলার চেষ্টা করবে।" এরূপ আশংকা তিনি করতে থাকেন। অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাকে লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন।" (৫ঃ ৬৭) এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আশংকা দূর হয়ে যায়। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি নিজের জন্যে প্রহরী নিযুক্ত রাখতেন। কিন্তু এটা অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রহরী রাখাও তিনি বন্ধ করে দেন। বাস্তবিকই ঐ সময় বানু হাশেমের সবারই মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) অপেক্ষা বড় ঈমানদার ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সত্যায়নকারী আর কেউ ছিল না। এজন্যেই তিনিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাহচর্য দান করার স্বীকারোক্তি করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাফা পর্বতের উপর উঠে জনগণকে সাধারণ দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে খাঁটি তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন এবং নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দেন।

আবদুল ওয়াহিদ দেমাশকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আবূ দারদা (রাঃ) মসজিদে বসে ওয়াজ করছিলেন এবং ফতওয়া দিচ্ছিলেন। মজলিস লোকে ভরপুর ছিল। সবারই দৃষ্টি তাঁর চেহারার উপর ছিল এবং তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁর ওয়াজ শুনছিল। কিন্তু তাঁর ছেলে এবং তাঁর বাড়ীর লোকেরা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে নিজেদের কথায় লিপ্ত ছিল। কেউ একজন হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেনঃ "অন্যান্য সব লোকই তো আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কিন্তু আপনার বাড়ীর লোকেরা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে নিজেদের কথায় লিপ্ত রয়েছে, ব্যাপার কি?" তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "দুনিয়া হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ

থাকেন নবীরা এবং তাঁদের উপর সবচেয়ে বেশী কঠিন ও ভারী হয় তাঁদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন।" এব্যাপারেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ হতে فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তুমি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তিনিই তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনিই তোমার শক্তি যোগাবেন এবং তোমার কথাকে সমুন্নত করবেন। তাঁর দৃষ্টি সব সময় তোমার উপর রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের উপর ধৈর্য ধারণ কর, তুমি তো আমার চোখের সামনেই রয়েছো।" (৫২ঃ ৪৮) ভাবার্থ এটাওঃ যখন তুমি নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হও তখন তুমি আমার চোখের সামনে থাকো। আমি তোমার রুকু ও সিজদা দেখে থাকি। তুমি দাঁড়িয়ে থাকো বা বসে থাকো অথবা যে অবস্থাতেই থাকো না কেন আমার চোখের সামনেই থাকো। অর্থাৎ তুমি একাকী নামায পড়লেও আমি দেখতে পাই এবং জামাআতে পড়লেও তুমি আমার সামনেই থাকো। ভাবার্থ এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যেভাবে তাঁর সামনের জিনিসগুলো দেখাতেন তেমনিভাবে তাঁর পিছনের মুক্তাদীরাও তাঁর দৃষ্টির সামনে থাকতো। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "তোমরা তোমাদের নামাযের সারি সোজা করে নেবে। জেনে রেখো যে, আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতে দেখতে পাই।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ভাবার্থ এও করেছেনঃ "তাঁর এক নবীর পিঠ হতে অন্য নবীর পিঠের দিকে স্থানান্তরিত হওয়াকে আমি বরাবরই দেখতে রয়েছি, শেষ পর্যন্ত তিনি নবী হিসেবে দুনিয়ায় এসেছেন।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা খুবই শুনে থাকেন এবং তাদের কাজ কারবার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا-

অর্থাৎ "তুমি যে অবস্থায় থাকো, তুমি যে কুরআন পাঠ কর, তুমি যে আমল কর সেসব সম্পর্কে আমি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।" (১০ঃ৬১)

٢٢١- هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۝

২২১। তোমাদেরকে কি জানাবো কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

٢٢٢- تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

২২২। তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

٢٢٣- يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۝

২২৩। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

٢٢٤- وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝

২২৪। এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত।

٢٢٥- اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝

২২৫। তুমি কি দেখো না তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?

٢٢٦- وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝

২২৬। এবং যা তারা করে না তা বলে।

٢٢٧- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝ ع

২২৭। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারিরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মুশরিকরা বলতোঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন তা সত্য নয়। তিনি এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। অথবা তাঁর কাছে জ্বিনদের নেতা এসে থাকে যে তাঁকে শিখিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে এই আপত্তিকর কথা হতে পবিত্র করছেন এবং

প্রমাণ করছেন যে, তিনি যে কুরআন আনয়ন করেছেন তা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর নিকট হতেই এটা অবতারিত। সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এটা আনয়ন করেছেন। এটা কোন শয়তান বা জ্বিন আনয়ন করেনি। শয়তানরা তো কুরআনের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বিমুখ। তাদের শিক্ষা তো কুরআন কারীমের শিক্ষার একেবারে বিপরীত। সুতরাং কি করে তারা কুরআনের ন্যায় পবিত্র ও সুপথ প্রদর্শনকারী কালাম আনয়ন করতঃ মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারে? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। কেননা, তারা নিজেরাও চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী। তারা চুরি করে আকাশে যে এক আধটি কথা শুনে নেয়, ওর সাথে বহু কিছু মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে যাদুকরদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ যাদুকররা তখন ওর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরো বহু মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে লোকদের মধ্যে প্রচার করে। এখন শয়তান লুকিয়ে যে সত্য কথাটি আকাশে শুনেছিল ওটা সত্যরূপেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু লোকেরা ঐ একটি সত্য কথার উপর ভিত্তি করে যাদুকরের আরো শত শত মিথ্যা কথাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে। এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, একদা জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যাদুকর ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "তারা কিছুই নয়।" জনগণ বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা এমনও কথা বলে যা সত্য হয়ে থাকে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ, এটা ঐ কথা যা জ্বিনেরা-চুরি করে আকাশ হতে শুনে আসে এবং তা ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার কানে পৌঁছিয়ে থাকে। অতঃপর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা নিজের পক্ষ হতে শতটি মিথ্যা কথা ওর সাথে মিলিয়ে বলে দেয়।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন কাজের ফায়সালা করেন তখন ফেরেশতারা আদবের সাথে নিজেদের পালক ঝুঁকিয়ে দেন। কোন কংকরময় ভূমিতে জিঞ্জীর বাজানো হলে যেরূপ শব্দ হয় ঐরূপ শব্দ ঐ সময় আসতে থাকে। যখন ঐ বিহ্বলতা বিদূরিত হয় তখন ফেরেশতারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন (কি হুকুম করেছেন)?" উত্তরে বলা হয়ঃ "তিনি সত্য বলেছেন (সঠিক হুকুম করেছেন)। তিনি সমুন্নত ও মহান।" কখনো

কখনো আল্লাহ তা'আলার ঐ হুকুম চুরি করে শ্রবণকারী কোন জ্বিনের কানে পৌঁছে যায় যারা এভাবে একের উপর এক হয়ে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সুফিয়ান (রঃ) স্বীয় হাতের অঙ্গুলীগুলো বিছিয়ে দিয়ে ওর উপর অপর হাত ঐভাবেই রেখে ওগুলোকে মিলিত করে বলেনঃ "এইভাবে।" এখন উপরের জন নীচের জনকে, সে তার নীচের জনকে ঐ কথা বলে দেয়। শেষ পর্যন্ত সর্ব নীচের জন ঐ কথা ভবিষ্যদ্বক্তা বা যাদুকরের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। কখনো কখনো এমনও হয় যে, ঐ কথা পৌঁছাবার পূর্বেই অগ্নিশিখা পৌঁছে যায়, সুতরাং শয়তান ঐ কথা পৌঁছাতে পারে না। আবার কখনো কখনো অগ্নিশিখা পৌঁছার পূর্বেই শয়তান ঐ কথা পৌঁছিয়ে থাকে। ঐ কথার সাথে যাদুকর নিজের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে দিয়ে প্রচার করে দেয়। ঐ একটি কথা সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ায় জনগণ সবগুলোকেই সত্য মনে করে থাকে।"[১] এই সমুদয় হাদীসের বর্ণনা حَتّٰىٓ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ .... الخ (৩৪ঃ ২৩) এই আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এও আছে যে, ফেরেশতারা আসমানী বিষয়ক কথাবার্তা মেঘের উপর বলে থাকেন যা শয়তান শুনে নিয়ে যাদুকরদের কানে পৌঁছিয়ে থাকে। আর ঐ যাদুকর একটি সত্যের সাথে শতটি মিথ্যা মিলিয়ে দেয়।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ (কাফির) কবিদের অনুসরণ বিভ্রান্ত লোকেরাই করে থাকে। আরব কবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, কারো নিন্দায় তারা কিছু বলতো। জনগণের একটি দল তাদের সাথে হয়ে যেতো এবং তাদের নিকট হতে ঐ নিন্দাসূচক কবিতা নিয়ে আসতো।

একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে আ'রজের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে একজন কবির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় যে কবিতা পাঠ করতে করতে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "তাকে ধর অথবা তাকে কবিতা পাঠ হতে বিরত রাখো। কারো রক্ত পুঁজ দ্বারা পেট পূর্ণ করা কবিতা দ্বারা পেট পূর্ণ করা অপেক্ষা উত্তম।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তুমি কি দেখো না যে, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? প্রত্যেক বাজে বিষয়ের মধ্যে তারা ঢুকে পড়ে। কারো প্রশংসা করতে গিয়ে তারা তাকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দেয়। মিথ্যা প্রশংসা করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা হয় কথার সওদাগর, কিন্তু কাজে অলস। তারা নিজেরা যা করে না তা বলে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে দু'টি লোক একে অপরকে নিন্দা করে। তাদের একজন ছিল আনসারী এবং অপরজন ছিল অন্য গোত্রের লোক। তখন দুই গোত্রেরই বড় বড় লোকেরা তাদের সাথে যোগ দেয়। তাই এই আয়াতে এটাই রয়েছে যে, বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে থাকে। তারা ঐ কথা বলে থাকে যা তারা নিজেরা করে না। এজন্যেই আলেমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, যদি কোন কবি নিজের কবিতার মধ্যে এমন কোন পাপের কথা স্বীকার করে নেয় যার উপর শরীয়তের হদ ওয়াজিব হয়, তবে তার উপর হদ জারী করা যাবে কি যাবে না? আলেমরা দুই দিকেই গিয়েছেন। আসলে তারা ফখর ও গর্ব করে এ ধরনের কথা বলে থাকে। তারা বলেঃ "আমি এই করেছি, ঐ করেছি," অথচ আসলে তারা কিছুই করেনি এবং করতেও পারে না।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রঃ) তাবাকাতে এবং যুবায়ের ইবনে বিকার (রঃ) কিতাবুল ফুকাহাতে বর্ণনা করেছেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খিলাফতের আমলে হযরত নু'মান ইবনে আদী ইবনে ফুযলা (রাঃ)-কে বসরার মাইসান শহরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। তিনি কবিতায় বলেনঃ

اَلَاهَلْ اَتِى الْحَسْنَاءَ اَنَّ خَلِيْلَهَا * بِمَيْسَانَ يَسْقِىْ فِىْ زُجَاجٍ وَّحَنْتَمِ

اِذَا شِئْتَ غَنَّتْنِىْ دَهَاقِيْنُ قَرْيَةٍ * وَرَقَّاصَةٌ تَحْنُوْ عَلٰى كُلِّ مَيْسَمِ

فَاِنْ كُنْتَ نَدْمَانِىْ فَبِالْاَكْبَرِ اَسْقِنِىْ * وَلَا تُسْقِنِىْ بِالْاَصْغَرِ الْمُتَثَلِّمِ

لَعَلَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَسُوْءُهٗ * تَنَادِ مِنَّا بِالْجَوْسَقِ الْمُتَهَدِّمِ

অর্থাৎ "সুন্দরী মহিলারা কি এ খবর পায়নি যে, তাদের প্রেমিক মাইসানে অবস্থান করছে? যেখানে সদা-সর্বদা শীশার গ্লাসে মদ্যচক্র চলছে? আর গ্রামের

তরুণীরা নাচ-গানে মত্ত রয়েছে। হ্যাঁ, যদি আমার কোন বন্ধু দ্বারা এটা সম্ভব হয় তবে এর চেয়ে বড় ও পূর্ণ মদ্যের গ্লাস আমাকে পান করাতে পারে। কিন্তু ছোট গ্লাস আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। আল্লাহ করুন যেন আমীরুল মুমিনীনের কাছে এ খবর না পৌঁছে। অন্যথায় তিনি এতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমাকে শাস্তি দিবেন।" ঘটনাক্রমে সত্যিই এ কবিতাগুলো আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে যায় এবং সাথে সাথেই তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং তিনি একটি চিঠিও পাঠান। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِىْ وَايْمُ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَيَسُوْؤُنِىْ وَقَدْ عَزَلْتُكَ -

অর্থাৎ "দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। অতঃপর আমার কাছে তোমার (কবিতার) কথা পৌঁছেছে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই ওটা আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। তাই আমি তোমাকে পদচ্যুত করলাম।" এ চিঠি পাঠ মাত্রই হযরত নু'মান (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে যান এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আরয করেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো মদ্যপানও করিনি, নাচও দেখিনি এবং গান বাজনাও করিনি। এটা তো শুধু কবিতাসূচক আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল।" তাঁর একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন বলেনঃ "আমারও ধারণা এটাই ছিল। কিন্তু আমি তো এটা সহ্য করতে পারি না যে, এরূপ অশ্লীলভাষী কবিকে কোন পদে রেখে দিই।" তাহলে বুঝা গেল যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর মতেও কবি যদি তার কবিতার মাধ্যমে এমন কোন অপরাধের কথা ঘোষণা করে যা হদ্দের যোগ্য, তবুও তাকে হদ মারা যাবে না। কেননা, সে বলে বটে, কিন্তু করে না। তবে নিঃসন্দেহে সে তিরস্কার ও নিন্দার যোগ্য। হাদীসে আছে যে, রক্ত, পুঁজ দ্বারা পেট পূর্ণ করা কবিতা দ্বারা পেট পূর্ণ

করা অপেক্ষা উত্তম। ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবিও নন, যাদুকরও নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও নন এবং মিথ্যা আরোপকারীও নন। তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই তাঁর এসব দোষ হতে মুক্ত হওয়ার বড় সাক্ষী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ "আমি রাসূল (সঃ)-কে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়, এটাতো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।" (৩৬ ঃ ৬৯) আর এক জায়গায় আছেঃ

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ- وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ- تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ "এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" (৬৯ঃ ৪১-৪৩) অনুরূপভাবে এখানে বলেছেনঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ -

অর্থাৎ "আর নিশ্চয়ই এটা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আঃ) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" (২৬ ঃ ১৯২-১৯৫) এ সূরারই আর একটি জায়গায় বলেছেনঃ "শয়তানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।" এর আরো কিছু পরে বলেছেনঃ "তোমাদেরকে কি আমি জানিয়ে দেবো কার কাছে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখো না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তা বলে।"

এরপরে যা রয়েছে তার শানে নুযূল এই যে, এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় (যাতে কবিদেরকে নিন্দে করা হয়েছে), তখন নবী (সঃ)-এর দরবারের কবিরা যেমন হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এবং হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে তো কবিদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমরাও তো কবি (সুতরাং আমরাও তো তাহলে নিন্দনীয়?)।" তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ "ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল তোমরাই এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারীও তোমরাই। তোমরাই অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং তোমরা এদের হতে স্বতন্ত্র।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে হযরত কা'ব (রাঃ)-এর নাম নেই। একটি রিওয়াইয়াতে শুধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর কথা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও তো কবি?" তাঁরই একথার পরিপ্রেক্ষিতে إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الخ-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মক্কী সূরা। আর আনসার কবিরা মক্কায় ছিলেন না। তাঁরা সবাই ছিলেন মদীনায়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে এ সূরা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভবই বটে। যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে ওগুলো মুরসাল। সুতরাং এগুলোর উপর ভরসা করা যায় না। তবে এ আয়াতটি যে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর এই স্বাতন্ত্র্য শুধু এই আনসার কবিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন কবি তার অজ্ঞতার যুগে যদি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে কবিতা লিখে থাকে, অতঃপর মুসলমান হয়ে গিয়ে তাওবা করে থাকে এবং পূর্বের দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বার বার আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে তবে তারাও নিন্দনীয় কবিদের হতে স্বতন্ত্র হবে। কেননা, সৎ কার্যাবলী দুষ্কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়। তাহলে সে যখন কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্নাম করেছিল এবং আল্লাহর দ্বীনকে মন্দ বলেছিল তখন ওটা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজই ছিল। কিন্তু পরে যখন সে মুসলমানদের ও ইসলামের প্রশংসা করলো তখন ঐ দুষ্কর্ম সৎকর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাবআরী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর দুর্নাম করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বড়ই প্রশংসা করেছিলেন এবং পূর্বে যে তিনি তাঁর দুর্নাম করেছিলেন, কবিতার মাধ্যমে ওর ওজর পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, ঐ সময় তিনি শয়তানের খপ্পরে পড়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একজন বড় শত্রু ছিলেন এবং কবিতার মাধ্যমে তাঁর খুবই দুর্নাম করতেন। কিন্তু যখন তিনি মুসলমান হলেন তখন এমন পাকা মুসলমান হলেন যে, সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) অপেক্ষা বড় প্রিয়জন তাঁর কাছে আর কেউই ছিল না। প্রায়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত ভালবাসা রাখতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব যখন মুসলমান হন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে আপনি তিনটি জিনিস দান করুন। প্রথম এই যে, আমার পুত্র মুআবিয়া (রাঃ)-কে আপনার লেখক (অর্থাৎ অহী লেখক) বানিয়ে নিন। দ্বিতীয় এই যে, আমার সাথে এক দল সৈন্য প্রেরণ করুন যাতে আমি কাফিরদের সাথে লড়তে পারি যেমন আমি মুসলমানদের সাথে লড়তাম।" তাঁর এই দু'টি আবেদনই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবূল করে নেন। তৃতীয় আর একটি আবেদন তিনি করেন এবং সেটাও গৃহীত হয়।[১] সুতরাং এই লোকদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম হতে এই পরবর্তী আয়াত দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। আল্লাহর অধিক স্মরণ তাঁরা তাঁদের কবিতার মাধ্যমেই করুন অথবা অন্য কোন প্রকারে করুন, নিশ্চিতরূপে তা তাঁদের পূর্ববর্তী পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তারা অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে তাঁরা কাফিরদের নিন্দামূলক কবিতার জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "তুমি কাফিরদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তোমার সাথে রয়েছেন।"

হযরত কাব ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরআন পাকে কবিদের নিন্দা শুনেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আরয

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

করেনঃ "আল্লাহ তা'আলা (কবিদের সম্পর্কে) যা নাযিল করার তা তো নাযিল করেছেন (তাহলে আমিও কি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত?)।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ " (না, না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। জেনে রেখো যে,) মুমিন তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে থাকে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতাগুলো তো তাদেরকে (কাফিরদেরকে) মুজাহিদের তীরের ন্যায় ছিদ্র করে দিয়েছে।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ অত্যাচারীদের গন্তব্যস্থল কোথায় তা তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। সেই দিন তাদের ওজর আপত্তি কোন কাজে আসবে না। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকো। কারণ কিয়ামতের দিন যুলুম অন্ধকারের কারণ হবে।"

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাকের وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ উক্তিটি আম বা সাধারণ, কবি হোক বা অন্য কেউ হোক, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) একজন খৃষ্টানের জানাযা যেতে দেখে এ আয়াতটিই পাঠ করেছিলেন। তিনি যখন এ আয়াতটি পাঠ করতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তাঁর হেঁচকী বন্ধ হয়ে যেতো।

হযরত ফুযালা ইবনে উবায়েদ (রঃ) যখন রোমে আগমন করেন তখন একটি লোক নামায পড়ছিলেন। যখন লোকটি سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ -এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন যে, এর দ্বারা বায়তুল্লাহর ধ্বংসকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা মক্কাবাসী উদ্দেশ্য। আবার এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আয়াতটি হলো সাধারণ। সুতরাং এটা সব যালিমকেই অন্তর্ভুক্তকারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় মাত্র দু'টি লাইনে তাঁর অসিয়ত লিখে যান। তা ছিল নিম্নরূপঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবূ বকর ইবনে আবি কাহাফা (রাঃ)-এর অসিয়ত। এটা ঐ সময়ের অসিয়ত, যখন তিনি দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছেন। যে সময় কাফিরও মুমিন হয়ে যায়, পাপীও তাওবা করে এবং মিথ্যাবাদীকেও সত্যবাদী মনে করা হয়। আমি উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তোমাদের উপর আমার খলীফা নিযুক্ত করে যাচ্ছি। সে যদি ইনসাফ করে তবে খুব ভাল কথা এবং তার সম্পর্কে আমার ধারণা এটাই আছে। আর যদি সে যুলুম করে এবং কোন পরিবর্তন আনয়ন করে তবে জেনে রেখো যে, আমি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা নই। অত্যাচারীরা তাদের গন্তব্যস্থল কোথায় তা সত্বরই জানতে পারবে।"

সূরাঃ শুআ'রা এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ নাম্‌ল, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৯৩, রুকূ' ঃ ৭)

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٩٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

১। ত্বোয়া-সীন, এগুলো আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

٢- هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

২। পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্যে।

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৩। যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

٤- اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ط

৪। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

٥- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

৫। এদেরই জন্যে আছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ

৬। নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুরআন দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআত বা বিছিন্ন অক্ষরগুলো এসে থাকে সেগুলোর পূর্ণ আলোচনা সূরায়ে বাকারার শুরুতে করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ওগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এগুলো হলো উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। এগুলো হলো মুমিনদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ। কেননা তারাই এগুলোকে বিশ্বাস করতঃ এগুলোর অনুসরণ করে থাকে। তারা কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং ওর উপর আমল করে থাকে।

এরা তারাই যারা সঠিকভাবে ফরয নামায আদায় করে এবং অনুরূপভাবে ফরয যাকাত প্রদানের ব্যাপারেও কোন ত্রুটি করে না। আর তারা পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং এরপরে পুরস্কার ও শাস্তিকেও তারা স্বীকার করে থাকে। জান্নাত ও জাহান্নামকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ

অর্থাৎ "তুমি বল– এই কুরআন মুমিনদের জন্যে হিদায়াত ও শিফা (রোগমুক্তি), আর যারা মুমিন নয় তাদের কর্ণসমূহে বধিরতা রয়েছে।" (৪১ ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

অর্থাৎ "যেন তুমি এর দ্বারা আল্লাহ-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দাও এবং অবাধ্য ও দুষ্ট লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর।" (১৯ ঃ ৯৭)

এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভনীয় করেছি। তাদের কাছে তাদের মন্দ কাজও ভাল মনে হয়। তাই তারা ঔদ্ধত্য ও বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আখিরাতে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। তাঁর আদেশ ও নিষেধের মধ্যে কি নিপুণতা রয়েছে তা তিনিই ভাল জানেন। ছোট বড় সমস্ত কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত। সুতরাং কুরআন কারীমের সবকিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। এর মধ্যে যেসব আদেশ ও নিষেধ রয়েছে সবই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায় রূপে পূর্ণ হয়ে গেছে।" (৬ঃ ১১৬)

٧- اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

৭। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা (আঃ) তার পরিবারবর্গকে বলেছিলঃ আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান হতে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনবো অথবা তোমাদের জন্যে আনবো জ্বলন্ত অঙ্গার যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

٨- فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮। অতঃপর সে যখন ওর নিকট আসলো, তখন ঘোষিত হলোঃ ধন্য সে ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত।

٩- يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

৯। হে মূসা (আঃ)! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٠- وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا

১০। তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে

وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى لَا
تَخَفْ إِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ قف
الْمُرْسَلُوْنَ ق صلے

দেখলো তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরেও তাকালো না; বলা হলোঃ হে মূসা (আঃ)! ভীত হয়ো না, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না।

١١- إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا
بَعْدَ سُوْٓءٍ فَإِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১। তবে যারা যুলুম করার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ
تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ
سُوْٓءٍ قف فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى
فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ

১২। এবং তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

١٣- فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً
قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ج

১৩। অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসলো তখন তারা বললোঃ এটা সুস্পষ্ট যাদু।

١٤- وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ

১৪। তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান

أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ع ○ (١٤)	করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল!

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয় পাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে মর্যাদাসম্পন্ন নবী বানিয়েছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তাঁকে বড় বড় মু'জিযা দান করেছিলেন এবং ফিরাউন ও তার লোকদের কাছে তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ কাফিরের দল তাঁকে অস্বীকার করে। তারা কুফরী ও অহংকার করে এবং তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মহান আল্লাহ বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলছিলেন তখন তিনি পথ ভুলে যান। রাত্রি এসে পড়ে এবং চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায়। একদিকে তিনি অগ্নিশিখা দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বলেনঃ "তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি ঐ আলোর দিকে যাচ্ছি। হয়তো সেখানে কেউ রয়েছে, তার কাছে পথ জেনে নেবো, অথবা সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসবো। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। হলোও তাই। সেখান হতে তিনি একটি বড় খবর আনলেন এবং বড় একটা নূর (জ্যোতি) লাভ করলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) ঐ আলোর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি সেখানকার দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি একটি সবুজ রং গাছ দেখলেন যার উপর আগুন জড়িয়ে রয়েছে। অগ্নিশিখা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে এবং গাছের শ্যামলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান যে, ঐ নূর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা আগুন ছিল না। বরং জ্যোতি ছিল। সেটা আবার ছিল বিশ্বপ্রতিপালক এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর। হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ শব্দ আসলোঃ ধন্য সে ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুষ্পার্শ্বে (অর্থাৎ ফেরেশতামণ্ডলী)।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ নিদ্রা যান না এটা তাঁর জন্যে উপযুক্ত নয়। তিনি দাঁড়ি-পাল্লাকে নীচে নামিয়ে দেন এবং উঁচু করে থাকেন। রাত্রির কাজ দিনের পূর্বেই এবং দিনের কাজ রাত্রির পূর্বেই তাঁর নিকট উঠে যায়।"[১] "তাঁর পর্দা হলো জ্যোতি অথবা অগ্নি। যদি ওটা সরে যায় তবে তাঁর চেহারার তাজাল্লীতে ঐ সমুদয় জিনিস পুড়ে যাবে যেগুলোর উপর তাঁর দৃষ্টি পড়বে (অর্থাৎ সারা জগত)।"[২] এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ উবাইদাহ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا এ আয়াতটিই পাঠ করেন।

জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। তিনি যা চান তা-ই করে থাকেন। তাঁর সৃষ্টের মধ্যে তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেউই নেই। তিনি সমুচ্চ ও মহান। তিনি সমুদয় সৃষ্ট হতে পৃথক। যমীন ও আসমান তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি এক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি মাখলূকের সঙ্গে তুলনীয় হওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে মূসা (আঃ)! আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি তোমার হাতের লাঠিখানা যমীনে ফেলে দাও যাতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছাচারী এবং তিনি সবকিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।" আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শ্রবণ মাত্রই হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দেন। তৎক্ষণাৎ লাঠিখানা এক বিরাট সাপ হয়ে যায় এবং চলতে ফিরতে শুরু করে। লাঠিকে এরূপ বিরাট জীবন্ত সাপ হতে দেখে হযরত মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়েন। কুরআন কারীমে جَانّ শব্দ রয়েছে, এটা হলো এক প্রকার সাপ যা অতি দ্রুত চলতে পারে এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে অবস্থানকারী সাপকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।
২. এটুকু মাসউদী (রঃ) বেশী করেছেন।

মোটকথা, হযরত মূসা (আঃ) ঐ সাপ দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং ভয়ের কারণে স্থির থাকতে পারেননি, বরং পিঠ ফিরিয়ে সেখান হতে পালাতে শুরু করেন। তিনি এতো ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, একবার মুখ ঘুরিয়েও দেখেননি। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! ভীত হয়ো না। আমি তো তোমাকে আমার মনোনীত রাসূল ও মর্যাদা সম্পন্ন নবী বানাতে চাই। এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ "তবে যারা যুলুম করার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎ কর্ম করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের জন্যে বড়ই সুসংবাদ রয়েছে। যে কেউই কোন অন্যায় ও মন্দ কাজ করবে, অতঃপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ঐ কাজ ছেড়ে দেবে ও খাঁটি অন্তরে তাওবা করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করে নিবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্ষমাশীল যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে অতঃপর হিদায়াত লাভ করে।" (২০ ঃ ৮২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে অথবা নিজের নফসের উপর যুলুম করে।" (৪ ঃ ১১০) এই বিষয়ের আয়াত বহু রয়েছে।

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া একটি মু'জিযা, এর সাথে সাথে হযরত মূসা (আঃ)-কে আর একটি মু'জিযা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও, তাহলে এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত, যেগুলো দ্বারা আমি সময়ে সময়ে তোমার পৃষ্ঠপোষকতা করবো, যাতে তুমি সত্যত্যাগী ফিরাউন ও তার কওমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পার।

এ নয়টি মু'জিয়া এগুলোই ছিল যেগুলোর বর্ণনা وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ... الخ. (১৭ঃ ১০১) এই আয়াতে রয়েছে যার পূর্ণ তাফসীর ওখানেই গত হয়েছে।

যখন এই সুস্পষ্ট ও প্রকাশমান মু'জিযাগুলো ফিরাউন ও তার লোকদেরকে দেখানো হলো তখন তারা হঠকারিতা করে বললোঃ 'এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। আমরা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাবার জন্যে আমাদের বড় বড় যাদুকরদেরকে আহ্বান করছি।' যাদুকরদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে জয়যুক্ত করলেন এবং ঐ হঠকারিদের সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে গেল। তবুও তারা বাহ্যিক মুকাবিলা হতে সরলো না। শুধু যুলুম ও ফখরের উপর ভিত্তি করেই তারা সত্যকে অবিশ্বাস করতে থাকলো।

মহান আল্লাহ বলেনঃ দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কতই না বিস্ময়কর ও শিক্ষামূলক হয়েছিল। একই বারে একই সাথে সবাই তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং হে শেষ নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাসকারীর দল! তোমরা এই নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস করে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে বসো না। কেননা, এই নবী (সঃ) তো হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠতর। তাঁর দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাগুলোও হযরত মূসা (আঃ)-এর মু'জিযাগুলো অপেক্ষা বড় এবং মযবূত। স্বয়ং তাঁর ঐ অস্তিত্ব, তাঁর স্বভাব চরিত্র, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) তাঁর সম্পর্কে শুভ সংবাদ ও তাঁদের নিকট হতে তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে না মেনে নির্ভয়ে থাকবে এটা মোটেই উচিত নয়।

১৫। আমি অবশ্যই দাউদ (আঃ)-কে ও সুলাইমান (আঃ)-কে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিলঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

١٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

١٦- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○

১৬। সুলাইমান (আঃ) হয়েছিল দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিলঃ হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু হতে দেয়া হয়েছে; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

١٧- وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

১৭। সুলাইমান (আঃ)-এর সামনে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে-জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।

١٨- حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৮। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো তখন এক পিপীলিকা বললোঃ হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

١٩- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ

১৯। সুলাইমান (আঃ) ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করলো এবং বললোঃ হে আমার

نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ○

প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন!

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার ঐ নিয়ামতরাশির বর্ণনা রয়েছে যেগুলো তিনি হযরত দাঊদ (আঃ) ও হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উপর দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন উভয় জগতের সম্পদ। এই নিয়ামতগুলো দান করার সাথে সাথে তিনি তাঁদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কারণে সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা তাঁর প্রশংসা করতেন।

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) লিখেছেনঃ "যে বান্দাকে আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেন সেই নিয়ামতের উপর যদি সে তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে তার ঐ প্রশংসা ঐ নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম হবে। দেখো, স্বয়ং আল্লাহর কিতাবেই একথা বিদ্যমান রয়েছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতই লিখেন। তারপর তিনি লিখেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এ দুই নবী (আঃ)-কে যে নিয়ামত দান করেছিলেন তা অপেক্ষা উত্তম নিয়ামত আর কি হতে পারে?"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'সুলাইমান (আঃ) হয়েছিল দাঊদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-মালের উত্তরাধিকারী নয়। বরং রাজত্ব ও

নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য। যদি সম্পদের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হতো তবে শুধুমাত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নাম আসতো না। কেননা, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর একশটি স্ত্রী ছিল। আর নবীদের (আঃ) মালের মীরাস হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) খবর দিয়েছেনঃ "আমরা নবীদের দল (মালের) কাউকেও উত্তরাধিকারী করি না। আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা (রূপে পরিগণিত) হয়।"

হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নিয়ামতরাজি স্মরণ করে বলছেনঃ "হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা আমার প্রতি আল্লাহর একটি বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ যা অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। এটা অবশ্যই তাঁর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।"

কোন কোন অজ্ঞ লোক বলেছে যে, ঐ সময় পক্ষীকুলও মানুষের ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের তো এটা অনুধাবন করা উচিত ছিল যে, যদি সত্যি এরূপই হতো তবে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য আর কি থাকতো? অথচ তিনি গর্বের সাথে বর্ণনা করছেনঃ "আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।" সুতরাং ঐ অজ্ঞদের কথা সত্য হলে সবাই পাখীর ভাষা বুঝতে পারতো এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কিছুই থাকতো না। কাজেই তাদের উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। পাখী ও পশুর ভাষা এখন যা আছে তখনও তাই ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এটা একটা বিশেষ মর্যাদা যে, খেচর-ভূচর সবকিছুরই ভাষা বুঝতে পারতেন। সাথে সাথে তিনি এই নিয়ামতও লাভ করেছিলেন যে, একটা রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যত কিছু জিনিসের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবই দান করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর প্রকাশ্য অনুগ্রহ।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত দাঊদ (আঃ) একজন বড় মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি বাড়ী হতে বের হতেন তখন দরযা বন্ধ করে যেতেন। অতঃপর তাঁর বাড়ীতে প্রবেশের কারো অনুমতি ছিল না। একদা অভ্যাসমত তিনি বাড়ী হতে বের হন। অল্পক্ষণ পরে তাঁর এক পত্নী দেখতে পান যে, বাড়ীর শিশুদের মাঝে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি এ দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং

অন্যদেরকেও দেখান। তাঁরা সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পরস্পর বলাবলি করেনঃ "দরযা বন্দ রয়েছে তবুও এ লোকটি ভিতরে প্রবেশ করলো কি করে? আল্লাহর কসম! হযরত দাঊদ (আঃ)-এর সামনে আজ আমাদের অপমানের কোন সীমা থাকবে না।" ইতিমধ্যে হযরত দাঊদ (আঃ) এসে পড়েন। তিনিও লোকটিকে তথায় দণ্ডায়মান দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কে?" লোকটি উত্তরে বলেঃ "আমি সেই যাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং দরযা বন্ধ করা দ্বারাও যাকে বাধা দেয়া যায় না। আর যে বড় হতে বড়তম ব্যক্তিরও কোন পরোয়া করে না।" হযরত দাঊদ (আঃ) বুঝে নিয়ে বলেনঃ "মারহাবা! মারহাবা! (সাবাস! সাবাস!) আপনি মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা)।" তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর রূহ কবয করে নেন। সূর্য উদিত হলো এবং হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মৃতদেহের উপর রৌদ্র এসে পড়লো। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) পক্ষীকুলকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর ছায়া করে। পাখীগুলো তখন তাদের পালক বিস্তার করে এমন গভীরভাবে ছায়া করলো যে, যমীন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) পাখীগুলোকে এক এক করে পালক গুটিয়ে নিতে বললেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পাখীগুলো কিভাবে তাদের পালকগুলো গুটিয়ে নিলো?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন নিজের হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেনঃ "এভাবে। তাঁর উপর সেই দিন লাল রং এর গৃধিনী জয়যুক্ত হয়।"[১]

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সৈন্য একত্রিত হলো যাদের মধ্যে মানুষ, জ্বিন, পাখী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জ্বিন। পাখী তাঁর মাথার উপর থাকতো। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিতো। সবাই নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার জন্যে যে জায়গা নির্ধারিত ছিল সে সেই জায়গাতেই থাকতো। এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) চলতে রয়েছেন। একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে গমন করতে হলো যেখানে পিপীলিকার সেনাবাহিনী ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সেনাবাহিনীকে দেখে একটি পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বললোঃ "তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনী তাঁদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ঐ পিপীলিকাটির নাম ছিল হারস। সে বানু শায়সানের গোত্রভুক্ত ছিল। সে আবার খোঁড়া ছিল। সে অন্যান্য পিপীলিকার ব্যাপারে ভয় করলো যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘোড়াগুলো তাদের ক্ষুরের দ্বারা পিপীলিকাগুলোকে পিষে ফেলবে।

পিপীলিকাটির এ কথা শুনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর হাসি আসলো এবং তৎক্ষণাৎ তিনি দু'আ করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্যে। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে পাখী ও জীব-জন্তুর ভাষা শিখিয়েছেন ইত্যাদি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনার ইনআম এই যে, তাঁরা মুমিন ও মুসলমান হয়েছেন ইত্যাদি। আর আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি সৎ কার্য করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন।

তাফসীরকারদের উক্তি রয়েছে যে, এই উপত্যকাটি সিরিয়ায় অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ অন্য জায়গাতে বলেছেন। এই পিপীলিকাটি মাছির মত দুই পালক বিশিষ্ট ছিল। অন্য উক্তিও রয়েছে। নাওফ বাক্কালী (রঃ) বলেন যে, পিপীলিকাটি নেকড়ে বাঘের মত ছিল। খুব সম্ভব, আসলে ذِبَابٌ শব্দ লিখে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ) জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতে পারতেন বলে ঐ পিপীলিকাটির কথা তিনি বুঝে নেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর হাসি এসে যায়।

আবুস সাদীক নাজী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সুলাইমান ইবনে দাঊদ (আঃ) বৃষ্টির পানি চাওয়ার জন্যে বের হন। তিনি দেখতে পান যে, একটি পিপীলিকা উল্টোভাবে শুয়ে পা আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করতে রয়েছেঃ "হে আল্লাহ! আমরাও আপনার সৃষ্টজীব। বৃষ্টির পানির আমরাও মুখাপেক্ষী। যদি আপনি বৃষ্টি বর্ষণ না করেন তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" পিপীলিকাকে এভাবে দু'আ করতে দেখে নিজের লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেনঃ "চল, ফিরে যাই। অন্য কারো দু'আর বরকতে তোমাদেরকে বৃষ্টির পানি পান করানো হবে।"[১]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কোন এক নবীকে একটি পিপীলিকায় কামড়িয়ে নেয়। তিনি তখন পিপীলিকাসমূহের গর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ নবীর নিকট অহী করেনঃ "একটি পিপীলিকায় তোমাকে কেটেছে বলে আমার তাসবীহ পাঠকারী পিপীলিকার বিরাট দলকে তুমি ধ্বংস করে দিলে? প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা থাকলে যেটা তোমাকে কেটেছে ওর থেকেই প্রতিশোধ নিতে?"[১]

২০-وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○

২০। সুলাইমান (আঃ) পক্ষীকুলের সন্ধান নিলো এবং বললোঃ ব্যাপার কি? হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি?

২১- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ○

২১। সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা যবাহ করবো।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে হুদ্‌হুদ্‌ গণতকারের কাজ করতো। পানি কোথায় আছে তা সে বলতে পারতো। যমীনের নীচের পানি সে তেমনই দেখতে পেতো যেমন যমীনের উপরের জিনিস মানুষ দেখতে পায়। যখন হযরত সুলাইমান (আঃ) জঙ্গলে থাকতেন তখন পানি কোথায় আছে তা তিনি হুদ্‌হুদ্‌কে জিজ্ঞেস করতেন। তখন হুদ্‌হুদ্‌ বলে দিতো যে, অমুক অমুক জায়গায় পানি আছে ও এতোটা নীচে আছে ইত্যাদি। এরূপ সময় হযরত সুলাইমান (আঃ) জ্বিনদেরকে হুকুম করে কূপ খনন করিয়ে নিতেন। এইভাবে একদিন তিনি এক জঙ্গলে ছিলেন এবং পানির খোঁজ নেয়ার জন্যে পাখীগুলোর সন্ধান নেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় হুদ্‌হুদ্‌ উপস্থিত ছিল না। তাকে দেখতে না পেয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) বলেনঃ "আমি আজ হুদ্‌হুদ্‌কে দেখতে পাচ্ছি না। সে কি পাখীদের মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে বলেই আমার চোখে পড়ছে না, না আসলেই সে অনুপস্থিত রয়েছে?"

---

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এই তাফসীর শুনে নাফে ইবনে আরযাক খারেজী প্রতিবাদ করে বসে। এই বাজে উক্তিকারী লোকটি প্রায়ই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর কথার প্রতিবাদ করতো। সে বললোঃ "হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! আপনি তো আজ হেরে গেলেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ "এটা তুমি কেন বলছো?" উত্তরে সে বললোঃ "আপনি বলছেন যে, হুদ্‌হুদ্ যমীনের নীচের পানি দেখতে পেতো। কিন্তু কি করে এটা সত্য হতে পারে? ছেলেরা জাল বিছিয়ে ওকে মাটি দ্বারা ঢেকে ওর উপর দানা নিক্ষেপ করে হুদ্‌হুদ্ পাখীকে শিকার করে থাকে। যদি সে যমীনের নীচের পানি দেখতে পায় তবে যমীনের উপরের জাল সে দেখতে পায় না কেন?" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তর দেনঃ "তুমি মনে করবে যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিরুত্তর হয়ে গেছেন, এরূপ ধারণা আমি না করলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করতাম না। জেনে রেখো যে, যখন মৃত্যু এসে যায় তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান লোপ পায়।" একথা শুনে নাফে নিরুত্তর হয়ে যায় এবং বলে– "আল্লাহর কসম! আর আমি আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবো না।"

হযরত আবদুল্লাহ বারাযী (রঃ) অলীউল্লাহ লোক ছিলেন। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিতভাবে রোযা রাখতেন। আশি বছর তাঁর বয়স হয়েছিল। তাঁর এক চক্ষু কানা ছিল। সুলাইমান ইবনে যায়েদ (রঃ) তাঁকে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিছনে লেগেই থাকেন। মাসের পর মাস কেটে যায়, কিন্তু না তিনি কারণ বলেন এবং না তিনি তাঁর পিছন ছাড়েন। শেষে অসহ্য হয়ে তিনি বলেনঃ "তাহলে শোন– দু'জন খুরাসানী দামেশকের পার্শ্ববর্তী বারযাহ নামক একটি শহরে আমার নিকট আগমন করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, আমি যেন তাদেরকে বারযাহ উপত্যকায় নিয়ে যাই। আমি তখন তাদেরকে সেখানে নিয়ে যাই। তারা অঙ্গার ধানিকাসমূহ বের করলো এবং তাতে চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে দিলো। এর ফলে সারা উপত্যকা সুগন্ধে ভরপুর হয়ে গেল এবং চতুর্দিক হতে সেখানে সাপ আসতে লাগলো। কিন্তু তারা বেপরোয়াভাবে সেখানে বসেই থাকলো। কোন সাপের দিকেই তারা ভ্রূক্ষেপও করলো না। অল্পক্ষণ পরে একটি সাপ আসলো যা এক হাত বরাবর ছিল। তার চক্ষুগুলো সোনার ন্যায় জ্বলজ্বল করছিল। এতে তারা খুবই খুশী হলো এবং বললোঃ "আমরা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করছি যে, আমাদের এক বছরের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।" অতঃপর সাপটিকে ধরে তারা ওর চোখে শলাকা ঘুরিয়ে দিলো এবং এরপর নিজেদের চোখে ঐ শলাকা ঘুরালো। আমি তখন তাদেরকে বললামঃ আমার চোখেও এই শলাকা ঘুরিয়ে দাও। তারা অস্বীকার করলো। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে শেষে সম্মত হলো এবং আমার চোখে শলাকা ঘুরিয়ে দিলো। তখন আমি তাকিয়ে দেখি তো যমীন যেন আমার নিকট একটি শীশার মত মনে হতে লাগলো। যমীনের উপরের জিনিস আমি যেমন দেখছিলাম, ঠিক তেমনই যমীনের নীচের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর তারা আমাকে বললোঃ "আচ্ছা, আপনি আমাদের সাথে কিছু দূর চলেন।" আমি তখন তাদের কথামত তাদের সাথে চলতে থাকলাম। যখন আমরা জনপদ হতে বহু দূরে চলে গেলাম তখন তারা দু'জন আমাকে দু'দিক থেকে ধরে নিলো এবং একজন আমার চোখে অঙ্গুলী ভরে দিয়ে আমার চোখ উঠিয়ে নিলো এবং তা ফেলে দিলো। তারপর আমাকে তারা বেঁধে সেখানে রেখে চলে গেল। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে এক যাত্রীদল যাচ্ছিল। তারা আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বন্ধনমুক্ত করলো। অতঃপর আমি সেখান হতে চলে আসলাম। আমার চক্ষু নষ্ট হওয়ার কাহিনী এটাই।"[১]

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঐ হুদ্হুদের নাম ছিল আম্বার। তিনি বললেনঃ "যদি সত্যিই সে অনুপস্থিত থেকে থাকে তবে অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা যবাহ করেই ফেলবো। আর যদি সে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে তবে তাকে ক্ষমা করা হবে।"

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে গেল। জীব-জন্তুগুলো তাকে বললোঃ "আজ তোমার রক্ষা নেই। বাদশাহ সুলাইমান (আঃ) তোমাকে হত্যা করে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।" হুদহুদ তখন তাদেরকে বললোঃ "বাদশাহ কি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন বল দেখি?" তারা তা বর্ণনা করলো। তখন সে খুশী হয়ে বললোঃ "তাহলে আমি রক্ষা পেয়ে যাবো।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সে তার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতো বলেই আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেছেন।

১. এ ঘটনাটি হাফিয ইবনে আসাকের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○

২২। অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্‌ এসে পড়লো এবং বললোঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি। এবং সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

٢٣- اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ○

২৩। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

২৪। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে; শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎপথ পায় না।

٢٥- اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

২৫। নিবৃত্ত করেছে এই জন্যে যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।

২৬। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।

٢٦- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

হুদ্‌হুদ তার অনুপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই এসে পড়লো এবং আরয করলোঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! যে সংবাদ আপনি অবগত নন সেই সংবাদ নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমি সাবা (একটি দেশের নাম) হতে আসলাম এবং সেখান থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। একজন নারী তাদের উপর রাজত্ব করছে।"

তার নাম ছিল বিলকীস বিনতে শারাহীল। সে ছিল সাবা দেশের সম্রাজ্ঞী। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তার মা জ্বিন্নিয়্যাহ নারী ছিল। তার পায়ের পিছন ভাগ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষুরের মত ছিল।

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, বিলকীসের মায়ের নাম ছিল কারেআহ। ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, তার পিতার নাম ছিল যীশারখ এবং মাতার নাম ছিল বুলতাআহ। তার লাখ লাখ লোক-লশ্‌কর ছিল।

হুদহুদ বললোঃ "তাদের উপর একজন নারীকে আমি রাজত্ব করতে দেখেছি।" তার উপদেষ্টা ও উযীরের সংখ্যা তিনশ বারো জন। তাদের প্রত্যেকের অধীনে দশ হাজারের একটি করে দল রয়েছে। তার (বাস) ভূমির নাম ছিল মারিব, যাসানআ হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই উক্তিটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। ওর অধিকাংশ ইয়ামন রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

পার্থিব প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সবই তাকে দেয়া হয়েছে। তার একটি সুদৃশ্য ও বিরাট সিংহাসন রয়েছে। ঐ সিংহাসনে সে বসে। সিংহাসনটি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ছিল এবং দামী দামী পাথর দ্বারা কারুকার্য খচিত। ওটার উচ্চতা ছিল আশি হাত এবং প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত। ছয়শ' জন নারী সদা-সর্বদা তার খিদমতে নিয়োজিত থাকতো। তার দিওয়ানে খাস, যার মধ্যে এ সিংহাসনটি ছিল, খুবই বড় প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদটি ছিল খুবই প্রশস্ত, উঁচু, মযবূত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওর পূর্ব অংশে তিনশ' ষাটটি তাক বা খিলান ছিল। অনুরূপ সংখ্যক তাক পশ্চিম অংশেও ছিল। ওটাকে এমন শিল্পচাতুর্যের সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, প্রত্যহ সূর্য

একটি তাক দিয়ে উদিত হতো এবং ওর বিপরীত দিকের তাক দিয়ে অস্তমিত হতো। দরবারের লোকেরা সকাল সন্ধ্যায় তাকে সিজদা করে নিতো। রাজা-প্রজা সবাই ছিল সূর্যপূজক। আল্লাহর উপাসক তাদের মধ্যে একজনও ছিল না। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করে তুলতো। সে তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করতো। ফলে তারা সৎ পথে আসতোই না। সৎ পথ তো এটাই যে, শুধু আল্লাহর সত্তাকেই সিজদার উপযুক্ত মনে করা হবে, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজীকে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"(৪১ ঃ ৩৭)

কোন কোন কারী اَلَا يَا اُسْجُدُوْا لِلّٰهِ এইরূপ পড়েছেন। يَا -এর পরে مُنَادٰى উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ "হে আমার কওম! সাবধান, সিজদা শুধু আল্লাহর জন্যেই করবে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন।" خَبْءٌ -এর তাফসীর পানি, বৃষ্টি ও উৎপাদন দ্বারাও করা হয়েছে। যে হুদহুদের মধ্যে এই বিশেষণই ছিল তার উদ্দেশ্য যে এটাই হবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

ঘোষিত হয়েছেঃ তোমরা যা গোপন কর এবং যা ব্যক্ত কর তিনি সবই জানেন। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। তিনি একাই প্রকৃত মা'বূদ। তিনিই মহা আরশের অধিপতি। যার চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই।

যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী, এক আল্লাহর ইবাদতের হুকুমদাতা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করতে বাধাদানকারী, সেই হেতু তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ উঠিয়ে নেয়া হয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) চারটি প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো হলোঃ পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ এবং সুরদ্ অর্থাৎ লাটূরা।[১]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাঊদ ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে।

২৭। সুলাইমান (আঃ) বললোঃ আমি দেখবো তুমি কি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদী?

٢٧- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৮। তুমি যাও আমার এই পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে থেকো এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কি?

٢٨- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৯। সেই নারী বললোঃ হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।

٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

৩০। এটা সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট হতে এবং এটা এই- দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে,

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩১। অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

٣١- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ○ ع

হুদহুদের খবর শ্রবণ মাত্রই হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সত্যতা নিরূপণ শুরু করলেন যে, যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তবে সে ক্ষমার যোগ্য হবে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তবে হবে সে শাস্তির যোগ্য। তাই তিনি তাকেই বললেনঃ "তুমি আমার এ চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে বিলকীসকে দিয়ে এসো যে সেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা রয়েছে।" তখন ঐ চিঠিখানা চঞ্চুতে করে

নিয়ে বা পালকের সাথে বাঁধিয়ে নিয়ে হুদহুদ উড়ে চললো। সেখানে পৌঁছে সে বিলকীসের প্রাসাদে প্রবেশ করলো। ঐ সময় বিলকীস নির্জন কক্ষে অবস্থান করছিল। হুদহুদ একটি তাকের মধ্য দিয়ে ঐ চিঠিখানা তার সামনে রেখে দিলো এবং ভদ্রতার সাথে একদিকে সরে গেল। এতে সে অত্যন্ত বিস্মিতা হলো এবং সাথে সাথে কিছুটা ভয়ও তার অন্তরে জেগে উঠলো। চিঠিখানা উঠিয়ে নিয়ে মোহর ছিঁড়ে দিয়ে পত্রটি খুললো এবং পড়তে শুরু করলো। ওর বিষয়বস্তু অবগত হয়ে নিজের সভাষদবর্গকে একত্রিত করলো এবং বললোঃ "আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।" ঐ পত্রটি যে সম্মানিত ছিল এটা তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, একটি পাখী ওটাকে নিয়ে আসছে, অতি সতর্কতার সাথে তার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে এবং তার সামনে আদবের সাথে রেখে দিয়ে এক দিকে সরে দাঁড়াচ্ছে! তাই সে বুঝে নিলো যে, নিঃসন্দেহে চিঠিটি সম্মানিত এবং কোন মর্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষ হতে প্রেরিত।

তারপর সে পত্রটির বিষয়বস্তু সকলকে শুনিয়ে দিলো। শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা রয়েছে এবং সাথে সাথে মুসলমান হওয়ার ও তাঁর অনুগত হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

সুতরাং তারা সবাই বুঝে নিলো যে, এটা আল্লাহর নবীরই দাওয়াতনামা। তারা এটাও বুঝতে পারলো যে, তাঁর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই।

অতঃপর পত্রটির সুন্দর বাচনভঙ্গী, সংক্ষেপণ, অথচ গভীর ভাব তাদের সকলকেই বিস্ময়াভিভূত করলো। অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। এ যেন সমুদ্রকে কুঁজো বা কলসির মধ্যে বন্ধ করা।

উলামায়ে কিরামের উক্তি রয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পূর্বে কেউ পত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখেননি।

হযরত বারীদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ "এমন একটি আয়াত আমি জানি যা আমার পূর্বে হযরত সুলাইমান ইবনে দাঊদ (আঃ)-এর পরে আর কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি।" আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ আয়াতটি কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে আয়াতটির কথা বলে দিবো।" অতঃপর তিনি মসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত

হন, এমনকি মসজিদ হতে একটি পা বাইরে রেখেও দেন। আমি মনে করলাম যে, হয়তো তিনি ভুলে গেছেন। এমতাবস্থায় তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান এবং إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এই আয়াতটিপাঠ করেন।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ লিখতেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখতে শুরু করেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পত্রের বিষয়বস্তু শুধু নিম্নরূপই ছিলঃ

"আমার সামনে হঠকারিতা করো না, আমাকে বাধ্য করো না, আমার কথা মেনে নাও, অহংকার করো না, বরং খাঁটী একত্ববাদী ও অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো।"

٣٢- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○

৩২। সেই নারী বললোঃ হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।

٣٣- قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ○

৩৩। তারা বললোঃ আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।

٣٤- قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا

৩৪। সে বললোঃ রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই গারীব ও দুর্বল হাদীস।

اَعِـــزَّةَ اَهْلِهَـــا اَذِلَّةً وَكَـــذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে; এরাও এইরূপই করবে।

٣٥- وَاِنِّىْ مُـرْسِلَةٌ اِلَيْـهِمْ بِهَـدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْـمُرْسَلُوْنَ ○

৩৫। আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে!

বিলকীস তার সভাষদবর্গকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পত্রের বিষয়বস্তু শুনিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললোঃ "তোমরা তো জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ না করি এবং তোমরা উপস্থিত না থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত একা গ্রহণ করি না। কাজেই এই ব্যাপারেও আমি তোমাদের নিকট পরামর্শ চাচ্ছি যে, তোমাদের মতামত কি?" সবাই সমস্বরে জবাব দিলোঃ "আমাদের যুদ্ধের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে এবং আমাদের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। আপনি আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনি যা হুকুম করবেন তা আমরা পালন করার জন্যে প্রস্তুত আছি।

বিলকীসের সভাষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধের প্রতি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করলো বটে, কিন্তু সে ছিল বড়ই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী। আর সে হুদহুদের মাধ্যমে পত্র পাওয়ার সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখেছিল। সে এটাও বুঝতে পেরেছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর শক্তির মুকাবিলা করার ক্ষমতা তার সেনাবাহিনীর নেই। যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে তার রাজ্যও ধ্বংস হবে এবং তার নিজেরও কোন নিরাপত্তা থাকবে না। তাই সে তার মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাদেরকে বললোঃ "রাজা-বাদশাহদের নিয়ম এই যে, যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্থ করে। এরাও এইরূপই করবে।"

অতঃপর সে একটি কৌশল অবলম্বন করলো যে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে সন্ধি করা যাক। সুতরাং সে তার কৌশলপূর্ণ কথা সভাষদদের সামনে পেশ করলো। সে তাদেরকে বললোঃ "এখন আমি তাঁর কাছে এক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখা যাক, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে? খুব সম্ভব তিনি এটা কবূল

করবেন এবং ভবিষ্যতেও প্রতি বছর আমরা এটা জিযিয়া হিসেবে তাঁর নিকট পাঠাতে থাকবো। সুতরাং তাঁর আমাদের দেশকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হবে না।"

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এভাবে উপঢৌকন পাঠিয়ে সে বড়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। সে জানতো যে, টাকা পয়সা এমনই জিনিস যা লোহাকেও নরম করে দেয়। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সে তার কওমকে বলেছিলঃ "যদি তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করেন তবে বুঝবে যে, তিনি একজন বাদশাহ। আর যদি গ্রহণ না করেন তবে বুঝবে যে, তিনি একজন নবী। সুতরাং তখন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য হবে।

٣٦- فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰـنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○

৩৬। অতঃপর যখন দূত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট আসলো তখন সুলাইমান (আঃ) বললোঃ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছো? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে উৎকৃষ্ট; অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দবোধ করছো।

٣٧- اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

৩৭। তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসবো এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করবার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করবো লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত।

বিলকীস খুবই মূল্যবান উপঢৌকন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলো। যেমন সোনা, মণি-মাণিক্য, বহু সংখ্যক সোনার ইষ্টক, সোনার পাত্র ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেন যে, কিছু ছেলেকে মেয়ের পোশাকে এবং কতকগুলো মেয়েকে ছেলের পোশাকে পাঠিয়েছিল। আর বলেছিলঃ "যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) তাদেরকে চিনে নিতে পারেন তবে তাঁকে নবী বলে মেনে নেয়া হবে।"

যখন তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি তাদের সকলকেই অযু করার নির্দেশ দেন। মেয়েরা তো বরতন হতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করলো, আর ছেলেরা বরতনের মধ্যেই হাত ডুবিয়ে দিয়ে পানি নিলো। এর দ্বারা হযরত সুলাইমান (আঃ) তাদের চিনে নিয়ে পৃথক পৃথক করে দিলেন আর বললেনঃ "এরা ছেলে এবং এরা মেয়ে।"

অন্য কেউ কেউ বলেছেন যে, মেয়েরা প্রথমে তাদের হাতের ভিতরের অংশ ধুয়েছিল এবং ছেলেরা প্রথমে তাদের হাতের বাইরের অংশ ধৌত করেছিল। এইভাবে তিনি তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে পেরেছিলেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, তাদের মধ্যে একটি দল নির্দেশ প্রাপ্তির পর হাত ধুতে শুরু করে এবং অঙ্গুলী পর্যন্ত ধৌত করে। আর অন্য দল তাদের বিপরীত হাতের অঙ্গুলী হতে ধুতে শুরু করে হাতের কনুই পর্যন্ত নিয়ে যায়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, বিলকীস হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট একটি বরতন পাঠিয়েছিল এবং বলে পাঠিয়েছিল যে, তিনি যেন বরতনটিকে এমন পানি দ্বারা পূর্ণ করেন যা যমীনেরও নয় এবং আসমানেরও নয়। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) ঘোড়া-দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। ঘোড়াগুলোর ঘর্ম বের হলে তিনি ঐ ঘর্ম দ্বারা বরতনটি পূর্ণ করে দেন। প্রায় এ সবগুলোই বানী ইসরাঈলের উক্তি। এখন এগুলোর মধ্যে কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা তো জানা যাচ্ছে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) ঐ রাণীর উপঢৌকনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। বরং তা দেখা মাত্রই বলেছিলেনঃ "তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ ঘুষ দিয়ে নিজেদেরকে শিরকের উপর বাকী রাখার ইচ্ছা করছো? এটা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বহু কিছু দিয়েছেন। রাজ্য-রাজত্ব, ধন-মাল, সৈন্য-সামন্ত

সবকিছুই আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। যে কোন দিক দিয়েই আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম অবস্থায় রয়েছি। তোমরা এগুলো নিয়ে তোমাদের লোকদের নিকট ফিরে যাও। জেনে রেখো যে, আমি অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসবো এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তোমাদের নেই। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করবো লাঞ্ছিতভাবে এবং তোমরা হবে অবনমিত।

এটাও বলা হয়েছে যে, বিলকীসের দূতেরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাঁর নির্দেশক্রমে জ্বিনেরা এক হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করে। যখন দূতেরা রাজধানীতে পৌঁছে তখন প্রাসাদগুলো দেখে তো তাদের আক্কেল গুড়ুম! তারা বলেঃ "বাদশাহ তো আমাদের উপঢৌকনগুলো ঘৃণার চক্ষে দেখবেন। এখানে তো সোনা মাটির সমানও মর্যাদা রাখে না।" এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, বিদেশী লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু লৌকিকতা করা বাদশাহদের জন্যে জায়েয।

এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) দূতদেরকে বললেনঃ "তোমরা এই উপঢৌকনগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাদেরকে গিয়ে বলো যে, তারা যেন মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। জেনে রেখো যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসবো যাদের মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করবো লাঞ্ছিতভাবে। আমি তাদের সিংহাসন ও রাজমুকুটকে পদদলিত করবো।"

যখন দূতেরা উপঢৌকনগুলো ফিরিয়ে নিয়ে বিলকীসের নিকট গিয়ে পৌঁছলো এবং শাহী পয়গাম তাকে জানিয়ে দিলো তখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে তার আর কোন সন্দেহ থাকলো না। সুতরাং সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাসহ সে মুসলমান হয়ে গেল এবং সে তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট হাযির হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। যখন হযরত সুলাইমান (আঃ) বিলকীসের সংকল্পের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

৩৮। সুলাইমান (আঃ) আরো বললোঃ হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?

٣٨- قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩৯। এক শক্তিশালী জ্বিন বললোঃ আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার পূর্বে আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিবো এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।

٣٩- قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○

৪০। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বললোঃ আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিবো। সুলাইমান (আঃ) যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলো তখন সে বললোঃ এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।

٤٠- قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

যখন দূতেরা বিলকীসের নিকট ফিরে আসে এবং পুনরায় তার কাছে নবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছে তখন সে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) একজন নবী। তাই সে বলে– "আল্লাহর শপথ! তিনি একজন নবী এবং নবীদের সঙ্গে কখনো মুকাবিলা করা যায় না।" তৎক্ষণাৎ সে পুনরায় দূত পাঠিয়ে বললোঃ "আমি আমার কওমের নেতৃস্থানীয় লোকজনসহ আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি, যাতে স্বয়ং আপনার সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনী জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আপনার কাছে সান্ত্বনা পেতে পারি।" একথা বলে পাঠিয়ে একজনকে এখানে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলো এবং তার দায়িত্বে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে নিজের মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণের মহামূল্যবান সিংহাসনটি সাতখণ্ড করে সাতটি প্রাসাদে তালাবদ্ধ করে রাখলো এবং প্রতিনিধিকে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দিলো। অতঃপর বারো হাজার নেতৃস্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। ঐ বারো হাজার নেতৃস্থানীয় লোকের প্রত্যেকের অধীনে আবার হাজার হাজার লোক ছিল। জ্বিনেরা বিলকীস ও তার লোকজনের প্রতিক্ষণের খবর হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তারা নিকটবর্তী হয়ে গেছে তখন তিনি তাঁর রাজসভায় বিদ্যমান মানব ও দানবকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "বিলকীস ও তার লোক-লশ্‌কর এখানে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই তার সিংহাসনটি আমার নিকট হাযির করে দিতে পারে এরূপ কেউ তোমাদের মধ্যে আছে কি? কেননা, যখন সে এখানে এসে পড়বে এবং ইসলাম কবূল করে নিবে তখন তার ধন-সম্পদ আমাদের জন্যে হারাম হয়ে যাবে।" তাঁর একথা শুনে একজন শক্তিশালী উদ্ধত জ্বিন, যার নাম ছিল কাওযান এবং সে ছিল একটা বিরাট পাহাড়ের মত, বললোঃ "আপনার দরবার ভেঙ্গে দেয়ার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিতে পারি।" হযরত সুলাইমান (আঃ) জনগণের বিচার মীমাংসার জন্যে সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দরবারে বসতেন। কাওযান নামক জ্বিনটি বললোঃ "এই সময়ের মধ্যেই আমি বিলকীসের সিংহাসনটি আপনার নিকট নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আমি আমানতদারও বটে। ওর থেকে কোন জিনিস আমি চুরি করবো না।" হযরত সুলাইমান (আঃ) বললেনঃ "আমি চাই যে, এরও পূর্বে যেন তার সিংহাসনটি আমার নিকট পৌঁছে যায়।" এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হযরত

সুলাইমান ইবনে দাঊদ (আঃ)-এর ঐ সিংহাসনটি আনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর একটি বড় মু'জিযা ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণ বিলকীসকে প্রদর্শন করা। কাতাদা (রঃ) যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন তা সঠিক ।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই ত্বরা ও পীড়াপীড়িপূর্ণ নির্দেশ শুনে যার নিকট কিতাবী জ্ঞান ছিল, এক উক্তি অনুযায়ী, তিনি ছিলেন আসেফ, তিনি হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর লেখক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বারখায়া। তিনি একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। তিনি ছিলেন একজন পাকা মুসলমান। আবূ সালেহ (রঃ), যহহাক (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তিনি মানবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাতাদা (রঃ) আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তাঁর নাম ছিল উসতূম। একটি রিওয়াইয়াতে তাঁর নাম বালীখও রয়েছে। যুহায়ের ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন যে, তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং তাঁকে মুন্‌নূর বলা হতো। আবদুল্লাহ ইবনে লাহীআহ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, তিনি ছিলেন হযরত খিযর (আঃ)। কিন্তু এই উক্তিটি খুবই গারীব বা দুর্বল। যাই হোক, তিনি বললেনঃ "আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি সিংহাসনটি আপনাকে এনে দিবো।" সুতরাং হযরত সুলাইমান (আঃ) ইয়ামনের দিকে তাকালেন যেখানে বিলকীসের সিংহাসনটি ছিল। এদিকে যে লোকটির কিতাবের জ্ঞান ছিল তিনি অযু করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দু'আ করতে শুরু করলেন। তিনি দু'আয় বললেনঃ

يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থাৎ "হে মহিমময়, মহানুভব!" অথবা বলেনঃ

يَا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِئْتِنِيْ بِعَرْشِهَا

অর্থাৎ "হে আমার মা'বূদ ও প্রত্যেক জিনিসের মা'বূদ, একক মা'বূদ! আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আপনি তার আরশটি এনে দিন।" তৎক্ষণাৎ বিলকীসের সিংহাসনটি সামনে এসে পড়লো। এটুকু সময়ের মধ্যে ওটা ইয়ামন হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেল এবং সুলাইমান (আঃ)-এর সৈন্যদের চোখের সামনে দিয়ে ওটা তাঁর কাছে এসে গেল। যখন তিনি ওটা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেনঃ "এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করি, না অকৃতজ্ঞ হই? যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যেই এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত ও মহানুভব।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

অর্থাৎ "যে ভাল কাজ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যেই করে এবং যে মন্দ কাজ করে, ওর ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।"(৪১ ঃ ৪৬) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা ভাল কাজ করছে তারা নিজেদের জন্যেই কল্যাণ জমা করছে।" (৩০ ঃ ৪৪) হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "যদি তোমরা এবং ভূ-পৃষ্ঠের সবাই কুফরী করতে শুরু কর তবে জেনে রেখো যে, (এতে তোমরা আল্লাহর একটুও ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ) আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।" (১৪ঃ ৮)

সহীহ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের এবং তোমাদের মানব ও দানব সবাই আল্লাহভীরু ও সৎ হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্ব ও মান-মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সবাই পাপী ও অবাধ্য হয়ে যায় তবুও আমার আধিপত্য ও মান-মর্যাদা একটুও হ্রাস পাবে না। এগুলো তো তোমাদের আমল মাত্র, যেগুলো জমা হবে এবং তোমরা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কেউ কল্যাণ পেলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, আর কোন অকল্যাণ ও অনিষ্ট পেলে যেন সে নিজেকেই তিরস্কার করে।"

٤١- قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

৪১। সুলাইমান বললোঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে না সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়?

٤٢- فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۗ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ○

৪২। ঐ নারী যখন আসলোঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তোমার সিংহাসনটি কি এই রূপই? সে বললোঃ এটা তো যেন ওটাই, আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

٤٣- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৪৩। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করতো তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ ع

৪৪। তাকে বলা হলোঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখলো তখন সে ওটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করলো এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করলো, সুলাইমান (আঃ) বললোঃ স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, আমি সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি।

বিলকীসের সিংহাসনটি এসে যাওয়ার পর হযরত সুলাইমান (আঃ) নির্দেশ দিলেনঃ "সিংহাসনটিতে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন কর।" সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ওর কিছু হীরা জওহর পরিবর্তন করা হলো, রঙও কিছুটা বদলিয়ে দেয়া হলো এবং নীচ ও উপর হতেও কিছু পরিবর্তন করা হলো, তাছাড়া কিছু কম-বেশীও করা হলো। বিলকীস তার সিংহাসনটি চিনতে পারে কি-না তা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে পৌঁছে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "এটাই কি তোমার সিংহাসন?" উত্তরে সে বললোঃ "আমার সিংহাসনটি হুবহু এই রূপই বটে।" এই উত্তর দ্বারা তার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, সে দেখছে যে, সিংহাসনটি সম্পূর্ণরূপে তার সিংহাসনেরই মত। কিন্তু ওটা সেখানে পৌঁছা অসম্ভব বলেই সে এইরূপ উত্তর দিয়েছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) বললেনঃ "এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।" বিলকীসকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত এবং তার কুফরী আল্লাহর একত্ববাদ হতে ফিরিয়ে রেখেছিল। অথবা এও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) বিলকীসকে গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে বিরত রেখেছিলেন। ইতিপূর্বে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথম উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা এ জিনিসটিও করছে যে, রাণী বিলকীস তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রাসাদে প্রবেশের পরে করেছিল। যেমন এটা সত্বরই আসছে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) জ্বিনদের দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন যা শুধু শীশা ও কাঁচ দ্বারা নির্মিত ছিল। শীশা ছিল খুবই স্বচ্ছ। তথায় আগমনকারী ওটাকে শীশা বলে চিনতে পারতো না, বরং মনে করতো যে, ওগুলো পানি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ আসলে পানির উপরে শীশার ফারাশ ছিল।

কারো কারো ধারণা এই যে, এই শিল্প-চাতুর্যপূর্ণ কাজের দ্বারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল বিলকীসকে বিয়ে করা। কিন্তু তিনি শুনেছিলেন যে তার পায়ের গোছা খুবই নিকৃষ্ট এবং তার পায়ের গিঁঠ চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষুরের মত। এর সত্যাসত্য যাচাই করার জন্যেই তিনি এইরূপ করেছিলেন। যখন সে এখানে আসতে শুরু করে তখন সামনে পানির হাউয দেখে পায়ের গোছা হতে কাপড় উঠিয়ে নেয়। ফলে হযরত সুলাইমান (আঃ) তার পায়ের গোছা দেখে নেন এবং তিনি এটা নিশ্চিতরূপে জেনে নেন যে, তার

পায়ের গোছার যে দোষের কথা তিনি শুনেছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার পায়ের গোছা ও পা সম্পূর্ণরূপে মানুষের পায়ের মতই। হ্যাঁ, তবে সে অবিবাহিতা সম্রাজ্ঞী ছিল বলে তার পায়ের গোছায় বড় বড় চুল বা লোম ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে ঐ লোমগুলো ক্ষুর দ্বারা কামিয়ে ফেলবার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে বলে যে, এটা সে সহ্য করতে পারবে না। তখন তিনি জ্বিনদেরকে এমন একটা জিনিস তৈরী করতে নির্দেশ দেন যার দ্বারা ঐ লোম আপনা আপনিই উঠে যায়। তখন জ্বিনেরা মলম পেশ করে। এ ওষুধ সর্ব প্রথম হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নির্দেশক্রমেই আবিষ্কৃত হয়।

বিলকীসকে প্রাসাদে আহ্বান করার কারণ ছিল এই যে, সে যেন তার নিজের রাজ্য হতে, দরবার হতে, শান-শওকত ও সাজ-সরঞ্জাম হতে এবং আরাম-আয়েশ হতে, এমনকি নিজ হতেও শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্ব অবলোকন করতে পারে এবং নিজের উচ্চ মান-মর্যাদার কথা ভুলে যেতে পারে। এর ফলে নিজের দর্প ও অহংকারের পরিসমাপ্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর যখন বিলকীস ভিতরে আসতে শুরু করলো এবং হাউযের নিকট পৌঁছলো তখন ওটাকে তরঙ্গায়িত নদী মনে করে পাজামা উঠিয়ে নেয়। তৎক্ষণাৎ তাকে বলা হয়ঃ "তুমি ভুল করছো। এটা তো শীশা মণ্ডিত। সুতরাং তুমি পা না ভিজিয়েই এর উপর দিয়ে চলে আসতে পার।" যখন সে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলো তখনই তিনি তার কানে তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে দেন এবং সূর্যপূজার নিন্দাবাণী তাকে শুনিয়ে দেন। প্রাসাদে প্রবেশ করেই এর হাকীকত তার দৃষ্টিগোচর হলো এবং দরবারের শান-শওকত ও জাঁক-জমক দেখেই সে বুঝতে পারলো যে, এর সাথে তো তার দরবারের তুলনাই হয় না। নীচে পানি আছে এবং উপরে আছে শীশা। মধ্যভাগে আছে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসন। উপর হতে পক্ষীকুল ছায়া করে রয়েছে। দানব ও মানব সবাই হাযির আছে এবং তাঁর নির্দেশ মানবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। যখন তিনি তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে যিন্দীকদের (আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসীদের) মতই জবাব দিলো। এতে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলো। তার উত্তর শুনেই হযরত সুলাইমান (আঃ) সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তাঁকে সিজদাবনত অবস্থায় দেখে তাঁর সব লোক-লশ্করও সিজদাবনত হলো। এতে বিলকীস খুবই লজ্জিত হলো। এরপর হযরত

সুলাইমান (আঃ) তাকে ধমকের সুরে বললেনঃ "তুমি কি বললে?" সে উত্তরে বললোঃ "আমার ভুল হয়ে গেছে।" তৎক্ষণাৎ সে প্রতিপালকের দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং বলে উঠলোঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, আমি সুলাইমান (আঃ)-এর সহিত জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি।" এভাবে সে খাঁটি অন্তরে মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন তাঁর সিংহাসনের উপর উপবেশন করতেন তখন ওর পার্শ্ববর্তী চেয়ারসমূহের উপর মানুষ বসতো, ওর পার্শ্ববর্তী চেয়ারগুলোর উপর জ্বিনেরা বসতো, তারপর শয়তানরা বসতো। অতঃপর বাতাস ঐ সিংহাসন নিয়ে উড়ে চলতো। এর পর পাখীগুলো এসে পালক দ্বারা ছায়া করতো। তারপর তাঁর নির্দেশক্রমে বাতাস সকাল বেলায় তাঁকে এক মাসের পথ অতিক্রম করাতো। অনুরূপভাবে সন্ধ্যা বেলায়ও এক মাসের পথের মাথায় পৌঁছিয়ে দিতো। এভাবে একদা তিনি চলতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পাখীসমূহের খোঁজ-খবর নিলেন, তখন তিনি হুদ্‌হুদ্‌কে অনুপস্থিত পেলেন। তাই তিনি বললেনঃ "ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? অনুপস্থিতির সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিবো অথবা যবাহ্ করেই ফেলবো।"

এরপর অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়লো এবং তার 'সাবা' নামক দেশে গমন করা এবং তথা হতে খবর আনার কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করলো।

হযরত সুলাইমান (আঃ) তখন তার সত্যতা পরীক্ষার জন্যে 'সাবা' দেশের সম্রাজ্ঞীর নামে একটি চিঠি লিখে তাকে দিলেন এবং পুনরায় তাকে সেখানে পাঠালেন। ঐ চিঠির মাধ্যমে তিনি সম্রাজ্ঞীকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট চলে আসে। ঐ চিঠি পাওয়া মাত্র সম্রাজ্ঞীর অন্তরে চিঠি ও ওর লেখকের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে তার সভাষদবর্গের সাথে পরামর্শ করে। তারা তাদের শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে বলে– "আমরা মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি, শুধু আপনার হুকুমের অপেক্ষা করছি।" কিন্তু সম্রাজ্ঞী তার মন্দ পরিণাম ও পরাজয়ের কথা চিন্তা করে মুকাবিলা করা হতে বিরত থাকে। সে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে বন্ধুত্ব

স্থাপনের চেষ্টা এইভাবে করে যে, সে তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করে যা তিনি ফিরিয়ে দেন এবং তার রাজ্য আক্রমণের হুমকি দেন। এখন সম্রাজ্ঞী হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। যখন তারা তাঁর সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্রাজ্ঞীর সেনাবাহিনীর পদ-ধূলি উড়তে দেখেন তখন তিনি তাঁর অধীনস্থদেরকে তার সিংহাসনটি অতিসত্বর তাঁর কাছে হাযির করার নির্দেশ দেন। একজন জ্বিন বলে– "ঠিক আছে, আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার পূর্বেই আমি ওটা এনে দিবো এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত।" হযরত সুলাইমান (আঃ) বলেনঃ "এরও পূর্বে আনা কি সম্ভব নয়?" তাঁর এ প্রশ্ন শুনে ঐ জ্বিন তো নীরব হয়ে গেল, কিন্তু কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বললোঃ "আপনি চক্ষুর পলক ফেলবার পূর্বেই আমি ওটা আপনার নিকট হাযির করে দিবো।" ইত্যবসরেই যখন হযরত সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনটি তাঁর সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং ঐ সিংহাসনের কিছুটা পরিবর্তন আনয়নের পরামর্শ দিলেন। বিলকীসের আগমন মাত্রই হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার সিংহাসনটি কি এই রূপই?" উত্তরে সে বললোঃ "এটা তো যেন ওটাই।"

বিলকীস হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কাছে দু'টি জিনিস চাইলো। একটি হলো ঐ পানি যা না যমীন হতে বের হয়েছে, না আসমান হতে বর্ষিত হয়েছে। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে প্রথমে তিনি মানবদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তারপর দানবদেরকে এবং সবশেষে শয়তানদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শয়তানরা হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে বললোঃ "এটা কোন কঠিন কিছু নয়। আপনি ঘোড়া তাড়িয়ে দিন এবং ওর ঘর্ম দ্বারা পাত্র পূর্ণ করুন।" বিলকীসের এই চাহিদা পূর্ণ হলে সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলোঃ "আচ্ছা, বলুন তো আল্লাহ তা'আলার রঙ কেমন?" এ কথা শোনা মাত্রই হযরত সুলাইমান (আঃ) লাফিয়ে উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ সিজদায় পতিত হন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! সে আমাকে এমন প্রশ্ন করেছে যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে পারি না।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "তুমি নিশ্চিত থাকো, তাদের ব্যাপারে আমিই তোমার জন্যে যথেষ্ট।" অতঃপর তিনি সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বিলকীসকে

জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে?” জবাবে সে বললোঃ “আমি আপনাকে পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম এবং আপনি তা পূর্ণ করেছেন। আর কোন প্রশ্ন তো আমি করিনি।” সে স্বয়ং এবং তার সৈন্যরা সবাই দ্বিতীয় প্রশ্নটি ভুলেই যায়। হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্রাজ্ঞীর সৈন্যদেরকেও জিজ্ঞেস করেন। তারাও একই উত্তর দেয় যে, বিলকীস পানি ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি।

শয়তানরা ধারণা করলো যে, যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) বিলকীসকে পছন্দ করে নেন এবং তাকে বিয়ে করে ফেলেন, আর ছেলে-মেয়েরও জন্ম হয়ে যায় তবে তিনি তাদের (শয়তানদের) থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করবেন। তাই তারা হাউজ তৈরী করলো ও তা পানি দ্বারা পূর্ণ করে দিলো এবং উপরে কাঁচের ফারাশ তৈরী করলো। তারা ওটা এমনভাবে তৈরী করলো যে, দর্শকরা ওকে পানিই মনে করে, পানির উপরে যে কিছু আছে তা তারা বুঝতেই পারে না। বিলকীস দরবারে আসলো এবং ওখান দিয়ে আসার ইচ্ছা করলো, কিন্তু ওটাকে পানি মনে করে নিজের পাজামা উঠিয়ে নিলো। হযরত সুলাইমান (আঃ) তার পায়ের গোছার লোম দেখে তা অপছন্দ করলেন এবং সাথে সাথেই বললেনঃ “পায়ের লোমগুলে দূর করে দেয়ার চেষ্টা কর।” তাঁর লোকেরা বললোঃ “ক্ষুর দ্বারা এগুলো দূর করা সম্ভব।” তখন সুলাইমান (আঃ) বললেনঃ “ক্ষুরের চিহ্নও আমি পছন্দ করি না। সুতরাং অন্য কোন পন্থা বাতলিয়ে দাও।” তখন শয়তানরা এক প্রকার মলম বা মালিশ তৈরী করলো, যা লাগানো মাত্রই লোমগুলো উঠে গেল। লোম উঠানো মলম সর্বপ্রথম হযরত সুলাইমানের নির্দেশক্রমেই তৈরী করা হয়।[১]

১. এটা ইমাম আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা বর্ণনা করার পর তিনি লিখেছেন যে, এটা শুনতে খুব ভাল গল্প বটে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গল্প। আতা ইবনে সায়েব (রঃ) ভুলক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নাম দিয়ে এটা বর্ণনা করেছেন। খুব সম্ভব এটা বানী ইসরাঈলের দফতর হতে নেয়া হয়েছে যা কা'ব (রঃ) ও অহাব (রঃ) মুসলমানদের মধ্যে চালু করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করুন। বানী ইসরাঈলরা তো অতিরঞ্জন প্রিয়। তারা অনেক কিছু নিজেরাই বানিয়ে নেয়। আল্লাহর হাজার শুকর যে, আমরা তাদের মুখাপেক্ষী নই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে এমন এক পবিত্র গ্রন্থ দান করেছেন যা সবদিক দিয়েই তাদের অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও উপকারী। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

صَرْحٌ বলা হয় প্রাসাদকে এবং প্রত্যেক উচ্চ ইমারতকে। যেমন অভিশপ্ত ফিরাউন তার উযীর হামানকে বলেছিলঃ يَا هَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا অর্থাৎ "হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর।" (৪০ঃ ৩৬) ইয়ামনের একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সুউচ্চ প্রাসাদের নামও صَرْحٌ ছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ভিত্তি যা খুবই দৃঢ় ও মযবূত। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঐ প্রাসাদটি কাঁচ ও স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত ছিল। বিলকীস যখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই শান-শওকত ও জাঁক-জমক অবলোকন করলো এবং সাথে সাথে তাঁর উত্তম চরিত্র ও গুণ স্বচক্ষে দেখলো তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তৎক্ষণাৎ সে মুসলমান হয়ে গেল। নিজের পূর্ব জীবনের শিরক ও কুফরী হতে তাওবা করে দ্বীনে সুলাইমানী (আঃ)-এর অনুগত হয়ে গেল। এরপর সে ঐ আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলো যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী।

৪৫। আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহ (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম, এই আদেশসহ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো।

٤٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَاهُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৬। সে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার?

٤٦- قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

٤٧- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طٰئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○

৪৭। তারা বললোঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি; সালিহ (আঃ) বললোঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর কওমের কাছে আসলেন এবং আল্লাহর রিসালাত আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তাদের মধ্যে দু'টি দল হয়ে যায়। একটি মুমিনদের দল এবং অপরটি কাফিরদের দল। এ দু'টি দল পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ-قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

অর্থাৎ "তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বললো, তোমরা কি জান যে, সালেহ (আঃ) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বললো, তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।" (৭ঃ ৭৫–৭৬)

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর কওমকে বলেনঃ "হে আমার কওম! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা রহমত চাওয়ার পরিবর্তে শাস্তি চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছো না, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার?"

তারা উত্তরে বললোঃ 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।' এ কথাই ফিরাউন ও তার লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন তারা কল্যাণ লাভ করে তখন বলে-আমরা তো এরই উপযুক্ত, আর যখন তাদেরকে অকল্যাণ পৌঁছে তখন তারা এ জন্যে মূসা (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে দায়ী করে।" অন্য আয়াতে আছেঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "যদি তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছে তবে তারা বলে-এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর যদি তাদেরকে অকল্যাণ পৌঁছে তবে তারা বলে- এটা তোমার পক্ষ হতে এসেছে; তুমি বল, সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে।" (৪ ঃ ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে খবর দিয়ে বলেন, যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেনঃ

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ـ

অর্থাৎ "তারা বললোঃ আমরা তোমাদেরকে অকল্যাণের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। তারা বললোঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে।" (৩৬ঃ ১৮-১৯)

এখানে রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আঃ) বললেনঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পরীক্ষা করা হচ্ছে তিরস্কার দ্বারাও এবং বিপদ-আপদ দ্বারাও। তবে এখানে তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। এ অবকাশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে, এর পরে পাকড়াও করা হবে।

٤٨- وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ○

৪৮। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎকর্ম করতো না।

٤٩- قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

৪৯। তারা বললোঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করঃ আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করবো, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলবো–তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٥٠- وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৫০। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

٥١- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৫১। অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে– আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

٥٢- فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৫২। এই তো তাদের ঘরবাড়ী–সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৫৩। এবং যারা মুমিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

٥٣- وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সামূদ সম্প্রদায়ের শহরে নয়জন ঝগড়াটে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোক ছিল। তাদের স্বভাব বা প্রকৃতিতে সংস্কার বা শুদ্ধকরণের মূল জিনিস কিছুই ছিল না। তারাই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক। তাদেরই পরামর্শক্রমে উষ্ট্রীকে হত্যা করা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনামতে তাদের নামগুলো হলোঃ দামী, দায়ীম, হারাম, হারীম, দা'ব, সওয়াব, রিবাব, মিসতা এবং কিদার ইবনে সালিফ (আল্লাহ তাদের অবস্থা মন্দ করুন ও তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন!)। এদের শেষোক্ত ব্যক্তিটিই নিজের হাতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীটির পা কেটে ফেলেছিল। যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতগুলোতে রয়েছে।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ অর্থাৎ "অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করলো, সে ওকে ধরে হত্যা করলো। (৫৪ঃ ২৯) اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا অর্থাৎ "তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো।" (৯১ঃ ১২)

এরা ছিল ঐ সব লোক যারা দিরহামের ছাঁচকে কিছুটা কেটে দিতো এবং ওটাকেই চালিয়ে দিতো। ছাঁচকে কেটে দেয়াও এক প্রকারের বিপর্যয় সৃষ্টি। যেমন সুনানে আবি দাঊদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, যে মুদ্রা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে ওকে বিনা প্রয়োজনে কাটতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। মোটকথা, তারা এ ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিও করতো এবং আরো নানা প্রকারের ফাসাদ সৃষ্টি করতো। ঐ অপবিত্র দল একত্রিত হয়ে পরামর্শ গ্রহণ করলোঃ "আজ রাত্রে সালেহ (আঃ)-কে এবং তার পরিবারবর্গকে হত্যা করে ফেলো।" এতে তারা সবাই একমত হয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করলো। কিন্তু তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হলো এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে আসলো। ঐসব নেতার মাথা ফুটে গেল। একই সাথে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তাদের সাহস খুবই বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে যখন তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করলো এবং

দেখলো যে, কোন শাস্তি এলো না তখন তারা আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করলোঃ "তোমরা গোপনে তাকে ও তার ছেলেমেয়েদেরকে হঠাৎ হত্যা করে ফেলো এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও কওমের লোকদেরকে বলো-তাদের খবর আমরা কি জানি? আমরা তাদের কোন খবরই রাখি না।"

তখন আল্লাহ তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেন। তারা আরো বলেছিলঃ "যদি সালেহ (আঃ) সত্যই নবী হয় তবে তাকে আমরা হাতে পাবো না। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উষ্ট্রীর সাথে তাকেও আমরা সেলাই করে দেবো।" এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা বের হয়ে পড়লো। তারা পথেই ছিল এমতাবস্থায় ফেরেশতা তাদের সবারই মস্তিষ্ক টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তাদের পরামর্শে অন্য যেসব দল শরীক ছিল তারা যখন দেখলো যে, অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে অথচ তারা ফিরে আসছে না তখন তারা তাদের খবর নিতে এসে দেখে যে, তাদের সবারই মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে গেছে এবং সবাই মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তখন তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে তাদের হত্যাকারী বলে অপবাদ দেয় এবং তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাঁর কওমের লোকেরা ইতিমধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে পড়ে এবং তাদেরকে বলে- "দেখো, সালেহ (আঃ) তো তোমাদেরকে বলেছেন যে, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে। তাহলে যদি তিনি তাঁর কথায় সত্যবাদী হন তবে তাঁকে হত্যা করলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি আরো অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হবেন এবং তোমাদের উপর আরো কঠিন শাস্তি আপতিত হবে। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তবে তিনি তোমাদের হাত হতে যাবেন কোথায়?" তাঁর কওমের এ কথা শুনে ঐ দুষ্ট লোকেরা ফিরে যায়। সত্যিই হযরত সালেহ (আঃ) ঐ লোকদের পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেনঃ "যদি তোমরা আল্লাহর উষ্ট্রীকে হত্যা করে ফেলো তবে তিন দিন পর্যন্ত তোমরা মজা উড়িয়ে নাও। অতঃপর আল্লাহর সত্য ওয়াদা প্রকাশিত হবেই।"

হযরত সালেহ (আঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে ঐ উদ্ধত লোকগুলো পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলোঃ "এ লোকটি তো বহুদিন হতেই এ কথা বলে আসছে। এসো, আজই এর ফায়সালা হয়ে যাক।" যে পাহাড়ের মধ্য হতে উষ্ট্রীটি বের হয়েছিল ঐ পাহাড়েই হযরত সালেহ (আঃ)-এর একটি মসজিদ ছিল, যেখানে

তিনি নামায পড়তেন। তারা পরামর্শ করলো যে, যখন তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন পথেই তাঁকে হত্যা করে ফেলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যখন তারা পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করলো তখন তারা লক্ষ্য করলো যে, উপর হতে একটি বিরাট পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। ওটা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। পাথরটি এসে গুহাটির মুখে এমনভাবে থেমে গেল যে, ওর মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। কারো কোন খবর রইলো না যে, এ লোকগুলো কোথায় গেল। এখানে তো এরা এভাবে ধ্বংস হলো আর ওদিকে বাকী লোকেরা তাদের জায়গাতেই ধ্বংস হয়ে গেল। না এদের খবর ওরা পেলো এবং না ওদের খবর এরা পেলো। হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁর অনুসারী মুমিনদের তারা কোনই ক্ষতি করতে পারলো না। বরং তারা নিজেদেরই জীবন আল্লাহর শাস্তিতে নষ্ট করে ফেললো।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও তাদেরকে তাদের চক্রান্তের মজা চাখিয়ে দিলাম। তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেল যে, ক্ষণেক পূর্বেও তারা এটা বুঝতে পারেনি। ঐ চক্রান্তকারীদের পরিণাম এই হলো যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের সীমালংঘন হেতু জনশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে! তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ শহর ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যারা মুমিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

৫৪। স্মরণ কর লূত (আঃ)-এর কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছো?

٥٤- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۝

৫৫। তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

٥٥- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

৫৬। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললোঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।

٥٦- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

৫৭। অতঃপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٧- فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ الْغَبِرِينَ ○

৫৮। তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্যে এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

٥٨- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর উম্মত অর্থাৎ তাঁর কওমকে তাদের এমন জঘন্যতম কাজের জন্যে ভীতি প্রদর্শন করেন যে কাজ তাদের পূর্বে কেউই করেনি অর্থাৎ কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হওয়া। সমস্ত কওমের অবস্থা এই ছিল যে, পুরুষ লোকেরা পুরুষ লোকদের দ্বারা এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদের দ্বারা তাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো। সাথে সাথে তারা এতো বেহায়া হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ জঘন্য কাজ গোপনে করাও প্রয়োজন মনে করতো না। প্রকাশ্যে তারা এই বেহায়াপূর্ণ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়তো। স্ত্রীলোকদেরকে ছেড়ে তারা পুরুষ লোকদের কাছে আসতো। এ জন্যেই হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ হতে ফিরে এসো। তোমরা এমনই মূর্খ হয়ে গেছো যে, শরীয়তের পবিত্রতার সাথে সাথে তোমাদের স্বাভাবিক পবিত্রতাও বিদায় নিতে শুরু করেছে।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْـرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَـا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ -

অর্থাৎ “তোমরা বিশ্ব জগতের পুরুষদের নিকট আসছো এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে জোড়াসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছ? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” (২৬ঃ ১৬৫-১৬৬)

মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা উত্তরে বলেছিলঃ “তোমরা লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, তারা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।”

যখন কাফিররা হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারকে দেশান্তর করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সবাই একমত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাদের হতে এবং যে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তা হতে রক্ষা করেন। হ্যাঁ, তবে তাঁর স্ত্রী, যে তাঁর কওমের সাথেই ছিল এবং ঐ ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম হতেই তার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সে এখানে বাকী রয়ে যায় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা, সে ঐ ধ্বংসপ্রাপ্তদেরকে তাদের দ্বীন ও রীতি নীতিতে সাহায্য করতো। সে তাদের দুষ্কর্মকে পছন্দ করতো। সে-ই হযরত লূত (আঃ)-এর অতিথিদের খবর তাঁর কওমের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তবে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সে তাদের অশ্লীল কাজে শরীক ছিল না। আল্লাহর নবীর স্ত্রী বদকার হবে এটা নবীর মর্যাদার পরিপন্থী।

ঐ কওমের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়, যে পাথরগুলোর উপর তাদের নাম অংকিত ছিল। প্রত্যেকের উপর তার নামেরই পাথর পড়েছিল এবং তাদের একজনও বাঁচেনি। অত্যাচারীদের হতে আল্লাহর শাস্তি দূর হয় না। তাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত কায়েম হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং তাদের উপর রিসালাতের তাবলীগ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। কিন্তু তারা বিরোধিতাকরণ, অবিশ্বাসকরণ ও বেঈমানীর উপর অটল ছিল। তারা আল্লাহর নবী হযরত লূত (আঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, এমনকি তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তৎক্ষণাৎ ঐ মন্দ প্রস্তর-বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৫৯। বল, প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি; শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?

৫৯- قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "হে রাসূল (সঃ)! তুমি বলে দাও যে, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তিনি মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম উচ্চ ও পবিত্র।" তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে আরো হুকুম করছেনঃ 'তুমি আমার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম (শান্তি) পৌঁছিয়ে দাও।' তাঁরা হলেন তাঁর রাসূল ও নবীগণ। তাঁদের সবারই প্রতি উত্তম দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতইঃ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি! প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।" (৩৭ঃ ১৮০-১৮২)

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদেরকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে এবং নবীরাও (আঃ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত এটা তো বলাই বাহুল্য।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবীদেরকে এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া ও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার নিয়ামত বর্ণনা করার পর নিজের প্রশংসা কীর্তনের ও তাঁর সৎ বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর প্রশ্ন হিসেবে মুশরিকদের ঐ কাজের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন যে, তারা তাঁর ইবাদতে অন্যদেরকে শরীক করছে যা থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত।

উনবিংশ পারা সমাপ্ত

٦٠- اَمَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَاَنۡزَلَ لَكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنۡۢبَتۡنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمۡ اَنۡ تُنۡۢبِتُوۡا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ يَّعۡدِلُوۡنَ ۝

৬০। বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, ওর বৃক্ষাদি উদ্‌গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।

বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের সবকিছুই নির্ধারণকারী, সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই আহার্যদাতা একমাত্র আল্লাহ্। বিশ্ব জগতের সব কিছুর ব্যবস্থাপক তিনিই। ঐ সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী এবং ঐ উজ্জ্বল তারকারাজি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই কঠিন ও ভারী যমীন, এই সুউচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতরাজি এবং এই বিস্তীর্ণ মাঠ সৃষ্টি করেছেন তিনিই। এই ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, ফল-মূল, নদ-নদী, জীব-জন্তু, দানব-মানব এবং জল ও স্থল ভাগের সাধারণ প্রাণীসমূহের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী। এর দ্বারা স্বীয় সৃষ্টজীবের জীবিকার ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। মনোরম উদ্যান ও বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া আর কারো নেই। এগুলো হতে ফল-মূল বের করেন তিনিই, যেগুলো চক্ষু জুড়ায় এবং খেতেও সুস্বাদু ও আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মুশ্‌রিক ও কাফিরের দল! তোমাদের মধ্যে কেউ বা তোমাদের বাতিল মা'বূদদের কেউই না কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, না বৃক্ষাদি উদ্‌গত করবার শক্তি রাখে। আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র আহার্যদাতা।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই যে রিয্‌কদাতা তা মুশ্‌রিকরাও স্বীকার করতো। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে? তবে অবশ্যই তারা বলবে– আল্লাহ্।" (৪৩ ঃ ৮৭) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? অতঃপর ওর দ্বারা যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর পুনর্জীবন দান করেন? তবে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে– আল্লাহ্।" (২৯ ঃ ৬৩) মোটকথা, তারা জানে ও মানে যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ই বটে, কিন্তু তাদের জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়ে গেছে যে, তারা ইবাদতের সময় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে থাকে। অথচ তারা জানে যে, তাদের মা'বূদরা না পারে সৃষ্টি করতে এবং না পারে রুযী দিতে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী লোকই তো সহজেই এই কথার ফায়সালা করতে পারে যে, ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও রিয্‌কদাতা।

এ জন্যেই মহান আল্লাহ্ এখানে প্রশ্ন করেনঃ "আল্লাহ্র সাথে অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য আছে কি? মাখলূককে সৃষ্টি করার কাজে এবং তাদেরকে আহার্য দেয়ার কাজে আল্লাহ্র সাথে অন্য কেউও শরীক আছে কি?" মুশরিকরা সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা রূপে একমাত্র আল্লাহ্কেই স্বীকার করতো অথচ ইবাদতে অন্যদেরকেও শরীক করতো বলেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করতে পারে না?" (১৬ঃ ১৭)

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকৃত কখনো সমান হতে পারে না। সুতরাং হে মুশরিকরা! কেমন করে তোমরা খালেক ও মাখলূককে সমান করে দিচ্ছ? এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এসব আয়াতে যেখানে যেখানে أَمَّنْ শব্দ রয়েছে সেখানে অর্থ এটাই যে, এক তো তিনি যিনি এই সমুদয় কাজ করতে পারেন এবং এগুলোর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, আর অন্য সে যে এ কাজগুলোর কোন একটা

কাজ না করেছে, না করতে পারে, এ দু'জন কি কখনো সমান হতে পারে? শব্দে দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা যদিও নেই, কিন্তু বাকরীতি এটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

آللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ - অর্থাৎ "আল্লাহই কি উত্তম, না যাদেরকে তারা শরীক করছে (তারা উত্তম)?" অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ অর্থাৎ "বরং তারা এমন কওম যারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করছে।" আর একটি আয়াতে বলেন ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি যে নিজের অন্তরে আখিরাতের ভয় রেখে স্বীয় প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করে রাত্রি নামাযে কাটিয়ে দেয় (সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে এইরূপ নয়)?" (৩৯ ঃ ৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ "যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? নিশ্চয়ই জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।" (৩৯ঃ ৯) আরো এক আয়াতে রয়েছেঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

অর্থাৎ "এই ব্যক্তি, যার বক্ষ ইসলামের জন্যে খুলে গেছে এবং সে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রাপ্ত নূর বা জ্যোতির উপর রয়েছে সে কি ঐ ব্যক্তির মত কি যার অন্তর আল্লাহর যিক্‌র হতে শক্ত হয়ে গেছে? তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।" (৩৯ ঃ ২২) আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর সত্তা সম্পর্কে বলেন ঃ

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

অর্থাৎ "তিনি, যিনি প্রত্যেকের কাজ-কারবার সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, যিনি সমস্ত অদৃশ্যের খবর রাখেন তিনি কি তার মত যে কিছুই জানে না (এমন কি যার চক্ষু ও কর্ণও নেই, যেমন তোমাদের এসব প্রতিমা ?)" (১৩ঃ ৩৩) এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوْهُمْ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্‌র শরীক স্থাপন করছে, তুমি (তাদেরকে) বলঃ তোমরা (আমাকে) তাদের নাম তো বল।" (১৩ ঃ ৩৩)

সুতরাং এসব আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের গুণাবলীর বর্ণনা দিলেন, অতঃপর এসব গুণ অন্য কারো মধ্যে না থাকার খবর প্রদান করলেন।

٦١- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬১। বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি যমীনকে স্থির ও বাসোপযোগী করেছেন যাতে মানুষ তাতে আরামে বসবাস করতে পারে এবং এই বিস্তৃত বিছানার উপর শান্তি লাভ করে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন স্থির ও বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ।" (৪০ ঃ ৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা এতে বাগ-বাগিচা উদ্‌গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ যমীনকে দৃঢ় করার জন্যে ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়া-চড়া ও হেলা-দোলা না করে। তাঁর কি ক্ষমতা যে, একটি লবণাক্ত পানির সমুদ্র এবং আর একটি মিষ্ট পানির সমুদ্র, দু'টিই প্রবাহিত হচ্ছে। এ দু'টি সমুদ্রের মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই। তথাপি মহাশক্তির

অধিকারী আল্লাহ্ এ দু'টিকে পৃথক পৃথক করে রেখেছেন। না লবণাক্ত পানি মিষ্ট পানির সাথে মিশ্রিত হতে পারে, না মিষ্ট পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিলিত হতে পারে। লবণাক্ত পানি নিজের উপকার পৌঁছাতে রয়েছে এবং মিষ্ট পানিও নিজের উপকার পৌঁছাতে আছে। এর নির্মল ও সুপেয় পানি মানুষ নিজেরা পান করে এবং নিজেদের জন্তুগুলোকে পান করায়। শস্যক্ষেত্র, বাগান ইত্যাদিতেও এ পানি পৌঁছিয়ে থাকে। এ পানিতে মানুষ গোসল করে এবং কাপড়-চোপড় কেঁচে থাকে। লবণাক্ত পানি দ্বারাও মানুষ উপকার লাভ করে থাকে। এটা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত রয়েছে যাতে বাতাস খারাপ না হয়। অন্য আয়াতেও এ দু'টির বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

অর্থাৎ "তিনিই দু'টি সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (২৫ ঃ ৫৩) এ জন্যেই তিনি এখানে বলেছেন ঃ আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি যে এসব কাজ করতে পারে? এসব কাজ তারা করতে পারলে তো ইবাদতের যোগ্য তাদেরকে মনে করা যেতো? প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু অজ্ঞতাবশতঃই গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করে থাকে। অথচ ইবাদতের যোগ্য তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

৬২। বরং তিনি যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো।

٦٢- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۤءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط ○

আল্লাহ তা'আলা অবহিত করছেন যে, বিপদ-আপদের সময় তাঁর সত্তাই আহ্বানের যোগ্য। আর্ত ও অসহায়দের সহায় ও আশ্রয়স্থল তিনিই। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁকেই ডেকে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ـ

অর্থাৎ "সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা একমাত্র তাঁকেই (আল্লাহকেই) ডেকে থাকো এবং অন্য সবকেই ভুলে যাও।" (১৭ ঃ ৬৭) আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ

অর্থাৎ "অতঃপর যখন তোমাদেরকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকো।" (১৬ ঃ ৫৩) তাঁর সত্তা এমনই যে, প্রত্যেক আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করে থাকে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ তিনি ছাড়া আর কেউই দূর করতে পারে না।

হযরত আবূ তামীমাতুল হাজীমী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কোন জিনিসের দিকে আহ্বান করছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমি তোমাকে আহ্বান করছি ঐ আল্লাহ তা'আলার দিকে যিনি এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। যিনি ঐ সময় তোমার কাজে এসে থাকেন যখন তুমি কোন বিপদ-আপদে পতিত হও। যখন তুমি জঙ্গলে ও মরুপ্রান্তরে পথ ভুলে যাও তখন তুমি যাঁকে ডাকো এবং তিনি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমাকে পথ-প্রদর্শন করেন। যখন তোমার কিছু হারিয়ে যায় এবং তুমি ওটা প্রাপ্তির জন্যে যাঁর নিকট প্রার্থনা কর তখন যিনি তোমাকে তা পৌঁছিয়ে দেন ও তুমি তা পেয়ে যাও। যদি দুর্ভিক্ষ হয়, আর তুমি তাঁর নিকট প্রার্থনা কর তবে তিনি মুষলধারে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।" লোকটি বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "কাউকেও খারাপ বলো না, পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না যদিও সেই কাজ মুসলমানের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়া হয় এবং নিজের বালতি হতে কোন পিপাসার্তকে এক ঢোক পানি পান করানোও হয়। আর স্বীয় লুঙ্গীকে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত রাখবে। এটা স্বীকার না করলে খুব জোর পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত লটকাবে। এর চেয়ে নীচে

লটকানো হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, এটা ফখর ও গর্ব। আল্লাহ তা'আলা এটা অপছন্দ করেন।"[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, লোকটির নাম ছিল জাবির ইবনে সালীম হাজীমী (রাঃ)। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করি, ঐ সময় তিনি চাদর পরিহিত অবস্থায় বসেছিলেন যার প্রান্ত তাঁর পায়ের উপর পড়েছিল। আমি (তাঁর পাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করিঃ তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন। আমি তখন বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একজন গ্রাম্য লোক। ভদ্রতার কোন জ্ঞান আমার নেই। আমাকে আহ্কামে ইসলামের কিছু শিক্ষা দান করুন! তিনি বললেনঃ "কোন ছোট পুণ্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না যদিও তা মুসলমান ভাই-এর সাথে সচ্চরিত্রতার সাথে সাক্ষাৎ করা হয় এবং নিজের বালতি হতে পানি প্রার্থীর পাত্রে কিছু পানি দিয়ে দেয়াও হয়। যদি কেউ তোমার ব্যাপারে কিছু জেনে তোমাকে দোষারোপ করে ও তোমাকে গালি দেয় তবে তুমি তার ব্যাপারে কিছু জেনে তাকে দোষারোপ করো না এবং তাকে গালি দিয়ো না। তাহলে তুমি পুরস্কার লাভ করবে এবং তার স্কন্ধে পাপের বোঝা চেপে যাবে। গিঁঠের নীচে কাপড় লটকানো হতে তুমি বেঁচে থাকবে। কেননা, এটা অহংকার, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। আর কাউকেও কখনো তুমি গালি দেবে না।" এ কথা শোনার পর হতে আজ পর্যন্ত আমি কোন মানুষকে এমন কি কোন জন্তুকেও গালি দেইনি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সালেহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রোগাক্রান্ত হলে হযরত তাউস (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন তাঁকে বলিঃ হে আবূ আবদির রহমান (রঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন! তিনি তখন আমাকে বলেনঃ "তুমি নিজেই তোমার জন্যে দু'আ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আর্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন যখন সে তাঁকে ডাকে। আর তিনি বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।"[২]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে পড়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার মর্যদার শপথ! যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে ও আমাকে করজোড়ে ধরে, আমি তাকে তার বিরুদ্ধচারীদের খপ্পর হতে রক্ষা করি। আমি তাকে অবশ্যই রক্ষা করি যদিও আসমান, যমীন ও সমস্ত সৃষ্টজীব তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার উপর ভরসা করে না এবং আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হয় না, আমি তাকে তার নিরাপদে চলাফেরা অবস্থাতেই ইচ্ছা করলে যমীনে ধ্বসিয়ে দেই এবং তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করি না।"

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) একটি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, একটি লোক বলে, আমি লোকদেরকে আমার খচ্চরের উপর সওয়ার করিয়ে দামেশক্ হতে যাবদান শহরে যাওয়া-আসা করতাম এবং এই ভাড়ার উপর আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। এভাবে একদিন একটি লোককে আমি খচ্চরের উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করি। চলতে চলতে এমন এক জায়গায় পৌঁছি যেখানে দু'টি পথ ছিল। লোকটি বললোঃ "এই পথে চলো।" আমি বললামঃ আমি তো এই পথ চিনি না। আমি যে পথটি চিনি সেটাই সোজা পথ। লোকটি বললোঃ "আমি যে পথের কথা বলছি সে পথেই চলো। আমার এ পথ ভালরূপে চেনা আছে। এটাই খুব কাছের পথ।" তার কথার উপর বিশ্বাস করে আমি ঐ পথেই খচ্চরকে চালিত করলাম। অল্পদূর গিয়েই আমি দেখলাম যে, আমরা একটি জনহীন অরণ্যে এসে পড়েছি। সেখানে রাস্তার কোন লেশমাত্র নেই। অত্যন্ত ভয়াবহ জঙ্গল। চতুর্দিকে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। আমি তো অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। লোকটি আমাকে বললোঃ "খচ্চরের লাগাম টেনে ধর। এখানে আমার নামবার প্রয়োজন আছে। তার কথামত আমি খচ্চরটির লাগাম টেনে ধরলাম। সে নেমে পড়লো এবং স্বীয় পরিহিত কাপড় ঠিক ঠাক করে নিয়ে ছুরি বের করলো এবং আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। আমি তখন সেখান হতে দ্রুত বেগে পালাতে লাগলাম। সে আমার পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং ধরে ফেললো। তাকে আমি কসম দিতে শুরু করলাম। কিন্তু সে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলো না। তখন আমি তাকে বললামঃ তুমি আমার খচ্চরটি এবং আমার কাছে যা কিছু রয়েছে সবই নিয়ে নাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও। সে বললোঃ "এগুলোতো আমার হয়েই গেছে। আসল

কথা, আমি তোমাকে জীবিত ছেড়ে দিতে চাই না।" আমি তখন তাকে আল্লাহর ভয় দেখালাম এবং আখিরাতের শাস্তির উল্লেখ করলাম। কিন্তু এটা তার উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলো না। সে আমাকে হত্যা করার উপর অটল থাকলো। এখন আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলাম এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমি তার নিকট আবেদন করলামঃ আমাকে দুই রাকআত নামায পড়ার সময় দাও! সে বললোঃ "আচ্ছা, তাড়াতাড়ি পড়ে নাও।" আমি তখন নামায শুরু করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমার মুখ দিয়ে কুরআনের একটি অক্ষরও বের হচ্ছিল না। হাত বুকের উপর রেখে আতংকিত অবস্থায় শুধু দাঁড়িয়েই ছিলাম। সে তাড়াহুড়া করছিল। ঘটনাক্রমে হঠাৎ আমার মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হলোঃ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ

অর্থাৎ "বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে, এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।" এ আয়াতটি আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া মাত্রই আমি দেখি যে, জঙ্গলের মধ্য হতে একজন অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব চালনা করে বর্শা হাতে আমাদের দিকে আসছেন। তিনি মুখে কিছু উচ্চারণ না করেই ঐ ডাকাতটির পেটে বর্শা ঢুকিয়ে দেন যা তার পেটের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অশ্বারোহী ফিরে যেতে উদ্যত হন। আমি তখন তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বলিঃ আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি তাঁরই প্রেরিত দূত যিনি আশ্রয়হীন, আর্ত ও অসহায়ের দু'আ কবূল এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে থাকেন।" আমি তখন আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এবং সেখান হতে আমার খচ্চর ও আসবাবপত্রসহ নিরাপদে ফিরে আসলাম।"

এ ধরনের আর একটি ঘটনা এই যে, মুসলমানদের এক সেনাবাহিনী এক যুদ্ধে কাফিরদের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন বড়ই দানশীল ও সৎ লোক। তাঁর দ্রুতগামী ঘোড়াটি হঠাৎ থেমে যায়। ঐ দরবেশ লোকটি বহুক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ ঘোড়াটি একটি কদমও উঠালো না। শেষে অপারগ হয়ে ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করে আফসোস করে তিনি বলেনঃ "তুমি তো বেঁকে বসলে। অথচ এইরূপ সময়ের জন্যেই আমি তোমার খিদমত করেছিলাম এবং তোমাকে অত্যন্ত ভালবেসে লালন-পালন করেছিলাম!"

সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে বাক-শক্তি দান করলেন। সে বললোঃ আমার থেমে যাওয়ার "কারণ এই যে, আপনি আমার জন্যে যে ঘাস ও দানা সহিসের হাতে সমর্পণ করতেন, ওর মধ্য হতে সে কিছু কিছু চুরি করে নিতো। আমাকে সে খুব কমই খেতে দিতো এবং আমার উপর যুলুম করতো।" ঘোড়ার এ কথা শুনে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরু লোকটি ওকে বললেনঃ "এখন তুমি চলতে থাকো। আমি আল্লাহকে সামনে রেখে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, এখন থেকে আমি সদা-সর্বদা তোমাকে নিজের হাতে খাওয়াবো।" মনিবের এ কথা শোনা মাত্রই ঘোড়াটি দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করলো এবং তাঁকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দিলো। ওয়াদা অনুযায়ী লোকটি ঘোড়াটিকে নিজের হাতেই খাওয়াতে থাকলেন। জনগণ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন এক লোকের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন সাধারণভাবে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং জনগণ এ ঘটনা শুনবার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর নিকট আসতে লাগলো। রোমক বাদশাহ এ খবর পেয়ে কোন রকমে এই দরবেশ লোকটিকে তার শহরে আনয়নের ইচ্ছা করলো। বহু চেষ্টা করেও কিন্তু সে সফলকাম হলো না। অবশেষে সে একটি লোককে পাঠালো যে, সে যেন কোন রকম কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রেরিত লোকটি পূর্বে মুসলমান ছিল, কিন্তু পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। সে সম্রাটের নির্দেশক্রমে দরবেশ লোকটির নিকট আসলো এবং নিজের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করলো। সে তাওবা করতঃ অত্যন্ত সৎ সেজে গিয়ে তাঁর নিকট থাকতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর ঐ অলীর নিকট বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে গেল। তাকে সৎ ও দ্বীনদার বলে বিশ্বাস করে তিনি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং তার চলাফেরা করতে লাগলেন। সে তাঁর উপর পূর্ণভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে তার বাহ্যিক দ্বীনদারীর প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিলো। অতঃপর সে সম্রাটের নিকট খবর পৌঁছালো যে, সে যেন অমুক সময় একজন অসীম সাহসী বীর পুরুষকে সমুদ্রের তীরে পাঠিয়ে দেয়। সে তাঁকে (দরবেশকে) নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবে। অতঃপর ঐ বীর পুরুষের সাহায্যে তাকে গ্রেফতার করতঃ (সম্রাটের) নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। অতঃপর সে দরবেশকে প্রতারণা করে নিয়ে চললো এবং ঐ জায়গাতেই পৌঁছিয়ে দিলো।

হঠাৎ ঐ (সাহসী) লোকটি আত্মপ্রকাশ করলো এবং ঐ মহান ব্যক্তিকে আক্রমণ করলো। আর এদিক থেকে এই মুরতাদ লোকটিও আক্রমণ চালালো। তখন ঐ পুণ্যবান লোকটি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে প্রার্থনা করলেনঃ "হে আল্লাহ! এ লোকটি আমাকে আপনার নাম করে ধোঁকা দিয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আপনি যেভাবেই চান আমাকে এ দু'জন হতে রক্ষা করুন!" তৎক্ষণাৎ দু'টি হিংস্র জন্তু জঙ্গল হতে দৌড়িয়ে আসলো এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাদেরকে টুক্রো টুক্রো করে দিলো। অতঃপর তারা ফিরে গেল। আর আল্লাহ্র ঐ নেককার বান্দা নিরাপদে সেখান হতে ফিরে আসলেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণার মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর বলেনঃ তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। একজন একজনের পিছনে আসতে রয়েছে। ক্রমান্বয়ে এটা চলতেই আছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যদি তিনি চান তবে তোমাদেরকে এখান হতে ধ্বংস করে দিবেন এবং অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যেমন তোমাদেরকে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন!" (৬ ঃ ১৩৩) অন্য আয়াতে আছেঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

অর্থাৎ "তিনি ঐ আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের এককে অপরের উপর মর্যাদা দান করেছেন।" (৬ঃ ১৬৫) হযরত আদম (আঃ)-কেও খলীফা বা প্রতিনিধি বলা হয়েছে, এটাও এই হিসেবেই যে, তাঁর সন্তানরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" (২ ঃ ৩০) এ আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে

সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানকার এই আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই যে, একের পরে এক, এক যুগের পরে দ্বিতীয় যুগ এবং এক কওমের পরে অপর কওম প্রতিনিধিত্ব করবে।

সুতরাং এটা হলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং এতে মাখলূকের কল্যাণ রয়েছে। কারণ তিনি ইচ্ছা করলে সবকেই একই সাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এই নিয়ম রেখেছেন যে, একজন মারা যাবে এবং আর একজন জন্মগ্রহণ করবে। তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর বংশাবলী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন এক পন্থা রেখেছেন যে, যেন দুনিয়াবাসীদের জীবিকার পথ সংকীর্ণ না হয়। অন্যথায় হয়তো সমস্ত মানুষ একই সাথে হলে তাদেরকে পৃথিবীতে খুবই সংকীর্ণতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে হতো। আর একের দ্বারা অপরকে কষ্ট পৌঁছতো। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলার নিপুণতারই পরিচায়ক। সবারই জন্ম, মৃত্যু এবং আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। প্রত্যেকটাই তাঁর অবগতিতে আছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। তিনি এমনই একটা দিন আনয়নকারী যেই দিনে সবকেই একত্রিত করবেন এবং তাদের কার্যাবলীর বিচার করবেন। সেই দিন তিনি পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করবেন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্ন করছেন ঃ এসব কাজ করতে পারে এমন অন্য কেউ আছে কি? অর্থাৎ অন্য কারোই এসব কাজের কোন ক্ষমতা নেই। তাদের ক্ষমতা যখন নেই তখন তারা ইবাদতেরও যোগ্য হতে পারে না। কিন্তু মানুষ উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকে।

৬৩। বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ-প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে।

٦٣- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি এমন কতগুলো নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যে, জলে ও স্থলে কেউ পথ ভুলে গেলে ওগুলো দেখে সঠিক পথে আসতে পারে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَعَلَامَاتٍ وَّبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ "আরো নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তারকারাজি দ্বারা তারা পথ পেয়ে থাকে।" (১৬ ঃ ১৬) আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদের জন্যে তারকারাজি রেখে দিয়েছেন যাতে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকারে ওগুলোর মাধ্যমে পথ পেতে পার।" (৬ঃ ৯৭)

আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদবাহী ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করে থাকেন, যার দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন রহমতের বারিধারা বর্ষিত হবে। আল্লাহ ছাড়া এসব কাজ করার ক্ষমতা আর কারো নেই। তিনি সমস্ত শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি এদের হতে বহু ঊর্ধ্বে।

৬৪। বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ওর পুনরাবৃত্তি করেন, এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? বলঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○

ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তিনিই যিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে সৃষ্টজীবকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন ও করতে রয়েছেন। অতঃপর এগুলো ধ্বংস করে

দিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। সুতরাং হে কাফিরের দল! যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি যে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম এটা তোমরা মানছো না কেন? কেননা, দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি তো প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা বহুগুণে সহজ। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা, জমি হতে ফসল উৎপাদন করা এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা তাঁরই কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ـ

অর্থাৎ "শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি, এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়।" (৮৬ ঃ ১১-১২) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

অর্থাৎ " তিনি প্রত্যেক ঐ জিনিসকে জানেন যা যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যা ওর থেকে বের হয়, আর যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা ওর উপর উঠে যায়।" (৩৪ঃ ২) সুতরাং মহিমান্বিত আল্লাহই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী, ওটাকে যমীনে এদিক হতে ওদিকে প্রেরণকারী এবং এর মাধ্যমে নানা প্রকারের ফল, ফুল, শস্য এবং ঘাসপাতা উদ্‌গতকারী, যা মানুষের নিজেদের ও তাদের জন্তুগুলোর জীবিকা। নিশ্চয়ই জ্ঞানবানদের জন্যে এগুলো আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনাবলী বটে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব শক্তি এবং এসব মূল্যবান অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার পর প্রশ্নের সুরে বলেনঃ "এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ শরীক আছে কি? যার ইবাদত করা যেতে পারে? যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বূদ রূপে মেনে নেয়ার দাবীকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পার তবে দলীল পেশ কর।" কিন্তু তাদের নিকট কোনই দলীল নেই বলে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য মা'বূদকে, ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।" (২৩ঃ ১১৭)

٦٥- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

৬৫। বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।

٦٦- بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ

৬৬। আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে; তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন সারা জগতবাসীকে জানিয়ে দেন যে, অদৃশ্যের খবর কেউ জানে না। এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মানব, দানব এবং ফেরেশতা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔

অর্থাৎ "তাঁর নিকটই গায়েব বা অদৃশ্যের চাবি-কাঠি রয়েছে, তিনি ছাড়া ওটা কেউ জানে না।" (৬ ঃ ৫৯) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

অর্থাৎ "কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।" (৩১ ঃ ৩৪) এই বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। কিয়ামতের সময় কখন হবে তা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের কেউই জানে না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

অর্থাৎ "আসমান ও যমীনে এই ইলম বা জ্ঞান (সবারই উপর) মুশকিল ও ভারী, ওটা তো আকস্মিকভাবে তোমাদের নিকট এসে পড়বে।" (৭ ঃ ১৮৭)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আগামীকালের কথা জানতেন সে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উপর খুব বড় অপবাদ দিয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে"।[১]

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির মধ্যে তিনটি উপকার রেখেছেন। তাহলো আকাশের সৌন্দর্য, পথভ্রান্তদেরকে পথ-প্রদর্শন এবং শয়তানদেরকে প্রহারকরণ। এগুলো ছাড়া তারকারাজির উপর অন্য কোন বিশ্বাস রাখা নিজের মতে কথা বানানো, কষ্ট উঠানো এবং নিজের অংশকে হারানো ছাড়া আর কিছুই নয়। অজ্ঞ লোকেরা তারকারাজির সাথে জ্যোতির্বিদ্যাকে দোদুল্যমান রেখে বাজে কথা বানিয়ে নিয়েছে যে, এই তারকার সময় যে বিয়ে করবে সে এইরূপ হবে। অমুক তারকার সময় সফর করলে এই হয়, অমুক নক্ষত্রের সময় সন্তান হলে এইরূপ হয় ইত্যাদি। তাদের এসব হলো অসম্ভব ও প্রতারণামূলক কথা। অধিকাংশ সময়ই তাদের কথার বিপরীত হয়ে থাকে। প্রত্যেক তারকার সময়েই কৃষ্ণবর্ণের, গৌরবর্ণের, বেঁটে, লম্বা, সুন্দর এবং কুৎসিত সন্তান জন্মগ্রহণ করেই থাকে। না কোন জন্তু অদৃশ্যের খবর জানে, না কোন পাখী দ্বারা অদৃশ্য জানা যায় এবং না কোন তারকা অদৃশ্যের খবর দিতে পারে। সবারই জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ফায়সালা হয়েই গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টজীব অদৃশ্য হতে বে-খবর রয়েছে। তারা তো নিজেদের পুনরুত্থানের সময়ও অবহিত নয়।

হযরত কাতাদা (রঃ)-এর এ উক্তিটি সত্যি সঠিকই বটে। এটা তাঁর খুবই উপকারী ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে। অন্যেরা بَلْ اَدْرَكَ عِلْمُهُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ আখিরাতের সঠিক সময় না জানার ব্যাপারে সবারই জ্ঞান সমান। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন– "আমার ও আপনার জ্ঞান এর জবাব দিতে অপারগ।" এখানেও বলা হয়েছেঃ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কাফিররা তাদের প্রতিপালক থেকে অজ্ঞ বলে তারা আখিরাতকেও অস্বীকারকারী! সেখান পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছেনি।

একটি উক্তি এও আছে যে, আখিরাতে তারা এই জ্ঞান লাভ করবে বটে, কিন্তু তা হবে বৃথা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "যেদিন তারা আমার কাছে পৌঁছবে সেই দিন তারা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হয়ে যাবে, কিন্তু আজ যালিমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে হবে।"

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ বরং তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا -

অর্থাৎ "তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হাযির করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবেঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট হাযির হয়েছো; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না।" (১৮ ঃ ৪৮) উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের মধ্যে কাফিররা এটা মনে করতো। সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে যদিও ضَمِيْر টি جِنْس -এর দিকে ফিরেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য কাফিরই বটে! এ জন্যেই শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। তারা চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে।

৬৭। কাফিররা বলে ঃ আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

٦٧- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○

৬৮। এই বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ভীতি

٦٨- لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ

وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

٦٩- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৬৯। বলঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

٧٠- وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

৭০। তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদেরকে যে তাদের মৃত্যু হওয়া ও সড়ে-পচে যাওয়া এবং মাটি ও ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কিভাবে সৃষ্টি করা হবে এটা এখন পর্যন্ত তাদের বোধগম্যই হয় না। তারা এটাকে বড়ই বিস্ময়কর মনে করে। তারা বলেঃ "পূর্ব যুগ হতেই আমরা এটা শুনে আসছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকেও আমরা মৃত্যুর পর জীবিত হতে দেখিনি। এটা শুধু শোনা কথা। এক যুগের লোক তাদের পূর্বযুগীয় লোকদের হতে, তারা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের হতে শুনেছে এবং এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু এ সবকিছুই অযৌক্তিক ও বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত।" আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে জবাব বলে দিচ্ছেনঃ "তুমি বল–তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো, যারা রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল ও কিয়ামতকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে! তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে নবীদেরকে ও মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন। এটা নবীদের সত্যবাদীতারই দলীল।"

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেনঃ "এই কাফির ও মুশরিকরা তোমাকে ও আমার কালামকে অবিশ্বাস করছে এ জন্যে তুমি দুঃখ করো না ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। তারা তোমার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করছে তা আমার অজানা নেই। আমিই তোমার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী।

সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তোমাকে ও তোমার দ্বীনকে জয়যুক্ত রাখবো এবং দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তোমাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবো।”

৭১। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?

٧١- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

৭২। বল ঃ তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।

٧٢- قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ○

৭৩। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

٧٣- وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ○

৭৪। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

٧٤- وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

৭৫। আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

٧٥- وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ○

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কিয়ামতকে স্বীকারই করতো না বলে সাহসিকতা ও বাহাদুরীর সাথে সত্বর এর আগমন কামনা করতো এবং বলতোঃ “যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে বল দেখি এটা আসবে কখন? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মাধ্যমে জবাব দেয়া হচ্ছে যে, খুবই সম্ভব যে, ওটা সম্পূর্ণরূপে নিকটবর্তী হয়েই গেছে। যেমন

অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا অর্থাৎ "সম্ভবতঃ ওটার সময় নিকটবর্তী হয়েছে।" (১৭ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমার কাছে তারা আযাবের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে (তাড়াতাড়ি আযাব চাচ্ছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (২৯ ঃ ৫৪) لَكُمْ -এর لَام অক্ষরটি رَدِفَ শব্দের عَجِلَ (তাড়াতাড়ি করা)-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে। যেমন এটা হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মানুষের উপর তো আল্লাহর বহু দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং রয়েছে তাদের উপর তাঁর অসংখ্য নিয়ামত। তথাপি তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে তা তিনি অবশ্যই জানেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

سَوَاۤءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ -

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যে কথাকে গোপন করে এবং যে তা প্রকাশ করে উভয় (তাঁর কাছে) সমান।" (১৩ঃ ১০) আর এক জায়গায় আছে ঃ

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

অর্থাৎ "তিনি গোপনীয় ও লুক্কায়িত কথাও জানেন।" (২০ঃ ৭)

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। তিনি অদৃশ্যের সব খবরই রাখেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থাৎ "তুমি কি জান না যে, আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তিনি সবই জানেন, নিশ্চয়ই তা কিতাবে রয়েছে এবং নিশ্চয়ই ওটা আল্লাহর কাছে সহজ।" (২২ ঃ ৭০)

٧٦- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৭৬। বানী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।

٧٧- وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৭। আর নিশ্চয়ই এটা মুমিনদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত।

٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ○ۚ

৭৮। তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

٧٩- فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

৭৯। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

٨٠- اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৮০। মৃতকে তো তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮১। তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শুনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাব সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, কুরআন যেমন রহমত স্বরূপ তেমনই ফুরকানও বটে। বানী ইসরাঈল অর্থাৎ যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের বাহক তাদের মতভেদের ফায়সালা এই কিতাবে রয়েছে।

যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ইয়াহূদীরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং খৃষ্টানরা তাঁকে তাঁর সীমার চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুরআন এর ফায়সালা করে দিয়েছে এবং ইফরাত (বাহুল্য) এবং তাফরীত (অত্যল্প)-কে ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা প্রকাশ করেছে। কুরআন বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্র হুকুমে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর মাতা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী। সঠিক ও সন্দেহহীন কথা এটাই। এই কুরআন মুমিনদের অন্তরের হিদায়াত এবং তাদের জন্যে সরাসরি রহমত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফায়সালা করবেন যিনি বদলা নেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং বান্দাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেন ঃ "তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। তুমি তো স্পষ্টভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বিরুদ্ধবাদীরা চিরন্তনরূপে হতভাগ্য। তাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে ঈমান নেই। তুমি যদি তাদের সমস্ত মু'জিযা প্রদর্শন কর তবুও তারা ঈমান আনয়ন করবে না। তারা মৃতের ন্যায়। আর তুমি তো মৃতকে কথা শুনাতে পারবে না এবং পারবে না তুমি বধিরকে তোমার ডাক শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। আর যারা চোখ থাকতেও অন্ধ সাজে তাদেরকে তুমি পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে সক্ষম হবে না। তুমি শুনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করে এবং তারাই তো আত্মসমর্পণকারী। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে স্বীকার করে এবং আল্লাহ্র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে যায়।

৮২। যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বের করবো এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এই জন্যে যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।

٨٢- وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝ ع

যে জীবের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে তা শেষ যুগে প্রকাশিত হবে যখন মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। যখন তারা সত্য দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা মক্কা শরীফ হতে বের হবে। আবার অন্য কেউ বলেন যে, এটা অন্য স্থান হতে বের হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনই আসবে ইনশাআল্লাহ্। সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে এবং বলবে যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এই উক্তি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, এটা তাদেরকে আহত করবে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, উভয়েই এটা করবে, অর্থাৎ এও করবে এবং এও করবে। এটা খুবই চমৎকার উক্তি। এই উক্তি দু'টির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

'দাব্বাতুল আরয্' সম্বন্ধে যেসব হাদীস ও আসার বর্ণিত আছে, ঐগুলোর কিছু কিছু আমরা এখানে বর্ণনা করছি। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য প্রার্থী।

হযরত হুযাইফা ইবনে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফা হতে আমাদের নিকট আগমন করেন। আমাদেরকে এই আলোচনায় লিপ্ত দেখে বলেন ঃ "কিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। ওগুলো হলো– পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আরয্ ও ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হওয়া। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর আগমন ঘটা, দাজ্জাল বের হওয়া, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে তিনটি খাসফ (মাটিতে প্রোথিত হওন) হওয়া এবং আদন হতে এক আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে চালনা করবে বা তাদেরকে একত্রিত করবে। তাদের সাথেই রাত্রি কাটাবে এবং তাদের সাথেই দুপুরে বিশ্রাম করবে।"[১]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দাব্বাতুল আরযের উল্লেখ করে বলেন ঃ "দাব্বাতুল আরয্ তিনবার বের হবে। প্রথমবার বের হবে দূর-দূরান্তের জঙ্গল ও মরুপ্রান্তর হতে এবং ওর যিকর শহর অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করবে। তারপর এক দীর্ঘ যুগ পরে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হবে এবং জনগণের মুখে এই কাহিনী কথিত হতে থাকবে, এমনকি মক্কায়ও এর প্রসিদ্ধি পৌঁছে যাবে। তারপর যখন জনগণ আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ 'মসজিদে হারাম'-এ অবস্থান করবে ঐ সময় হঠাৎ সেখানে তারা দাব্বাতুল আরয্ দেখতে পাবে। রুক্‌ন ও মাকাম (মাকামে ইবরাহীম আঃ)-এর মাঝে নিজের মস্তক হতে মাটি ঝাড়তে থাকবে। লোকেরা ওকে দেখে এদিক ওদিক হয়ে যাবে। এটা মুমিনদের দলের নিকট যাবে এবং তাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্যোতির্ময় করে তুলবে। না তার থেকে পলায়ন করে কেউ বাঁচতে পারে, না তার থেকে লুকিয়ে গিয়ে রক্ষা পেতে পারে। এমনকি একটি লোক নামায শুরু করে তার নিকট আশ্রয় চাবে। সে তখন তার পিছনে এসে বলবেঃ "এখন তুমি নামাযে দাঁড়িয়েছো?" অতঃপর তার কপালে চিহ্ন এঁকে দিয়ে সে চলে যাবে। তার এই চিহ্নের পরে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। এমনকি মুমিন কাফিরকে বলবেঃ "হে কাফির! আমাকে আমার প্রাপ্য প্রদান কর।" আর কাফির মুমিনকে বলবেঃ "হে মুমিন! আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও।"[১]

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এটা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর যুগে হবে। তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে থাকবেন। কিন্তু এর ইসনাদ সঠিক নয়। সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, সর্বপ্রথম যে নিদর্শন প্রকাশ পাবে তা হলো সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া এবং দাব্বাতুল আরযের চাশ্‌তের সময় এসে পড়া। এ দুটোর মধ্যে যেটা প্রথমে হবে, তার পরপরই দ্বিতীয়টি হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ "ছ'টি জিনিসের আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎ কাজ করে নাও।

১. এ হাদীসটি আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা হুযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতেও মাওকূফ রূপে বর্ণিত আছে।

ওগুলো হলো– সূর্যের পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র নির্গত হওয়া, দাজ্জালের আগমন ঘটা, দাব্বাতুল আরয্ আসা এবং তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ ও সাধারণ বিষয়।”[১]

এ হাদীসটি অন্য সনদে অন্যান্য কিতাবগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দাব্বাতুল আরয্ বের হবে এবং তার সাথে থাকবে হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি ও হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি। লাঠি দ্বারা কাফিরের নাকের উপর মোহর লাগানো হবে এবং আংটি দ্বারা মুমিনের চেহারা উজ্জ্বল করা হবে। এমনকি জনগণ দস্তরখানার উপর একত্রিত হয়ে মুমিন ও কাফিরকে পৃথকভাবে চেনে নেবে।”[২]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের নাকের উপর আংটি দ্বারা মোহর করে দেয়া হবে এবং মুমিনদের চেহারা লাঠির ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল হয়ে যাবে।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে প্রবেশ করেন। আমি দেখি যে, একটি শুষ্ক ভূমি রয়েছে, যার চতুর্দিকে রয়েছে বালুকারাশি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “এখান থেকে দাব্বাতুল আরয্ বের হবে।” এই ঘটনার কয়েক বছর পর আমি হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। তখন আমাকে তার লাঠি দেখানো হয় যা আমার এই লাঠির মত।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার চারটি পা হবে। সে সাফার গিরিপথ হতে বের হবে। সে এতো দ্রুত গতিতে চলবে যে, যেন ওটা কোন দ্রুতগামী ঘোড়া। কিন্তু তবুও তিন দিনে তার দেহের এক তৃতীয়াংশও বের হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “জিয়াদে এক কংকরময় ভূমি আছে। সেখান থেকে এই দাব্বাতুল আরয্ বের হবে। আমি যদি সেখানে থাকতাম তবে তোমাদেরকে ঐ কংকরময় ভূমি

১. এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দেখিয়ে দিতাম। এটা সোজা পূর্ব দিকে যাবে এবং এতো জোরে চলবে যে, চতুর্দিকে ওর শব্দ পৌঁছে যাবে। সেখানে চীৎকার করে আবার ইয়ামনের দিকে যাবে। এখানেও শব্দ করে সন্ধ্যার সময় মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে সকালে আসফান পৌঁছে যাবে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ "এরপর কি হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এরপর কি হবে তা আমার জানা নেই।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, দাব্বাতুল আরয্ মুযদালাফার রাত্রে (১০ই যিলহজ্ব দিবাগত রাত্রে) বের হবে।

হযরত উযায়ের (আঃ)-এর কালাম হতে বর্ণিত আছে যে, দাব্বাতুল আরয্ সুদূমের নীচে হতে বের হবে। তার কথা সবাই শুনবে, গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে সময়ের পূর্বেই, সুস্বাদু পানি বিস্বাদ হয়ে যাবে, বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে, হিকমত জ্বলে যাবে, ইলম উঠে যাবে, নীচের যমীন কথা বলবে, মানুষ এমন আশা পোষণ করবে যা কখনো পুরো হবে না, তারা এমন জিনিসের জন্যে চেষ্টা করবে যা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং তারা এমন কিছুর জন্যে কাজ করবে যা খাবে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "দাব্বাতুল আরযের দেহের উপর সর্বপ্রকারের রঙ থাকবে এবং তার দুই শিং এর মাঝে সওয়ার বা আরোহীর জন্যে এক ফারসাকের পথ হবে।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা মোটা বর্শার মত হবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, ওর লোম থাকবে; ক্ষুর থাকবে, দাড়ী থাকবে এবং লেজ থাকবে না। সে দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে চলবে তবুও তিন দিনে তার দেহের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বের হবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, তার মাথা হবে বলদের মাথার মত, চোখ হবে শূকরের চোখের মত, কান হবে হাতীর কানের মত এবং শিং-এর জায়গাটি উটের মত হবে। তার ঘাড় হবে উটপাখীর মত, বক্ষ হবে সিংহের মত, রঙ হবে চিতা বাঘের মত, ক্ষুর হবে বিড়ালের মত, লেজ হবে ভেড়ার মত এবং পা হবে উটের মত। প্রত্যেক দুই জোড়ের মাঝে বার গজের ব্যবধান থাকবে। তার সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি ও হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি থাকবে। সে হযরত মূসা

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(আঃ)-এর ঐ লাঠি দ্বারা প্রত্যেক মুমিনের কপালে চিহ্ন দিয়ে দেবে, যা ছড়িয়ে পড়বে এবং তার চেহারা জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক কাফিরের চেহারার উপর হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি দ্বারা চিহ্ন দিয়ে দেবে যা ছড়িয়ে পড়বে এবং তার সারা চেহারা কালো হয়ে যাবে। এইভাবে মুমিন ও কাফিরকে পৃথক করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং খাদ্য খাওয়ার সময় মানুষ একে অপরকে ‘হে মুমিন!’ এবং ‘হে কাফির!’ এই বলে সম্বোধন করবে। দাব্বাতুল আরয্ এক এক করে নাম ডেকে ডেকে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ অথবা জাহান্নামের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেবে। এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই।

٨٣- وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

৮৩। স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করতো এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

٨٤- حَتّٰى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৮৪। যখন তারা সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না, তোমরা অন্য কিছু করছিলে?

٨٥- وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ○

৮৫। সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

৮৬। তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

٨٦- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁকে মানে না এবং তাঁর কথা স্বীকার করে না তাদেরকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে। সেখানে তাদেরকে শাসন-গর্জন করা হবে। যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় এবং হেয় প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক কওমের মধ্য হতে প্রত্যেক যুগের এ ধরনের মানুষের দলকে পৃথক পৃথকভাবে পেশ করা হবে। যেমন মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ

অর্থাৎ "(ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবেঃ) একত্রিত কর যালিমদেরকে ও তাদের সহচরদেরকে।" (৩৭ ঃ ২২) আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ

অর্থাৎ "দেহে যখন আত্মা সংযোজিত হবে।" (৮১ঃ ৭) তারা সবাই একে অপরকে ধাক্কা দেবে। তাদের প্রথম শেষেরদেরকে অগ্রাহ্য ও খণ্ডন করবে। অতঃপর তাদের সবকেই জন্তুর মত হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির করে দেয়া হবে। তাদের হাযির হওয়া মাত্রই ঐ প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন এবং হিসাব নিবেন। পুণ্য থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত হবে। যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ

অর্থাৎ "সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায আদায় করেনি। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" (৭৫ ঃ ৩১-৩২) সুতরাং ঐ

সময় তাদের উপর হুজ্জত সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তারা কোন কিছু পেশ করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ-وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ -

অর্থাৎ "এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাক্যস্ফূর্তি হবে না এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না অপরাধ স্খলনের।" (৭৭ঃ ৩৫-৩৬) অনুরূপভাবে এখানে বলেনঃ "সীমালংঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।" তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। নিজেদের যুলুমের প্রতিফল তারা পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত হবে। দুনিয়ায় তারা যালিম ছিল। এখন তারা যাঁর সামনে দাঁড়াবে তিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন। কোন কথা তাঁর সামনে বানিয়ে বললে তা টিকবে না।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং স্বীয় সমুন্নত মাহাত্ম্যের কথা বলছেন। আর তিনি নিজের বিরাট সাম্রাজ্য প্রদর্শন করছেন যা তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হওয়া, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য হওয়া এবং নবীদেরকে বিশ্বাস করার মূলের উপর সুস্পষ্ট দলীল। তা এই যে, তিনি মানুষের বিশ্রামের জন্যে রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আর দিবসকে তিনি করেছেন উজ্জ্বল ও আলোকময়, যাতে তারা জীবিকার অনুসন্ধানে ছুটে পড়তে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সফর যেন তাদের জন্যে সহজ হয়। এসবের মধ্যে তো মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই যথেষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় নিদর্শন রয়েছে।

٨٧- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ ۗ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

৮৭। আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন,তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।

٨٨- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

৮৮। তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো, কিন্তু সেই দিন এগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান; এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

٨٩- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○

৮৯। যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেই দিন তারা শংকা হতে নিরাপদ থাকবে।

٩٠- وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ط هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯০। আর যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে (এবং তাদেরকে বলা হবেঃ), তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভীতি-বিহ্বলতা ও অস্বস্তিকর অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যেমন সূরের (সিঙ্গার) হাদীসে রয়েছে যে, হযরত ইসরাফীল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। ঐ সময় ভূ-পৃষ্ঠে অসৎ ও পাপিষ্ঠ লোকেরা থাকবে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি ফুৎকার দিতে থাকবেন যার ফলে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। এইরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা হতে শুধুমাত্র শহীদগণ ছাড়া আর কেউই রক্ষা পাবে না, যাঁরা আল্লাহর নিকট জীবিত রয়েছেন এবং তাঁদেরকে আহার্য দেয়া হচ্ছে।

উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাঁকে বলেঃ "আপনি এটা কি কথা বলেন যে, এরূপ এরূপ সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে?" উত্তরে তিনি সুবহানাল্লাহ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অথবা এই ধরনের কোন কালেমা উচ্চারণ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "আমার ইচ্ছা তো হচ্ছে যে, আমি কারো কাছে কোন হাদীসই বর্ণনা করবো না। আমি এ কথা বলেছিলাম যে, সত্তরই তোমরা বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে। বায়তুল্লাহ্ খারাপ হয়ে যাবে এবং এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে, অতঃপর চল্লিশ (চল্লিশ দিন, মাস বা বছর) অবস্থান করবে, চল্লিশ দিন, কি চল্লিশ মাস, কি চল্লিশ বছর তা আমার জানা নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নাযিল করবেন। তিনি রূপে ও আকারে হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মত হবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এরপর সাতটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, সারা দুনিয়ায় দু'জন লোক এমন থাকবে না যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন, এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যারই অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি কোন পাহাড়ের গর্তেও ঢুকে পড়ে তবে সেই গর্তেও বায়ু প্রবেশ করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে দেবে। তখন ভূ-পৃষ্ঠে শুধু দুষ্ট লোকেরাই অবস্থান করবে। তারা পাখীর মত হাল্‌কা ও চতুষ্পদ জন্তুর মত জ্ঞান-বুদ্ধিহীন হবে। তাদের মধ্য হতে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা উঠে যাবে। তাদের কাছে শয়তান এসে বলবেঃ "তোমরা এই মূর্তিগুলোর উপাসনা পরিত্যাগ করেছো এতে কি তোমাদের লজ্জা হয় না?" তখন তারা মূর্তিপূজা শুরু করে দেবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করতেই থাকবেন এবং তাদেরকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবেন। সুতরাং তারা আনন্দ বিহ্বল থাকবে। এমতাবস্থায় হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে শিংগার ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যার কানেই এই শব্দ পৌঁছবে সেই সেখানেই ডানে-বানে ফিরতে থাকবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ ঐ লোকটি শুনতে পাবে যে তার উটগুলোর জন্যে হাউয্ ঠিক ঠাক করার কাজে লিপ্ত থাকবে। এই শব্দ শোনা মাত্রই সে

অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং সব লোকই অজ্ঞান হতে শুরু করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিশিরের মত বারিবর্ষণ করবেন। ফলে দেহ অঙ্কুরিত বা উত্থিত হতে লাগবে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। এর ফলে সবাই কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। সেখানে শব্দ উচ্চারিত হবেঃ "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে চলো এবং তথায় অবস্থান করতে থাকো। তোমাদের সওয়াল-জবাব হবে।" তারপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ "আগুন বা জাহান্নামের অংশকে পৃথক কর।" তাঁরা প্রশ্ন করবেন ঃ "কতজনের মধ্য হতে কতজনকে?" উত্তরে বলা হবেঃ "প্রতি হাযারের মধ্য হতে নয় শত নিরানব্বই জনকে।" এটা হবে ঐ দিন যেই দিন বালককে বুড়ো করে দেবে এবং হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হয়ে যাবে অর্থাৎ চরম সংকটময় দিন হবে।

প্রথম ফুৎকার হবে ভীতি-বিহ্বলতার, দ্বিতীয় ফুৎকার হবে অজ্ঞানতার ও মৃত্যুর এবং তৃতীয় ফুৎকারের সময় মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে হাযির হয়ে যাবে।

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ (সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়)-এর هَمْزَةٌ টিকে মদ দিয়েও পড়া হয়েছে। সবাই নিরুপায়, অসহায়, অধীনস্থ এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির হবে। আল্লাহ পাকের হুকুম টলাবার কারো ক্ষমতা হবে না। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ

অর্থাৎ "যেই দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতঃ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে।" (১৭ঃ ৫২) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যমীনের মধ্যে থাকা অবস্থায় আহ্বান করবেন তখন তোমরা তথা হতে বের হয়ে পড়বে।"

সূর বা সিঙ্গার হাদীসে রয়েছে যে, তৃতীয় ফুৎকারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে সমস্ত রূহকে সিঙ্গার ছিদ্রে রাখা হবে এবং দেহ কবর হতে উদ্‌গত হতে শুরু করবে। তখন হযরত ইসরাফীল (আঃ) আবার সূরে ফুৎকার দিবেন।

তখন রূহগুলো উড়তে লাগবে। মুমিনদের রূহ্ জ্যোতির্ময় হবে এবং কাফিরদের রূহ্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ "আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রূহ্ নিজ নিজ দেহে ফিরে যাবে।" তখন রূহ্গুলো তাদের দেহগুলোর মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমনভাবে গরল বা বিষ শিরার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অতঃপর লোকেরা তাদের মাথা হতে কবরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ-

অর্থাৎ "সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" (৭০ ঃ ৪৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো, কিন্তু সেই দিন ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। অর্থাৎ ঐ দিন পর্বতমালাকে মেঘপুঞ্জের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে এবং টুকরা টুকরা হতে দেখা যাবে। ঐ টুকরাগুলো চলতে ফিরতে শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا - وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ـ

অর্থাৎ "সেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত।" (৫২ ঃ ৯-১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا-فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا-لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا-

অর্থাৎ "তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলঃ আমার প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না।" (২০ ঃ ১০৫-১০৭)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এটা আল্লাহ্রই সৃষ্টিনৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। তাঁর সর্বক্ষমতার বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরতে পারে না। তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাদের প্রতিটি কাজের তিনি শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর মহান আল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যে কেউ সৎকর্ম করে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। একের বিনিময়ে দশটি পুণ্য সে লাভ করবে এবং ঐ দিনের ভীতি-বিহ্বলতা হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। অন্য লোকেরা সেই দিন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে এবং শাস্তি ভোগ করবে। অথচ এই ব্যক্তি নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে। সুউচ্চ প্রাসাদ এবং আরামদায়ক কক্ষে সে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মুফাস্‌সির হতে বর্ণিত আছে যে, অসৎকর্ম দ্বারা শির্‌ককে বুঝানো হয়েছে।

৯১- إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَىْءٍ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

৯১। আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণ কারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

৯২- وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝

৯২। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন আবৃত্তি করতে; অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎ পথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে এবং কেউ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করলে তুমি বলোঃ আমি তো শুধু সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।

৯৩। আর বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফিল নন।

٩٣- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সম্মানিত রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ "হে রাসূল (সঃ)! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও– আমি এই মক্কা শহরের প্রভুর ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি।" যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে লোক সকল! আমার দ্বীনের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে (তবে তোমরা সন্দেহ কর, কিন্তু জেনে রেখো যে) আমি তাদের ইবাদত করবো না, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ইবাদত করছো, বরং আমি ইবাদত করি সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের জীবন-মরণের মালিক।"

এখানে মক্কা শরীফের দিকে প্রতিপালকের সম্বন্ধ শুধুমাত্র ওর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণেই লাগানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ-

অর্থাৎ "তারা ইবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" (১০৬ ঃ ৩-৪)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, তিনি এই শহরকে সম্মানিত করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই শহরকে সম্মানিত করেছেন সেই দিন হতে যেই দিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সম্মান দানের কারণে এটা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে। না এর কাঁটা কেটে ফেলা হবে, না এর শিকারকে ভয় প্রদর্শন করা যাবে এবং না এখানে পতিত কোন জিনিস উঠানো যাবে। হ্যাঁ, তবে যদি এটা চিনতে পেরে

এর মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তার জন্যে এটা জায়েয হবে এবং এর ঘাসও কেটে নেয়া চলবে না (শেষ পর্যন্ত)।"[১]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ জিনিসের অধিকারের বর্ণনা দেয়ার পর নিজের সাধারণ অধিকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ সব কিছুরই উপর অধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মালিক ও মা'বূদ নেই। প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও অধিপতি তিনিই।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি আরো বলে দাও– আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন আবৃত্তি করি। যেমন আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ـ

অর্থাৎ "যা আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী হতে।" (৩ ঃ ৫৮) অন্য জায়গায় আছেঃ

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ "আমি তোমার কাছে মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের সত্য ঘটনা বর্ণনা করছি।" (২৮ ঃ ৩) অর্থাৎ নবী (সঃ) যেন বলছেন ঃ আমি আল্লাহ প্রেরিত একজন প্রচারক ও ভয়-প্রদর্শক। যদি তোমরা আমার কথা মেনে নিয়ে সৎপথ অনুসরণ কর তবে তোমরা নিজেরাই কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আমার কথা অমান্য করে ভ্রান্তপথ অবলম্বন কর তবে তোমরা নিজেদেরই অকল্যাণ ডেকে আনবে। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সুতরাং তোমাদের কাজের জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। পূর্ববর্তী রাসূলগণও এরূপই করেছিলেন। তাঁরাও আল্লাহর কালাম জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এটা বহু সনদে আরো বহু কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আহকামের কিতাবগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ "তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া, হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।" (১৩ঃ ৪০) আরো বলেন ঃ

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ -

অর্থাৎ "তুমি একজন ভয় প্রদর্শক মাত্র এবং আল্লাহ সব কিছুর উপরই কর্মবিধায়ক।" (১১ ঃ ১২) সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি স্বীয় বান্দাদের উপর তাদের বে-খবর অবস্থায় শাস্তি নাযিল করেন না। বরং প্রথমে তাদের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে দেন, স্বীয় হুজ্জত সমাপ্ত করেন এবং ভাল ও মন্দ বুঝিয়ে দেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে।" যেমন তিনি বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থাৎ "সত্বরই আমি তাদেরকে তাদের চতুর্দিকে এবং স্বয়ং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করবো, যার ফলে তাদের জন্যে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে।" (৪১ঃ ৫৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যা করছো সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফিল নন। বরং ছোট-বড় সব জিনিসকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে আছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে কোন জিনিস হতে এবং তোমাদের কোন কাজ হতে গাফিল বা উদাসীন মনে করো না। জেনে রেখো যে, তিনি এক একটি মশা, এক একটি পতঙ্গ এবং এক একটি অণু-পরমাণুরও খবর রাখেন।"[১]

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন ঃ "যদি আল্লাহ তা'আলা উদাসীন হতেন তবে মানুষের যে পদচিহ্নকে বাতাস মিটিয়ে দেয় তা থেকে তিনি অবশ্যই উদাসীন থাকতেন (কিন্তু তিনি ঐ পদচিহ্নগুলোরও খবর রাখেন)।"[২]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটাও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রায়ই নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করতেন, যা তাঁর নিজের রচিত অথবা অন্য কারো রচিতঃ

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ * خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ يَغْفَلُ سَاعَةً * وَلَا أَنَّ مَا يَخْفٰى عَلَيْهِ بِغَيْبُ

অর্থাৎ "যখন যুগের কোন এক দিন নির্জনে থাকবে তখন তুমি বলো নাঃ আমি নির্জনে রয়েছি। বরং তুমি বলোঃ আমার উপর একজন রক্ষক রয়েছেন। তুমি কখনো ধারণা করো না যে, আল্লাহ্ এক মুহূর্ত উদাসীন রয়েছেন বা কোন গোপনীয় জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে রয়েছে।"

সূরা ঃ নামল এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ কাসাস্, মাক্কী

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৮৮, রুকূ' ঃ ৯)

(اٰيَاتُهَا : ٨٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

হযরত মা'দীকারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাঁর কাছে আবেদন জানালাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে طٰسٓمّٓ দু'শ বার পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তখন তিনি বললেনঃ "এটা আমার মুখস্থ নেই, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে এটা শ্রবণ কর। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এটা শিখিয়েছেন।" সুতরাং আমরা হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমাদেরকে সূরাটি পড়ে শুনিয়ে দেন।"[১]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। তোয়া-সীন-মীম।

١- طٰسٓمّٓ ۝

২। এই আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

৩। আমি তোমার নিকট মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

٣- نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৪। নিশ্চয়ই ফিরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখতো। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

٤- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১. এটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে।

٥- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

৬। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট তারা আশংকা করতো।

٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَةٌ -এর বর্ণনা ইতিপূর্বে গত হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই আয়াতগুলো হলো সুস্পষ্ট কিতাবের অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের। সমস্ত কাজের মূল এবং অতীতের ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবর এই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। যেমন অন্য এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

অর্থাৎ "আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।" (১২ঃ ৩) তাঁর সামনে এটা এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি যেন ঐ সময় তথায় বিদ্যমান ছিলেন।

ফিরাউন একজন অহংকারী, উদ্ধত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে জনগণের উপর জঘন্যভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে তাদেরকে পরস্পরে লড়িয়ে দিয়ে, তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে দিয়ে স্বয়ং তাদের উপর জোরপূর্বক প্রভুত্ব চালাতে থাকে। বিশেষ করে বানী ইসরাঈলকে তো সে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। অথচ মাযহাবী হিসেবে সেই যুগে তারাই ছিল সর্বোত্তম। ফিরাউন তাদেরকে খুবই নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে

দিয়েছিল। সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিতো। এতো করেও তার প্রাণ ভরেনি। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল, যাতে তারা শক্তিশালী হতে না পারে। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন মিসর দেশের মধ্য দিয়ে স্বীয় স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ) সহ গমন করছিলেন এবং তথাকার উদ্ধত বাদশাহ হযরত সারা (রাঃ)-কে নিজের দাসী বানিয়ে নেয়ার জন্যে তাঁর নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল, যাঁকে আল্লাহ ঐ কাফির থেকে রক্ষা করেছিলেন, তখন তিনি হযরত সারা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "তোমার সন্তানদের মধ্য হতে একটি সন্তানের হাতে এই মিসরের শাসন ক্ষমতা এই কওম হতে খতম হয়ে যাবে এবং এর বাদশাহ তার সামনে অতি লাঞ্ছিতভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।" বানী ইসরাঈলের মধ্যে এ রিওয়াইয়াতটি চলে আসছিল এবং তাদের পাঠ্যের মধ্যেও এটা ছিল বলে ফিরাউনের কওম কিবতীরাও এটা শুনেছিল। সুতরাং তারা এটা ফিরাউনের কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তাই ফিরাউন এই আইন জারী করে দিলো যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হবে। এতো বড় অত্যাচারমূলক কাজ করতে সে মোটেই দ্বিধাবোধ করলো না। কিন্তু মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আঃ) জীবিত রয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ উদ্ধত কওমকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতঃ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। এ জন্যেই তো আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ হতে يَحْذَرُوْنَ পর্যন্ত। অর্থাৎ "আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে। আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট তারা আকাঙ্ক্ষা করতো।" এটা প্রকাশমান কথা যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ۔

অর্থাৎ "যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি, এবং বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল; আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।" (৭ ঃ ১৩৭) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ

অর্থাৎ "এভাবেই আমি বানী ইসরাঈলকে ওর উত্তরাধিকারী বানিয়েছি।" (২৬ ঃ ৫৯)

ফিরাউন তার সর্বশক্তি প্রকাশ করেছিল, কিন্তু আল্লাহর শক্তি সে অনুমানও করতে পারেনি। শেষে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় এবং যে শিশুর কারণে সে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুর রক্ত প্রবাহিত করেছিল তাঁকেই তিনি তারই ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়ে নেন, আর তাঁরই হাতে তিনি তাকে ও তার লোক-লস্করকে ধ্বংস করিয়ে দেন, যাতে সে জেনে ও বুঝে নেয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার এক লাঞ্ছিত ও অসহায় দাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। হযরত মূসা (আঃ)-কে ও তাঁর কওমকে আল্লাহ তা'আলা মিসরের রাজত্ব দান করলেন এবং ফিরাউন যাকে ভয় করছিল তিনিই সামনে এসে গেলেন এবং সে ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

৭। মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলামঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্যদান করতে থাকো; যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে রাসূলদের একজন করবো।

٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

٨- فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ○

৮। অতঃপর ফিরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

٩- وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৯। ফিরাউনের স্ত্রী বললোঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। তাকে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি।

বর্ণিত আছে যে, যখন বানী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করে দেয়া হয় তখন কিব্তীদের এই আশংকা হয় যে, এভাবে যদি বানী ইসরাঈলকে খতম করে দেয়া হয় তবে যেসব জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজ হুকুমতের পক্ষ হতে তাদের দ্বারা করিয়ে নেয়া হচ্ছে সেগুলো হয়তো তাদেরই দ্বারা করিয়ে নেয়া হবে। তাই দরবারে তারা মিটিং ডাকলো এবং মিটিং এ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে এক বছর হত্যা করা হবে এবং পরের বছর হত্যা করা হবে না। ঘটনাক্রমে যে বছর হযরত হারূন (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছর ছিল হত্যা বন্ধ রাখার বছর। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) ঐ বছর জন্মগ্রহণ করেন যে বছর বানী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে সাধারণভাবে হত্যা করা হচ্ছিল। স্ত্রী লোকেরা চক্কর লাগিয়ে গর্ভবতী নারীদের খোঁজ খবর নিচ্ছিল এবং তাদের নামগুলো তালিকাভুক্ত করছিল। গর্ভপাতের সময় ঐ মহিলাগুলো হাযির হয়ে যেতো। কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ফিরে যেতো। আর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সাথে সাথে জল্লাদদেরকে খবর দিয়ে দিতো এবং তৎক্ষণাৎ জল্লাদেরা দৌড়ে এসে পিতা-মাতার সামনে তাদের ঐ পুত্র সন্তানকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে যেতো।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা যখন তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন তখন সাধারণ গর্ভধারণের মত তাঁর গর্ভ প্রকাশ পায়নি। তাই যেসব নারী ও ধাত্রী গর্ভের সত্যতা নির্ণয়ের কাজে নিয়োজিতা ছিল তারা তাঁর গর্ভবতী হওয়া টের পায়নি। অবশেষে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। তাঁর মাতা অত্যন্ত আতংকিতা হয়ে পড়েন। তাঁর প্রতি তাঁর মাতার স্নেহ-মমতা এতো বেশী ছিল যা সাধারণতঃ অন্যান্য নারীদের থাকে না। মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর চেহারা এমনই মায়াময় করেছিলেন যে, শুধু তাঁর মা কেন, যেই তাঁর দিকে একবার তাকাতো তারই অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত জমে যেতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي -

অর্থাৎ "আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম।" (২০ ঃ ৩৯)

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা যখন তাঁর ব্যাপারে সদা আতংকিতা ও উৎকণ্ঠিতা থাকেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেনঃ "তুমি শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং তুমি ভয় করো না, দুঃখ করো না; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে রাসূলদের একজন করবো।" তাঁর বাড়ী নীল দরিয়ার তীরেই অবস্থিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা একটি বাক্স বানিয়ে নিলেন এবং তাঁকে ঐ বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। তাঁর মাতা তাঁকে দুধ পান করিয়ে দিয়ে ঐ বাকসের মধ্যে শুইয়ে দিতেন। আতংকের অবস্থায় ঐ বাক্সটিকে তিনি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতেন এবং একটি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতেন। ভয় কেটে যাওয়ার পর ওটা আবার টেনে নিতেন।

একদিন এমন একটি লোক তাঁর বাড়ীতে আসলো যাকে তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি তিনি শিশুকে বাক্সে রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু ভয়ে তাড়াতাড়ি এ কাজ করার কারণে তিনি দড়ি দ্বারা বাক্সটিকে বেঁধে রাখতে ভুলে গেলেন। বাক্সটি পানির তরঙ্গের সাথে জোরে প্রবাহিত হতে লাগলো এবং ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়ে চলতে থাকলো। এ দেখে দাসীরা ওটা উঠিয়ে নিয়ে ফিরাউনের স্ত্রীর কাছে গেল। পথে তারা এই ভয়ে বাক্সটি খুলেনি যে, হয়তো বা তাদের উপর কোন অপবাদ দেয়া হবে।

ফিরাউনের স্ত্রীর নিকট বাক্সটি খোলা হলে দেখা গেল যে, ওর মধ্যে একটি নূরানী চেহারার অত্যন্ত সুন্দর সুস্থ শিশু শায়িত রয়েছে। শিশুটিকে দেখা মাত্রই তার অন্তর তার প্রতি মহব্বতে পূর্ণ হয়ে গেল। আর তার প্রিয় রূপ তার অন্তরে ঘর করে নিলো। এতে প্রতিপালকের যুক্তি এই ছিল যে, তিনি ফিরাউনের স্ত্রীকে সুপথ প্রদর্শন করলেন এবং ফিরাউনের সামনে তার ভয় আনয়ন করলেন এবং তাকে ও তার দর্পকে চূর্ণ করে দিলেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'ফিরাউনের লোকেরা তাকে (শিশুকে) উঠিয়ে নিলো। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে।' এতে একটি মজার কথা এও আছে যে, যাঁর থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল তিনিই তাদের মাথার উপর চড়ে বসলেন। এজন্যেই এর পরই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।'

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) এমন এক কওমের নিকট চিঠি লিখেন যারা তকদীরকে বিশ্বাস করে না, তিনি চিঠিতে লিখেনঃ "আল্লাহ তা'আলার পূর্ব ইল্মেই হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের শত্রু ও তার দুঃখের কারণ ছিলেন, যেমন আল্লাহ পাক لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا -এই আয়াতে বলেছেন। অথচ তোমরা বলে থাকো যে, ফিরাউন যদি ইচ্ছা করতো তবে সে হযরত মূসা (আঃ)-এর বন্ধু ও সাহায্যকারী হতে পারতো?"

শিশুটিকে দেখা মাত্রই ফিরাউন চমকে উঠলো এই ভেবে যে, হয়তো বানী ইসরাঈলের কোন মহিলা শিশুটিকে নদীতে নিক্ষেপ করেছে এবং হতে পারে যে, এটা ঐ শিশুই হবে যাকে হত্যা করার জন্যেই সে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে, এটা চিন্তা করে সে ঐ শিশুকেও হত্যা করে ফেলার ইচ্ছা করলো। তখন তার স্ত্রী হযরত আসিয়া (রাঃ) শিশুটির প্রাণ রক্ষার জন্যে ফিরাউনের নিকট সুপারিশ করে বললোঃ 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। তাকে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' উত্তরে ফিরাউন বলেছিলঃ 'সে তোমার জন্যে নয়ন-প্রীতিকর হতে পারে। কিন্তু আমার জন্যে নয়ন-প্রীতিকর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।' আল্লাহর কি মাহাত্ম্য যে, এটাই হলো। তিনি হযরত আসিয়া (রাঃ)-কে স্বীয় দ্বীন লাভের সৌভাগ্য দান করলেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কারণে তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তা হলেন। আর ঐ অহংকারী ফিরাউনকে তিনি স্বীয় নবী (আঃ)-এর

মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। ইমাম নাসাঈ (রঃ) প্রমুখের উদ্ধৃতি দ্বারা সূরায়ে 'তোয়া-হা'-এর তাফসীরে হাদীসে ফুতূনের মধ্যে এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আসিয়া (রাঃ) বলেছিলেনঃ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আশা পূর্ণ করেন। হযরত মূসা (আঃ) দুনিয়ায় তাঁর হিদায়াত লাভের মাধ্যম হন এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়ে যান।

হযরত আসিয়া (রাঃ) আরো বলেনঃ "আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।" তাদের কোন সন্তান ছিল না। তাই হযরত আসিয়া (রাঃ) শিশু হযরত মূসা (আঃ)-কে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ কিভাবে গোপনে গোপনে স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তা তারা বুঝতে পারেনি।

১০- وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল; যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্যে আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিতো।

১১- وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ؗ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ○

১১। সে মূসার ভগ্নীকে বললোঃ তার পিছনে পিছনে যাও; সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখতেছিল।

১২- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○

১২। পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগ্নী বললোঃ তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিবো যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?

১৩। অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

١٣- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মা যখন তাঁকে বাক্সের মধ্যে রেখে ফিরাউনের লোকজনের ভয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন এবং অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন, আর আল্লাহর রাসূল (আঃ) ও তাঁর কলিজার টুকরা হযরত মূসা (আঃ)-এর চিন্তা ছাড়া অন্য কোন খেয়াল তাঁর অন্তরে জেগেই উঠেনি, ঐ সময় যদি মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরকে দৃঢ় না করতেন তবে ধৈর্যহারা হয়ে গোপন রহস্য তিনি প্রকাশ করে ফেলতেন যে, এই ভাবে তাঁর পুত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে দেন এবং তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে, তাঁর পুত্রকে অবশ্যই তিনি ফিরে পাবেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা তাঁর বড় কন্যাকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এই বাক্সের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলে যাও। পরিণাম কি হয় দেখা যাক? পরে তুমি আমাকে খবর জানাবে।"

মায়ের কথামত হযরত মূসা (আঃ)-এর বোনটি দূর হতে বাক্সের দিকে দৃষ্টি রেখে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে থাকলেন। কিন্তু এমন আনমনাভাবে তিনি চলতে লাগলেন যে, তিনি যে বাক্সটির দিকে খেয়াল রেখে চলছেন তা কেউ টেরও পেলো না। যখন বাক্সটি ফিরাউনের প্রাসাদের নিকট পৌঁছলো এবং দাসীরা তা উঠিয়ে নিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করলো তখন কি ঘটে তা জানবার আশায় তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে এই ঘটলো যে, যখন হযরত আসিয়া (রাঃ) ফিরাউনকে হযরত মূসা (আঃ)-এর হত্যার আদেশ জারী করা হতে বিরত রাখলেন এবং শিশু হযরত মূসা (আঃ)-কে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন শাহী মহলে যতগুলো ধাত্রী ছিল সবকেই শিশুটি দেয়া হলো এবং সবাই অতি আদরের সাথে শিশুটিকে দুধ পান করাতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে শিশু হযরত মূসা (আঃ) কারো দুধ এক ঢোকও পান করলেন না। অবশেষে হযরত আসিয়া শিশুটিকে তাঁর দাসীদের হাতে দিয়ে তাদেরকে বাইরে

পাঠালেন যে, তারা যেন ধাত্রী অনুসন্ধান করে এবং শিশুটি যার দুধ পান করবে তাকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে যায়।

বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের ইচ্ছা ছিল এটাই যে, তাঁর নবী (আঃ) যেন স্বীয় মাতা ছাড়া আর কারো দুধ পান না করেন এবং এতে বড় যৌক্তিতা এই ছিল যে, এই বাহানায় যেন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মাতার নিকট পৌঁছতে পারেন। দাসীরা শিশু হযরত মূসা (আঃ)-কে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর বোন তাঁকে চিনে নেন। কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করলেন না এবং তারাও কিছু বুঝতে পারলো না। তাঁর মাতা প্রথমে খুবই অস্থির ও উদ্বিগ্না ছিলেন বটে, কিন্তু পরে মহান আল্লাহ তাঁকে ধৈর্য ও স্থিরতা দান করেছিলেন। ফলে তিনি নীরব ও শান্তই ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর বোন দাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা এতো ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন কেন?" তারা উত্তরে বললোঃ "এই শিশুটি কারো দুধ পান করছে না। তাই আমরা এমন এক ধাত্রীর খোঁজে বেরিয়েছি যার দুধ এ শিশু পান করবে।" তাদের একথা শুনে হযরত মূসা (আঃ)-এর বোন তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা বললে আমি একজন ধাত্রীর খোঁজ দিতে পারি। সম্ভবতঃ এ শিশু তার দুধ পান করবে এবং সে একে উত্তমরূপে লালন-পালন করবে ও এর শুভাকাঙ্ক্ষিনী হবে।" তাঁর এ কথা শুনে ঐ দাসীদের মনে কিছু সন্দেহ জাগলো যে, এ মেয়েটি শিশুটির পিতা-মাতার খবর রাখে, সুতরাং তারা তাঁকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি করে জানলে যে, ঐ মহিলাটি এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে ও এর শুভাকাঙ্ক্ষিনী হবে?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেনঃ "সুবহানাল্লাহ! কে এটা চাইবে না যে, শাহী দরবারে তার সম্মান হোক এবং পুরস্কার ও দানের খাতিরে কে এই শিশুর প্রতি সহানুভূতি না দেখাবে?" তাঁর এ জবাবে তারাও বুঝে নিলো যে, তাদের পূর্ব ধারণা ভুল ছিল, মেয়েটি সঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললোঃ "আচ্ছা, তাহলে চলো, ঐ ধাত্রীটির বাড়ী আমাদেরকে দেখিয়ে দাও।" তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে তাঁদের বাড়ী গেলেন এবং তাঁর মাতার দিকে ইশারা করে বললেনঃ "একে দিয়ে দাও।" সরকারী লোকেরা শিশুটি তাঁকে প্রদান করলে তিনি তাঁর দুধ পান করতে শুরু করলেন। সাথে সাথে এ খবর হযরত আসিয়া (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। এ খবর শুনে তিনি তো আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তাঁকে তিনি তাঁর প্রাসাদে ডেকে নেন এবং বহু কিছু পুরস্কার দেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তিনিই শিশুটির মা। তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করলেন শুধু এই কারণে যে, শিশুটি তাঁর দুধ পান করেছে। হযরত আসিয়া (রাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর মায়ের উপর অত্যন্ত

খুশী হন এবং তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে থেকেই শিশুটিকে দুধ পান করাবার জন্যে অনুরোধ করেন। উত্তরে হযরত মূসা (আঃ)-এর মা বলেনঃ "এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, আমার ছেলে মেয়ে ও স্বামী রয়েছে। আমি বরং শিশুটিকে আমার নিজ বাড়ীতেই দুধ পান করাবো, তারপর আপনার নিকট পাঠিয়ে দেবো।" শেষে এটাই মীমাংসিত হয় এবং ফিরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়াও (রাঃ) এতে সম্মত হয়ে যান। সুতরাং হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতার ভয় নিরাপত্তায়, দারিদ্র ঐশ্বর্যে, লাঞ্ছনা সম্মানে এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্তি বা স্বচ্ছলতায় পরিবর্তিত হয়। দৈনিক তিনি বেতন ও পুরস্কার পেতে থাকলেন এবং পেতে লাগলেন খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র শাহী দরবার থেকে। আর সবচেয়ে বড় সুযোগ তিনি এই পেলেন যে, নিজের ছেলেকে নিজেরই ক্রোড়ে লালন-পালন করতে থাকলেন। একই রাত্রে বা একই দিনে অথবা এক দিন রাত্রির পরেই পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর কষ্ট ও বিপদকে সুখ ও আরামে পরিবর্তিত করলেন। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নিজের কাজকর্ম করে এবং তাতে আল্লাহর ভয় ও আমার সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখে তার উপমা হযরত মূসা (আঃ)-এর মায়ের মত। তিনি নিজের ছেলেকেই দুধ পান করাতেন, আবার মজুরীও পেতেন।"

আল্লাহর সত্তা অতি পবিত্র। তাঁরই হাতে সমস্ত কাজ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা কখনো হয় না। অবশ্য এমন প্রতিটি লোকের সাহায্য করেন যে তাঁর উপর ভরসা করে। তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারীর সহায়ক তিনিই। তিনি তাঁর সৎ বান্দাদের বিপদের সময় এগিয়ে আসেন এবং তাদের বিপদ দূর করে দেন। তাদের সংকীর্ণতাকে তিনি প্রশস্ততা ও স্বচ্ছলতায় পরিবর্তিত করেন এবং দুঃখের পরে সুখ দিয়ে থাকেন। কাজেই কতই না মহান তিনি! আমরা তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাকে তার জননীর নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার দ্বারা তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সে যেন এটা বিশ্বাস করে নেয় যে, সে অবশ্যই নবী ও রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা মনের সুখে স্বীয় সন্তানের লালন-পালনে নিমগ্ন হলেন এবং এমনিভাবে তিনি লালিত-পালিত হলেন যেমনিভাবে একজন উচ্চমানের রাসূলকে লালন-পালন করা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ

তা'আলার নিপুণতা এবং তাঁর আনুগত্যের শুভ পরিণাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। তাই তো আল্লাহ পাক বলেনঃ কিন্তু মানুষই এটা জানে না। তারা শুধু বাহ্যিক লাভ-লোকসানের প্রতিই দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং দুনিয়ার প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পরকালকে পরিত্যাগ করে। তারা এটা অনুধাবন করে না যে, যেটা তারা খারাপ মনে করছে সেটাই হয়তো তাদের জন্যে উত্তম। পক্ষান্তরে যেটাকে তারা ভাল মনে করছে সেটাই হয়তো তাদের জন্যে খারাপ। তারা একটা কাজকে খারাপ মনে করছে, কিন্তু মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ কি উপকার তাতে লুক্কায়িত রেখেছেন তার কোন খবরই তারা রাখে না।

١٤- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪। যখন মূসা (আঃ) পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; এই ভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।

١٥- وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۗ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৫। সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলো—একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসা (আঃ)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো, তখন মূসা (আঃ) তাকে ঘুষি মারলো; এই ভাবে সে তাকে হত্যা করে বসলো। মূসা (আঃ) বললোঃ এটা শয়তানের কাণ্ড; সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী।

১৬। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক। আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٦- قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

১৭। সে আরো বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছো, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

١٧- قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ○

হযরত মূসা (আঃ)-এর বাল্যকালের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যৌবনের ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলেন অর্থাৎ তাঁকে নবুওয়াত দিলেন। সৎ লোকেরা এরূপই প্রতিদান পেয়ে থাকেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ঐ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তাঁর মিসর ত্যাগের কারণ হয়েছিল। তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ানের পথে যাত্রা শুরু করেন।

ঘটনা এই যে, একদা হযরত মূসা (আঃ) নগরে বের হন মাগরিবের পরে অথবা যোহরের সময়, যখন জনগণ পানাহারে অথবা শয়নে লিপ্ত ছিল। তিনি বেশীদূর পথ অতিক্রম করেননি এমন সময় তিনি দেখতে পান যে, দু'টি লোক ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে। একজন ছিল বানী ইসরাঈলের লোক এবং অপরজন ছিল কিব্তীদের লোক। ইসরাঈলী তাঁর নিকট কিব্তীর অত্যাচারের অভিযোগ করে, যার ফলে তাঁর ক্রোধ এসে যায় এবং তিনি তাকে একটি ঘুষি মারেন। এতেই সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হযরত মূসা (আঃ) এতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং বলেনঃ "এটা শয়তানী কাজ এবং শয়তান তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।" অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

এরপর হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। এটা আমি ওয়াদা করলাম।"

١٨- فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৮। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো–পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্যে চীৎকার করছে। মূসা (আঃ) তাকে বললোঃ তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

١٩- فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৯। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠলোঃ হে মূসা (আঃ)! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!

হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘুষিতে কিব্‌তী মারা যায় এই কারণে তাঁর মনে ভয় ধরেছিল। তাই তিনি শহরে খুবই সতর্কতার সাথে চলাফেরা করছিলেন যে, দেখা যাক কি ঘটে! রহস্য খুলে তো যায়নি? পরের দিন আবার তিনি শহরে বের হলে দেখেন যে, গতকাল যে ইসরাঈলীকে তিনি কিব্‌তীর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন সে আজ আর এক কিব্‌তীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তাঁকে দেখে আজকেও সে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করে। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ "তুমিই বড় দুষ্ট লোক।" তাঁর এ কথা শুনে সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। হযরত মূসা (আঃ)

যখন ঐ যালিম কিবতীকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ান তখন ঐ ইসরাঈলী তার ইত্‌রামি ও কাপুরুষতার কারণে মনে করে বসে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাকে দুষ্ট বলেছেন, কাজেই তাকেই হয়তো তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাই সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে চীৎকার শুরু করে দেয় এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি গতকল্য যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছেন?" গতকালকের ঘটনার সময় শুধু সেই উপস্থিত ছিল। এজন্যে এ পর্যন্ত কেউই জানতে পারেনি যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আজ তার মুখে একথা শুনে কিব্‌তী জানতে পারে যে, তিনিই এ কাজ করেছেন। ঐ ভীরু ইসরাঈলী এ কথাও তাঁকে বলেঃ "আপনি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছেন, শান্তি স্থাপন করতে আপনি চান না।" কিব্‌তী ঐ ইসরাঈলীকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেয় এবং ফিরাউনের দরবারে পৌঁছে খবর দিয়ে দেয়। এ খবর শুনে ফিরাউন অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর নিকট ধরে আনার জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দেয়।

২০। নগরীর দূরপ্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো ও বললোঃ হে মূসা (আঃ)! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।

٢٠- وَجَـــاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْـــصَـــا الْـمَدِيْنَةِ يَسْـعٰى قَالَ يٰـمُوْسٰى اِنَّ الْـمَـلَاَ يَاْتَـمِـرُوْنَ بِكَ لِيَـقْـتُـلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

এই আগন্তুককে رَجُل বলা হয়েছে। আরবীতে পাকে رِجْل বলা হয়। এ লোকটি যখন দেখলো যে, পুলিশ হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছনে লেগে পড়েছে এবং তাঁকে ধরবার জন্যে বেরিয়ে গেছে তখন সে পায়ের ভরে দ্রুত দৌড়াতে শুরু করে এবং কাছের পথ ধরে চলে অতি তাড়াতাড়ি হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে গিয়ে তাঁকে এ খবর অবহিত করে। সে তাঁকে বলেঃ "পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করে ফেলার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি তো তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং হে মূসা (আঃ)! আমার কথা মেনে নাও।"

٢١- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

২১। ভীত সতর্ক অবস্থায় সে তথা হতে বের হয়ে পড়লো এবং বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন।

٢٢- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

২২। যখন মূসা (আঃ) মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো তখন বললোঃ আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ-প্রদর্শন করবেন।

٢٣- وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

২৩। যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছলো তখন দেখলো যে, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। মূসা (আঃ) বললোঃ তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বললোঃ আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালরা তাদের জানোয়ার গুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।

٢٤- فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۝

২৪। মূসা (আঃ) তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালো। তৎপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলো ও বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাংগাল।

এই লোকটির মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ) যখন ফিরাউন ও তার লোকদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হন তখন তিনি অতি সন্তর্পণে একাকী সেখান থেকে পালিয়ে যান। ইতিপূর্বে তিনি রাজপুত্রদের মত জীবন যাপন করেছিলেন বলে এই সফর তাঁর কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। কিন্তু ভয় ও ত্রাসের কারণে তিনি এদিক ওদিক দেখছিলেন এবং সোজা পাড়ি দিচ্ছিলেন। আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি ফিরাউনের ও তার লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন।" বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-কে মিসরের পথ-প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যিনি ঘোড়ায় চড়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি বন-জঙ্গল ও মরুভূমি অতিক্রম করে মাদইয়ানের পথে পৌঁছে যান। এতে তিনি খুবই খুশী হন এবং বলে ওঠেনঃ "আমি মহান আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ আশাও পূরণ করেন এবং তাঁকে শুধু দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক পথ-প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং তাঁকে অন্যদের জন্যে সঠিক পথ-প্রদর্শকও বানালেন। মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী কূপের নিকট এসে তিনি দেখলেন যে, রাখালরা কূপ হতে পানি উঠিয়ে তাদের জন্তুগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি এটাও দেখতে পেলেন যে, দু'টি মহিলা তাদের বকরীগুলোকে ঐ জন্তুগুলোর সাথে পানি পান করানো হতে বিরত রয়েছে। তিনি যখন এ অবস্থা অবলোকন করলেন যে, মহিলাদ্বয় নিজেরাও তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারছে না এবং ঐ রাখালরাও তাদের জানোয়ারগুলোর সাথে ঐ বকরীগুলোকে পানি পান করানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না তখন তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হলো। তাই তিনি মহিলা দুটিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা তোমাদের এ বকরীগুলোকে পানি পান করানো হতে বিরত থাকছো কেন?" তারা উত্তরে বললোঃ "আমরা বকরীগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না রাখালরা তাদের জানোয়াগুলোকে নিয়ে সরে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।" তাদের একথা শুনে তিনি নিজেই পানি উঠিয়ে তাদের বকরীগুলোকে পান করালেন।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাখালরা একটি বিরাট পাথর দ্বারা ঐ কূপটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল যা দশজন লোক মিলে সরাতে পারতো।

অথচ হযরত মূসা (আঃ) একাকী ঐ পাথরটি সরিয়ে ফেলেন। তিনি মাত্র এক বালতি পানি উঠিয়েছিলেন যাতে মহান আল্লাহ বরকত দান করেছিলেন, ফলে ঐ মহিলাদ্বয়ের বকরীগুলো ঐ পানি পান করেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ক্লান্ত শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি গাছের ছায়ার নীচে বসে পড়েন। মিসর হতে মাদইয়ান পর্যন্ত তিনি দৌড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাই তাঁর পায়ে ফোসকা উঠে গিয়েছিল। খাওয়ার কোন দ্রব্য তাঁর সাথে ছিল না। গাছের পাতা, ঘাস ইত্যাদি তিনি ভক্ষণ করে আসছিলেন। পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। ঐ সময় তিনি আধখানা খেজুরেরও মুখাপেক্ষী ছিলেন। অথচ সেই সময় সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে তিনিই ছিলেন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও মনোনীত বান্দা!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "দুই দিনের সফর শেষে আমি মাদইয়ানে পৌঁছি। আমি জনগণকে ঐ গাছের পরিচয় জানতে চাই যে গাছের ছায়ায় হযরত মূসা (আঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনগণ আমাকে গাছটি দেখিয়ে দেয়। আমি দেখি যে, ওটা একটি সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ। আমার আরোহণের পশুটি ক্ষুধার্ত ছিল। তাই সে ঐ গাছের পাতা মুখ দ্বারা ছিঁড়ে নেয় এবং অতি কষ্টে চিবাতে থাকে। কিন্তু শেষে সে পাতা মুখ হতে বের করে ফেলে দেয়। আমি হযরত কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর দু'আ করে সেখান হতে ফিরে আসি।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ঐ গাছটি দেখতে গিয়েছিলেন যেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। এর বর্ণনা সত্বরই আসবে ইনশাআল্লাহ!

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ওটা ছিল বাবলার গাছ। মোটকথা, হযরত মূসা (আঃ) ঐ গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী।" হযরত আতা (রঃ) বলেন যে, ঐ মহিলাটিও তাঁর এ প্রার্থনা শুনেছিল।

২৫। তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট আসলো এবং বললোঃ আমার পিতা তোমাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান

٢٥- فَجَاءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ

لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۟ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

করাবার পারিশ্রমিক তোমাকে দেয়ার জন্যে। অতঃপর মূসা (আঃ) তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বললোঃ ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।

٢٦- قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ○

২৬। তাদের একজন বললোঃ হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

٢٧- قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭। সে মূসা (আঃ)-কে বললোঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।

٢٨- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○ ع

২৮। মূসা (আঃ) বললোঃ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টি মিয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।

এই মেয়ে দু'টির বকরীগুলোকে যখন হযরত মূসা (আঃ) পানি পান করিয়ে দিলেন তখন তারা তাদের বকরীগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তাদের পিতা যখন দেখলেন যে, তাঁর মেয়েরা সময়ের পূর্বেই ঐদিন বাড়ীতে ফিরে গেছে তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" তারা উত্তরে সত্যভাবে ঘটনাটি বলে দিলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন হযরত মূসা (আঃ)-কে ডেকে আনতে। মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলো। সে আসলো সতী-সাধ্বী মেয়েরা যেভাবে পথে চলে সেই ভাবে। অর্থাৎ সে আসলো অত্যন্ত লজ্জাজড়িত চরণে চাদর দ্বারা সারা দেহ আবৃত করে। মুখমণ্ডলও সে চাদরের অঞ্চল দ্বারা ঢেকে রেখেছিল। অতঃপর তার সত্যবাদিতা ও বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হতে হয় যে, সে 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন' একথা বললো না। কেননা, এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল। বরং সে পরিষ্কারভাবে বললোঃ "আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্যে আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন।" হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) ছিলেন ক্ষুধার্ত ও অসহায়, তাই তিনি এই সুযোগকে গনীমত মনে করলেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একজন সদাশয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তার কাছে তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর ঘটনা শুনে নারীদ্বয়ের পিতা তাঁকে সহানুভূতির সুরে বললেনঃ "তোমার আর কোন ভয় নেই। ঐ অত্যাচারীদের কবল হতে তুমি রক্ষা পেয়ে গেছ। এখানে তাদের কোন শাসন কর্তৃত্ব নেই।"

কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এই সম্ভ্রান্ত লোকটি ছিলেন হযরত শুআ'য়েব (আঃ), যিনি মাদইয়ানবাসীর নিকট আল্লাহর নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই বটে। ইমাম হাসান বসরী (রঃ) এবং আরো বহু আলেম একথাই বলেছেন।

ইমাম তিবরানী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালমা ইবনে সা'দ আলগুযযা (রাঃ) স্বীয় কওমের পক্ষ হতে দূতরূপে রাসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলে তিনি বলেনঃ "হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর গোত্রীয় লোক এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর গোষ্ঠীর লোকের আগমন শুভ হোক! তোমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করা হয়েছে।" কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ছিলেন হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর ভ্রাতষ্পুত্র। আবার অন্য কেউ বলেন যে, তিনি হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর কওমের একজন মুমিন লোক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর যুগ তো হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের বহু পূর্বের যুগ। কুরআন কারীমে তাঁর কওমের সামনে তাঁর উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ

مِّنكُم بِبَعِيدٍ অর্থাৎ "হযরত লূত (আঃ)-এর কওম তোমাদের থেকে খুব দূরের নয়।" (১১ঃ ৮৯) আর কুরআন কারীম দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগেই ধ্বংস হয়েছিল। আর এটা খুবই স্পষ্ট কথা যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের মধ্যে খুবই দীর্ঘ-দিনের ব্যবধান ছিল। অর্থাৎ প্রায় চারশ' বছরের ব্যবধান, যেমন অধিকাংশ ঐতিহাসিকের উক্তি রয়েছে। হ্যাঁ, তবে কেউ কেউ এই কঠিন ব্যাপারের উত্তর এই দিয়েছেন যে, হযরত শুআ'য়েব (আঃ) দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই আপত্তিকর কথা হতে রক্ষা পাওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এটাও খেয়াল করা এখানে দরকার যে, যদি এই সম্ভ্রান্ত লোকটি হযরত শুআ'য়েবই (আঃ) হতেন তবে অবশ্যই কুরআন কারীমে এই স্থলে তাঁর নাম পরিষ্কারভাবে নেয়া হতো। হ্যাঁ, তবে কোন হাদীসে এসেছে যে, তিনি হযরত শুআ'য়েব (আঃ) ছিলেন। কিন্তু এ হাদীসগুলোর সনদ বিশুদ্ধ নয়। সত্বরই আমরা ওগুলো আনয়ন করবো ইনশাআল্লাহ। বানী ইসরাঈলের কিতাবগুলোতে তাঁর নাম শীরূন বলা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর পুত্র বলেন যে, শীরূন হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াসরাবী ছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, একথা ঐ সময় সাব্যস্ত হতো যখন এ ব্যাপারে কোন খবর বর্ণিত হতো এবং এরূপ হয়নি।

ঐ মেয়ে দু'টির মধ্যে যে মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-কে ডাকতে গিয়েছিল সে পিতাকে সম্বোধন করে বললোঃ "হে পিতা! আপনি এ লোকটিকে আমাদের বক্‌রী চরানোর কাজে নিযুক্ত করুন! কেননা, উত্তমরূপে কাজ সে-ই করতে পারে যে হয় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" পিতা তখন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! তার মধ্যে যে এ দু'টি গুণ রয়েছে তা তুমি কি করে জানতে পারলে?" উত্তরে মেয়েটি বললোঃ "দশটি শক্তিশালী লোক মিলিতভাবে কূপের মুখের যে পাথরটি সরাতে সক্ষম হতো তা সে একাকী সরিয়ে ফেলেছে। এর দ্বারা অতি সহজেই তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর তার বিশ্বস্ততার পরিচয় আমি এইভাবে পেয়েছি যে, তাকে সাথে নিয়ে যখন আমি আপনার নিকট আসতে শুরু করি তখন সে পথ চিনে না বলে আমি আগে হই। সে তখন আমাকে বলেঃ "না, না, তুমি আমার পিছনে থাকো। যখন পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে তখন ঐ দিকে তুমি একটি কংকর ছুঁড়ে ফেলবে। তাহলেই আমি বুঝতে পারবো যে, ঐ পথে আমাকে চলতে হবে।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “তিন ব্যক্তির মত বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা আর কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি। তাঁরা হলেনঃ (১) হযরত আবূ বকর (রাঃ), তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় এই যে, তিনি খিলাফতের জন্যে হযরত উমার (রাঃ)-কে মনোনীত করেন। (২) মিসরের অধিবাসী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ক্রেতা, যিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মর্যাদা বুঝে নেন এবং তাঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীকে বলেনঃ “সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা করো।” আর (৩) এই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকটির কন্যা, যে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাদের কাজে নিয়োগ করার জন্যে তার পিতার নিকট সুপারিশ করেছিল।”

মেয়ের কথা শোনা মাত্রই তার পিতা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেনঃ “আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার বকরী চরাবে।” মেয়ে দু'টির নাম ছিল সাফূরইয়া এবং লিয়া। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, তাদের দু'জনের নাম ছিল সাফূরইয়া ও শারফা এবং শারফাকে লিয়া বলা হতো।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অনুসারীগণ এ থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যদি কোন লোক বলেঃ “আমি এই গোলাম দু'টির মধ্যে একটিকে একশ'র বিনিময়ে বিক্রী করলাম” এবং ক্রেতা তা স্বীকার করে নেয় তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি আরো বললেনঃ “যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। এটা তোমার জন্যে অবশ্যকরণীয় নয়। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনে। আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।” ইমাম আওযায়ী (রঃ) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যদি কেউ বলেঃ “আমি অমুক জিনিস নগদে দশে এবং বাকীতে বিশে বিক্রী করছি।” তবে এই বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে। আর ক্রেতার এটা ইচ্ছাধীন থাকবে যে, সে ওটা নগদে দশে কিনবে অথবা বাকীতে বিশে কিন্‌বে। তিনি ঐ হাদীসটিরও এই ভাবার্থ নিয়েছেন যাতে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এক বেচা-কেনায় দু'টি বেচা-কেনা করবে তার জন্যে কমেরটার বেচা-কেনা হবে অথবা সুদ হবে। কিন্তু এ মাযহাবটির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনার জায়গা এটা নয়। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'অলাাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর অনুসারীরা এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন যে, পানাহার ও কাপড়ের উপর কাউকেও মজুরী ও কাজে লাগানো জায়েয। এর দলীল হিসেবে সুনানে ইবনে মাজাহ্র একটি হাদীসও রয়েছে। ওটা

এই ব্যাপারে যে, কোন মজুরের মজুরী এটা নির্ধারণ করা যে, সে পেটপুরে আহার করবে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস আনয়ন করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে তোয়া-সীন পাঠ করেন। যখন তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন বলেনঃ "হযরত মূসা (আঃ) নিজের পেট পূর্ণ করা ও নিজের লজ্জাস্থানকে আবৃত করার জন্যে আট বছর বা দশ বছরের জন্যে নিজেকে চাকুরীতে নিয়োগ করেছিলেন।"[১]

হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) ঐ মহানুভব ব্যক্তির ঐ শর্ত কবূল করে নেন এবং তাঁকে বলেনঃ "আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইলো। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।"

যদিও দশ বছর পূর্ণ করা আইনানুমোদিত কিন্তু ওটা অতিরিক্ত বিষয়, জরুরী নয়। জরুরী হলো আট বছর। যেমন মিনার শেষ দুই দিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে। আর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ)-কে সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেনঃ "সফরে রোযা রাখা ও না রাখা তোমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে রাখবে, না করলে না রাখবে।" যদিও অন্য দলীল দ্বারা রোযা রাখাই উত্তম। এখানেও এই দলীলই রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) দশ বছরই পূর্ণ করেছিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাবাসী এক ইয়াহূদী আমাকে জিজ্ঞেস করেঃ "হযরত মূসা (আঃ) আট বছর পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছর?" আমি উত্তরে বলিঃ এটা আমার জানা নেই। অতঃপর আমি আরবের খুবই বড় আলেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে এটা জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাবে বলেনঃ "এ দু'টোর মধ্যে যেটা বেশী ও পবিত্র মেয়াদ সেটাই তিনি পূর্ণ করেন অর্থাৎ তিনি দশ বছর পূর্ণ করেন। আল্লাহর রাসূল যা বলেন তাই করে থাকেন।"[২] হাদীসে ফুতূনে রয়েছে যে, ঐ প্রশ্নকারী লোকটি খৃষ্টান ছিল। কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে যা রয়েছে ওটাই বেশী গ্রহণযোগ্য। এসব ব্যাপার আল্লাহ্ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করিঃ হযরত মূসা (আঃ) কোন্

১. এই সনদে এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এর একজন বর্ণনাকারী হলেন মাসলামা ইবনে আলী আল খুশানী আদ্ দিমাশ্কী। তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। অন্য সনদেও এটা বর্ণিত আছে কিন্তু ওটাও সন্দেহমুক্ত নয়।

২. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

সময় পূর্ণ করেছিলেন? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "ঐ দুই সময়ের মধ্যে যেটা ছিল পরিপূর্ণ ঐ সময়ই তিনি পূর্ণ করেছিলেন।"[১]

একটি মুরসাল হাদীসে আছে যে, কোন একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন অন্য ফেরেশতাকে, অন্য ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ তা'আলাকে এবং আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেনঃ "দুই সময়ের মধ্যে পবিত্র ও পূর্ণতম সময় তিনি পূর্ণ করেছিলেন অর্থাৎ দশ বছর।"

একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেন। এর পর তিনি একথাও বলেনঃ "যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মেয়ে দু'টির মধ্যে কোন মেয়েটিকে হযরত মূসা (আঃ) বিয়ে করেছিলেন? তবে তুমি জবাবে বলবেঃ মেয়ে দু'টির মধ্যে যে ছোট ছিল তাকেই তিনি বিয়ে করেছিলেন।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দীর্ঘ মেয়াদটি পূর্ণ করার কথা বলার পরে বলেন, যখন হযরত মূসা (আঃ) হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হন তখন স্বীয় স্ত্রীকে বলেনঃ "তোমার আব্বার নিকট হতে কিছু বকরী নিয়ে নাও, যেগুলো দ্বারা আমাদের জীবিকা নির্বাহ হবে।" তাঁর স্ত্রী তখন তার পিতার নিকট কিছু বকরীর আবেদন করেন। তাঁর পিতা ওয়াদা করেন যে, ঐ বছর যতগুলো সাদা-কালো মিশ্রিত বকরীর জন্ম হবে সবই তিনি তাঁদেরকে দিয়ে দিবেন। হযরত মূসা (আঃ) বকরীগুলোর পেটের উপর দিয়ে স্বীয় লাঠিখানা চালিয়ে দিলেন এবং এর ফলে প্রত্যেকটি বকরী দু'টি করে ও তিনটি করে বাচ্চা প্রসব করলো। আর সবগুলোই হলো সাদা-কালো রঙ মিশ্রিত। ওগুলোর বংশ এখনও খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত শুআ'য়েব (আঃ)-এর সমস্ত বকরী ছিল কালো রঙ এর এবং খুবই সুন্দর। ঐ বছর তাঁর যতগুলো বকরীর জন্ম হয় সবই হয় খুঁৎবিহীন, বড় বড় স্তন বিশিষ্ট এবং বেশী দুধদানকারী। এই সমুদয় রিওয়াইয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর উপর নির্ভরশীল, যাঁর স্মরণশক্তি তেমন প্রখর ছিল না এবং এগুলো মারফূ' না হওয়ারও আশংকা রয়েছে। যেহেতু অন্য সনদে এটা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে মাওকূফ রূপে বর্ণিত আছে, তাতে এও রয়েছে যে, ঐ বছর একটি বকরী ছাড়া সমস্ত বকরীর বাচ্চাই হয়েছিল সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ-এর, যেগুলোর সবই হযরত মূসা (আঃ) নিয়ে গিয়েছিলেন।

---

১. এ হাদীসটি ইবনু জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٢٩- فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

২৯। মূসা (আঃ) যখন মেয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা শুরু করলো তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলো। সে তার পরিজনবর্গকে বললোঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি সেখান হতে তোমাদের জন্যে খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

٣٠- فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰۤى اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ○

৩০। যখন মূসা (আঃ) আগুনের নিকট পৌঁছলো তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হলোঃ হে মূসা (আঃ)! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।

٣١- وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ۚ یٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ ○

৩১। আরো বলা হলোঃ তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না। তাকে বলা হলোঃ হে মূসা (আঃ)! সামনে এসো, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ।

৩২। তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করবার জন্যে তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এই দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্যে। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	٣٢- اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

পূর্বেই এটা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। কুরআন কারীমের اَلْاَجَلُ শব্দের দ্বারাও ঐদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) তো বলেন যে, এই দশ বছর এবং আরো দশ বছর তিনি পূর্ণ করেছিলেন। কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারা আমরা এই দশ বছরই বুঝছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মনে খেয়াল ও আগ্রহ জাগে যে, তিনি চুপে চুপে স্বদেশে চলে যাবেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হবেন। তাই তিনি স্বীয় স্ত্রী ও নিজের বকরীগুলো সাথে নিয়ে মাদইয়ান হতে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয় এবং ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। চতুর্দিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তিনি বারবার প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনক্রমেই আলো জ্বালাতে পারলেন না। তিনি খুবই বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি কিছু দূরে আগুন জ্বলতে দেখতে পেলেন। তাই তিনি স্বীয় পরিজনকে বললেনঃ "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। ওখানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আমি ওখানে যাচ্ছি। সেখানে যদি কেউ থেকে থাকে তবে আমি তার কাছে রাস্তা জেনে নেবো, যেহেতু আমরা পথ ভুল করেছি এবং সেখান হতে কিছু আগুন নিয়ে আসবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।"

যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন তখন ঐ উপত্যকার ডান দিকের পশ্চিমা পাহাড় হতে শব্দ শুনতে পান। যেমন কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ وَمَا كُنْتَ

الخ ..... بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (২৮ঃ ৪৪)-এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আঃ) আগুনের উদ্দেশ্যে কিবলার দিকে গিয়েছিলেন এবং মাগরীবের পাহাড়টি তাঁর ডান দিকে ছিল। এক সবুজ-শ্যামল গাছে আগুন দেখা যাচ্ছিল। যা পাহাড় সংলগ্ন মাঠে অবস্থিত ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন যে, সবুজ-শ্যামল গাছ হতে অগ্নিশিখা বের হচ্ছে! অথচ কোন জিনিসে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে না।!

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট যে গাছ হতে শব্দ এসেছিল আমি ঐ গাছটি দেখেছি। ওটা ডালে-পাতায় ভরা সবুজ-শ্যামল গাছ। গাছটি উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছিল।" কেউ কেউ বলেন যে, ওটা আওসাজ বৃক্ষ। তাঁর লাঠিও ঐ গাছেরই ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) শুনতে পেলেন যে, শব্দ আসছেঃ "হে মূসা (আঃ)! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি। আমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। আমি ব্যতীত প্রতিপালকও কেউ নেই। আমি এক ও অদ্বিতীয়। আমি অতুলনীয়। আমার কোন অংশীদার নেই। আমার সত্তায়, আমার গুণাবলীতে, আমার কাজে এবং আমার কথায় আমার কোন শরীক ও সঙ্গী-সাথী নেই। সর্বদিক দিয়েই আমি পবিত্র। আমার কোন লয় ও ক্ষয় নেই।" এই শব্দে তাঁকে আরো বলা হলোঃ "তুমি তোমার যষ্টিটি নিক্ষেপ কর এবং আমার ক্ষমতা তুমি স্বচক্ষে দেখে নাও।" অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ـ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ـ

অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? সে বললোঃ ওটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।" (২০ ঃ ১৭-১৮) অর্থ হলো এই যে, তোমার যে লাঠিটি তুমি চেনো, اَلْقِهَا অর্থাৎ 'তুমি ওটাকে নিক্ষেপ কর।'

فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى অর্থাৎ "অতঃপর ওটা নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথে ওটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো।" (২০ ঃ ২০) এটা ঐ বিষয়েরই প্রমাণ ছিল যে, শব্দকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই বটে। যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে জিনিসকে যা বলে দেন তা টলবার নয়। সূরায়ে তোয়া-হা-এর তাফসীরে এর বর্ণনা গত হয়েছে।

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যখন সে ওকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলো তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগলো এবং পিছনের দিকে ফিরেও তাকালো না।" তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ আসলোঃ 'হে মূসা (আঃ)! সামনে এসো, ভয় করো না; তুমি তো নিরাপদ।' এ শব্দ শুনে হযরত মূসা (আঃ)-এর ভয় কেটে গেল। তিনি নির্ভয়ে শান্তভাবে নিজের স্থানে এসে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই মু'জিযা দান করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ "তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে।" এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ভয় দূর করবার জন্যে তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর।' যে ব্যক্তি ভয় ও সন্ত্রাসের সময় আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় হাতখানা বুকের উপর রাখবে, ইনশাআল্লাহ তার ভয় দূর হয়ে যাবে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রথম প্রথম হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে খুব ভয় করতেন। যখন তিনি তাকে দেখতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْرَاُبِكَ فِیْ نَحْرِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনাকে তার মুকাবিলায় রাখছি এবং তার অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তর হতে ফিরাউনের ভয় দূর করে দেন এবং ফিরাউনের অন্তরে তাঁর ভয় প্রবেশ করিয়ে দেন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, যখনই ফিরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখতো তখনই গাধার মত সে প্রস্রাব করে ফেলতো।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেনঃ এ দু'টি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠি ও উজ্জ্বল হাত নিয়ে ফিরাউন ও তার লোকদের নিকট গমন কর এবং দলীল হিসেবে তার সামনে এ মু'জিযাগুলো পেশ কর এবং ঐ পাপাচারদেরকে আল্লাহর পথ প্রদর্শন কর।

৩৩। মূসা (আঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

٣٣- قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۝

٣٤- وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

৩৪। আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○

৩৫। আল্লাহ বললেনঃ আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।

এটা গত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের ভয়ে তার শহর হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সেখানে তারই কাছে নবীরূপে যেতে বললেন তখন তাঁর সব কিছু স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি আরজ করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি হয় তো তার প্রতিশোধ হিসেবে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

শৈশবে হযরত মূসা (আঃ)-এর পরীক্ষার জন্যে তাঁর সামনে একখণ্ড জ্বলন্ত অগ্নিকাষ্ঠ এবং একটি খেজুর বা মুক্তা রাখা হয়েছিল। তখন তিনি অগ্নিকাষ্ঠ ধরে নিয়েছিলেন এবং মুখে পুরে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর যবানে কিছুটা তোতলামি এসে গিয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেনঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ـ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ـ هٰرُوْنَ اَخِيْ ـ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ـ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ـ

অর্থাৎ “আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন । যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার জন্যে করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কর্মে অংশী করুন।” (২০ ঃ ২৭ -৩২) এখানেও তাঁর অনুরূপ প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেনঃ “আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং হারূন (আঃ) আমার সাথে থাকলে সে আমার কথা জনগণকে বুঝিয়ে দেবে।” মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে জবাবে বললেনঃ “আমি তোমার দু'আ কবূল করলাম। তোমার ভ্রাতার দ্বারা আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। অর্থাৎ তাকেও তোমার সাথে নবী বানিয়ে দেবো।” যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى

অর্থাৎ “হে মূসা (আঃ)! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হলো।” (২০ ঃ ৩৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا -

অর্থাৎ “আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে নবীরূপে।” (১৯ঃ ৫৩) এ জন্যেই পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজন বলেছেনঃ “কোন ভাই তার ভাই এর উপর ঐরূপ অনুগ্রহ করেনি যেরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-এর উপর। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে তাঁকে নবী বানিয়ে নিয়েছিলেন।” হযরত মূসা (আঃ) যে একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন তার এটাই বড় প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দু'আও প্রত্যাখ্যান করেননি। বাস্তবিকই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।” যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ .... وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ “হে রাসূল (সঃ)! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয় তা তুমি (জনগণের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও...... আল্লাহ তোমাকে লোকদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন।” (৫ঃ ৬৭) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ .... وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ

অর্থাৎ “যারা আল্লাহর রিসালাত পৌঁছিয়ে দেয় ..... এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।” (৩৩ ঃ ৩৯) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ـ

অর্থাৎ “আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ আমি ও আমার রাসূলরা অবশ্যই জয়যুক্ত হবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপ্রতাপশালী।” (৫৮ ঃ ২১) আর এক আয়াতে বলেনঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে (শেষপর্যন্ত)।” (৪০ ঃ ৫১)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে আয়াতটির ভাবার্থ হলোঃ “আমার প্রদত্ত প্রাধান্য দানের কারণে ফিরাউন ও তার লোকেরা তোমাদেরকে কষ্ট দিতে সক্ষম হবে না এবং আমার প্রদত্ত নিদর্শন বলে বিজয় শুধু তোমরাই লাভ করবে।” কিন্তু পূর্বে যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তার দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এই ভাবার্থের কোন প্রয়োজনই নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

٣٦- فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৬। মূসা (আঃ) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলো, তারা বললোঃ এটা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে আমরা কখনো এরূপ কথা শুনিনি।

৩৭। মূসা (আঃ) বললোঃ আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথ-নির্দেশ এনেছে, এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালিমরা সফলকাম হবে না।

٣٧- وَقَالَ مُوسٰى رَبِّىٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

হযরত মূসা (আঃ) নবুওয়াত রূপ উপহার লাভ করে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মিসরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ফিরাউন ও তার লোকদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর রিসালাতের ঘোষণা দেন এবং তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযাগুলো তাদেরকে প্রদর্শন করেন। ফিরাউনসহ সবারই এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, নিশ্চয়ই হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নবী। কিন্তু সে যুগ যুগ ধরে যে অহংকার করে আসছিল তা এবং তার পুরাতন কুফরী মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তাই অন্তরের বিশ্বাসকে গোপন রেখে সে মুখে বলতে শুরু করলোঃ "এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়।" অতঃপর সে স্বীয় দবদবাও শক্তির দাপট দেখিয়ে সত্যের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল এবং আল্লাহর নবী (আঃ)-এর সামনে বললো ঃ "আমরা তো কখনো শুনিনি যে, আল্লাহ এক। শুধু আমরা কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরাও কখনো এরূপ কথা শুনেনি। আমরা বড়, ছোট সবাই বহু খোদার উপাসনা করে আসছি। এই নবী কোথা হতে এই নতুন কথা নিয়ে এসেছে?" উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "আমাকে ও তোমাদেরকে আল্লাহ খুব ভাল রূপেই অবগত আছেন। তিনিই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন যে, কে সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। আল্লাহর সাহায্য কার সাথে রয়েছে তা তোমরা সত্বরই জানতে পারবে। যালিম অর্থাৎ মুশ্‌রিকদের পরিণাম কখনো শুভ হয় না। সুতরাং তারা সফলকাম হবে না।

৩৮। ফিরাউন বললোঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্যে ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ

٣٨- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ

فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

প্রাসাদ তৈরী কর; হয়তো আমি তাতে উঠে মূসা (আঃ)-এর মা'বূদকে দেখতে পাবো। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী।

٣٩- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ○

৩৯। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।

٤٠- فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০। অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখো, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।

٤١- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

৪১। তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো; কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

٤٢- وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○ ع

৪২। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।

এখানে ফিরাউনের ঔদ্ধত্যপনা এবং তার খোদায়ী দাবীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে তার কওমকে নির্বোধ বানিয়ে তাদের দ্বারা তার দাবী আদায় করে। সে ঐ ইতর ও অজ্ঞদেরকে একত্রিত করে উচ্চস্বরে বলেঃ "তোমাদের রব বা প্রতিপালক আমিই। সবচেয়ে উচ্চ ও উন্নত অস্তিত্ব আমারই।" তার এই ঔদ্ধত্য

ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তিতে পাকড়াও করেন। আর অন্যান্যদের জন্যে এটাকে শিক্ষণীয় বিষয় করেন। ঐ ইতর লোকেরা তাকে খোদা মেনে নিয়ে তার দম্ভ এত বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, সে কালীমুল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে ধমকের সুরে বলেছিলঃ "তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বূদ বানিয়ে নাও তবে আমি তোমাকে কয়েদখানায় বন্দী করবো।" সে ঐ নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে বসে তাদের দ্বারা নিজের দাবী পূরণ করে নিয়ে তারই মত ম্লেচ্ছ উযীর হামানকে বললোঃ "হে হামান! তুমি আমার জন্যে ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; যেন আমি তাতে উঠে দেখতে পারি যে, সত্যি মূসা (আঃ)-এর কোন মা'বূদ আছে কি না। সে যে প্রতারক এটা তো আমার নিকট পরিষ্কার, কিন্তু আমি চাই যে, সে যে মিথ্যাবাদী এটা যেন তোমাদের সবারই নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে।" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ـ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ـ

অর্থাৎ "ফিরাউন বললোঃ হে হামান! আমার জন্যে তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন–আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসা (আঃ)-এর মা'বূদকে; তবে তাকে তো আমি মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।" (৪০ঃ ৩৬-৩৭) সুতরাং তার জন্যে এমন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় যা দুনিয়ায় কখনো দেখা যায়নি। ফিরাউন যে শুধু হযরত মূসা (আঃ)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল তা নয়, বরং সেতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতো না। যেহেতু সে হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলঃ وَمَارَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ "জগতসমূহের প্রতিপালক কি?" সে এও বলেছিল ঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকেও মা'বূদ মেনে থাকো তবে আমি তোমাকে বন্দী করে দেবো।"

এখানে ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলেছিলঃ "হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের জন্যে কোন মা'বূদ আছে বলে আমার জানা নেই।" যখন তার ও তার কওমের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে যায়, দেশে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টি সীমা

ছাড়িয়ে যায়, তাদের আকীদা অচল পয়সার মত হয়ে পড়ে এবং কিয়ামতের হিসাব কিতাবকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে তখন শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই শাস্তি সবকে পেয়ে বসে এবং একই দিনে, একই সময়ে এবং একই সাথে তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা চিন্তা করে দেখো, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো। যারাই তাদের পথে চলেছে তাদেরকেই তারা জাহান্নামে নিয়ে গেছে। যারাই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করেছে তারাই তাদের পথে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না। উভয় জগতেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ - অর্থাৎ "আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।" (৪৭ ঃ ১৩) দুনিয়াতেও এরা অভিশপ্ত হলো। তাদের উপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেশ্তাদের, তাঁর নবীদের এবং সমস্ত সৎ লোকের অভিসম্পাত। যে কোন ভাল লোক তাদের নাম শুনবে সেই তাদেরকে অভিশাপ দেবে। সুতরাং দুনিয়াতেও তারা অভিশপ্ত হলো এবং আখিরাতেও তারা হবে ঘৃণিত। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ

অর্থাৎ "এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তারা লাভ করবে।" (১১ঃ ৯৯)

৪৩। আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করবার পর মূসা (আঃ)-কে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্যে জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

এই আয়াতে একটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ফিরাউন ও তার লোকদের পরবর্তী উম্মতরা এইভাবে আসমানী আযাবে ধ্বংস হয়নি। বরং যে উম্মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি ঐ যুগের সৎ লোকদের দ্বারাই প্রদান করেছেন। মুমিনরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করতে থেকেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ـ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ـ

অর্থাৎ "ফিরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন—কঠোর শাস্তি।" (৬৯ঃ ৯-১০) এই দলের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরেও আল্লাহর ইনআ'ম হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হতে থাকে। ওগুলোর মধ্যে একটি বড় ইনআ'মের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। তা এই যে, তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত অবতীর্ণ করেন। তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কওমকে আসমান বা যমীনের সাধারণ আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়নি। শুধুমাত্র ঐ লোকালয়ের কতকগুলো পাপাচারীকে তিনি শূকর ও বানর করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, যারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দিন শনিবারে মৎস্য শিকার করেছিল, অথচ সেই দিন মৎস্য শিকার তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। এটা অবশ্যই হযরত মূসা (আঃ)-এর পরের ঘটনা। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এরপরেই তিনি তাঁর উক্তির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ .... الخ ـ-এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

একটি মারফূ' হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে আল্লাহ তা'আলা কোন কওমকে আসমানী বা যমীনী আযাব দ্বারা ধ্বংস করেননি। এরূপ আযাব যত এসেছে সবই তাঁর পূর্বেই এসেছে।" অতঃপর তিনি- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى ..... الخ।-এ আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর তাওরাতের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এটা জনগণকে অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্টতা হতে বেরকারী ছিল, প্রতিপালকের দয়া স্বরূপ ছিল, তাদের জন্যে ছিল জ্ঞানবর্তিকা এবং পথ-নির্দেশ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٤- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۙ○

৪৪। মূসা (আঃ)-কে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না।

٤٥- وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৪৫। বস্তুতঃ আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্যে। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

٤٦- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৬। মূসা (আঃ)-কে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুতঃ এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়া স্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٧- وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

৪৭। রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলতোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○	**প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নির্দেশ মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মুমিন।**

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শেষ নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের দলীল দিচ্ছেন যে, তিনি এমন একজন লোক যাঁর কোন আক্ষরিক জ্ঞান নেই, যিনি একটি অক্ষরও কারো কাছে শিক্ষা করেননি, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, যার কওমের সবাই বিদ্যাচর্চা ও অতীতের ইতিহাস হতে সম্পূর্ণ বে-খবর, তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এবং পূর্ণ বাকপটুতার সাথে ও সঠিকভাবে অতীতের ঘটনাবলী এমনভাবে বর্ণনা করছেন যে, যেন তিনি সেগুলো স্বচক্ষে দর্শন করেছেন এবং তিনি যেন সেগুলো সংঘটিত হওয়ার সময় তথায় বিদ্যমান ছিলেন। এটা কি একথার প্রমাণ নয় যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শিক্ষাদান করা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ অহীর মাধ্যমে ওগুলো তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন? হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও এটা পেশ করেছেন এবং বলেছেনঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! মারইয়াম (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে এর জন্যে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।" (৩ ঃ ৪৪) সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদ্যমান না থাকা এবং অবহিত না থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেন তিনি তথায় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর সামনেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, এটা তাঁর নবুওয়াতের স্পষ্ট দলীল ও পরিষ্কার নিদর্শন যে, তিনি অহীর মাধ্যমে এগুলোর খবর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ "এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ যেগুলো আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি, ইতিপূর্বে এগুলো না তুমি জানতে, না তোমার কওম জানতো, সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং জেনে রেখো যে, শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদেরই।" (১১ঃ ৪৯) সূরায়ে ইউসুফেরও শেষে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ -

অর্থাৎ "এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহীর দ্বারা অবহিত করছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তখন তুমি তাদের সাথে ছিলে না।" (১২ ঃ ১০২) সূরায়ে তোয়াহা-তে রয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ -

অর্থাৎ "পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি।" (২০ঃ ৯৯) অনুরূপভাবে এখানেও হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম, নবুওয়াতের সূচনা ইত্যাদি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বলেনঃ "(হে মুহাম্মদ সঃ!) যখন আমি মূসা (আঃ)-কে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুতঃ আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবার জন্যে। আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আর হে নবী (সঃ)! যখন আমি মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে হাযির ছিলে না।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আওয়ায দেয়া হয়ঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত! তোমাদের চাওয়ার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি এবং তোমরা দু'আ করবে তার পূর্বেই আমি কবূল করে নিয়েছি।"[১]

হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমরা যখন তাদের বাপ-দাদাদের পৃষ্ঠদেশে ছিলে তখনই আমি তাদেরকে ডাক দিয়েছিলাম যে, আমি যখন তোমাকে নবী করে প্রেরণ করবো তখন তারা তোমার অনুসরণ করবে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আবদুর রহমান আন নাসাঈ (রঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'আমি মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করেছিলাম।' এটাই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, উপরেও এরই বর্ণনা রয়েছে। উপরে সাধারণভাবে বর্ণনা ছিল এবং এখানে বিশিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى ۔

অর্থাৎ "যখন তোমার প্রতিপালক মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করলেন।" (২৬ ঃ ১০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِذْنَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔

অর্থাৎ "তার প্রতিপালক যখন তাকে পবিত্র তূর উপত্যকায় আহ্বান করেন।" (৭৯ ঃ ১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর একটি আয়াতে বলেনঃ

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۔

অর্থাৎ "তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম।" (১৯ ঃ ৫২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ এগুলোর মধ্যে একটি ঘটনাও তোমার উপস্থিতকালে এবং তোমার চোখের সামনে সংঘটিত হয়নি, বরং তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়া স্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। এটা এ জন্যেও যে, তাদের কাছে যেন কোন দলীল বাকী না থাকে এবং ওযর করারও কিছু না থাকে যে, তাদের কাছে কোন রাসূল আসেননি এবং তাদেরকে কেউ সুপথ প্রদর্শন করেননি, করলে অবশ্যই তারা আল্লাহর নিদর্শন মেনে চলতো এবং তারা মুমিন হতো।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় স্বীয় পবিত্র কিতাব কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করার পর বলেনঃ "এটা এই জন্যে যে, তোমরা যেন বলতে না পার– কিতাব তো আমাদের পূর্বে দু'টি দলের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা তো এর পাঠ ও শিক্ষাদান হতে ছিলাম সম্পূর্ণ উদাসীন। যদি এ কিতাব আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হতো তবে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে বেশী সুপথগামী হতাম। এখন জেনে রেখো যে, তোমাদের কাছেও তোমাদের প্রতিপালকের দলীল, হিদায়াত ও রহমত এসে গেছে।" অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ "এরা হলো সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী রাসূল যাতে লোকদের

জন্যে রাসূলদের পরে কোন হুজ্জত বাকী না থাকে।" আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ۔

অর্থাৎ "হে আহ্‌লে কিতাব! তোমাদের কাছে রাসূলশূন্য যুগে আমার রাসূল এসে গেছে যে তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে, যাতে তোমরা বলতে না পার– আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি, কারণ এখন তো তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী এসে গেছে।" (৫ ঃ ১৯) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

৪৮। অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য আসলো, তারা বলতে লাগলোঃ মূসা (আঃ)-কে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হলো না কেন? কিন্তু পূর্বে মূসা (আঃ)-কে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিলঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিলঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি।

٤٨- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ۝

৪৯। বলঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সে কিতাব অনুসরণ করবো।

٤٩- قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৫০। অতঃপর যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়,

٥٠- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ

فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ۗ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

তাহলে জানবে যে, তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না।

৫১- وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৫১। অমি তো তাদের নিকট পরপর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেনঃ যদি নবীদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতাম তবে তাদের একথা বলার অধিকার থাকতো যে, তাদের কাছে নবী আগমন করলে তবে অবশ্যই তারা তাঁদেরকে মেনে চলতো। এজন্যেই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। বিশেষ করে আমি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে পাঠিয়েছি। যখন তিনি জনগণের নিকট আগমন করেন তখন তারা চক্ষু ফিরিয়ে নেয়, মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং অত্যন্ত দর্পভরে বলেঃ হযরত মূসা (আঃ)-কে যেমন বহু মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যথা—লাঠি, হাতের ঔজ্জ্বল্য, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এবং শস্য ও ফলের হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি, যেগুলো দেখে আল্লাহর শত্রুরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সমুদ্রকে বিভক্ত করা, মেঘ দ্বারা ছায়া করা ও মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি, যেগুলো ছিল বড় বড় মু'জিযা, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (সঃ)-কে কেন দেয়া হয় না? তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ লোকগুলো যে ঘটনাকে উদাহরণ রূপে পেশ করছে এবং যেসব মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে এসব মু'জিযা হযরত মূসা (আঃ)-এর থাকা সত্ত্বেও কয়জন লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল? তারা তো পরিষ্কারভাবে বলেছিলঃ "মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এ দুই ভাই যাদুকর ছাড়া কিছুই নয়। তারা আমাদের হতে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়। সুতরাং আমরা কখনো তাদের কথা মানতে পারি না।" এভাবে তারা ঐ দুই নবী

(আঃ)-কে অবিশ্বাস করে, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা বলেছিল, "এই দুই ভাই যাদুকর, তারা একত্রিত হয়ে আমাদেরকে খাটো করার জন্যে ও নিজেদেরকে বড় মানিয়ে নেয়ার জন্যেই এসেছে। আমরা তাদের প্রত্যেককেই প্রত্যাখ্যান করি।"

এখানে শুধু হযরত মূসা (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু তারা দু' ভাই এমনভাবে মিলে গিয়েছিলেন যে, যেন তাঁরা দু'জন এক। এ জন্যে একজনের উল্লেখই অপরজনের জন্যে যথেষ্ট মনে করা হয়। যেমন কবি বলেনঃ

فَمَا اَدْرِىْ اِذَا يَمَّمْتُ اَرْضًا ۔ اُرِيْدُ الْخَيْرَ اَيُّهُمَا يَلِيْنِىْ

অর্থাৎ "যখন আমি কোন জায়গার ইচ্ছা করি তখন সেখানে আমার লাভ হবে কি ক্ষতি হবে তা আমি জানি না।" এখানে কবি শুধু লাভের কথা উল্লেখ করেছেন, ক্ষতির কথা উল্লেখ করেননি। কেননা, লাভ ও ক্ষতি, ভাল ও মন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটির সাথে অপরটি থাকা অপরিহার্য। এজন্যেই কবি শুধু কল্যাণের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, অনিষ্টের উল্লেখ তিনি করেননি।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা কুরায়েশদেরকে বলে যে, তারা যেন মুহাম্মাদ (সঃ)-কে এ কথা বলে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদে বলেনঃ পূর্বে মূসা (আঃ)-কে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিলঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে, অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)। তারা এই উত্তর পেয়ে নীরব হয়ে যায়। একটি উক্তি এও আছে যে, দু'জন যাদুকর দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর একটি উক্তি এটাও যে, দু'জন যাদুকর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উক্তি অপেক্ষা প্রথম উক্তিটিই বেশী দৃঢ় ও উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। سَاحِرَانِ-এর কিরআতের উপর এই ভাবার্থ। আর سِحْرَانِ যাদের কিরআত তারা বলেন যে, এর দ্বারা তাওরাত ও কুরআন উদ্দেশ্য। এ দু'টি একটি অপরটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী। কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইঞ্জীল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা ইঞ্জীল ও কুরআন উদ্দেশ্য। কোনটি সঠিক কথা তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে এই কিরআতেও যাহেরী তাওরাত ও কুরআনের অর্থ সঠিক। কেননা এর পরেই আল্লাহ পাকের উক্তি রয়েছেঃ "তোমরাই তাহলে এ দু'টো অপেক্ষা বেশী হিদায়াত দানকারী কোন কিতাব আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসো, যার

আনুগত্য আমি করবো?” কুরআন কারীমে তাওরাত ও কুরআনকে অধিকাংশ জায়গায় একই সাথে আনয়ন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ ـ

অর্থাৎ “তুমি বল– কে ঐ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা নিয়ে মূসা (আঃ) এসেছিল, যা লোকদের জন্যে জ্যোতি ও হিদায়াত স্বরূপ?” (৬ ঃ ৯২) এর পরেই তিনি বলেনঃ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ ـ অর্থাৎ “এই কিতাবকেও (কুরআনকেও) আমি বরকতময় ও কল্যাণময় রূপে অবতীর্ণ করেছি।” আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ “তোমরা আমার অবতারিত এই কল্যাণময় কিতাবের অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমাদের উপর দয়া করা হবে।” (৬ঃ ১৫৬) জ্বিনেরা বলেছিলঃ “আমরা এমন এক কিতাব শ্রবণ করেছি যা মূসা (আঃ)-এর পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা ওর পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপাদনকারী।” অরাকা ইবনে নওফল (রাঃ) বলেছিলেনঃ “এটা আল্লাহর রহস্যবিদ যাকে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল।” চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশকারী ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এই কুরআন মজীদ ও ফুরকান হামীদই বটে। এটা প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় দয়ালু নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। এরপর তাওরাত শরীফের মর্যাদা, যাতে নূর ও হিদায়াত ছিল, যা অনুসারে নবীরা ও তাঁদের অনুসারীরা হুকুম জারী করতেন। ইঞ্জীল তো শুধু তাওরাতকে পূর্ণকারী এবং কোন কোন হারামকে হালালকারী ছিল। এজন্যেই এখানে বলা হয়েছেঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথ-নির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করবো। অতঃপর হে নবী (সঃ)! তারা যদি এতে অপারগ হওয়া সত্ত্বেও তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে যে, তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? এভাবে যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করে সে শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ লাভে বঞ্চিত হয়। আমি তো তাদের কাছে বিস্তারিতভাবে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি যাতে তারা

উপদেশ গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা বলতে মুজাহিদ (রঃ) ও অন্যান্যদের মতে কুরায়েশদেরকে বুঝানো হয়েছে। স্পষ্ট ও প্রকাশমান কথা এটাই। কারো কারো মতে এদের দ্বারা রিফাআহ্ ও তার সঙ্গী নয়জন লোককে বুঝানো হয়েছে।

রিফাআহ্ ছিল হযরত সুফিয়া বিন্‌তে হুইয়াই (রাঃ)-এর মামা, যে তামীমাহ্ বিন্‌তে অহাবকে তালাক প্রদান করেছিল, যার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে।

٥٢- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

৫২। এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে।

٥٣- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ○

৫৩। যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।

٥٤- اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৫৪। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

٥٥- وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ○

৫৫। তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলেঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্যে; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।

আহ্‌লে কিতাবের আলেমগণ, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা কুরআনকে মেনে চলেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

অর্থাৎ "যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা ওটাকে সঠিকভাবে পাঠ করে থাকে, তারা ওর উপর ঈমান আনয়ন করে।" (২ ঃ ১২১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে অবশ্যই এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এসবগুলোর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে, আর তারা আল্লাহর নিকট বিনীত হয়।" (৩ ঃ ১৯৯) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ـ

অর্থাৎ "যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকটে যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর বলে– আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে।" (১৭ঃ ১০৭-১০৮) আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ـ وَاِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব হিসেবে সমস্ত লোক হতে বেশী নিকটতম ঐ লোকদেরকে তুমি পাবে যারা বলে– আমরা নাসারা, এটা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে আলেম ও বিবেকবান লোকেরা রয়েছে, তারা অহংকার ও দাম্ভিকতা

শূন্য এবং তারা কুরআন শুনে কেঁদে ফেলে ও বলে ওঠেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং (ঈমানের) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নাম লিখে নিন।" (৫ঃ ৮২-৮৩)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যাদের ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরা ছিলেন সত্তরজন খৃষ্টান আলেম। তাঁরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে সূরায়ে 'ইয়াসীন' শুনিয়ে দেন। শোনা মাত্রই তাঁরা কান্নায় ফেটে পড়েন এবং সাথে সাথেই মুসলমান হয়ে যান। তাঁদের ব্যাপারেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এখানে তাঁদেরই প্রশংসা করা হয় যে, আয়াতগুলো শোনা মাত্রই তাঁরা নিজেদেরকে খাঁটি একত্ববাদী ঘোষণা করেন এবং ইসলাম কবূল করে মুমিন ও মুসলমান হয়ে যান। তাঁদের ব্যাপারেই আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। প্রথম পুরস্কার তাঁদের নিজেদের কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের কারণে এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনকে বিশ্বাস করে নেয়ার কারণে। তাঁরা সত্যের অনুসরণে অটল থাকেন, যা প্রকৃতপক্ষে একটি বড় কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সহীহ্ হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকারের লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। প্রথম হলো ঐ আহ্লে কিতাব যে নিজের নবীকে মেনে নেয়ার পর আমার উপরও ঈমান আনে। দ্বিতীয় হলো ঐ গোলাম যে নিজের পার্থিব মনিবের আনুগত্য করার পর আল্লাহর হকও আদায় করে। তৃতীয় হলো ঐ ব্যক্তি, যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে। তাকে আদব ও বিদ্যা শিক্ষা দেয়। অতঃপর তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করে নেয়।"

হযরত কাসেম ইবনে আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সওয়ারীর সাথে ছিলাম এবং তাঁর খুবই নিকটে ছিলাম। তিনি খুবই ভাল ভাল কথা বলেন। সেদিন তিনি একথাও বলেনঃ "ইয়াহূদী ও নাসারার মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায় তার জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার। তার জন্যে আমাদের সমান (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের সমান) অধিকার রয়েছে।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুণ বর্ণনা করছেন যে, তাঁরা মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না, বরং ক্ষমা করে দেন। তাঁদের সাথে যারা মন্দ ব্যবহার করে তাদের সাথে তাঁরা উত্তম ব্যবহারই করে থাকেন। তাঁদের হালাল ও পবিত্র জীবিকা হতে তাঁরা আল্লাহর পথে খরচ করে থাকেন, নিজেদের সন্তানদেরকেও লালন পালন করেন, দান-খায়রাত করার ব্যাপারেও তাঁরা কার্পণ্য করেন না এবং বাজে ও অসার কার্যকলাপ হতে তাঁরা দূরে থাকেন। যারা অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তাদের সাথে তাঁরা বন্ধুত্ব করেন না। তাদের মজলিস হতে তাঁরা দূরে থাকেন। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে হঠাৎ গমন করলে ভদ্রভাবে তাঁরা সেখান হতে সরে পড়েন। এইরূপ লোকদের সাথে তাঁরা মেলামেশা করেন না এবং তাদের সাথে ভালবাসাও রাখেন না। পরিষ্কারভাবে তাদেরকে বলে দেনঃ "আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্যে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।" অর্থাৎ তাঁরা অজ্ঞদের কঠোর ভাষাও সহ্য করে নেন। তাদেরকে এমন জবাব দেন না যাতে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে যায়। বরং তাঁরা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। যেহেতু তাঁরা নিজেরা পাক-পবিত্র, সেহেতু মুখ দিয়ে পবিত্র কথাই বের করে থাকেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, আবিসিনিয়া হতে প্রায় বিশ জন খৃষ্টান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ঐ সময় কুরায়েশরা নিজ নিজ মজলিসে কা'বা ঘরের চতুর্দিকে বসেছিল। ঐ খৃষ্টান আলেমগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেয়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআন কারীম পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত ও ভদ্র এবং তাঁদের মস্তিষ্ক ছিল প্রখর। তাই কুরআন কারীম তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করলো এবং তাঁদের চক্ষুগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তাঁরা দ্বীন ইসলাম কবূল করে নিলেন। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করলেন। কেননা, আসমানী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যেসব বিশেষণ তাঁরা পড়েছিলেন সেগুলোর সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান পেয়েছিলেন। যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলতে শুরু করেন তখন অভিশপ্ত আবূ জেহেল তার লোকজনসহ পথে তাঁদের সাথে মিলিত হয় এবং তাঁদেরকে বিদ্রূপ করতে থাকে। তারা তাঁদেরকে বলেঃ "তোমাদের ন্যায় জঘন্যতম প্রতিনিধি আমরা কখনো কোন কওমের মধ্যে দেখিনি। তোমাদের কওম তোমাদেরকে এই লোকটির (হযরত মুহাম্মদের সঃ) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে এখানে পাঠিয়েছিলেন। এখানে এসেই তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের

ধর্ম ত্যাগ করে দিলে এবং এই লোকটির প্রভাব তোমাদের উপর এমনভাবে পড়ে যায় যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমরা তোমাদের নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার ধর্ম গ্রহণ করে বসলে। সুতরাং তোমাদের চেয়ে বড় আহমক আর কেউ আছে কি?" তাঁরা ঠাণ্ডা মনে তাদের কথাগুলো শুনলেন এবং উত্তরে বললেনঃ "আমরা তোমাদের সাথে অজ্ঞতামূলক আলোচনা করতে চাই না। আমাদের ধর্ম আমাদের সাথে এবং তোমাদের ধর্ম তোমাদের সাথে। আমরা যে কথার মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত পেয়েছি সেটাই আমরা কবূল করে নিয়েছি।" একথাও বলা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এটাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো তাঁদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত যুহ্‌রী (রঃ)-কে এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "আমি তো আমার আলেমদের থেকে শুনে আসছি যে, এ আয়াতগুলো নাজ্জাশী ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরায়ে মায়েদার ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا হতে مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (৫ ঃ ৮২-৮৩) পর্যন্ত এই আয়াতগুলোও তাঁদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

٥٦- اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬। তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্‌ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসরণকারীদেরকে।

٥٧- وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۗ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৭। তারা বলেঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি! যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! কাউকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা তোমার শক্তির বাইরে। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার বাণী জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। হিদায়াতের মালিক আমি। আমি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত কবূল করার তাওফীক দান করে থাকি।" যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ -

অর্থাৎ "তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করে থাকেন।" (২ ঃ ২৭২) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমার লিপ্সা থাকলেও অধিকাংশ লোক মুমিন নয়।" (১২ ঃ ১০৩) হিদায়াত লাভের হকদার কে এবং কে পথভ্রষ্ট হবার হকদার এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চাচা আবূ তালিবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যিনি তাঁকে খুবই সাহায্য সহানুভূতি করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সহযোগিতা করে এসেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর এ ভালবাসা ছিল আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে প্রকৃতিগত। এ ভালবাসা শরীয়তগত ছিল না। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি তাঁকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তাঁর তকদীরের লিখন এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং কুফরীর উপরই অটল থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর নিকট আগমন করেন। আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় চাচা! আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করুন। এই কারণে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্যে সুপারিশ করবো।" তখন আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে বলেঃ "হে আবূ তালিব! তুমি কি তোমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে?" এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বুঝাতে থাকেন এবং তারা দু'জন তাঁকে ফিরাতে থাকে। অবশেষে তাঁর মুখ দিয়ে শেষ কথা বের হয়ঃ "আমি এ কালেমা পাঠ করবো না, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই থাকলাম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "আচ্ছা, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। তবে যদি আল্লাহ আমাকে এর থেকে বিরত রাখেন এবং নিষেধ করে দেন তাহলে অন্য কথা।" তৎক্ষণাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى

অর্থাৎ “নবী (সঃ) ও মুমিনদের জন্যে মোটেই উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয় হয়।” (৯ ঃ ১১৩) আর আবূ তালিবের ব্যাপারে - اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ الخ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে চাচা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করুন, আমি কিয়ামতের দিন এর সাক্ষ্য দান করবো।” উত্তরে আবূ তালিব বলেনঃ “হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার যদি আমার বংশ কুরায়েশদের বিদ্রূপ বলে ভয় না থাকতো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে এ কালেমা পাঠ করছি তবে অবশ্যই আমি এটা পাঠ করতাম। আর এভাবে তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা করতাম।” ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা - اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[২]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কালেমা পড়তে অস্বীকার করেন এবং পরিষ্কারভাবে বলে দেন– “হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তো আমার বড়দের ধর্মের উপর রয়েছি।” তাঁর মৃত্যু একথারই উপর হয় যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মাযহাবের উপর রয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আবি রাশেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রোমক সম্রাট কায়সারের দূত যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয় এবং কায়সারের পত্রখানা নবী (সঃ)-এর সামনে পেশ করে তখন নবী (সঃ) তা নিজের ক্রোড়ে রেখে দেন। অতঃপর দূতকে বলেনঃ “তুমি কোন গোত্রের লোক?” সে উত্তরে বলেঃ “আমি তানূখ গোত্রের লোক।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি কি চাও যে, তুমি তোমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপর এসে যাবে?” জবাবে সে বলেঃ “আমি যে কওমের দূত, যে পর্যন্ত না আমি তাদের পয়গামের জবাব তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবো, তাদের মাযহাব পরিত্যাগ করতে পারবো না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হেসে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে - اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ ... الخ - এই আয়াতটিই পাঠ করেন।[৩]

---

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেন।
৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুশরিকরা তাদের ঈমান আনয়ন না করার একটি কারণ এও বর্ণনা করতো যে, তারা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক আনীত হিদায়াত মেনে নেয় তবে তাদের ভয় হচ্ছে যে, এই ধর্মের বিরোধী লোকেরা যে তাদের চতুর্দিকে রয়েছে তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদেরকে কষ্ট দেবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এটাও তাদের ভুল কৌশল। আল্লাহ পাক তো তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে অর্থাৎ মক্কা শরীফে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেখানে দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরাপত্তা বিরাজ করছে। তাহলে কুফরীর অবস্থায় যখন তারা সেখানে নিরাপত্তা লাভ করছে, তখন আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করলে কি করে ঐ নিরাপত্তা উঠে যেতে পারে? এটাতো ঐ শহর যেখানে তায়েফ ইত্যাদি বিভিন্ন শহর হতে ফলমূল, ব্যবসার মাল ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আমদানী হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিস এখানে অতি সহজে চলে আসে এবং এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে রিযক পৌঁছিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। এজন্যেই তারা এরূপ বাজে ওযর পেশ করে থাকে। বর্ণিত আছে যে, এ কথা যে বলেছিল তার নাম ছিল হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফিল।

৫৮- وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৫৮। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করতো! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

৫৯- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْۤ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰۤى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○

৫৯। তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করবার জন্যে রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুলুম করে।

মক্কাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার বহু নিয়ামত লাভ করে ভোগ সম্পদের দম্ভ করতো এবং হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ করতো, আল্লাহ ও তাঁর নবীদেরকে (আঃ) অমান্য ও অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ্র রিযক ভক্ষণ করে নিমকহারামী করতো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন যে, আজ তাদের নাম নেয়ারও কেউ নেই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ

হতে - فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ পর্যন্ত। অর্থাৎ "আল্লাহ একটি গ্রামের (লোকদের) উপমা বর্ণনা করেছেন যারা (পার্থিব বিপদ-আপদ হতে) নিরাপদে ছিল এবং তাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করছিল, সব জায়গা থেকে তাদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে রিয্ক আসতো .... অতঃপর তাদের যুলুম করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে পেয়ে বসে।" (১৬ ঃ ১১২-১১৩) এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের গর্ব করতো! এইতো তাদের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে; তাদের পর এগুলোতে লোকজন খুব কমই বসবাস করেছে। আমিই তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'ব (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে হযরত সুলাইমান (আঃ) পেঁচাকে বলেনঃ "তুমি ক্ষেতের ফসল খাও না কেন?" সে উত্তরে বলেঃ "এই কারণেই তো হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছিল। এজন্যেই আমি তা খাই না।" আবার তিনি প্রশ্ন করেনঃ "তুমি পানি পান কর না কেন?" জবাবে সে বলেঃ "কারণ এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে এই পানিতেই ডুবিয়ে দেয়া হয়।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি তাঁবুতে বাস কর কেন?" সে উত্তর দেয়ঃ "কেননা, ওটা আল্লাহর মীরাস।" অতঃপর হযরত কা'ব (রাঃ) وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ-আয়াতটি পাঠ করেন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি কাউকেও যুলুম করে ধ্বংস করেন না। প্রথমে তিনি তাদের সামনে তাঁর হুজ্জত ও দলীল প্রমাণ পেশ করেন এবং তাদের ওযর উঠিয়ে দেন। রাসূলদেরকে প্রেরণ করে তিনি তাদের কাছে নিজের বাণী পৌঁছিয়ে দেন।

এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াত ছিল সাধারণ। তিনি উম্মুল কুরা বা জনপদের কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁকে সারা আরব-আজমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ "যেন তুমি মক্কাবাসীকে এবং ওর চতুষ্পার্শ্বের লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর।" (৪২ ঃ৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

অর্থাৎ "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (৭ ঃ ১৫৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ ۢبَلَغَ

অর্থাৎ "যাতে আমি এই কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছে যাবে।" (৬ ঃ ১৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ـ

অর্থাৎ "দুনিয়াবাসীদের মধ্যে যে কেউ এই কুরআনকে অস্বীকার করবে তার ওয়াদার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।" (১১ ঃ ১৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا

অর্থাৎ "সমস্ত জনপদকে আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংসকারী অথবা কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।" (১৭ ঃ ৫৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খবর দিলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে তিনি সত্বরই প্রত্যেক জনপদকে ধ্বংস করবেন। আর এক জায়গায় মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ـ

অর্থাৎ "আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না আমি রাসূল প্রেরণ করি।" (১৭ ঃ ১৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাত বা প্রেরিতত্বকে সাধারণ করেছেন এবং সারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল মক্কাভূমিতে তাঁকে প্রেরণ করে বিশ্বজাহানের উপর স্বীয় হুজ্জত খতম করে দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি প্রত্যেক লাল-কালোর নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" এ জন্যেই তাঁর উপরই নবুওয়াতকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। বলা হয়েছে যে, أُمِّ الْقُرٰى দ্বারা আসল এবং বড় গ্রাম বা শহর উদ্দেশ্য।

٦٠- وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۟

৬০। তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

٦١- اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

৬১। যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে?

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, ওর জাঁকজমকের নগণ্যতা এবং অস্থায়িত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং অপরপক্ষে আখিরাতের নিয়ামতরাজির স্থায়িত্ব ও উৎকৃষ্টতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেনঃ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ "তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা তা বাকী থাকবে।" (১৬ ঃ ৯৬) আরো বলেনঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট যা রয়েছে সৎলোকদের জন্যে তা অতি উত্তম।" (৩ ঃ ১৯৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ - وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ "পার্থিব জীবন (অস্থায়ী) ভোগ-বিলাস ছাড়া কিছুই নয়।" (৫৭ ঃ ২০) অন্যত্র বলেনঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।" (৮৭ ঃ ১৬-১৭)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এমনই যেমন কেউ সমুদ্রের পানিতে তার অঙ্গুলী ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর তা উঠিয়ে নিলে দেখতে পায় যে, তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যতটুকু পানি উঠেছে তা সমুদ্রের পানির তুলনায় কতটুকু।" তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ যারা আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে তারা কি মোটেই জ্ঞান রাখে না?

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাই বলেনঃ যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে সে কি কখনো ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে (ও খুঁটিনাটিভাবে হিসাব নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে)?

বর্ণিত আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং অভিশপ্ত আবূ জেহেলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একটি উক্তি এও আছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হযরত হামযা (রাঃ) ও আবূ জেহেলের ব্যাপারে। এটা প্রকাশমান যে, আয়াতটি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, জান্নাতী মুমিন জান্নাত হতে ঝুঁকে দেখবে এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পেয়ে বলবেঃ

وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।" (৩৭ ঃ ৫৭) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকে অবশ্যই হাযির করা হবে।" (৩৭ ঃ ১৫৮)

৬২। আর সেই দিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?

٦٢- وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৬৩। যাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেও আমরা

٦٣- قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ

أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ○

বিভ্রান্ত করেছিলাম, এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদত করতো না।

٦٤- وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ○

৬৪। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে; হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো!

٦٥- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ○

৬৫। আর সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে?

٦٦- فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ○

৬৬। সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

٦٧- فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ○

৬৭। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল সে তো সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুশ্‌রিকদেরকে ডেকে সামনে দাঁড় করাবেন এবং বলবেনঃ “আমি ছাড়া যেসব প্রতিমা ও পাথরের তোমরা পূজা করতে সেগুলো আজ কোথায়? তাদেরকে আজ ডাকো এবং দেখো যে, তারা তোমাদের

কোন সাহায্য করতে বা তাদের নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে কি না?" এ কথা তাদেরকে শুধু ধমক হিসেবেই বলা হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই তোমরা আমার কাছে এককভাবে এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম সেগুলোর সবই তোমরা পিছনে ছেড়ে এসেছো। আজ তো আমি তোমাদের সাথে কোন সুপারিশকারীকে দেখছি না যাদেরকে তোমরা আল্লাহর অংশীদার মনে করতে? তাদের সাথে আজ তোমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, তোমরা যা ধারণা করতে তার সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারা আজ সবাই তোমাদের থেকে দূরে সরে পড়েছে।" (৬ ঃ ৯৪)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ যাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে অর্থাৎ শয়তান, উদ্ধত এবং শির্‌ক্ ও কুফরীর দিকে আহ্বানকারীরা সেদিন বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম এবং তারা আমাদের কুফরীপূর্ণ কথা শুনেছিল ও মেনে নিয়েছিল। আমরা নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট এবং তাদেরকেও করেছিলাম পথভ্রষ্ট। আজ আমরা আপনার সামনে তাদের ইবাদতের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।" যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ـ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ـ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদ গ্রহণ করে এই জন্যে যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (১৯ ঃ ৮১-৮২) আল্লাহ তা'আলা আর এক আয়াতে বলেনঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِهِمْ غٰفِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহ্বান করে যারা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং তারা তাদের ডাক হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন?" (৪৬ ঃ ৫) তিনি আরো বলেনঃ

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "(কিয়ামতের দিন) যখন লোকেরা একত্রিত হবে তখন তারা (উপাস্যরা) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে।" (৪৬ ঃ ৬)

হযরত (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ "তোমরা যে প্রতিমাগুলোর উপাসনা করছো তাদের সাথে তোমাদের শুধু দুনিয়াতেই বন্ধুত্ব থাকছে, কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের প্রতি লা'নত বর্ষণ করবে।" মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেনঃ "যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের থেকে নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত বলে ঘোষণা করবে এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে.... তারা (জাহান্নামের) আগুন হতে বের হতে পারবে না।" তাদেরকে বলা হবেঃ "দুনিয়ায় যাদের তোমরা পূজা-অর্চনা করতে এখন তাদেরকে ডাকছো না কেন?" তখন তারা ডাকতে শুরু করবে, কিন্তু কোন জবাব তারা পাবে না। তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে যেতেই হবে। ঐ সময় তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করতো! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا - وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا -

অর্থাৎ "আর সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেবো এক ধ্বংস গহ্বর। অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা তথায় পতিত হচ্ছে এবং তারা ওটা হতে কোন পরিত্রাণস্থল পাবে না।" (১৮ ঃ ৫২-৫৩)

এই কিয়ামতের দিনেই তাদের সবকে শুনিয়ে একটা প্রশ্ন এও করা হবেঃ "তোমরা নবীদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে এবং তাদেরকে কতদূর সাহায্য সহযোগিতা করেছিলে?" প্রথমে তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিচার-বিশ্লেষণের আলোচনা ছিল। এখন রিসালাত সম্পর্কে সওয়াল-জবাবের আলোচনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে কবরেও প্রশ্ন হয়ঃ "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী কে? এবং তোমার দ্বীন কি?" মুমিন উত্তর দেয়ঃ "আমার প্রতিপালক ও মা'বূদ আল্লাহ, আমার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন এবং আমার দ্বীন হলো ইসলাম।" তবে কাফির কোন উত্তর দিতে পারে না। ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে বলেঃ "আমি এসব জানি না।" সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

অর্থাৎ "যে এই দুনিয়ায় অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ এবং সে চরম পথভ্রষ্ট।" (১৭ ঃ ৭২) সমস্ত দলীল প্রমাণ তার দৃষ্টি হতে সরে যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যাবে। বংশ তালিকার কোন প্রশ্ন করা হবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে অবশ্যই সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে عَسٰى শব্দটি يَقِيْنٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন অবশ্যই কৃতকার্য ও সফলকাম হবে।

৬৮। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন হাত নেই, আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।

٦٨- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৯। আর তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন আছে এবং তারা যা ব্যক্ত করে।

٦٩- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৭০। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত আধিপত্য তাঁরই। না তাঁর সাথে কেউ বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে, না কেউ তাঁর শরীক হতে পারে। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করে থাকেন এবং যাকে চান নিজের বিশিষ্ট বান্দা বানিয়ে নেন। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। ভাল ও মন্দ সবই তাঁরই হাতে। সবকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারো কোন অধিকার নেই। خِيَرَةٌ শব্দের অর্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" (৩৩ ঃ ৩৬)

সঠিক দু'টি উক্তিতেই مَا শব্দটি نَفِى বা নেতিবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইবনে জারীর (রঃ) বলেছেন যে, এখানে مَا ব্যবহৃত হয়েছে اَلَّذِىْ অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ ওটাই পছন্দ করেন যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এখানে مَا ব্যবহৃত হয়েছে نَفِى অর্থে। যেমন এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতটি এই বর্ণনাতেই রয়েছে যে, মাখলূককে সৃষ্টি করা, তকদীর নির্ধারণ করা ইত্যাদি সবকিছুর অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি অতুলনীয়। এজন্যেই এ আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে এবং তারা যা প্রকাশ করে। হে মানুষ! তোমরা যা গোপন কর বা প্রকাশ কর, সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশমান, তিনি সবই জানেন। দিবসে ও রজনীতে যা কিছু ঘটছে, কিছুই তাঁর কাছে গোপন

থাকে না। মা'বূদ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি একক। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই, তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর হুকুম কেউই রদ করতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। এমন কেউ নেই যে তাঁর ইচ্ছা থেকে তাঁকে ফিরাতে পারে। হিকমত ও রহমত তাঁরই পবিত্র সত্তায় রয়েছে। কিয়ামতের দিন তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। তিনি তোমাদের সকলকেই তোমাদের আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। তাঁর কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন নেই। তিনি সেই দিন সৎ লোকদেরকে পুরস্কার ও অসৎ লোকদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে পূর্ণ ফায়সালা করে দিবেন।

٧١- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۭ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৭১। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

٧٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ
اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৭২। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদের জন্যে রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?

٨٣- وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ○

৭৩। তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্যে করেছেন রজনী ও দিবস, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা একটু চিন্তা করে দেখো তো, তিনি তোমাদের কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই বরাবরই দিবস ও রজনীকে আনয়ন করতে রয়েছেন। যদি শুধু রাত্রিই থেকে যায় তবে তোমরা কঠিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে, তোমাদের কাজ-কর্ম হয়ে যাবে বন্ধ এবং তোমাদের জীবন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় তোমরা এমন কাউকেও পাবে কি, যে তোমাদের জন্যে দিন আনয়ন করতে পারে? যার ফলে তোমরা আলোকের মধ্যে চলতে পার? অতঃপর নিজেদের কাজ-কর্মে লেগে যেতে পার? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর কথায় মোটেই কর্ণপাত কর না। অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যদি শুধু দিনই রেখে দেন তাহলেও তোমাদের জীবন তিক্ত ও দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা হয়ে পড়বে ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিশ্রামের কোন সুযোগ তোমরা পাবে না। এমতাবস্থায় এমন কেউ আছে কি, যে তোমাদেরকে রাত্রি এনে দিতে পারে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? কিন্তু তোমাদের চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর দয়াপূর্ণ কাজগুলো দেখে কিছুই চিন্তা ভাবনা কর না, এটা বড়ই দুঃখপূর্ণ ব্যাপারই বটে।

এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই মেহেরবানী যে, তিনি তোমাদের জন্যে দিবস ও রজনী দু'টোরই ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে কাজ-কর্মে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতে পার। আর যিনি তোমাদের প্রকৃত মালিক, যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৪। সেই দিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেনঃ তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়?

٧٤- وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ○

৭৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনবো এবং বলবোঃ তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা জানতে পারবে,

٧٥- وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا

أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ ع

মা'বূদ হবার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা উদ্ভাবন করতো তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

মুশরিকদেরকে দ্বিতীয়বার ধমক দিয়ে বলা হবেঃ দুনিয়ায় যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে গণ্য করতে তারা আজ কোথায়? প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হতে একজন সাক্ষী অর্থাৎ ঐ উম্মতের পয়গম্বর মনোনীত করা হবে এবং মুশ্‌রিকদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের শির্‌কের কোন দলীল তোমরা পেশ কর এবং ঐ সময় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যাবে যে, প্রকৃতপক্ষেই ইবাদতের যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়। সুতরাং তারা কোন জবাব দিতে পারবে না। তাই তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়বে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার উপর যা কিছু মিথ্যা আরোপ করেছিল সবই ভুলে যাবে।

٧٦- إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ○

৭৬। কারূন ছিল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিলঃ দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না।

٧٧- وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

৭৭। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি

اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○	অনুগ্রহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কারূন ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর চাচাতো ভাই। ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, তার নসবনামা (বংশ তালিকা) হলোঃ কারূন ইবনে ইয়াসহাব ইবনে কাহিস। ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর মতে কারূন ছিল হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর চাচা। কিন্তু অধিকাংশ আলেম তাকে তাঁর চাচাতো ভাই বলে থাকেন। কারূনের গলার স্বর ছিল খুবই সুমিষ্ট। সুমিষ্ট সুরে তাওরাত পাঠ করতো। কিন্তু সামেরী যেমন মুনাফিক ছিল, অনুরূপভাবে আল্লাহর এই শত্রুও মুনাফিক হয়ে গিয়েছিল। সে বড় সম্পদশালী ছিল বলে সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়েছিল এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তার কওমের মধ্যে সাধারণভাবে যে পোশাক প্রচলিত ছিল, সে ওর চেয়ে অর্ধহাত নীচু করে বানিয়েছিল, যাতে তার গর্ব ও ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়। তার এতো বেশী ধন-সম্পদ ছিল যে, তার কোষাগারের চাবিগুলো উঠাবার জন্যে শক্তিশালী লোকদের একটি দল নিযুক্ত ছিল। তার অনেকগুলো কোষাগার ছিল এবং প্রত্যেক কোষাগারের চাবি ছিল পৃথক পৃথক, যা ছিল অর্ধহাত করে লম্বা। যখন ঐ চাবিগুলো তার সওয়ারীর সাথে খচ্চরগুলোর উপর বোঝাই করা হতো তখন এর জন্যে কপাল ও চারটি পা সাদা চিহ্নযুক্ত ষাটটি খচ্চর নির্ধারিত থাকতো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তার কওমের সম্মানিত, সৎ ও আলেম লোকেরা যখন তার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছতে দেখলেন তখন তাঁরা তাকে উপদেশ দিলেনঃ "এতো দাম্ভিকতা প্রকাশ করো না, আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ো না, অন্যথায় তুমি তাঁর কোপানলে পতিত হবে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না।" উপদেশদাতাগণ তাকে আরো বলতেনঃ "আল্লাহর দেয়া নিয়ামত যে তোমার নিকট রয়েছে তদ্দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে ওগুলো হতে কিছু কিছু খরচ কর যাতে তুমি আখিরাতের অংশও লাভ করতে পার। আমরা একথা বলছি না যে, দুনিয়ায় তুমি সুখ ভোগ মোটেই করবে না। বরং আমরা বলি যে, তুমি দুনিয়াতেও ভাল খাও, ভাল পান কর, ভাল পোশাক পরিধান কর, বৈধ নিয়ামত

দ্বারা উপকৃত হও এবং ভাল বিবাহ দ্বারা যৌন ক্ষুধা নিবারণ কর। কিন্তু নিজের চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে তুমি আল্লাহ্র হক ভুলে যেয়ো না। তিনি যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি অনুগ্রহ করো। জেনে রেখো যে, তোমার সম্পদে দরিদ্রদেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারের হক তুমি আদায় করতে থাকো। আর তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। মানুষকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকো এবং জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহর মাখলূককে কষ্ট দেয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।”

٧٨- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○

৭৮। সে বললোঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতো না যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

কওমের আলেমদের উপদেশবাণী শুনে কারূন যে জবাব দিয়েছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে বলেছিলঃ “তোমাদের উপদেশ তোমরা রেখে দাও। আমি খুব ভাল জানি যে, আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন আমি তার যথাযোগ্য হকদার। আর আল্লাহ্ এটা জানেন বলেই আমাকে এই সব দান করেছেন।” যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ

فَإِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ -

অর্থাৎ “যখন মানুষকে কোন কষ্ট পৌঁছে তখন বড়ই বিনয়ের সাথে আমাকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আমি কোন নিয়ামত ও শান্তি তাকে প্রদান করি তখন সে বলে ফেলেঃ এটা আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি।” (৩৯ ঃ ৪৯) তিনি আরো বলেনঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ

অর্থাৎ "কষ্ট ও বিপদের পর যদি আমি তাকে আমার করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে অবশ্যই বলে ওঠে– এটা আমার জন্যেই অর্থাৎ আমি এর হকদার ছিলাম।" (৪১ ঃ ৫০)

কেউ কেউ বলেন যে, কারূন কিমিয়া শাস্ত্রবিদ ছিল।[১] কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কিমিয়ার জ্ঞান আসলে কারো নেই। কেননা, কোন জিনিসের মূলকে বদলিয়ে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এর ক্ষমতা আর কেউই রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

অর্থাৎ "হে লোক সকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা তার জন্যে একত্রিত হয়।" (২২ ঃ ৭৩)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার চেষ্টা করে? তাহলে সে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু বা একটি জব সৃষ্টি করুক তো দেখি?" এই হাদীসটি ঐ লোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য যারা ফটো বা ছবি উঠায় এবং শুধু বাহ্যিক আকৃতি নকল করে থাকে। এরপরেও যে ব্যক্তি দাবী করে যে, সে কিমিয়ার জ্ঞান রাখে, একটি জিনিসকে অপর জিনিসে রূপান্তরিত করতে পারে, যেমন লোহাকে সোনায় পরিণত করা ইত্যাদি, সে মিথ্যাবাদী ছাড়া কিছুই নয়। তবে রঙ ইত্যাদিকে বদলিয়ে দিয়ে ধোঁকাবাজী করা অন্য কথা। কিন্তু প্রকৃতভাবে এটা অসম্ভব। যারা এই কিমিয়ার দাবী করে তারা শুধু মিথ্যাবাদী, অজ্ঞ, ফাসেক ও অপবাদদাতা। এরূপ দাবী করে তারা শুধু মানুষকে প্রতারিত করে থাকে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ তা'আলার কোন কোন ওলী হতে যে কোন কোন কারামত প্রকাশ পায় এবং কোন কোন জিনিস পরিবর্তিত হয়ে থাকে আমরা তা অস্বীকার করি না। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ। এটা তাঁদের নিজেদের কোন ক্ষমতার কাজ নয়। এটা আল্লাহর হুকুমের ফল ছাড়া কিছুই নয়। এটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের মাধ্যমে স্বীয় মাখলূককে প্রদর্শন করে থাকেন।

১. যে লোহা, পিতল ইত্যাদিকে স্বর্ণে পরিণত করার কৌশল জানে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হায়ওয়াহ্ ইবনে শুরাইহ মিসরী (রঃ)-এর নিকট একদা একজন ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চায়। ঘটনাক্রমে ঐ সময় তাঁর কাছে দেয়ার মত কিছুই ছিল না। তার দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হন। তিনি মাটি হতে একটি কংকর উঠিয়ে নেন এবং হাতে নাড়াচাড়া করে ঐ ভিক্ষুকের ঝুলিতে ফেলে দেন। সাথে সাথে ঐ কংকরটি লাল স্বর্ণে পরিণত হয়। হাদীস ও আসারে মু'জিযা ও কারামাতের আরো বহু ঘটনা রয়েছে, এখানে ওগুলো বর্ণনা করলে এ কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় বর্ণনা করা সম্ভব হলো না।

কারো কারো উক্তি এই যে, কারূন ইসমে আযম জানতো, যা পাঠ করে সে দু'আ করেছিল। ফলে সে এতো বড় ধনী হয়েছিল।

কারূনের এ উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ কারূনের এটা ভুল কথা। আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি সদয় হন তাকেই তিনি সম্পদশালী করে থাকেন এটা মোটেই ঠিক নয়। তার পূর্বে তিনি তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, মানুষের সম্পদশালী হওয়া তার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন নয়। যে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং কুফরীর উপর অটল থাকে তার পরিণাম মন্দ হয়ে থাকে। পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোন প্রয়োজন হবে না। তার আমলনামাই তার হিসাব গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট হবে। কারূনের ধারণা ছিল যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও সততা রয়েছে বলেই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য। তার মতে তাকে আল্লাহ তা'আলা ভাল না বাসলে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলে তাকে এ নিয়ামত প্রদান করতেন না।

٧٩- فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○

৭৯। কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললোঃ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান।

৮০। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বললোঃ ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না।

٨٠- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ○

একদা কারূন অতি মূল্যবান পোশাক পরিহিত হয়ে, অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে উত্তম সওয়ারীতে আরোহণ করে, স্বীয় গোলামদের মূল্যবান পোশাক পরিয়ে সামনে ও পিছনে নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে বের হলো। তার এই জাঁকজমক ও শান-শওকত দেখে দুনিয়াদারদের মুখ পানিতে ভরে গেল এবং তারা বলতে লাগলোঃ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। আলেমরা তাদের মুখে একথা শুনে তাদেরকে এই ধারণা হতে বিরত রাখতে চাইলেন এবং বুঝাতে লাগলেনঃ "দেখো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ ও মুমিন বান্দাদের জন্যে নিজের কাছে যা কিছু তৈরী করে রেখেছেন তা এর চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীলগণ ছাড়া কেউ এটা লাভ করতে পারে না।" ভাবার্থ এটাও যে, এরূপ পবিত্র কথা ধৈর্যশীলদের মুখ দিয়েই বের হয়। যারা দুনিয়ার আকর্ষণ হতে দূরে থাকে এবং পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় খুব সম্ভব এই কথা ঐ আলেমদের নয়, বরং তাঁদের প্রশংসায় এই পরবর্তী কথা আল্লাহর পক্ষ হতেই এসে থাকবে।

৮১। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

٨١- فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ○

٨٢- وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ ع

৮২। পূর্বদিন যারা তার মত হবার কামনা করেছিল তারা বলতে লাগলো! দেখলে তো, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না।

উপরে কারূনের ঔদ্ধত্য ও বে-ঈমানীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে তার পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

হযরত সালিম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "একটি লোক তার লুঙ্গী লটকিয়ে গর্বভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে।"[১]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের পূর্বে একটি লোক দু'টি সবুজ চাদরে নিজেকে আবৃত করে দম্ভভরে চলছিল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দিলেনঃ 'তাকে গিলে ফেল'।"[২]

হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির (রঃ) তাঁর কিতাবুল আজায়েবে বর্ণনা করেছেন যে, নওফল ইবনে মাসাহিক (রঃ) বলেন, নাজরানের মসজিদে আমি এক যুবককে দেখতে পাই। আমি তার দিকে চেয়ে থাকি এবং তার দেহের দৈর্ঘ্য, পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেঃ "আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন?" আমি উত্তরে বলিঃ তোমার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। সে তখন বলেঃ "স্বয়ং আল্লাহও আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন।" তার মুখের কথা মুখেই আছে, হঠাৎ সে ছোট হতে শুরু করে এবং ছোট ও খাটো হতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত সে কনিষ্ঠাঙ্গুলী বরাবর হয়ে যায়। তখন তার একজন আত্মীয় তাকে ধরে তার জামার আস্তীনে ভরে নিয়ে চলে যায়।"

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ রিওয়াইয়াতটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর বদ দু'আর কারণেই কারূন ধ্বংস হয়েছিল। তার ধ্বংসের কারণের ব্যাপারে বহু মতভেদ রয়েছে।

একটি কারণ এরূপ বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত কারূন এক ব্যভিচারিণী নারীকে বহু মালধন দিয়ে এই কাজে উত্তেজিত করে যে, যখন মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের জামাআতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কিতাব পাঠ করতে শুরু করবেন ঠিক ঐ সময়ে যেন সে জনসম্মুখে বলেঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছো।" কারূনের এই কথামত ঐ স্ত্রীলোকটি তা-ই করে অর্থাৎ কারূনের শিখানো কথাই বলে। তার একথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) কেঁপে উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ দু'রাকআত নামায আদায় করে ঐ স্ত্রীলোকটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেনঃ "আমি তোমাকে ঐ আল্লাহর কসম দিচ্ছি যিনি সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, তোমার কওমকে ফিরাউনের অত্যাচার হতে রক্ষা করেছেন এবং আরো বহু অনুগ্রহ করেছেন, সত্য ঘটনা যা কিছু রয়েছে সবই তুমি খুলে বল।" স্ত্রীলোকটি তখন বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি যখন আমাকে আল্লাহর কসমই দিলেন তখন আমি সত্য কথাই বলছি। কারূন আমাকে বহু টাকা-পয়সা দিয়েছে এই শর্তে যে, আমি যেন বলি আপনি আমার সাথে এরূপ এরূপ কাজ করেছেন। আমি আপনাকে তা-ই বলেছি। এজন্যে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।" তার এ কথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় সিজদায় পড়ে যান এবং কারূনের শাস্তি প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নিকট অহী আসেঃ "আমি যমীনকে তোমার বাধ্য করে দিলাম।" হযরত মূসা (আঃ) তখন সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে যীমনকে বলেনঃ "তুমি কারূন ও তার প্রাসাদ'কে গিলে ফেল।" যমীন তা-ই করে।[১]

দ্বিতীয় কারণ এই বলা হয়েছে যে, একদা কারূনের সওয়ারী অতি জাঁকজমকের সাথে চলতে শুরু করে। সে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক পরিহিত হয়ে একটি অতি মূল্যবান সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে চলছিল। তার সাথে তার গোলামগুলোও ছিল, যারা সবাই রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল। এইভাবে সে চলতেছিল। আর ওদিকে হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। যখন কারূন তার দলবলসহ ঐ জনসমাবেশের পার্শ্ব দিয়ে গমন

১. কারূনের ধ্বংসের এ কারণটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করে তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে কারূন! আজ এমন শান-শওকতের সাথে গমনের কারণ কি?" সে উত্তরে বলেঃ "ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে একটি ফযীলত দান করেছেন এবং আমাকেও তিনি একটি ফযীলত দান করেছেন। যদি তিনি তোমাকে নবুওয়াত দান করে থাকেন তবে আমাকে তিনি দান করেছেন ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা। যদি আমার মর্যাদা সম্পর্কে তুমি সন্দেহ পোষণ করে থাকো তবে আমি প্রস্তুত আছি যে, চল, আমরা দু'জন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, দেখা যাক আল্লাহ্ কার দু'আ কবূল করেন?" হযরত মূসা (আঃ) কারূনের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি তাকে বলেনঃ "হে কারূন! আমি প্রথমে প্রার্থনা করবো, না তুমি প্রথমে করবে?" সে জবাবে বলেঃ "আমিই প্রথমে দু'আ করবো।" একথা বলে সে দু'আ করতে শুরু করে এবং শেষও করে দেয়। কিন্তু তার দু'আ কবূল হলো না। হযরত মূসা (আঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তাহলে আমি এখন দু'আ করি?" সে উত্তরে বলেঃ "হ্যাঁ, কর।" অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি যমীনকে নির্দেশ দিন যে, আমি তাকে যে হুকুম করবো তাই যেন সে পালন করে।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং তাঁর নিকট অহী অবতীর্ণ করেনঃ "হে মূসা (আঃ)! যমীনকে আমি তোমার হুকুম পালনের নির্দেশ দিলাম।" হযরত মূসা (আঃ) তখন যমীনকে বললেনঃ "হে যমীন! তুমি কারূন ও তার লোকদেরকে ধরে ফেল।" তাঁর একথা বলা মাত্রই তাদের পাগুলো যমীনে প্রোথিত হয়। তিনি আবার বলেনঃ "আরো ধরো।" তখন তাদের হাঁটু পর্যন্ত প্রোথিত হয়ে যায়। পুনরায় তিনি বলেনঃ "আরো পাকড়াও কর।" ফলে তাদের কাঁধ পর্যন্ত প্রোথিত হয়। তারপর তিনি যমীনকে বলেনঃ "তার মাল ও তার কোষাগারও পুঁতে ফেলো।" তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার ও সম্পদ এসে গেল। কারূন সবগুলোই স্বচক্ষে দেখে নিলো। অতঃপর তিনি যমীনকে ইঙ্গিত করলেনঃ "এগুলোসহ তাদেরকে তোমার ভিতরে করে নাও।" সাথে সাথে কারূন তার দলবল, প্রাসাদ, ধন-দৌলত এবং কোষাগারসহ যমীনে প্রোথিত হয়ে গেল। এভাবে তার ধ্বংস সাধিত হলো। যমীন যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, সপ্ত যমীন পর্যন্ত তারা প্রোথিত হয়। একটি বর্ণনা এও আছে যে, প্রত্যহ তারা এক মানুষ বরাবর নীচের দিকে প্রোথিত হতে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই শাস্তির মধ্যেই থাকবে। এখানে বানী ইসরাঈলের

আরো বহু রিওয়াইয়াত রয়েছে। কিন্তু আমরা ওগুলো ছেড়ে দিলাম। কারূনের স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। সে ধ্বংস হয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তার মূলোৎপাটন করা হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ পূর্বদিন যারা তার মত হবার কামনা করেছিল তারা তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বলতে লাগলোঃ আমরা ভুল বুঝেছিলাম। সত্যি ধন-দৌলত আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়। এটা তো আল্লাহর হিকমত বা নৈপুণ্য, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। তাঁর হিকমত তিনিই জানেন। যেমন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চরিত্রকে ঐভাবে বন্টন করেছেন, যেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে রিযক বন্টন করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তাকেও দুনিয়া (অর্থাৎ ধন-দৌলত) দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও দান করেন। আর দ্বীন একমাত্র ঐ ব্যক্তিকে দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন।"

কারূনের মত হওয়ার বাসনাকারীরা আরো বললোঃ যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরও তিনি ভূ-গর্ভে প্রোথিত করতেন। সত্যি, কাফিররা কখনো সফলকাম হয় না। না তারা দুনিয়ায় কৃতকার্য হয়, না আখিরাতে তারা পরিত্রাণ পাবে।

وَيْكَأَنَّ -এর অর্থ নিয়ে আরবী ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা وَيْلَكَ اعْلَمْ أَنَّ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এটাকে مُخَفَّف বা হালকা করে وَيْكَ রয়ে গেছে এবং أَنَّ -এর যবরটি اِعْلَمْ শব্দ مَحْذُوْف বা উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু এই উক্তিটিকে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) দুর্বল বলেছেন। কিন্তু আমি বলি যে, এটাকে দুর্বল বলা ঠিক নয়। কুরআন কারীমে এর লিখন এক সাথে হওয়া ওর দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে না। কেননা, كِتَابَت বা লিখনের পদ্ধতি তো পারিভাষিক আদেশ। যা প্রচলিত হয় তাই ধর্তব্য হয়ে থাকে। এর দ্বারা অর্থের উপর কোন ক্রিয়া হয় না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অন্য উক্তি এই যে, এটা أَلَمْ تَرَ أَنَّ -এর অর্থে ব্যবহৃত। আর একটি বর্ণনা এও আছে যে, এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে অর্থাৎ وَيْ এবং كَأَنَّ , وَيْ শব্দটি বিস্ময়

প্রকাশের জন্যে অথবা সতর্কতা প্রকাশের জন্যে। আর كَاَنَّ শব্দটি اَظُنُّ (আমি ধারণা করি)-এর অর্থে ব্যবহৃত। এসব উক্তির মধ্যে সবল উক্তি হলো এটাই যে, اَلَم تَرَ-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তুমি কি দেখনি? যেমন এটা হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি। আরবী কবিতাতেও এই অর্থই নেয়া হয়েছে।

৮৩- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৮৩। এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্যে যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে।

৮٤- مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৪। যে কেউ সৎকর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে, আর যে মন্দ কর্ম করে সে তো শাস্তি পাবে শুধু তার কর্ম অনুপাতে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাত ও আখিরাতের নিয়ামত শুধু তারাই লাভ করবে যাদের অন্তর সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং যারা পার্থিব জীবন বিনয়, নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের সাথে অতিবাহিত করে এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও উচ্চ মনে করে না। যারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে না। যারা কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে না এবং পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে না।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার জুতার চামড়া তার সঙ্গীর জুতার চামড়া অপেক্ষা ভালো হোক সে-ই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে গর্ব ও অহংকার করবে। আর যদি উদ্দেশ্য শুধু সৌন্দর্য প্রকাশ হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো এতে সন্তুষ্ট থাকি যে, আমার চাদর ভাল হোক, আমার জুতা সুন্দর

হোক, এটাও কি অহংকার হিসেবে গণ্য হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "না, না। এটা তো সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করে থাকেন।"

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যে কেউ সৎ কর্ম করে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। পক্ষান্তরে যে মন্দ কর্ম করে সে শাস্তি পাবে শুধু তার কর্ম অনুপাতে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ

অর্থাৎ "যে মন্দ কাজ করবে তাকে উল্টোমুখে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।" (২৭ ঃ ৯০) এরপরে বলেনঃ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ "তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা আমল করতে।" (২৭ঃ ৯০) আর এটা হলো অতিরিক্ত প্রদান ও ন্যায় বিচারের স্থান।

٨٥- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৮৫। যিনি তোমার জন্যে কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। বলঃ আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৮৬। তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সহায় হয়ো না।

٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى

৮৭। তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে।

رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৮। তুমি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহর তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি তোমার রিসালাতের তাবলীগ করতে থাকো, মানুষকে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে যাও, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কিয়ামতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতঃপর সেখানে তোমাকে নবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থাৎ "অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করবো যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং অবশ্যই আমি প্রশ্ন করবো রাসূলদেরকে।" (৭ঃ ৬) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ

অর্থাৎ "ঐদিন রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমাদেরকে কি জবাব দেয়া হয়েছিল?" (৫ ঃ ১০৯) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَجِايْءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ অর্থাৎ "আনয়ন করা হবে নবীগণকে এবং সাক্ষীদেরকে।"

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, مَعَاد দ্বারা জান্নাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার মৃত্যুও হতে পারে এবং পুনরুত্থানও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, مَعَاد দ্বারা মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, مَعَاد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্মভূমি ছিল।

যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে বের হন এবং জুহ্ফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন মক্কার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগে ওঠে, ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁর সাথে ওয়াদা করা হয় যে, তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। এর দ্বারা এটাও বের হচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত। অথচ পুরো সূরাটি মক্কী। এও বলা হয়েছে যে, مَعَاد দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যিনি এই মত পোষণ করেছেন, সম্ভবতঃ কিয়ামতই তাঁর উদ্দেশ্য। কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাসই হাশরের ময়দান হবে। এই সমুদয় উক্তিকে একত্রিত করার উপায় এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কখনো তাফসীর করেছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কায় ফিরে যাওয়ার দ্বারা, যা মক্কা বিজয় দ্বারা পূর্ণ হয়। আর এটা রাসূলল্লাহ (সঃ)-এর বয়স পূর্ণ হয়ে যাওয়ার একটি বড় নিদর্শন ছিল। যেমন তিনি সূরায়ে اِذَاجَآءَ-এর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। হযরত উমারও (রাঃ) তাঁর অনুকূলেই মত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ “এব্যাপারে আপনি যা জানেন, আমিও তাই জানি।” এটা একই কারণ যে, তাঁর থেকেই এই আয়াত দ্বারা যেখানে ‘মক্কা’ বর্ণিত আছে সেখানেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ‘ইন্তেকাল’ও বর্ণিত আছে। আবার তিনি কখনো ‘জান্নাত’ তাফসীর করেছেন, যেটা তাঁর আবাসস্থল এবং তাঁর তাবলীগে রিসালাতের প্রতিদান যে, তিনি দানব ও মানবকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছেন। আর তিনি ছিলেন সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাকপটু ও উত্তম।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তোমার বিরুদ্ধাচারীদেরকে ও তোমাকে অবিশ্বাসকারীদেরকে বলে দাও– কে সৎ পথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তা আমার প্রতিপালক খুব ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আর একটি বড় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আশা করেননি যে, তাঁর উপর আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং কাফিরদের সহায়ক হওয়া তাঁর জন্যে মোটেই সমীচীন নয়। তাদের থেকে পৃথক থাকাই তাঁর উচিত। তাঁর এই ঘোষণা দেয়া উচিত যে, তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণকারী।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই কাফিররা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো থেকে বিমুখ না করে। অর্থাৎ এই লোকগুলো যে তোমার ও দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং তোমার অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে এতে তুমি যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তোমার কাজ থেকে বিরত না হও। বরং তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহ তোমার কালেমাকে পুরোকারী, তোমার দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতাকারী, তোমার রিসালাতকে জয়যুক্তকারী এবং তোমার দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর বুলন্দকারী। সুতরাং তুমি জনগণকে তোমার প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকো, যিনি এক ও শরীকবিহীন। তোমার জন্যে এটা উচিত নয় যে, তুমি কাফিরদের সহায়তা করবে। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও আহ্বান করো না। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। উলুহিয়্যাতের যোগ্য একমাত্র তাঁরই বিরাট সত্তা। তিনিই চিরস্থায়ী ও সদা বিরাজমান। সমস্ত সৃষ্টজীব মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ -

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে যত কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।" (৫৫ঃ ২৬-২৭) وَجْهُ দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কবি লাবীদ একটি চরম সত্য কথা বলেছে। সে বলেছেঃ

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ -

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল বা অসার।" মুজাহিদ (রঃ) এবং সাওরী (রঃ) বলেন যে, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ -এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ সবকিছুই ধ্বংসশীল, কিন্তু শুধু ঐ কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। কবিদের কবিতাতেও وَجْه শব্দটি এই ভাবার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোন কবি বলেনঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَنْبًا لَّسْتُ مُحْصِيَهٗ * رَبُّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

অর্থাৎ "যে আল্লাহ সমস্ত বান্দার প্রতিপালক, যাঁর দিকে মনোযোগ ও বাসনা, যাঁর জন্যে আমল, তাঁর নিকট আমি আমার এমন পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারবো না।" এই উক্তি পূর্বের উক্তির

বিপরীত নয়। এটাও নিজের জায়গায় ঠিক আছে যে, মানুষের সব কাজই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, শুধুমাত্র ঐ কাজের পুণ্য সে লাভ করবে যা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে করেছে। আর প্রথম উক্তিটির ভাবার্থও সম্পূর্ণরূপে সঠিক যে, সমস্ত প্রাণী ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাবে, শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে যা ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া থেকে বহু উর্ধ্বে। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। সবকিছুর পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং সবকিছুর পরেও তিনি থাকবেন।

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) নিজের অন্তরকে দৃঢ় করতে চাইতেন তখন তিনি জঙ্গলে চলে যেতেন এবং কোন ভগ্নাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যথিত সুরে বলতেনঃ "তোমার পরিবারবর্গ কোথায়?" অতঃপর স্বয়ং এর উত্তরে তিনি كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ -এই আয়াতটিই পাঠ করতেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেককেই পুণ্য ও পাপের প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দিবেন।

সূরা ঃ কাসাস এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আনকাবূত, মাক্কী

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৬৯, রুকূ' ঃ ৭)

(اٰيَاتُهَا : ٦٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ-লাম-মীম।

١- الٓمّٓ ○

২। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?

٢- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○

৩। আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।

٣- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

৪। যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

٤- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

হুরূফে মুকাত্তাআতের আলোচনা সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ মুমিনদেরকেও পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে– এটা অসম্ভব।

সহীহ হাদীসে এসেছেঃ "সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় মুমিনদের উপর, তারপর সৎ লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর, এরপর তাদের চেয়েও নিম্ন মর্যাদার লোকদের উপর। পরীক্ষা তাদের দ্বীনের অনুপাতে হয়ে থাকে। যদি সে তার দ্বীনের উপর দৃঢ় হয় তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয় এবং বিপদ-আপদ তার উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না?" (৩ঃ ১৪২) অনুরূপ আয়াত সূরায়ে বারাআতেও রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ সূরায়ে বাকারায় বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠেছিল– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" (২ ঃ ২১৪) এই জন্যেই এখানেও বলেনঃ আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। এর দ্বারা এটা মনে করা চলবে না যে, আল্লাহ এটা জানতেন না। বরং যা হয়ে গেছে এবং যা হবে সবই তিনি জানেন। এর উপর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত ইমাম একমত। এখানে عِلْم অর্থ رُؤْيَتْ বা দেখার অর্থে ব্যবহৃত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) لِنَعْلَمَ-এর অর্থ لِنَرٰى করেছেন। কেননা, দেখার সম্পর্ক বিদ্যমান জিনিসের সাথে হয়ে থাকে এবং عِلْم এর থেকে عَام বা সাধারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! অর্থাৎ যারা ঈমান আনয়ন করেনি তারাও যেন এ ধারণা না করে যে, তারা পরীক্ষা হতে বেঁচে যাবে। তাদের জন্যে বড় বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। তারা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবে না। তাদের ধারণা খুবই মন্দ, যার ফল তারা সত্বরই জানতে পারবে।

٥- مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৫। যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহর নির্ধারিতকাল আসবেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٦- وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬। যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যেই সাধনা করে; আল্লাহ তো বিশ্বজগত হতে অমুখাপেক্ষী।

٧- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৭। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দিবো এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করবো।

যাদের আখিরাতে বিনিময় লাভের আশা রয়েছে এবং ওটাকে সামনে রেখে তারা পুণ্যের কাজ করে থাকে তাদের আশা পূর্ণ হবে। তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে যা কখনো শেষ হবার নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা শ্রবণকারী। তিনি জগতসমূহের সব খবরই রাখেন। তাঁর নির্ধারিত সময় টলবার নয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ ভাল আমল করে সে নিজের লাভের জন্যেই তা করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলের মুখাপেক্ষী নন। যদি সমস্ত মানুষ আল্লাহভীরু হয়ে যায় তবুও তাঁর সাম্রাজ্য সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না।

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, শুধু তরবারী চালনা করার নামই জিহাদ নয়। মানুষ পুণ্যময় কাজের চেষ্টায় লেগে থাকবে এটাও এক প্রকারের জিহাদ। মানুষ ভাল কাজ করলে তা আল্লাহ তা'আলার কোন উপকারে আসবে না, তবুও এটা তাঁর বড় মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। এই কারণে তিনি তার গুনাহ মাফ করে দেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্যেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং এর জন্যে বড় রকমের পুরস্কার প্রদান করেন। একটি পুণ্যের বিনিময়ে তিনি সাতশগুণ পর্যন্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

আর পাপকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেন। অথবা ওর সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করেন। তিনি যুলুম হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি পুণ্যকে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের নিকট হতে বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন। তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দিবো এবং তাদের কর্মের উত্তম ফল দান করবো।

৮- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِیْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ০

৮। আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদেরকে মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো যা তোমরা করতে।

৯- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِی الصّٰلِحِيْنَ ০

৯। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করবো।

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়ার পর এখন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ অস্তিত্বে এসে থাকে। পিতা সন্তানের জন্যে খরচ করে এবং তাকে লালন-পালন করে। আর মা তাকে স্নেহ দান করে, ভালবাসে এবং লালন-পালন করে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِیْ صَغِيْرًا۔

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে বলো সম্মান সূচক নম্র কথা। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো– হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"(১৭ ঃ ২৩-২৪) তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, যদি তারা শিরকের দিকে আহ্বান করে তবে তাদের কথা মানতে হবে না। মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তারা যা করতো তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। যদি মানুষ আল্লাহর সাথে শিরক করার ক্ষেত্রে তাদের পিতা-মাতার আদেশ না মানে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এগুলোর মধ্যে একটি وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ-এই আয়াতটিও। এটা এজন্যে অবতীর্ণ হয় যে, আমার মা আমাকে বলেঃ "(হে সা'দ রাঃ)! আল্লাহ কি তোমাকে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ! তুমি যদি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার না কর তবে আমি পানাহার ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করবো।" সে তাই করে । শেষ পর্যন্ত লোকেরা জোরপূর্বক তার মুখ ফেড়ে তার মুখে খাদ্য ও পানীয় প্রবেশ করিয়ে দিতো। ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[1]

১০। মানুষের মধ্যে কতক লোক বলেঃ আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা কষ্টে পতিত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন

١٠- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ○

সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে– আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?

١١- وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ○

১১। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।

এখানে ঐ মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা মুখে ঈমানের দাবী করে, কিন্তু যখন বিরোধীদের পক্ষ হতে কোন দুঃখ কষ্ট তাদের উপর আপতিত হয় তখন তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন এ অর্থই করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ

অর্থাৎ “মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে এক ধারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, যদি তাকে শান্তি ও সুখ পৌঁছে তবে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি কষ্ট ও বিপদ আপদ পৌঁছে তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (২২ ঃ ১১) এজন্যেই আল্লাহ পাক এখানে বলেনঃ মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে– আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য (গনীমত) আসে তখন বলে– আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ ‘যারা তোমাদের সাথে অপেক্ষমান থাকে, অতঃপর যদি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তোমাদের বিজয় লাভ হয় তবে তারা বলে– আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফিরদের (বিজয়ের) অংশ হয় তখন তারা (কাফিরদেরকে) বলে– আমরা কি তোমাদেরকে সহায়তা করিনি এবং

তোমাদের পক্ষে কি মুমিনদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিনি?" (৪ ঃ ১৪১) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "খুব সম্ভব যে, আল্লাহ বিজয় আনয়ন করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে কোন বিষয় আনয়ন করবেন, তখন তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছে সে জন্যে লজ্জিত হয়ে যাবে।" (৫ ঃ ৫২)

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে– আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? অর্থাৎ মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন রেখেছে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন।

আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন ঈমানদারদেরকে এবং অবশ্যই তিনি প্রকাশ করবেন মুনাফিকদেরকে। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ও বিপদ-আপদের মাধ্যমে তিনি মুমিন ও মুনাফিকদেরকে পৃথক করে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।" (৪৭ ঃ ৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা উহুদের ঘটনার পরে বলেনঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

অর্থাৎ "অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো আল্লাহ সেই অবস্থায় মুমিনদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন না।" (৩ ঃ ১৭৯)

১২। কাফিররা মুমিনদেরকে বলেঃ আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার	١٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ

خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

বহন করবো। কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১৩- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ ع

১৩। তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

কুরায়েশ কাফিররা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তাদেরকে একথাও বলতোঃ 'তোমরা আমাদের মাযহাবের উপর আমল কর, এতে যদি কোন পাপ হয় তবে তা আমরাই বহন করবো।' অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে এটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কেউ তার নিকটতম আত্মীয়েরও পাপের বোঝা বহন করবে না এবং করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا - يُّبَصَّرُوْنَهُمْ

অর্থাৎ "বন্ধু বন্ধুর তত্ত্ব নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর।" (৭০ ঃ ১০-১১) হ্যাঁ, তবে এ লোকগুলো নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরও পাপের বোঝা এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঐ পথভ্রষ্ট লোকেরাও বোঝামুক্ত হবে না। তাদের পাপের বোঝা তাদের উপরই থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ "যেন তারা তাদের বোঝা পূর্ণভাবে বহন করে কিয়ামতের দিন এবং অজ্ঞতা বশতঃ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরও বোঝা বহন করে।" (১৬ঃ২৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি লোকদেরকে হিদায়াতের দাওয়াত দিবে, কিয়ামত পর্যন্ত যেসব লোক ঐ হিদায়াতের উপর চলবে তাদের সবারই পুণ্য ঐ

একটি লোক লাভ করবে, অথচ তাদের পুণ্য হতে কিছুই কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেবে, যারা ওর উপর আমল করবে সবারই গুনাহ্ তার উপর পড়বে এবং তাদের গুনাহ্ হতে কিছুই কম করা হবে না।"

আর একটি হাদীসে আছেঃ "ভূ-পৃষ্ঠে যত খুনাখুনি হবে, সবগুলোর পাপ হযরত আদম (আঃ)-এর ঐ পুত্রের উপর পতিত হবে, যে অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কেননা, হত্যার সূচনা তার থেকেই হয়।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেনঃ তোমরা যুলুম হতে দূরে থাকো। কেননা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন– "আমার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ! আজ একটি যুলুমও ছেড়ে দিবো না।" অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ "অমুকের পুত্র অমুক কোথায়?" সে তখন আসবে এবং পর্বত বরাবর পুণ্য তার সাথে থাকবে। এমনকি হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি তার দিকে উঠবে। সে আল্লাহর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ "এ ব্যক্তি কারো উপর যুলুম করে থাকলে সে যেন আজ প্রতিশোধ নিয়ে নিজের হক আদায় করে নেয়।" একথা শুনে এদিক-ওদিক হতে লোকেরা এসে তাকে ঘিরে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেনঃ "আমার এই বান্দাদেরকে তাদের হক আদায় করিয়ে দাও।" ফেরেশতারা বলবেনঃ "কিভাবে আমরা তাদের হক আদায় করিয়ে দিবো?" আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ "তার পুণ্যগুলো নিয়ে এদেরকে দিয়ে দাও।" এরূপই করা হবে। শেষ পর্যন্ত তার আর কোন পুণ্য অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু অত্যাচারিত ও হকদার আরও বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেনঃ "এদেরকেও এদের হক আদায় করিয়ে দাও।" ফেরেশতারা বলবেনঃ "এখন তো তার কাছে আর কোন পুণ্য বাকী নেই!" আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ "তাদের পাপগুলো তার উপর চাপিয়ে দাও।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতবুদ্ধি হয়ে وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ الخ-এ আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মুআয (রাঃ)! নিশ্চয়ই মুমিনকে তার সমস্ত চেষ্টা-শ্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, এমনকি তার চক্ষুদ্বয়ের সুরমা ও তার অঙ্গুলি দ্বারা ঠাসা মাটি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। দেখো, যেন এরূপ না হয় যে, কিয়ামতের দিন কেউ তোমার পুণ্য নিয়ে নেয়।"[১]

١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৪। আমি তো নূহ (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে, কারণ তারা ছিল সীমালংঘনকারী।

١٥- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৫। অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্যে একে করলাম একটি নিদর্শন।

এখানে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমাকে আমি খবর দিচ্ছি যে, হযরত নূহ (আঃ) এই দীর্ঘ সময় ও যুগ ধরে তাঁর কওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকেন। দিবসে, রজনীতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে। অবশেষে প্লাবনের আকারে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়। ফলে তারা সমূলে বিনাশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তোমার কওম যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এটা নতুন কিছু নয়। কাজেই তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। সুপথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহরই হাতে। যাদের জাহান্নাম সম্পর্কে ফায়সালা হয়েই গেছে তাদেরকে কেউই হিদায়াত করতে পারে না। সমস্ত নিদর্শন দেখার পরেও ঈমান আনয়ন তাদের ভাগ্যে হবে না। পরিশেষে

১. এ হাদীসটিও ইবনে আবি হাতিমই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যেমনভাবে হযরত নূহ (আঃ) মুক্তি পায় ও তার কওম পানিতে নিমজ্জিত হয়, তেমনিভাবে তুমি বিজয় লাভ করবে এবং তোমার বিরুদ্ধাচারীরা পরাজিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে হযরত নূহ (আঃ) নবুওয়াত লাভ করেন এবং নবুওয়াতের পর সাড়ে নয়শ' বছর ধরে স্বীয় কওমের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। বিশ্বব্যাপী প্লাবনের পরেও হযরত নূহ (আঃ) ষাট বছর জীবিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত আদম সন্তানদের বংশ ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর মোট বয়স ছিল সাড়ে নয়শ' বছর। তিনশ' বছর তো তিনি তাদের মধ্যে প্রচার ছাড়াই কাটিয়ে দেন। তিনশ' বছর পর্যন্ত তিনি স্বীয় কওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন এবং প্লাবনের পর সাড়ে তিনশ' বছর তিনি জীবিত থাকেন। কিন্তু তাঁর এ উক্তিটি দুর্বল। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা তো এটাই জানা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ' বছর ধরে স্বীয় কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

আউন ইবনে আবি শাদ্দাদ (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়স যখন সাড়ে তিনশ' বছর ছিল ঐ সময় তাঁর কাছে আল্লাহর অহী আসে। এরপর সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত তিনি জনগণের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছাতে থাকেন। এরপর তিনি আরো সাড়ে তিনশ' বছর বয়স পান। কিন্তু এই উক্তিটিও গারীব বা দুর্বল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিটিই সঠিকতম রূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ " হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে কতদিন পর্যন্ত ছিলেন?" উত্তরে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ "সাড়ে নয়শ' বছর।" তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তখন হতে আজ পর্যন্ত লোকদের চরিত্র, বয়স এবং জ্ঞান কম হয়েই আসছে।"

হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের উপর যখন আল্লাহর গযব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে স্বীয় নবী (আঃ)-কে এবং ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে নেন যারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। সূরায়ে হূদে এর পূর্ণ তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করছি না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি বিশ্বজগতের জন্যে এটাকে করলাম একটি নিদর্শন। অর্থাৎ আমি স্বয়ং ঐ নৌকাকে বাকী রাখলাম। যেমন হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এই যে, ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত ঐ নৌকাটি জুদী পর্বতে বিদ্যমান ছিল। অথবা ঐ নৌকাটি দেখে লোকেরা সামুদ্রিক সফরের জন্যে যে নৌকাগুলো বানিয়ে নেয় ঐগুলো, যাতে ওগুলো দেখে মহান আল্লাহর ঐ রক্ষা করার কথা স্মরণে আসে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ - وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ - وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ - اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ -

অর্থাৎ “তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম; এবং তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না—আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে না দিলে।” (৩৬ ঃ ৪১-৪৪) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ - لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ -

অর্থাৎ “যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।” (৬৯ ঃ ১১-১২)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

এখনে ব্যক্তি হতে জাতি বা শ্রেণীর দিকে উঠানো হয়েছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ -

অর্থাৎ “আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।” (৬৭ ঃ ৫) এখানে

আল্লাহ তা'আলা তারকামণ্ডলীকে আকাশের সৌন্দর্য হিসেবে বানানোর কথা বর্ণনা করার পর বলেন যে, ওগুলোকে তিনি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করেছেন। আর এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ -

অর্থাৎ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।" (২৩ ঃ ১২-১৩) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করার কথা বলার পর বলেন যে, তিনি ওটাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করেন এক নিরাপদ আধারে।

এটাও বলা হয়েছে যে, هَا সর্বনামটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে عُقُوْبَةٌ বা শাস্তির দিকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৬। স্মরণ কর ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্যে এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।

১৭। তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তিপূজা করছো এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছো, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

١٦- وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

١٧- اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

١٨- وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৮। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

একত্ববাদীদের ইমাম, রাসূলদের পিতা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দেন, রিয়াকারী হতে বেঁচে থাকা এবং পরহেযগারী কায়েম করার হুকুম দেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলেন। আর এর উপকারের কথাও তিনি তাদেরকে বলে দেন যে, এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ দূর হয়ে যাবে এবং দুই জাহানের নিয়ামত তারা লাভ করবে। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বলেনঃ যে মূর্তিগুলোর তোমরা উপাসনা করছো ওগুলো তো তোমাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। তোমরা নিজেরাই ওদের নাম রেখেছো এবং দেহ তৈরী করেছো। এরা তো তোমাদের মতই সৃষ্ট। এমন কি এরা তোমাদের চেয়েও দুর্বল। এরা তো তোমাদের জীবনোপকরণেরও মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলার নিকটই তোমরা রিযিক যাঞ্চা কর, আর কারো কাছে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলতে শিখিয়ে দিয়েছেনঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ "আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (১ ঃ ৪) এই সীমাবদ্ধতা হযরত আসিয়া (রাঃ)-এর প্রার্থনাতেও রয়েছে। তিনি প্রার্থনা করেছিলেনঃ

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করুন।" (৬৬ ঃ ১১) আল্লাহ ছাড়া কেউ রিযিক দিতে পারে না, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই কাছে রিযিক যাঞ্চা কর। আর যখন তাঁরই রিযিক ভক্ষণ কর তখন তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ কর। তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। দেখো,

আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করো না। চিন্তা করে দেখো যে, তোমাদের পূর্বে যারা নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে! জেনে রেখো যে, নবীদের কাজ শুধু আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। হিদায়াত করা ও না করা আল্লাহরই হাতে। নিজেদেরকে তোমরা সৌভাগ্যবান বানিয়ে নাও। হতভাগ্যদের মধ্যে নিজেদেরকে শামিল করো না।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যথেষ্ট সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এর ভাবার্থের চাহিদা তো এই যে, প্রথম বাক্য এখানে শেষ হয়েছে এবং এরপর فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ (২৭ ঃ ৫৬) পর্যন্ত বাক্যগুলো جُمْلَةً مُعْتَرِضَةً হিসেবে এসেছে। ইমাম ইবনে জারীর তো স্পষ্ট ভাষায় একথাই বলেছেন। কিন্তু কুরআন কারীমের শব্দ দ্বারা এটা প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, সমুদয়ই হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এরই উক্তি। তিনি কিয়ামত কায়েম হওয়ার দলীল প্রমাণাদি পেশ করেছেন। কেননা, এই সমুদয় কালামের পর তাঁর কওমের জবাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১৯। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর ওটা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহর জন্যে সহজ।

٢٠- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২০। বলঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন? অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢١- يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۝

২১। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২। তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।	٢٢- وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ؏
২৩। যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্যে আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٢٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَاۤئِهٖۤ اُولٰۤئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা কি দেখে না যে, তারা তো কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করে দিলেন। কিন্তু এর পরেও তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে না। অথচ এর উপর কোন দলীলের প্রয়োজন হয় না। যিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুবই সহজ।

এরপর তিনি তাদেরকে হিদায়াত করছেনঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান ও বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা কর। আকাশমণ্ডল, নক্ষত্ররাজি, ভূ-মণ্ডল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, ফল-মূল, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে দেখো যে, এগুলোর কোনই অস্তিত্ব ছিল না। এগুলোর সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি মনে কর যে, এতো বড় কারিগর ও ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ কিছুই করতে পারেন না? তিনি তো শুধু 'হও' বললেই সবই হয়ে যায়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তাঁর জন্যে কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। এজন্যেই তো তিনি বলেনঃ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহর জন্যে সহজ। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন এবং এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।" (৩০ ঃ ২৭)

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন কিয়ামতের দিন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহ পাকের এ উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির সাথে সাদৃশ্য যুক্তঃ

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে দুনিয়ার প্রতিটি অংশে এবং স্বয়ং তাদের নফসের মধ্যে আমার এমন নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবো যাতে তাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে।" (৪১ ঃ ৫৩)

যেমন আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ -

অর্থাৎ "তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকারী? না তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? না, বরং তারা (আল্লাহর উপর) বিশ্বাস করে না।" (৫২ ঃ ৩৫-৩৬)

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তিনি পরম বিচারপতি, অধিপতি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কেউ তাঁর হুকুম নড়াতে-টলাতে পারে না। কেউ তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি সবারই উপর বিজয়ী ও পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন। সবাই তাঁর অধিকারভুক্ত, সবাই তাঁর অধীনস্থ। সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুরই মালিক তিনিই। তিনি যা কিছু করেন সবই ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। যেহেতু তিনিই মালিক, তিনি যুলুম হতে পবিত্র। হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সপ্ত আসমানবাসী ও সপ্ত যমীনবাসীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তবুও তিনি অত্যাচারী সাব্যস্ত হবেন না। শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা সবই তাঁরই হাতে। কিয়ামতের দিন সবাই তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সবকেই তাঁরই নিকট হাযির হতে হবে। আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীদের কেউই আল্লাহকে ব্যর্থ ও অসমর্থ করতে পারে না। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। সবাই আল্লাহ হতে ভীত-সন্ত্রস্ত। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবকিছু হতে অভাবমুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত মানুষের কোন অভিভাবকও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

যারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই তাঁর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্যে আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৪। উত্তরে ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় শুধু এই বললোঃ তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

٢٤- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

২৫। ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

٢٥- وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○ۙ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই জ্ঞান সম্মত ও শরীয়ত সম্মত যুক্তি প্রমাণ এবং উপদেশাবলী তাঁর কওমের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হলো না। তারা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতেই থাকলো। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের সামনে যেসব দলীল প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন সেগুলোর জবাব দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই শক্তির বলে সত্যকে তারা দাবিয়ে রাখতে থাকে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলেঃ 'তাকে (ইবরাহীম আঃ)-কে হত্যা কর অথবা তাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে আগুন

হতে রক্ষা করলেন। বহুদিন ধরে তারা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা করতে থাকে এবং একটি গর্ত খনন করে ওর চতুর্দিকে প্রাচীর খাড়া করে দেয়, তারপর কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়। যখন অগ্নি-শিখা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এমন ভীষণভাবে আগুন প্রজ্বলিত হয় যে, দুনিয়ায় ঐরূপ আগুন কখনো দেখা যায়নি, এমতাবস্থায় তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে ধরে বেঁধে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ স্বীয় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে ঐ অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করেন। কয়েক দিন পরে তিনি নিরাপদে ও সহীহ-সালামতে ওর মধ্য হতে বেরিয়ে আসেন। এটা এবং এ ধরনের আরো বহু আত্মত্যাগ তাঁর ছিল বলেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে ইমামতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণকে রহমানের (আল্লাহর) জন্যে, স্বীয় দেহকে মীযানের জন্যে, নিজের সন্তানকে কুরবানীর জন্যে এবং স্বীয় সম্পদকে মেহমানের জন্যে রেখে দেন। এ কারণেই দুনিয়ার সমস্ত মুমিন তাঁকে ভালবাসে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে আগুনকে বাগান বানিয়ে দেন, এই ঘটনায় ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেনঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। مَوَدَّةً শব্দের উপর যবর দিয়ে পড়লে এটা مَفْعُوْلٌ لَهٗ হবে। একটি কিরআতে পেশ দিয়েও রয়েছে। অর্থাৎ এই মূর্তি-পূজার মাধ্যমে যদিও তোমরা দুনিয়ার ভালবাসা লাভে সমর্থ হও, কিন্তু জেনে রেখো যে, কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হয়ে যাবে। বন্ধুত্বের স্থানে ঘৃণা এবং মতৈক্যের স্থলে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেদিন তোমরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত দেবে। একদল অপর দলকে অভিশাপ দিতে থাকবে। বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে। তবে আল্লাহভীরু লোকেরা আজও একে অপরের বন্ধু হিসেবে রয়েছে এবং সেদিনও তাই থাকবে।

কাফিররা সবাই কিয়ামতের মাঠে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পরিশেষে জাহান্নামে চলে যাবে। এমন কেউ থাকবে না যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর ভগ্নী হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি তোমাকে

খবর দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ও পরের সমস্তকে কিয়ামতের দিন এক ময়দানে একত্রিত করবেন। দুই দিকের কোন্ দিকে হবে তা কেউ জানে কি?" আমি জবাবে বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন। তখন একজন আহ্বানকারী আরশের নীচে হতে আহ্বান করবেনঃ "হে একত্ববাদীদের দল!" এ আহ্বান শুনে একত্ববাদীরা তাদের উত্তোলন করবে। দ্বিতীয়বার এই আহ্বানই করবেন। তৃতীয়বারও এই ডাকই দেবেন এবং বলবেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।" একথা শুনে লোকগুলো দাঁড়িয়ে যাবে এবং পরস্পরের যুলুম ও লেন-দেনের ব্যাপারে একে অপরের নিকট দাবী জানাবে। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আওয়ায আসবেঃ "হে একত্ববাদীদের দল! তোমরা পরস্পর একে অপরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তোমাদের এর প্রতিদান প্রদান করবেন।"

٢٦- فَـاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَـالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

২৬। লূত (আঃ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٧- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَـعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِـهِ النُّبُـوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ اَجْـرَهٗ فِی الدُّنْیَـا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِـرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ○

২৭। আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূব (আঃ) এবং তার বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও; সে নিশ্চয়ই সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম হবে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত লূত (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেন। বলা হয় যে, হযরত লূত (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন লূত (আঃ) ইবনে হারূন ইবনে আযর। তাঁর পুরো কওমের মধ্যে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন শুধু হযরত লূত (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ)।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ যুগীয় যালিম বাদশাহ যখন তার সিপাইদের মাধ্যমে হযরত সারা (রাঃ)-কে তার নিকট আনিয়ে নেয় তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত সারা (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "দেখো, আমি বাদশাহর সামনে বলেছি যে, তোমার সাথে আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক রয়েছে। তুমিও একথাই বলবে যে, তুমি আমার বোন। কেননা, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় আমি ও তুমি ছাড়া আর কোন মুমিন নেই।" সম্ভবতঃ একথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুমিন নেই।

হযরত লূত (আঃ) তো হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তিনি হিজরত করে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আহলে সুযূমের নিকট নবী করে পাঠানো হয়, যেমন ইতিপূর্বে এর বর্ণনা গত হয়েছে এবং সামনেও আসছে।

وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ (তিনি বললেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি), এখানে قَالَ-এর মধ্যস্থিত هُوَ সর্বনামটি সম্ভবতঃ হযরত লূত (আঃ)-এর দিকে ফিরেছে। কেননা, আলোচ্য দুই জনের মধ্যে তিনিই নিকটবর্তী। আবার এও হতে পারে যে, সর্বনামটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে ফিরেছে যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত যহ্হাক (রাঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। তাহলে হয়তো হযরত লূত (আঃ)-এর ঈমান আনয়নের পরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি সেখান হতে অন্য জায়গায় চলে যাবেন এবং হয়তো তথাকার লোকেরা আল্লাহ-ভক্ত হবে। শক্তি ও সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরই। আল্লাহ তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কূফা হতে হিজরত করে সিরিয়ার দিকে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "হিজরতের পরের হিজরত হবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হিজরতের দিকে। ঐ সময় ভূ-পৃষ্ঠে দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ লোকেরা অবস্থান করবে, যাদেরকে যমীন থুথু দেবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘৃণা করবেন। আগুন তাদেরকে শূকর ও বানরের সাথে হাঁকাতে থাকবে। তারা ওদের সাথেই রাত্রি যাপন করবে এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করবে।"

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের মধ্যে যারা পিছনে থাকবে, এই অগ্নি তাদেরকে খেয়ে ফেলবে। নবী (সঃ) আরো বলেনঃ "আমার উম্মতের মধ্য হতে

এমন লোকও বের হবে যারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নীচে নামবে না। তাদের একটি দল শেষ হয়ে যাবার পর আর একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে।” তিনি বিশ বারেরও অধিক এর পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ “তাদের শেষ দলটির মধ্য হতে দাজ্জাল বের হবে।”

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের উপর একটা যুগ এমন ছিল যে, আমরা আমাদের একটা মুসলমান ভাই-এর জন্যে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ও দীনারকে (স্বর্ণ মুদ্রা) কিছুই মনে করতাম না। আমরা আমাদের সম্পদকে আমাদের মুসলমান ভাইদের সম্পদই মনে করতাম। তারপর এমন যুগ আসলো যে, আমাদের সম্পদ আমাদের কাছে আমাদের মুসলমান ভাইদের চেয়ে প্রিয় মনে হতে লাগলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “যদি তোমরা বলদের লেজের পিছনে লেগে থাকো এবং ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে পড়, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিত্যাগ কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গলদেশে লাঞ্ছনার হাসুলী পরিয়ে দিবেন, যে পর্যন্ত না তোমরা সেখানেই ফিরে আসবে যেখানে ছিলে এবং যে পর্যন্ত না তাওবা করবে।”[১] অতঃপর তিনি ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং বলেনঃ “আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে যারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু মন্দ আমল করবে, ফলে কুরআন তাদের কণ্ঠ হতে নীচের দিকে নামবে না। তাদের ইলম বা বিদ্যাবুদ্ধি দেখে তোমরা নিজেদের ইলমকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা আহলে ইসলাম বা মুসলমানদেরকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং যখন এ লোকগুলো বের হবে তখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। আবার বের হলে আবারও হত্যা করো এবং পুনরায় বের হলে পুনরায় তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তারা কতই না ভাগ্যবান এবং যারা তাদের হাতে নিহত হবে তারাও ভাগ্যবান। যখন তাদের দল বের হবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। আবার তারা বের হবে, আবারও তিনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন।”[২] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিশবার বা তার চেয়েও অধিকবার একথাই বলেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূব (আঃ)। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অর্থাৎ “যখন সে তাদের হতে ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করতো ঐ সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূব (আঃ) এবং প্রত্যেককে নবী করলাম।” (১৯ ঃ ৪৯) এতে এরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকূবও (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন তাঁর পুত্র এবং হযরত ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً

অর্থাৎ “আমি তাকে দান করলাম ইসহাক (আঃ)-কে এবং অতিরিক্ত দান করলাম ইয়াকূবকে (আঃ)।” (২১ ঃ ৭২) যেমন আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

অর্থাৎ “আমি তাকে (সারাকে রাঃ) শুভ সংবাদ দিলাম ইসহাক (আঃ)-এর এবং তার পিছনে (পরে) ইয়াকূব (আঃ)-এর।” (১১ ঃ ৭১) অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আঃ)! তোমার জীবদ্দশাতেই তোমার সন্তানের সন্তান হবে, যার ফলে তোমাদের দু'জনের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন। সুন্নাতে নববী (সঃ) দ্বারাও এটা প্রমাণিত। কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖۚ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ “ ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলঃ আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা উত্তরে বলেছিল ঃ আমরা আপনার মা'বূদের ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর মা'বূদেরই ইবাদত করবো। তিনি একমাত্র মা'বূদ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।” (২ ঃ ১৩৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ “কারীম ইবনুল কারীম ইবনুল কারীম ইবনুল কারীম ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আলাইহিমুসসালাম)।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসহাক (আঃ) ও হযরত ইয়াকূব (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুত্রের পুত্র, ঔরষজাত পুত্র নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেন, একজন নিম্ন স্তরের মানুষও এ ব্যাপারে হোঁচট খেতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তার বংশধরদের জন্যে আমি স্থির করলাম নবুওয়াত ও কিতাব। হযরত ইবরাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত এবং তাঁকে ইমাম বলা হয়। তাঁর পরে তাঁরই বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও হিকমত থেকে যায়। বানী ইসরাঈলের সমস্ত নবী হযরত ইয়াকূব (আঃ) ইবনে ইসহাক (আঃ) ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হতেই হয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত এই ক্রম এভাবেই চলে এসেছে। বানী ইসরাঈলের এই শেষ নবী পরিষ্কারভাবে স্বীয় উম্মতকে বলে দিয়েছিলেনঃ "আমি তোমাদেরকে নবী আরবী, কুরায়েশী, হাশেমী, শেষ রাসূল, হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সুসংবাদ দিচ্ছি, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেছেন।" তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন, আর দান করেছিলেন সতী-সাধ্বী স্ত্রী, পবিত্র বাসভূমি, উত্তম প্রশংসা এবং উত্তম আলোচনা। সারা দুনিয়াবাসীর অন্তরে তিনি তাঁর মহব্বত জাগিয়ে তোলেন। তাঁকে তিনি তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করেন। পুরোমাত্রায় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর আনুগত্য করে গিয়েছিলেন। আখিরাতেও তিনি সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবেন। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ফরমাবর্দারী অর্থাৎ আদেশ পালনে সদা নিয়োজিত থাকতেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না......... নিশ্চয়ই তিনি আখিরাতেও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (১৬ ঃ ১২০-১২২)

২৮- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৮। স্মরণ কর লূত (আঃ)-এর কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছো, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।

২৯- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৯। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাকো এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বললোঃ আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩০- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ○ ع

৩০। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কওমকে তাদের বদভ্যাস হতে বাধা দিতে থাকেন। তাদেরকে তিনি বলেনঃ "তোমাদের মত অশ্লীল কর্ম তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউই করেনি। কুফরী, রাসূলকে অবিশ্বাস, আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা ইত্যাদি তো তারা করতোই, কিন্তু তারা পুরুষে উপগত হতো, যে কাজ তাদের পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে কেউ কখনো করেনি।

দ্বিতীয় বদভ্যাস তাদের এই ছিল যে, তারা রাহাজানি করতো, লুটপাট করতো, হত্যা করতো এবং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো। নিজেদের মজলিসে, সভা-সমিতিতে তারা প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তো। কেউ কাউকেও বাধা দিতো না। এমন কি কেউ কেউ তো বলেন যে, হস্তমৈথুনও তারা প্রকাশ্যভাবে করতো। তারা পরস্পর গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ছেড়ে দিয়ে হো হো করে হাসতো, ভেড়া লড়াতো, মোরগ লড়াতো এবং এ ধরনের আরো বহু অসার ও

বাজে কাজে তারা লিপ্ত থাকতো। প্রকাশ্যভাবে আমোদ-স্ফূর্তি করে তারা পাপের কাজ করতো। হাদীস শরীফে আছে যে, তারা পথচারীদের সামনে চীৎকার ও হট্টগোল করতো এবং তাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতো। তারা বাঁশী বাজাতো, কবুতর উড়াতো ও উলঙ্গ হয়ে যেতো। কুফরী, হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যপনা তাদের এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, নবী (আঃ)-এর উপদেশের জবাবে তাঁকে তারা বলতোঃ "ছেড়ে দাও তোমার উপদেশবাণী। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর।" শেষে অসহ্য হয়ে হযরত লূত (আঃ) আল্লাহর সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।"

৩১। যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসলো, তারা বলেছিলঃ আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো, এর অধিবাসীরা তো সীমালংঘনকারী।

٣١- وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৩২। ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বললোঃ সেথায় কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূত (আঃ)-কে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢- قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৩৩। এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তারা লূত (আঃ)-এর নিকট আসলো, তখন তাদের জন্যে সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা

٣٣- وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا

تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

বললোঃ ভয় করো না, দুঃখও করো না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪- اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৩৪। আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করবো, কারণ তারা পাপাচার করছিল।

৩৫- وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৩৫। আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

হযরত লূত (আঃ)-এর কওম যখন তাঁর কথা মানলো না তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ফলে মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করলেন। মানুষের রূপ ধরে ফেরেশতারা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বাড়ীতে মেহমান হিসেবে আগমন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে ফেললেন এবং তাঁদের সামনে তা হাযির করলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁরা খাদ্যের প্রতি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করছেন না তখন তিনি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন। ফেরেশতারা তখন তাঁর মনতুষ্টি করতে গিয়ে বললেন যে, তাঁদের একটি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তাঁর স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ), যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন, এ খবর শুনে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন। সূরায়ে হূদে ও সূরায়ে হিজরে এর বিস্তারিত তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতারা তাঁদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ধারণা করলেন যে, যদি হযরত লূত (আঃ)-এর কওমকে আরো কিছুদিন অবকাশ দেয়া হয় তবে হয়তো তারা সুপথে ফিরে আসবে। তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ "সেখানে তো হযরত লূত (আঃ) রয়েছেন!" উত্তরে ফেরেশতারা বললেনঃ "তাঁর ব্যাপারে আমরা উদাসীন বা অমনোযোগী নই। তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তবে তার স্ত্রী অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, সে তার কওমের সাথে সহযোগিতা করে থাকে।" এখান হতে বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা হযরত লূত (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন। তাঁদেরকে দেখেই

হযরত লূত (আঃ)-এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তাঁর কেঁপে ওঠার কারণ এই যে, যদি তাঁর কওম তাঁর মেহমানদের আগমন সংবাদ শুনতে পায় তবে দৌড়িয়ে তাঁর বাড়ীতে আসবে এবং তাঁকে অপ্রস্তুত ও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলবে। যদি তিনি তাঁর এই মেহমানদেরকে তাঁর বাড়ীতে রাখেন তবে তাঁরা এদের হাতে পড়ে যাবেন। তিনি তো তাঁর কওমের বদভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ জন্যেই তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ফেরেশতারা তার মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেনঃ "আপনি ভয় করবেন না, দুঃখও করবেন না। আমরা তো আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। আপনার কওমকে ধ্বংস করার জন্যে আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আপনাকে ও আপনার পরিবারর্গকে আমরা রক্ষা করবো। তবে আপনার স্ত্রীকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কেননা, সেও আপনার কওমের সাথে সহযোগিতা করেছে। তাদের উপর আসমানী গযব নাযিল করা হবে এবং তাদের দুষ্কর্মের ফল দেখিয়ে দেয়া হবে।"

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাদের জনপদকে যমীন হতে উঠিয়ে আসমান পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সেখান হতে উল্টিয়ে ফেলে দেন। তারপর তাদের নাম অংকিত পাথর তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং যে শাস্তিকে তারা বহু দূরের মনে করছিল তা খুবই নিকটে হয়ে গেল। তাদের বসতি স্থলে একটি তিক্ত ও দুর্গন্ধময় পানির বিল বা জলাশয় রয়ে গেল। এটা লোকদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়ে গেল। জ্ঞানী লোকেরা তাদের দূরবস্থা ও ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণের আস্পর্ধা না দেখায়। আরববাসীদের ভ্রমণের পথে রাত-দিন এই দৃশ্য চোখের সামনে পড়তো।

٣٦- وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৩৬। আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শুআইব (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

٣٧- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ○

৩৭। কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত শুআইব (আঃ) মাদইয়ানে স্বীয় কওমকে উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদত করার হুকুম করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন। তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে তিনি বলেনঃ "ঐদিনের জন্যে তোমরা কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ঐ দিনের খেয়াল রেখে লোকদের উপর যুলুম ও অবিচার করা হতে বিরত থাকো। আল্লাহর যমীনে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দূরে থাকো।"

তাদের মধ্যে একটি দোষ এও ছিল যে, তারা মাপে ও ওজনে কম করতো, মানুষের হক তারা নষ্ট করে দিতো । তারা রাস্তা বন্ধ করে ফেলতো এবং সাথে সাথে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (আঃ)-এর সাথে কুফরী করতো। তারা তাদের নবী (আঃ)-এর উপদেশের প্রতি কর্ণপাতও করেনি। বরং তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলে। এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। কঠিন ভূমিকম্প শুরু হয় এবং সাথে সাথে এমন জোরে শব্দ হয় যে, প্রাণ উড়ে যায়। তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। তাদের পূর্ণ ঘটনা সূরায়ে আ'রাফ ও সূরায়ে শুআ'রাতে গত হয়েছে।

৩৮। এবং আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের বাড়ী ঘরই তোমাদের জন্যে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।

٣٨- وَعَادًا وَّثَمُوْدَاْ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝ لا

৩৯। এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূন, ফিরাউন ও হামানকে; মূসা (আঃ) তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন তারা দেশে দম্ভ করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

٣٩- وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝ صلے

٤٠- فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৪০। তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, তাদের কাউকেও আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকেও করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

আ'দেরা ছিল হযরত হূদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়। তারা আহ্কাফে বাস করতো। ওটা ছিল ইয়ামনের শহরগুলোর মধ্যে একটি শহর। এটা হাযরামাউতের নিকটবর্তী ছিল।

সামূদীরা ছিল হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমের লোক। তারা হিজরে বসবাস করতো, যা ওয়াদীকুরার নিকটে ছিল। আরববাসীরা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসভূমি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কারূন ছিল একজন সম্পদশালী লোক, যার পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের চাবি একদল শক্তিশালী লোককে উঠাতে হতো।

ফিরাউন ছিল মিসরের বাদশাহ্। আর হামান ছিল তার প্রধানমন্ত্রী। তার যুগেই হযরত মূসা (আঃ)-কে নবীরূপে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফিরাউন ও হামান উভয়েই কিবতী কাফির। যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে, তারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে বসে, রাসূলদেরকে (আঃ) কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অবিশ্বাস করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আ'দ সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। তারা তাদের শক্তির বড়ই গর্ব করতো। কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এটা তারা বিশ্বাসই করতো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা যমীন হতে পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের উপর বর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ বায়ু এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদেরকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান হতে

উল্টো মুখে নীচে নিক্ষেপ করে। মাথার ভরে পড়ে তাদের মাথা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের এমন অবস্থা হয় যে, যেন খেজুরের গাছ, যার কাণ্ড পৃথক হয়ে গেছে।

সামূদ সম্প্রদায়ের উপরও আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ হয়। তাদেরকে নিদর্শন দেয়া হয়। তাদের দাবী ও চাহিদামত পাথরের মধ্য থেকে তাদের চোখের সামনে উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি তাদের ভাগ্যে ঈমান আসেনি। বরং হঠকারিতায় তারা বাড়তেই থাকে। নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে ভয় প্রদর্শন করতে ও ধমক দিতে থাকে। ঈমানদারদেরকে তারা বলতে শুরু করেঃ "তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে ফেলবো।" ফলে তাদেরকে এক গুরুগম্ভীর শব্দ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কারূন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সে মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করতঃ ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যমীনে সে গর্বভরে চলতে থাকে এবং ধনের গর্বে গর্বিত হয় ও ফুলে ওঠে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার দলবল ও প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করেন। আজ পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই আছে।

ফিরাউন, হামান এবং তাদের দলবলকে সকাল সকালই একই সাথে একই মুহূর্তে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। তাদের মধ্যে এমন একজনও বাঁচেনি যে তাদের নাম নিতে পারে। আল্লাহ পাক এসব কিছু যে করেছিলেন তা তাদের প্রতি তাঁর যুলুম ছিল না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

এই বর্ণনা এখানে ক্রমপর্যায়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমে অবিশ্বাসকারী উম্মতদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সর্বপ্রথম যাদেরকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা ধ্বংস করে দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের দ্বারা হযরত লূত (আঃ)-এর কওমকে বুঝানো হয়েছে। আর নিমজ্জিত করে দেয়া কওম দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমকে। কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু সনদের মধ্যে ইনকিতা বা ছেদ-কাটা আছে। এই দুই সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বর্ণনা এভাবেই সবিস্তারে বর্ণিত হয়ে গেছে। অতঃপর বহু দূরত্বের পরে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হযরত কাতাদা (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রস্তর বৃষ্টি যাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত লূত (আঃ)-এর কওম। আর বিকট ও গুরুগম্ভীর শব্দ দ্বারা যাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য

হচ্ছে হযরত শুআয়েব (আঃ)-এর কওম। কিন্তু এই উক্তিটিও এই আয়াতগুলো হতে দূরে রয়েছে। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

٤١- مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

৪১। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্যে ঘর বানায়, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো!

٤٢- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৪২। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকেই আহ্বান করে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٤٣- وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ○

৪৩। মানুষের জন্যে এই সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি; কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।

যেসব লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পূজা-অর্চনা করে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞানতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাদের সাহায্য প্রার্থী হয় এবং বিপদ আপদে তাদের কাছে উপকার লাভের আশা করে। এদের দৃষ্টান্ত ওদের মত যারা মাকড়সার জালে বৃষ্টি, রৌদ্র ও ঠাণ্ডা হতে আশ্রয় পাওয়ার আশা করে থাকে। যদি তাদের জ্ঞান থাকতো তবে তারা সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টের কাছে কোন আশা করতো না। সুতরাং তাদের অবস্থা ঈমানদারদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুমিনরা এক মযবূত লৌহ-কড়াকে ধরে রয়েছে। পক্ষান্তরে এই মুশরিকরা মাকড়সার জালে নিজেদের মস্তক লুকিয়ে রেখেছে। মুমিনদের অন্তর আল্লাহর দিকে এবং তাদের দেহ সৎ আমলের দিকে লিপ্ত রয়েছে। আর এই কাফির ও মুশরিকদের অন্তর সৃষ্টবস্তুর দিকে এবং তাদের দেহ সৃষ্টবস্তুর উপাসনার দিকে আকৃষ্ট রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহ্বান করে আল্লাহ তা অবগত আছেন। তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন। তিনি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছেন এতে তাঁর যুক্তি ও নিপুণতা রয়েছে। তাদেরকে অবকাশ দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের থেকে বে-খবর।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মানুষের (বুঝের) জন্যে আমি এই সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু শুধু (আমলকারী) আলেমরাই এটা অনুধাবন করে।

এই আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলো বুঝে নেয়া সত্য ও সঠিক ইলমের প্রমাণ।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন ঃ "আমি এক হাজার দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শিখেছি ও বুঝেছি।"[১]

হযরত আমর ইবনে মুররা (রাঃ) বলেনঃ "কুরআন কারীমের যে আয়াত আমি পাঠ করি এবং ওর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অপারগ হই তখন আমার মনে বড় দুঃখ হয় এবং অন্তরে খুব ব্যথা পাই ও ভীত হই যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি মূর্খ বলে গণ্য হয়ে যাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ "মানুষের সামনে আমি এসব দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকি, কিন্তু আলেমরা ছাড়া কেউই এগুলো বুঝতে পারে না।"

৪৪। আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

٤٤- خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এগুলো খেল-তামাশার জন্যে ও অযথা সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন যে, জনগণ এখানে বসতি স্থাপন করবে। আর তারা কি আমল করে তা তিনি দেখবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলকে তিনি পুরস্কার প্রদান করবেন এবং দুষ্কর্মকারীকে শাস্তি দিবেন।

বিংশতিতম পারা সমাপ্ত

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪৫। তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং নামায প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই নামায বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

٤٥- اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে ও মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁরা যেন কুরআন কারীম নিজেরা পাঠ করেন এবং অন্যদেরকেও শুনিয়ে দেন। আর তাঁরা যেন নিয়মিতভাবে নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে বিরত রাখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তির নামায তাকে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে বিরত রাখে না সে আল্লাহ হতে বহু দূরে রয়ে যায়।"

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "যার নামায তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে না, (তাহলে জানবে যে,) তার নামায নাই (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে তার নামায কবূল হয় না)।"[১]

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার নামায তাকে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে বিরত রাখে না, সে আল্লাহ হতে বহু দূরে চলে যায়।"[২]

একটি মাওকূফ রিওয়াইয়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে না ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে না, তার নামায তাকে আল্লাহ হতে (ক্রমে ক্রমে) দূর করতেই থাকে।[৩]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামাযের আনুগত্য করে না তার নামায নাই।"[১] নামাযের আনুগত্য এই যে, নামায নামাযীকে অশ্লীল ও দুষ্কর্ম হতে বিরত রাখবে।

হযরত শুআয়েব (আঃ)-কে তাঁর কওম বলেছিলঃ "হে শুআয়েব (আঃ)! তোমার প্রভু কি তোমাকে আদেশ করে?" হযরত সুফইয়ান (রঃ)-এর তাফসীরে বলেনঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! নামায আদেশ করে এবং নিষেধও করে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে কোন একজন লোক বলেঃ "অমুক লোক দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়ে থাকে।" তিনি তখন বলেনঃ "নামায তারই উপকার করে যে ওর আনুগত্য করে।" আমি তাহকীক করে যা বুঝেছি তা এই যে, উপরে যে মারফূ' রিওয়াইয়াত বর্ণিত হয়েছে তা মাওকূফ হওয়াই বেশী সঠিক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! অমুক লোক নামায পড়ে, কিন্তু চুরিও করে।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "অতিসত্বরই তার নামায তার এ মন্দ কাজ ছাড়িয়ে দেবে।"[২] নামায আল্লাহর যিকরের নাম, এ জন্যেই এর পরেই বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।'

আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ "নামাযে তিনটি জিনিস রয়েছে। এ তিনটি জিনিস না থাকলে নামায হবে না। প্রথম হলো ইখলাস বা আন্তরিকতা, দ্বিতীয় হলো আল্লাহর ভয় এবং তৃতীয় হলো আল্লাহর যিকর। ইখলাস দ্বারা মানুষ সৎ হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ের কারণে মানুষ পাপকার্য পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্র যিকর অর্থাৎ কুরআন মানুষকে ভাল ও মন্দ বলে দেয় এবং আদেশও করে, নিষেধও করে।"

ইবনে আউন আনসারী (রঃ) বলেনঃ "যখন তুমি নামাযে থাকো তখন ভাল কাজে থাকো এবং নামায তোমাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য হতে বিরত রাখে। আর ওর মধ্যে যে যিকর তুমি কর তা তোমার জন্যে বড়ই উপকারের বিষয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ বলেনঃ "নামাযের অবস্থায় কমপক্ষে তুমি তো মন্দ কার্য হতে বেঁচে থাকবে।" যে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন।

১. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ মহান আল্লাহর এই উক্তির ভাবার্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'তোমার আহারের সময় ও শয়নের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা।' তাঁর এ তাফসীর শুনে একটি লোক তাঁকে বলেনঃ "আমার একজন সঙ্গী রয়েছেন যিনি আপনার অর্থের বিপরীত অর্থ করে থাকেন।" তিনি তখন প্রশ্ন করলেনঃ "সে কি অর্থ করে?" উত্তরে লোকটি বলেন, তিনি বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'যখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে তখন তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন।' আর এটা খুব বড় জিনিস। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَاذْكُرُوْنِیْٓ اَذْكُرْكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।" (২ ঃ ১৫২) এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "সে ঠিকই বলেছে। দু'টি ভাবার্থই সঠিক। অর্থাৎ তারটাও ঠিক, আমারটাও ঠিক।" আর স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআহ্ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি এই বাক্যটির ভাবার্থ কি বুঝেছো?" জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআহ (রঃ) বলেনঃ "এর ভাবার্থ হচ্ছে– নামাযে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি বলা।" তাঁর এ উত্তর শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি তো এক বিস্ময়কর কথা বললে! ভাবার্থ এটা নয়। বরং এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আদেশ ও নিষেধ করার সময় আল্লাহর তোমাদেরকে স্মরণ করা। তোমাদের আল্লাহর যিকর করা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ দারদা (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন।

৪৬। তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী; এবং বলঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ﳓ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ

اِلَـيْكُمْ وَالٰهُنَا وَالٰهُكُمْ وَاحِـدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○	আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

হযরত কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এ আয়াতটি জিহাদের হুকুমের দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এখন তো হুকুম এই যে, হয় ইসলাম কবূল করবে; না হয় জিযিয়া দেবে, না হয় যুদ্ধ করবে। কিন্তু অন্যান্য বুযর্গ তাফসীরকারগণ বলেন যে, এটা মুহকাম ও বাকী রয়েছে। যে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ধর্মীয় বিষয় জানতে ও বুঝতে চায় তাকে উত্তম পন্থায় ও ভদ্রতার সাথে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, সে হয়তো সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করবে। যেমন অন্য আয়াতে সাধারণ হুকুম বিদ্যমান রয়েছেঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ "হিকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর।" (১৬ ঃ ১২৫)

হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-কে যখন ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করা হয় তখন মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নির্দেশ দেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

অর্থাৎ "তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" (২০ ঃ ৪৪) এটাই ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর পছন্দনীয় উক্তি। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তবে, তাদের মধ্যে যে যুলুম ও হঠকারিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তার সাথে আলোচনা বৃথা। এরূপ লোকের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ .... اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ.

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ; এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (৫৭ ঃ ২৫)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এই যে, উত্তম ও নম্র ব্যবহারের পর যে না মানবে তার প্রতি কঠোর হতে হবে, যে যুদ্ধ করবে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তবে কেউ যদি অধীনে থেকে জিযিয়া কর আদায় করে তাহলে সেটা অন্য কথা।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি।' অর্থাৎ যখন আমাদেরকে এমন কিছুর খবর দেয়া হবে যা সত্য কি মিথ্যা তা আমাদের জানা নেই ওটাকে মিথ্যাও বলা যাবে না এবং সত্য বলাও চলবে না। কেননা, এরূপ করলে হতে পারে যে, আমরা কোন সত্যকেও মিথ্যা বলে দেবো এবং হয়তো কোন মিথ্যাকেও সত্য বলে ফেলবো। সুতরাং শর্তের উপর সত্যতা স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবেঃ "আল্লাহর বাণীর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। যদি তোমাদের পেশকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে আমরা তা মেনে নিবো। আর যদি তোমরা তাতে পরিবর্তন করে ফেলে থাকো তবে আমরা তা মানতে পারি না।"

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত ইবরানী ভাষায় পাঠ করতো এবং মুসলমানদের জন্যে আরবী ভাষায় ওর তাফসীর করতো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও বলো না, মিথ্যাবাদীও বলো না। বরং তোমরা বলো– আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ তো একই এবং তাঁরই প্রতি আমরা আত্মসমর্পণকারী।"

হযরত আবূ নামলাহ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বসেছিলেন এমন সময় তাঁর নিকট একজন ইয়াহূদী এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই জানাযা কথা বলে কি?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন।" তখন ইয়াহূদী বলেঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই জানাযা কথা বলে।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেনঃ "এই ইয়াহূদীরা যখন তোমাদেরকে কোন কথা বলে তখন তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না। বরং তোমরা বলো– আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর। সুতরাং তারা যদি সত্য কথা বলে থাকে তাহলে তাদেরকে তোমাদের মিথ্যাবাদী বলা হলো না, আর যদি তারা মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে তোমাদের তাদেরকে সত্যবাদী বলা হলো না।"[১]

এটা মনে রাখা দরকার যে, এই আহলে কিতাবের অধিকাংশ কথাই তো ভুল ও মিথ্যা হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও ভুল ব্যাখ্যার প্রচলন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে। বলতে গেলে তাদের মধ্যে সত্য বলতে কিছুই নেই। তবুও যদি ধরে নেয়া হয় যে, তাদের কথার মধ্যেও সত্যতা কিছু রয়েছে তাহলেই বা আমাদের তাতে কি লাভ? আমাদের কাছে তো মহান আল্লাহর এমন এক শ্রেষ্ঠ কিতাব বিদ্যমান রয়েছে যা পূর্ণ ও ব্যাপক। এমন কিছু নেই যা এর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "আহলে কিতাবকে তোমরা কিছুই জিজ্ঞেস করো না। তারা নিজেরাই যখন পথভ্রষ্ট তখন কি করে তারা তোমাদেরকে পথ দেখাবে? হ্যাঁ, তবে এটা হয়ে যেতে পারে যে, তোমরা তাদের কোন সত্যকে মিথ্যা বলে দেবে বা কোন মিথ্যাকে সত্য বলে দেবে। স্মরণ রাখবে যে, আহলে কিতাবের অন্তরে তাদের ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি রয়েছে, যেমন মাল-ধনের ব্যাপারে তাদের লোভ-লালসা রয়েছে।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "কি করে তোমরা আহলে কিতাবকে (দ্বীন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে পার? তোমাদের উপর তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সবেমাত্রই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। এর মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে বলেই দিয়েছেন যে, আহলে কিতাব আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা আল্লাহর কিতাবকে বদলিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের হাতের লিখা কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে চালাতে শুরু করেছে। আর এভাবে তারা পার্থিব উপকার

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

লাভ করতে রয়েছে। তোমাদের কাছে যে আল্লাহর ইলম রয়েছে তা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তাদেরকে তোমরা জিজ্ঞেস করতে যাবে? এটা কত বড় লজ্জার কথা যে, তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছো অথচ তারা তোমাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না? এটা কি তোমরা চিন্তা করে দেখো না?"[১]

একদা মুআ'বিয়া (রাঃ) মদীনায় কুরায়েশদের একটি দলের সামনে বলেনঃ "দেখো, এসব আহলে কিতাবের মধ্যে তাদের কথা বর্ণনায় সবচেয়ে উত্তম ও সত্যবাদী হচ্ছেন হযরত কা'ব-আল্ আহবার (রঃ)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা কখনো কখনো তাঁর কথার মধ্যেও মিথ্যা পেয়ে থাকি। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন। বরং তিনি যে কিতাবগুলোর উপর নির্ভর করেন ওগুলোর মধ্যেই সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত রয়েছে। তাদের মধ্যে মযবূত ইলমের অধিকারী হাফিযদের দল ছিলই না। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীর সঃ) উপর আল্লাহর এটা একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাদের মধ্যে উত্তম মন মস্তিষ্কের অধিকারী, বিচক্ষণ ও মেধাবী এবং ভাল স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোক তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবুও দেখা যায় যে, এখানেও কতই না জাল ও বানানো হাদীস জমা হয়ে গেছে। তবে মুহাদ্দিসগণ এসব মিথ্যাকে সত্য হতে পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যেই।"

৪৭। এই ভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। শুধু কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○

৪৮। তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।

٤٨- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

---

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٤٩- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ○

৪৯। বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি যেমন পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আমার এই কিতাবের মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে এটা পাঠ করে। সুতরাং যেমন তারা তাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, অনুরূপভাবেই এই পবিত্র কিতাবকেও তারা মেনে চলে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ। আর ঐ লোকেরাও অর্থাৎ কুরায়েশ প্রভৃতি গোত্রের মধ্য হতেও কতকগুলো লোক এর উপর ঈমান এনে থাকে। হ্যাঁ, তবে যারা বাতিল দ্বারা হককে গোপন করে এবং সূর্যের আলো হতে চক্ষু বন্ধ করে নেয় তারা তো এই কিতাবকেও অস্বীকারকারী।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার উপর এই কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি তো তোমার বয়সের একটা বড় অংশ এই কাফিরদের মধ্যে অতিবাহিত করেছো। সুতরাং তারা তো ভালরূপেই জানে যে, তুমি লেখা পড়া জানতে না। সমস্ত গোত্র ও সারা দেশবাসী এ খবর রাখে যে, তোমার কোন আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না। এতদসত্ত্বেও যখন তুমি এক চারুবাক সম্পন্ন ও জ্ঞানপূর্ণ কিতাব পাঠ করছো তখন তো তা প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসেছে। তুমি তো একটি অক্ষরও কারো কাছে শিখোনি, অতএব কি করে তুমি এত বড় একটা কিতাব রচনা করতে পার?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এই কথাটিই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

অর্থাৎ "যারা আক্ষরিক জ্ঞান বিহীন রাসূল ও নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করে, যার গুণাবলী তারা তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জীলে পেয়ে থাকে, যে তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে।" (৭ ঃ ১৫৭)

বড় মজার কথা এই যে, আল্লাহর নিষ্পাপ নবী (সঃ)-কে সব সময়ের জন্যে লিখা হতে দূরে রাখা হয়। একটি অক্ষরও তিনি লিখতে পারতেন না। তিনি লেখক নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহর অহী লিখতেন। প্রয়োজনের সময় দুনিয়ার বাদশাহদের নিকট চিঠি-পত্র তাঁরাই লিখতেন। পরবর্তী ফকীহদের মধ্যে কাযী আবুল ওয়ালীদ বাজী প্রমুখ গুরুজন বলেছেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন নিম্নলিখিত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বহস্তে লিখেছিলেনঃ

هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ صلعم -

অর্থাৎ "এ হচ্ছে ঐ শর্তসমূহ যেগুলোর উপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ (সঃ) ফায়সালা করেছেন।" কিন্তু তাঁর এ উক্তি সঠিক নয়। কাযী সাহেবের মনে এ ধারণা জন্মেছে সহীহ বুখারীর ঐ রিওয়াইয়াত হতে যাতে রয়েছেঃ ثُمَّ اَخَذَ فَكَتَبَ অর্থাৎ "অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা নিলেন ও লিখলেন।" কিন্তু এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ثُمَّ اَمَرَ فَكُتِبَ অর্থাৎ "অতঃপর তিনি হুকুম করলেন তখন লিখা হলো।" পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত আলেমের এটাই মাযহাব। এমন কি তারা বাজী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তিকে কঠিনভাবে খণ্ডন করেছেন এবং তাঁদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁদের কবিতা ও ভাষণেও এঁদের উক্তি খণ্ডন করেছেন। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, কাযী সাহেব প্রমুখ মনীষীদের এটা ধারণা মোটেই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভালরূপে লিখতে পারতেন। বরং তাঁরা বলতেন যে, সন্ধিপত্রে তাঁর উপরোক্ত বাক্যটি লিখে নেয়া তাঁর একটি মু'জিযা ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, দাজ্জালের দু'চক্ষুর মাঝে 'কাফির' লিখা থাকবে এবং অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, 'কুফর' লিখিত থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবেন। অর্থাৎ লেখা পড়া না জানলেও সবাই পড়তে সক্ষম হবে। এটা মুমিনের একটা কারামাত হবে। অনুরূপভাবে উপরোক্ত বাক্য লিখে ফেলা আল্লাহর নবী (সঃ)-এর একটি মু'জিযা ছিল। এর ভাবার্থ এটা মোটেই নয় যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন।

কোন কোন লোক এই রিওয়াইয়াত পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হয়নি যে পর্যন্ত না তিনি কিছু শিখেছেন। কিন্তু এ রিওয়াইয়াতটি সম্পূর্ণ দুর্বল, এমন কি ভিত্তিহীনও বটে। কুরআন কারীমের এ আয়াতটির প্রতি

লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, কত জোরের সাথে এটা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর লেখাপড়া জানার কথা অস্বীকার করছে এবং কত জোরালো ভাষায় এটাও অস্বীকার করছে যে, তিনি লিখতে পারতেন।

এখানে যে ডান হাতের কথা বলা হয়েছে তা প্রায় বা অধিকাংশ ক্ষেত্র হিসেবে। নতুবা লিখা তো ডান হাতেই হয়। যেমন মহান আল্লাহর উক্তিঃ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ অর্থাৎ "না কোন পাখী যা ডানার সাহায্যে উড়ে।" (৬ ঃ ৩৮) কেননা, প্রত্যেক পাখীই তো ডানার সাহায্যেই উড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিরক্ষরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তুমি লেখাপড়া জানলে মিথ্যাচারীরা তোমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ পেতো যে, তুমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পড়ে, লিখে বর্ণনা করছো। কিন্তু এখানে তো এরূপ হচ্ছে না। এতদসত্ত্বেও এই লোকগুলো আল্লাহর নবী (আঃ)-এর উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের কাহিনী বর্ণনা করছেন, যা তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়। অথচ তারা ভালরূপেই জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লেখাপড়া জানেন না।

তাদের কথার উত্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

অর্থাৎ "তুমি বলে দাওঃ এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান ও যমীনের গোপনীয় বিষয় সম্যক অবগত আছেন।" (২৫ ঃ ৬)

এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ 'বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।' অর্থাৎ এই কুরআনের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। আলেমদের পক্ষে এগুলো বুঝা, মুখস্থ করা এবং জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া খুবই সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অর্থাৎ "কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্যে?" (৫৪ ঃ ৪০)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে এমন একটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকে ঈমান আনে। অনুরূপভাবে আল্লাহ আমার প্রতি একটি জিনিস অহী করেছেন। আমি আশা করি যে, সব নবী (আঃ)-এর অনুসারীদের চেয়ে আমার অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হবে।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় নবীকে সঃ) বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে পরীক্ষা করবো এবং তোমার কারণে জনগণকেও পরীক্ষা করবো। আমি তোমার উপর এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করবো যা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবে না। তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করতে থাকবে।" অর্থাৎ এটা পানিতে ধুলেও নষ্ট হবে না। যেমন অন্য হাদীসে এসেছেঃ "কুরআন চামড়ার মধ্যে থাকলেও তা আগুনে পুড়বে না।" কেননা, তা বক্ষে রক্ষিত থাকবে। পুস্তকটি মুখে পড়তে খুব সহজ। এটা অন্তরে সদা গাঁথা থাকে। শব্দ ও অর্থের দিক দিয়েও এটি একটি জীবন্ত মু'জিযা। এ কারণেই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এই উম্মতের একটি বিশেষণ এও বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَنَا جِيْلُهُمْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ

অর্থাৎ "তাদের কিতাব তাদের বক্ষে থাকবে।" ইমাম ইবনে জারীর কথাটি খুব পছন্দ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ -এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই কিতাবের পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না এবং নিজের হাতে কিছু লিখতে না। এই সুস্পষ্ট আয়াতগুলো আহলে কিতাবের জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকদের বক্ষে বিদ্যমান রয়েছে। কাতাদা (রঃ) ও ইবনে জুরায়েয (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। প্রথমটি হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি। আওফীও (রঃ) হযরত ইবনে অব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। যহ্হাকও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। এটাই বেশী প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে থাকে।' যারা সত্যকে বুঝেও না এবং ওদিকে আকৃষ্টও হয় না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনবে না যদিও তাদের কাছে সমস্ত আয়াত এসে যায়, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।" (১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৫০ - وَقَالُوا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫০। তারা বলেঃ তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বলঃ নিদর্শন আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।

৫১ - اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ ع

৫১। এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

৫২ - قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৫২। বলঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা ও অহংকারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কাছে এমনই নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল যেমন হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাছে তাঁর কওম নিদর্শন তলব করেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও– আয়াত, মু'জিযা এবং নিদর্শনাবলী দেখানো আমার সাধ্যের বিষয় নয়। এটা আল্লাহর কাজ। তিনি তোমাদের সৎ নিয়তের কথা জানলে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে মু'জিযা দেখাবেন। আর যদি তোমরা হঠকারিতা কর এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেই থাকো তবে আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ নন যে,

তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ـ

অর্থাৎ "নিদর্শনাবলী পাঠাতে আমাকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, পূর্বযুগীয় লোকেরা ওগুলো অবিশ্বাস করেছিল। পর্যবেক্ষণ হিসেবে আমি সামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর সাথে যুলুম করেছিল।" (১৭ ঃ ৫৯)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ শুধু তোমাদের কানে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের ভাল মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছি। পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করেছি। এখন তোমরা বুঝে সুঝে কাজ কর। সুপথে পরিচালিত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর কাজ। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ

অর্থাৎ "তাদেরকে হিদায়াত করা তোমার কাজ নয়, বরং আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করে থাকেন।" (২ ঃ ২৭২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোন পথ-প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।" (১৮ ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদের অত্যধিক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, অথচ তাদের কাছে অতি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এসে গেছে, যার মধ্যে কোনক্রমেই মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তারা নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে! এই কিতাব তো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। দুনিয়ার সমস্ত বাকপটু এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং এর মত কালাম পেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়ে গেছে। গোটা কুরআনের মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, দশটি সূরা, এমন কি একটি সূরা আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করতে সক্ষম হয়নি। তাহলে এতো বড় মু'জিযা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তারা অন্য নিদর্শন তলব করছে? এটি তো একটি পবিত্র গ্রন্থ যার মধ্যে অতীতের ও ভবিষ্যতের খবর এবং বিবাদের মীমাংসা রয়েছে। এটা এমন এক ব্যক্তির মুখে পঠিত হচ্ছে যিনি আক্ষরিক জ্ঞানশূন্য। যিনি কারো কাছে 'আলিফ, 'বা'ও পাঠ করেননি। যিনি কখনো একটি অক্ষরও লিখেননি এবং লিখতে জানেন না। যিনি কখনো বিদ্বানদের সাথেও উঠাবসা করেননি। তিনি এমন একটি কিতাব পাঠ করছেন যার দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানা যাচ্ছে। যার ভাষা লালিত্যপূর্ণ, যার ছন্দে মাধুর্য রয়েছে এবং যার বাচনভঙ্গী মনোমুগ্ধকর। যার মধ্যে দুনিয়াপূর্ণ উৎকৃষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে। বানী ইসরাঈলের আলেমরাও এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবগুলো এর সত্যতার সাক্ষী। ভাল লোকেরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং এর উপর আমলকারী। এতো বড় মু'জিযার বিদ্যমানতায় অন্য মু'জিযা দেখতে চাওয়া এর প্রতি চরম বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এতে অবশ্যই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। এই কুরআন সত্যকে প্রকাশকারী, মিথ্যাকে ধ্বংসকারী। এই কিতাব পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরে মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে এবং পাপীদের পরিণাম প্রদর্শন করে মানুষকে পাপকর্ম হতে বিরত রাখছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও- আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাদের অবিশ্বাস ও হঠকারিতা এবং আমার সত্যবাদিতা ও শুভাকাঙ্ক্ষা সম্যক অবগত। আমি যদি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতাম তবে অবশ্যই তিনি আমা হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। তিনি এ ধরনের লোকদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়েন না। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ۝لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ-

অর্থাৎ "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্তে ধরে ফেলতাম এবং কেটে ফেলতাম তার জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।" (৬৯ ঃ ৪৪-৪৭)

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত। অর্থাৎ কোন গোপন বিষয় তাঁর কাছে গোপন নেই।

অতঃপর ঘোষিত হচ্ছে– যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। এখানে তারা যে ঔদ্ধত্যপনা দেখাচ্ছে এর শাস্তি তাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে। আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং প্রতিমাগুলোকে মেনে চলা, এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে? তিনি সবকিছুই জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞানময়। পাপীদেরকে তাদের পাপকর্মের শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না।

৫৩। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো তবে শাস্তি তাদের উপর আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে।

٥٣- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৪। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।

٥٤- يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ○

৫৫। সেই দিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেনঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

٥٥- يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○

মুশরিকরা যে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর আযাব চাচ্ছিল তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মুশরিকরা নবী (সঃ)-কে আল্লাহর শাস্তি আনয়নের কথা বলেছিল এবং স্বয়ং আল্লাহর নিকটও প্রার্থনা করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থাৎ "(স্মরণ কর) যখন তারা বলেছিল– হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার নিকট হতে সত্য হয় তবে আকাশ হতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আনয়ন কর।" (৮ ঃ ৩২)

এখানে তাদেরকে জবাব দেয়া হচ্ছে– যদি বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা নির্ধারিত না থাকতো যে, এই কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে তবে তাদের শাস্তি চাওয়া মাত্রই তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি নেমে আসতো। এখন তাদের এর প্রতিও বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলছে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, জাহান্নাম তো তাদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত কথা যে, শাস্তি তাদের উপর আসবেই।

হযরত শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "এই বাহ্‌রে আখযারই (সবুজ সাগর)[1] হবে ঐ জাহান্নাম যাতে তারকারাজি ঝরে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র আলোশূন্য হয়ে এতে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা জ্বলে উঠবে এবং জাহান্নামে পরিণত হবে।"[2]

সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "সমুদ্রই জাহান্নাম।" তখন হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইয়া'লা (রাঃ)-কে জনগণ জিজ্ঞেস করে– আপনারা দেখেন না যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

অর্থাৎ " অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে।" (১৮ ঃ ২৯) উত্তরে ইয়া'লা (রাঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে ইয়া'লার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি তাতে কখনো প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত না আমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং এর এক ফোঁটাও আমার কাছে পৌঁছবে না যে পর্যন্ত না আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাযির করা হবে।"[3]

---

১. সবুজ সাগর বলতে আরবগণ আরব উপকূল হতে ভারতের মধ্যবর্তী জলরাশিকে বুঝে।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এ তাফসীরও খুবই গারীব এবং এ হাদীসও অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ সেই দিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ

অর্থাৎ "তাদের জন্যে জাহান্নামের (অগ্নির) বিছানা হবে এবং তাদের উপরে (আগুনেরই) ওড়না হবে।" (৭ ঃ ৪১ আর একটি আয়াতে আছেঃ

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

অর্থাৎ "তাদের উপরে হবে আগুনের সামিয়ানা এবং নীচে হবে আগুনেরই বিছানা।" (৩৯ ঃ ১৬) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِ هِمْ

অর্থাৎ "যদি কাফিররা ঐ সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সামনে হতে ও পিছন হতে আগুন সরাতে পারবে না।" (২১ ঃ ৩৯) এসব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই কাফিরদেরকে চতুর্দিক হতে আগুন পরিবেষ্টন করবে। তাদের সামনে হতে, পিছন হতে, উপর হতে, নীচ হতে, ডান দিক হতে এবং বাম দিক হতে আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। একদিক হতে তো তাদের উপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর শাসন, গর্জন ও ধমক আসতে থাকবে, অপরদিক হতে সদা তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। সুতরাং এক তো এই বাহ্যিক ও দৈহিক শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ এই মানসিক শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

অর্থাৎ "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেই দিন বলা হবে– জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (৫৪ ঃ ৪৮-৪৯) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا - هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ - اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (বলা হবে) এই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছো না? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।" (৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৬। হে আমার মুমিন বান্দারা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

٥٦- يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ○

৫৭। জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥٧- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

৫৮। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের।

٥٨- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○ صلے

৫৯। যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

٥٩- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৬০। এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহই রিযক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

٦٠- وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যেখানে তারা দ্বীনকে কায়েম রাখতে পারবে না সেখান থেকে তাদেরকে এমন জায়গায় চলে যেতে হবে যেখানে তারা দ্বীনের কাজ স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ্র যমীন খুব প্রশস্ত। সুতরাং যেখানে তারা আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবেক তাঁর ইবাদতে লেগে থেকে তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করতে পারবে সেখানেই তাকে হিজরত করতে হবে।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "সমস্ত শহর আল্লাহ্র শহর এবং সমস্ত বান্দা আল্লাহ্র দাস। যেখানে তুমি কল্যাণ লাভ করবে সেখানেই অবস্থান করবে।"[১]

সাহাবায়ে কিরামের জন্যে মক্কায় অবস্থান যখন কষ্টকর হয়ে গেল তখন তাঁরা হিজরত করে হাবশায় চলে গেলেন, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তথাকার বুদ্ধিমান ও দ্বীনদার বাদশাহ্ সাহমাহ্ নাজ্জাশী (রঃ) পূর্ণভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেন। সেখানে তাঁরা মর্যাদা ও পরম আনন্দের সাথে বসবাস করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় হিজরত করেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সবকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে। কাজেই তোমাদের জীবন আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার কাজে কাটিয়ে দেয়া উচিত যাতে মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে গিয়ে বিপদে পড়তে না হয়। মুমিন ও সৎ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদনের সুউচ্চ প্রসাদে পৌঁছিয়ে দিবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কতই না উত্তম! সেখান হতে তাদেরকে কখনো বের করা হবে না। না তথাকার নিয়ামতরাজি কখনো শেষ হবে, না কিছু হ্রাস পাবে। মুমিনদের সৎকার্যের বিনিময়ে তাদেরকে যে জান্নাতী প্রাসাদ দেয়া হবে তা সত্যিই পরম আরামদায়ক। যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর পথে হিজরত করে। যারা আল্লাহর শত্রুদেরকে পরিত্যাগ করে এবং তাঁর পথে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে বিসর্জন দেয় এবং তাঁর নিয়ামত ও পুরস্কারের আশায় পার্থিব সুখ-শান্তির উপর লাথি মারে।

আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে এমন অট্টালিকা রয়েছে যার বাইরের দিক ভিতরের দিক হতে এবং ভিতরের দিক বাইরের দিক হতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা তা এমন লোকদের জন্যে বানিয়েছেন যারা (মানুষকে) খাদ্য খেতে দেয়, ভাল কথা বলে, নিয়মিতভাবে নামায পড়ে ও রোযা রাখে এবং রাত্রে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। আর তারা পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে থাকে।"[১]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, রিযিক কোন জায়গার সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং আল্লাহর বন্টনকৃত রিযিক সাধারণভাবে সর্বজায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। যে যেখানে থাকে সেখানেই তার রিযিক পৌঁছে যায়। মুহাজিরদের (রাঃ) হিজরতের পর তাঁদের রিযিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এতো বরকত দেন যে, তাঁরা দুনিয়ার দূর দূর প্রান্তের মালিক হয়ে যান। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য জমা রাখার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলাই ওগুলোকে খাদ্য দান করে থাকেন এবং মানুষেরও খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই করে থাকেন। তিনি কোন সৃষ্টজীবকে কখনো ভুলে যান না। পিঁপড়াকে ওর গর্তে, পাখীকে আসমান ও যমীনের ফাঁকা জায়গায় এবং মাছকে পানির মধ্যেই তিনি খাদ্য পৌঁছিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সবারই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।" (১১ ঃ ৬)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। মদীনার বাগানসমূহের একটি বাগানে তিনি গেলেন এবং মাটিতে

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পড়ে থাকা খারাপ খেজুরগুলো পরিষ্কার করে করে তিনি খেতে লাগলেন এবং আমাকেও খেতে বললেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই (খারাপ) খেজুরগুলো খেতে আমার মন চায় না। তিনি বললেনঃ আমার তো এগুলো খেতে খুব ভাল লাগছে। কেননা, আজ চতুর্থ দিনের সকাল, এ পর্যন্ত আমি কিছুই খাইনি এবং না খাওয়ার কারণ এই যে, আমার খাবার জুটেনি। আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা জানাতাম তবে তিনি আমাকে কিসরা (পারস্য সম্রাট) এবং কায়সারের (রোমক সম্রাট) মালিক করে দিতেন। হে ইবনে উমার (রাঃ)! তোমার কি অবস্থা হবে যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে যারা কয়েক বছরের খাদ্য জমা করে রাখবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে।" আমি তো ঐ অবস্থাতেই রয়েছি এমন সময় وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا.... الخ-এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "মহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডার জমা করার এবং কু-প্রবৃত্তির পিছনে লেগে পড়ার নির্দেশ দেননি। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডার জমা করে এবং এর দ্বারা চিরস্থায়ী জীবন কামনা করে, তাঁর বুঝে নেয়া উচিত যে, চিরস্থায়ী জীবন তো আল্লাহর হাতে। জেনে রেখো যে, না আমি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) জমা করবো, না কালকের জন্যে আজ খাদ্যস্তূপ জমা রাখবো।"[১]

বর্ণনা করা হয় যে, কাকের ডিম হতে যখন বাচ্চা বের হয়, তখন বাচ্চাগুলোর পালক ও লোম সাদা হয়। এই দেখে কাক ওগুলোকে ঘৃণা করে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর ঐ শাবকগুলোর পালক কালো বর্ণ ধারণ করে। তখন ওদের মা-বাপ ওদের কাছে ফিরে আসে এবং আহার দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় যখন ওদের বাপ-মা ওদেরকে ঘৃণা করে ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং কাছেও আসে না তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ ছোট ছোট মশাগুলো ঐ বাচ্চাগুলোর নিকট পাঠিয়ে দেন এবং ঐ মশাগুলোই ওদের খাদ্য হয়ে যায়।

নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সফর কর, তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং রিযিক প্রাপ্ত হবে।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সফর কর, তাহলে তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং তোমরা গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) লাভ করবে।"[২]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা গারীব হাদীস। এর বর্ণনাকারী আবুল আতূফ জাযরী দুর্বল।

২. এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সফর কর, তাহলে তোমরা লাভবান হবে, রোযা রাখো, তোমরা সুস্থ থাকবে এবং যুদ্ধ কর, গনীমত লাভ করবে।"[১] আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ "তোমরা ভাগ্যবান ও স্বচ্ছলদের সাথে সফর কর।"

মহান আল্লাহর উক্তিঃ তিনি সর্বশ্রোতা অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদের কথাগুলো শ্রবণকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ বান্দাদের অঙ্গভঙ্গী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

٦١- وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৬১। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

٦٢- اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬২। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٦٣- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৬৩। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ ভূমি মৃত হবার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! বলঃ প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করে না।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এটা সাব্যস্ত করছেন যে, সঠিক ও প্রকৃত মা'বূদ তিনিই। স্বয়ং মুশরিকরাও এটা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, সূর্য ও চন্দ্রকে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিতকারী, দিবস ও রজনীকে পর্যায়ক্রমে আনয়নকারী, সৃষ্টিকর্তা, আহার্যদাতা এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। ধনী হওয়ার হকদার কে এবং দরিদ্র হওয়ার হকদার কে তা তিনিই ভাল জানেন। বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনিই ভাল খবর রাখেন।

সুতরাং মুশরিকরা নিজেরাই যখন স্বীকার করে যে, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং সবকিছুরই উপর তিনিই পূর্ণ ক্ষমতাবান, তখন তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা কেন করছে? আর কেনই বা তারা অন্যদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে? রাজ্যের মালিক যখন একমাত্র তিনিই তখন ইবাদতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই হবেন। পালনকর্তা হিসেবে তাঁকে এক মেনে নিয়ে তারা উপাস্য হিসেবে তাঁকে এক মানছে না। এটা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। কুরআন কারীমের মধ্যে তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের সাথে সাথেই তাওহীদে উলূহিয়্যাতের বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে। কেননা, মক্কার মুশরিকরা তাওহীদে রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করতো। তাই তাদেরকে বিবেচক হতে বলে তাওহীদে উলূহিয়্যাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। মুশরিকরা হজ্ব ও উমরার সময় 'লাব্বায়েক' বলার মাধ্যমেও আল্লাহকে অংশীবিহীন স্বীকার করতো। তারা বলতোঃ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু এমন অংশীদার রয়েছে যার মালিক এবং যার রাজ্যেরও মালিক আপনি।"

٦٤- وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৪। এই পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।

٦٥- فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৫। তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।

٦٦- لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬। ফলে তাদের প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে।

দুনিয়ার তুচ্ছতা, ঘৃণ্যতা, নশ্বরতা এবং ধ্বংসশীলতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। এ দুনিয়া তো খেল-তামাশার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে আখিরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী ও অবিনশ্বর। এটা ধ্বংস, নষ্ট, হ্রাস ও তুচ্ছতা হতে মুক্ত। যদি তাদের জ্ঞান বুদ্ধি থাকতো তবে কখনো এই স্থায়ী জিনিসের উপর অস্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দিতো না।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন যে, এই মুশরিকরা অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় এক ও অংশী বিহীন আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় এবং কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন অন্যদেরকে ডাকতে শুরু করে দেয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ

অর্থাৎ “সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ আপদ স্পর্শ করে তখন যাদেরকে ডাকতে তাদের সবকে ভুলে গিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডেকে থাকো, অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন তোমরা তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যাও।” (১৭ ঃ ৬৭) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা জয় করেন তখন ইকরামা (রাঃ) ইবনে আবি জেহেল সেখান হতে পালিয়ে যান এবং হাবশায় গমনের ইচ্ছা করে নৌকায় আরোহণ করেন। ঘটনাক্রমে ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হয়ে যায় এবং নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। নৌকায় যত মুশরিক ছিল সবাই বলে ওঠেঃ "এটা হলো এক আল্লাহকে ডাকার সময়। ওঠো এবং এসো, আমরা মুক্তির জন্যে তাঁরই নিকট বিশুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করি। এখন মুক্তি দেয়ার ও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে।" একথা শোনা মাত্রই ইকরামা (রাঃ) বলে উঠেনঃ "দেখো, আল্লাহর কসম! সমুদ্রের বিপদে যদি উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই থাকে তবে স্থল ভাগের বিপদ হতেও উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, যদি আমি এই বিপদ হতে রক্ষা পাই তবে সরাসরি গিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর হাতে হাত রেখে তাঁর কালেমা পাঠ করবো। আমার বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমার অপরাধ মার্জনা করবেন এবং আমার প্রতি দয়া করবেন।" তিনি তাই করেন।

لِيَكْفُرُوْا এবং لِيَتَمَتَّعُوْا শব্দদ্বয়ের শুরুতে যে لَام অক্ষরটি রয়েছে একে لَام عَاقِبَت (পরিণাম সম্বন্ধীয় لَام) বলা হয়েছে। কেননা, তারা ওটা ইচ্ছা করে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন তাদের দিকে সম্বন্ধ লাগানো হবে তখন এটা হবে لَام عَاقِبَت বা পরিণাম সম্বন্ধীয় লাম। তবে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে ওটা হবে لَام تَعْلِيْل বা কারণ সম্বন্ধীয় লাম। لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا (২৮ঃ ৮) এই আয়াতের তাফসীরে আমরা এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

৬৭। তারা কি দেখে না যে, আমি হারমকে নিরাপদ স্থান করেছি অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

٦٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○

৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?”	٦٨- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝
৬৯। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো; আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।	٦٩- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা কুরায়েশদের উপর নিজের একটি অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাদেরকে নিজের হারম শরীফে স্থান দিয়েছেন। এটা এমন এক জায়গা যে, এখানে কেউ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। এর আশে-পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুট-পাট হতে থাকে। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

অর্থাৎ “যেহেতু কুরায়েশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। তারা ইবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।” (১০৬ ঃ ১) তাহলে এতো বড় নিয়ামতের শুকরিয়া কি এটাই যে, তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরও ইবাদত করবে? ঈমান আনয়নের পরিবর্তে কুফরী করবে? এবং নিজেরা ধ্বংস হয়ে অন্যদেরকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে? তাদের তো উচিত ছিল যে, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকবে এবং শেষ নবী (সঃ)-এর পুরোপুরি অনুসারী হবে। কিন্তু এর বিপরীত তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতে, কুফরী করতে এবং নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস করতে ও তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের ঔদ্ধত্য এমন চরমে

পৌঁছেছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে মক্কা থেকে বের করে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে আল্লাহর নিয়ামত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। বদরের যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর হাতে মক্কা জয় করিয়েছেন এবং তাদেরকে করেছেন লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। অহী না আসলেও বলে যে, তার উপর আল্লাহর অহী এসেছে। তার চেয়েও বড় যালিম কেউ নেই যে আল্লাহর সত্য অহীকে এবং সত্যকে অবিশ্বাস করে এবং হক এসে যাওয়ার পরেও ওকে অবিশ্বাস করার কাজে উঠে পড়ে লেগে যায়। এইরূপ মিথ্যা আরোপকারী ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা কাফির। আর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ), তাঁর সাহাবীবর্গ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রামকারীদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথে পরিচালিত করবো।' হযরত আবূ আহমাদ আব্বাস হামাদানী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যারা নিজেদের ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে ঐ সব বিষয়েও সুপথ প্রদর্শন করবেন যা তাদের ইলমের মধ্যে নেই।

আবূ সালমান দারানী (রঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ যার অন্তরে কোন কথা জেগে ওঠে, যদিও তা ভাল কথাও হয়, তবুও ওর উপর আমল করা ঠিক হবে না যে পর্যন্ত না কুরআন ও হাদীস দ্বারা ওটা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয়ে গেলে ওর উপর আমল করতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে যে, তিনি তার অন্তরে এমন কথা জাগিয়ে দিয়েছেন যা কুরআন ও হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ "ইহসান হচ্ছে ওরই নাম যে, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যে সদ্ব্যবহার করে তার সাথে সদ্ব্যবহার করার নাম ইহসান নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা ঃ আনকাবূত এর তাফসীর সমাপ্ত

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا: ٦٠، رُكُوْعَاتُهَا: ٦)

সূরা ঃ রূম, মাক্কী

(আয়াতঃ ৬০, রুকূ'ঃ ৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- الٓمّٓ ۝

১। আলিফ-লাম-মীম

٢- غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝

২। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে,

٣- فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

৩। নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে,

٤- فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৪। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে,

٥- بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

৫। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٦- وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

٧- يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৭। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।

এই আয়াতগুলো ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন পারস্য সম্রাট সা'বূর সিরিয়া রাজ্য ও জযীরার আশে পাশের শহরগুলোর উপর বিজয় লাভ করে এবং রোমক

সম্রাট হিরাক্লিয়াস পরাজিত হয়ে কনস্টান্টিনোপলে অবরুদ্ধ হন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকে। পরিশেষে পরিবর্তন হয় এবং হিরাক্লিয়াসের বিজয় লাভ হয়। বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রোমকদেরকে পরাজয়ের উপর পরাজয় বরণ করতে হয় এবং এতে মুশরিকরা খুবই আনন্দিত হয়। কেননা, তাদের মত পারস্যবাসীরাও ছিল মূর্তিপূজক। আর মুসলমানরা কামনা করতো যে, যেন রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। কেননা, কমপক্ষে তারা আহলে কিতাব তো ছিল।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "রোমকরা সত্বরই বিজয় লাভ করবে।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ খবর মুশরিকদের নিকট পৌঁছালে তারা বলেঃ "এসো, একটি সময়কাল নির্ধারণ কর। যদি এই সময়ের মধ্যে রোমকরা বিজয় লাভ না করে তবে তোমরা আমাদেরকে এতো এতো দিবে। আর যদি তোমাদের কথা সত্যে পরিণত হয় তবে আমরা তোমাদেরকে এতো এতো দিবো।" সুতরাং পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারিত হলো। এই মেয়াদও পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু রোমকরা বিজয় লাভে সমর্থ হলো না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খিদমতে এ খবরও পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ "দশ বছরের মেয়াদ কেন নির্ধারণ করনি?"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে মেয়াদের জন্যে بِضْعِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রয়োগ হয়ে থাকে দশ হতে কমের উপর। হয়েছিলও তাই। দশ বছরের মধ্যেই রোমকরা জয়যুক্ত হয়েছিল। এরই কারণ এ আয়াতে রয়েছে।[১]

হযরত সুফইয়ান (রঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের পর রোমকরাও পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, পাঁচটি জিনিস গত হয়ে গেছে। دُخَانٌ ধোঁয়া, لِزَامٌ শাস্তি, بَطْشَةٌ আক্রমণ, شَقُّ قَمَرٍ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, এবং رُوْمٌ রোমকদের বিজয়।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে দুর্বল বলেছেন।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর শর্ত ছিল সাত বছর। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ " بِضْع শব্দের অর্থ তোমাদের কাছে কি?" জবাবে তিনি বললেনঃ 'দশের কম।' রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন বললেনঃ "যাও, সময় আরো দু' বছর বাড়িয়ে নাও।" সুতরাং ঐ সময়ে রোমকরা বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়। ফলে মুসলমানরা আনন্দে মেতে ওঠে। এ আয়াতে এগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, মুশরিকরা এ আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "এ ব্যাপারেও কি তুমি তোমাদের নবী (সঃ)-কে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস কর?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।" অতঃপর শর্ত করা হলো এবং মেয়াদ নির্ধারিত হলো। এরপর মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রোমকরা বিজয় লাভ করতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই শর্তের কথা জানতে পেরে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেনঃ "তুমি কেন এ কাজ করতে গেলে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্যবাদিতার উপর ভরসা করেই আমি একাজ করেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "যাও, সময় বাড়িয়ে দশ বছর করে নাও। যদি তাতে শর্তের মূল্য বাড়াতে হয় তবুও।" তিনি গেলেন। মুশরিকরা তা মেনে নিলো এবং সময় বাড়িয়ে দশ বছর করে দিলো। অতঃপর দশ বছর পূর্ণ না হতেই রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করলো। মাদায়েন পর্যন্ত তাদের সেনাবাহিনী পৌঁছে গেল। সেখানে তারা তাদের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলো।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) কুরায়েশদের নিকট হতে শর্তের সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ঐ সম্পদ সাদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এটা বাজি ধরা হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। এতে ছয় বছর সময় ধার্য করা হয়েছিল। এতে আরো আছে যে, যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় তখন বহু মুশিরক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[১]

ইমাম সুনায়েদ ইবনে দাউদ (রঃ) স্বীয় তাফসীরে একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেনঃ পারস্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল যার পুত্রেরা ছিল বড় বড় বীরপুরুষ। তারা যেন দেশের বাদশাহই ছিল। কোন এক সময় পারস্য সম্রাট কিসরা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে

১. এটা জামেউত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।

পাঠিয়ে বলেঃ "আমি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের ইচ্ছা করেছি এবং তোমার পুত্রদের কোন একজনকে আমার সেনাবাহিনীতে সেনাপতি করতে চাচ্ছি। এখন কাকে সেনাপতি করা যায় তা তুমিই বলে দাও।" একথা শুনে স্ত্রীলোকটি বললোঃ "আমার অমুক ছেলেটি তো শৃগাল অপেক্ষা বেশী ধোঁকাবাজ এবং শিকারী বাজপাখী হতে বেশী বুদ্ধিমান। আমার এই দ্বিতীয় ছেলেটির নাম ফারখান। সে ধনুকের তীরের ন্যায় ক্ষুরধার। আমার তৃতীয় ছেলেটি হলো শহরবারায। সে আমার তিনটি ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল। এখন আপনি যাকে ইচ্ছা সেনাপতি নিযুক্ত করতে পারেন।" বাদশাহ বহুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর শহরবারাযকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল এবং রোমকদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করলো। শত্রু পক্ষীয় সৈন্যরা নিহত হলো এবং শহর একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল। তাদের ফলবান বৃক্ষাদি ধ্বংস করে দেয়া হলো এবং তাদের সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামল দেশ বিজনে পরিণত হলো।

আযরেআ'ত ও বসরাতে যে দু'টি শহর ছিল তা আরব-এলাকা সংলগ্ন ছিল। সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং পারসিকরা রোমকদের উপর জয়লাভ করলো। এতে কুরায়েশরা খুবই আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো। মুসলমানরা এতে দুঃখিত হলো। কুরায়েশরা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। তারা মুসলমানদেরকে বলতে লাগলোঃ "তোমরা ও খৃষ্টানরা আহলে কিতাব, আর আমরা ও পারসিকরা অজ্ঞ, মূর্খ। আমাদের লোকেরা তোমাদের লোকদের উপর জয়লাভ করেছে। এভাবে আমরাও তোমাদের উপর জয়লাভ করবো। এখন যদি আবার যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে আমরা পারসিকদের ন্যায় জিতে যাবো এবং তোমরা রোমকদের ন্যায় হবে পরাজিত।" এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ-فِیْٓ اَدْنَی الْاَرْضِ .... یَنْصُرُ مَنْ یَّشَآءُ -এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুশরিকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে বলেনঃ "এ বিজয়ে গর্ব করো না, অতিসত্বরই এ বিজয় পরাজয়ে পরিবর্তিত হবে। আমাদের ভাই আহলে কিতাবরা তোমাদের ভাইদের উপর জয়লাভ করবে। আমার এ কথাগুলো তোমরা বিশ্বাস করে নাও, যেহেতু এগুলো আমার কথা নয়, বরং এগুলো হলো আমাদের নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।"

তাঁর একথা শুনে উবাই ইবনে খালফ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললোঃ "হে আবুল ফযল (রাঃ)! তুমি মিথ্যা বলছো।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বললেনঃ "রে আল্লাহর দুশমন! আমি আমার একথার উপর দশটি উষ্ট্রী বাজি রাখলাম। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভে সমর্থ না হয় তবে আমি এ দশটি উষ্ট্রী তোমাদেরকে দিয়ে দিবো। আর যদি তারা জয়লাভ করে তবে তোমাদেরকে দশটি উষ্ট্রী দিতে হবে। উভয়ের মধ্যে এ শর্ত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "আমি তো তোমাকে তিন বছরের কথা বলিনি। কুরআন কারীমে بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা তিন হতে নয় বছর সময়কে বুঝায়। সুতরাং যাও, ফিরে যাও। উষ্ট্রীর সংখ্যাও বাড়িয়ে দাও এবং সময়ও কিছু বাড়িয়ে নাও।"

হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন উবাই-এর কাছে গেলেন। উবাই তাঁকে বললোঃ "সম্ভবত তুমি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছো।" তিনি বললেনঃ "না, বরং আমি পূর্বের চেয়ে আরো শক্ত মন নিয়ে এসেছি।" এসো, সময়ও কিছু বাড়িয়ে নেয়া যাক এবং বাজির মালের পরিমাণও কিছু বাড়িয়ে দেয়া হোক।" সুতরাং বাজির মালের সংখ্যা নির্ধারিত হলো একশটি উট এবং সময়কাল নির্ধারিত হলো ৯ (নয় বছর)। ঐ সময়ের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর জয়লাভ করলো। ফলে মুসলমানরা মুশরিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন।

রোমকদের বিজয় লাভের ঘটনা এই যে, পারসিকরা যখন রোমকদের উপর জয়লাভ করে তখন শহর বারাযের ভাই ফারখান মদ্যপানরত অবস্থায় বলেঃ "আমি দেখি যে, আমি যেন কিসরার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছি এবং পারস্যের বাদশাহ হয়ে গেছি।" এ খবর পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পৌঁছা মাত্রই সে শহরবারাযের কাছে চিঠি লিখলোঃ "আমার এ পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি তোমার ভাই ফারখানের মাথা কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।" শহরবারায উত্তরে কিসরাকে লিখলোঃ "হে বাদশাহ! এতো তাড়াতাড়ি করবেন না। ফারখানের মত এতো বড় সাহসী পুরুষ এবং শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শক্তিশালী যুবক আর কেউই নেই।" সম্রাট পুনরায় লিখলোঃ "ফারখানের ন্যায় সাহসী বীর পুরুষ আমার দরবারে আরো বহু রয়েছে। এজন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমার আদেশ তাড়াতাড়ি কার্যকর কর।" শহরবারায আবার উত্তর দিলো এবং সম্রাটকে বুঝালো। এতে সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো। সে ঘোষণা

করলোঃ "শহরবারাযকে সেনাপতির পদ হতে বরখাস্ত করা হলো এবং তার স্থলে তার ভাই ফারখানকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো।" এভাবে একটি পত্র লিখে দূত মারফত তা শহরবারাযের নিকট পাঠিয়ে দিলো এবং তাকে বলা হলোঃ "তুমি আজ থেকে সেনাপতির পদ হতে অপসারিত হলে। তুমি তোমার দায়িত্ব ফারখানকে বুঝিয়ে দাও।" সম্রাট এর সাথে আর একটি গোপনীয় পত্র দূতের হাতে দিয়ে বলেছিল যে, শহরবারায যখন তার দায়িত্ব ফারখানকে বুঝিয়ে দেবে তখন এই গোপনীয় পত্রটি যেন সে তার হাতে দিয়ে দেয়।

শহরবারায পত্র পাওয়া মাত্রই সম্রাটের আদেশ মেনে নিলো এবং ফারখানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলো। অতঃপর ফারখান সেনাপতির দায়িত্ব নিলো। তারপর দূত দ্বিতীয় পত্রটি ফারখানের হাতে দিলো। ঐ পত্রে শহরবারাযকে হত্যা করে তার মাথা শাহী দরবারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ ছিল। পত্র পড়ে ফারখান শহরবারাযকে ডেকে নিলো এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলো। শহরবারায তাকে বললোঃ "এতো তাড়াতাড়ি করো না, আমাকে একটু সময় দাও। কমপক্ষে অসিয়তের সময়টুকু তো দেবে?" ফারখান তার আবেদন মঞ্জুর করলো এবং তাকে কিছু সময় দিলো। অতঃপর শহরবারায তার পুরাতন কাগজ-পত্রগুলো আনিয়ে নিলো যেগুলো কিসরা (পারস্য সম্রাট) তার কাছে পাঠিয়েছিল এবং যেগুলোতে ফারখানকে হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কাগজগুলো ফারখানের সামনে রেখে দিলো এবং বললোঃ "দেখো, তোমার ব্যাপারে সম্রাটের সাথে আমার কত কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু আমি আমার জ্ঞানের সাহায্য নিয়েছি, তাড়াতাড়ি করিনি। আর তুমি একটিমাত্র পত্র পেয়েই আমাকে হত্যা করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলে? এ পত্রগুলো দেখে একটু চিন্তা-ভাবনা কর।" পত্রগুলো দেখে ফারখানের চোখ খুলে গেল। সে সাথে সাথে সেনাপতির পদ হতে নেমে গেল এবং পুনরায় শহরবারাযকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করলো।

শহরবারায তৎক্ষণাৎ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পত্র লিখে তাঁর সাথে গোপন সাক্ষাতের আবেদন জানালো। সে সম্রাটকে জানালো যে, তাঁর সাথে তার একটি বিশেষ কাজের জন্য পরামর্শের প্রয়োজন আছে। একথাগুলো কোন দূত মারফত বলা সম্ভব নয়। তাই সে কথাগুলো মৌখিকভাবে তাঁর কাছে পেশ করতে চায়। সে আরো লিখলোঃ "পঞ্চাশটি লোক সাথে নিয়ে আপনি স্বয়ং চলে আসুন, আর পঞ্চাশজন লোক আমার সাথে থাকবে।" রোমক সম্রাট কায়সারের কাছে যখন এ খবর পৌঁছলো তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হয়ে গেলেন। কিন্তু সতর্কতা হিসেবে তিনি নিজের সাতে পাঁচ হাজার লোক নিলেন। পূর্বেই তিনি গুপ্তচরদেরকে পাঠিয়ে দিলেন যাতে ভিতরে কোন প্রতারণা বা ষড়যন্ত্র থাকলে তা ধরা পড়ে যায়। গুপ্তচররা গেল এবং রিপোর্ট দিলো যে, ভয়ের কোন কারণ নেই। শহরবারায মাত্র পঞ্চাশজন সওয়ার নিয়ে যথাস্থানে হাযির হলো। তার সাথে অন্য কেউ থাকলো না। সুতরাং রোমক সম্রাট নিশ্চিন্ত হয়ে অতিরিক্ত ঘোড় সওয়ারদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। সাথে পঞ্চাশজন মাত্র লোক রাখলেন। অতঃপর তিনি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে একটি রেশমী মঞ্চ ছিল। উভয়ের পঞ্চাশ পঞ্চাশজন লোককে পৃথক পৃথক করে দেয়া হলো। উভয় দলই সেখানে নিরস্ত্র অবস্থায় ছিল। সাথে থাকলো ছুরি চাকু। অতঃপর শহরবারায বললোঃ "হে রোমক সম্রাট! আপনার দেশকে বিরান এবং আপনার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছি আমরা দু'ভাই। আমরা দু'ভাই চতুরতা ও বীরত্বের মাধ্যমে আপনার দেশকে জয় করেছি। কিন্তু আমাদের সম্রাট কিসরা আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করতে শুরু করেছে। সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আমার কাছে সে আমার ভাইকে হত্যা করার ফরমান পাঠিয়েছে। এ ফরমান আমি অমান্য করলে এরই অপরাধে সে চালাকী করে আমার ভাই-এর কাছে আমাকে হত্যা করার ফরমান পাঠিয়েছে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দু'ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা আপনার বাহিনীভুক্ত হয়ে কিসরার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।" রোমক সম্রাট তার এ প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলেন। অতঃপর দু'জনের মধ্যে ইঙ্গিত ইশারায় কিছু কথাবার্তা হলো। আর এর অর্থ হলো এই যে, দু'জন দোভাষীকে হত্যা করে দেয়া হোক, যাতে এ দু'জনের কারণে এ গোপন তথ্য প্রকাশ না হয়ে পড়ে। কারণ দুয়ের পর তিনের কানে কোন কথা গেলে তা প্রকাশ হয়েই যায়। উভয়ে একথায় একমত হলো এবং দু'জন দাঁড়িয়ে নিজ নিজ দোভাষীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ফেললো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিসরাকে খতম করে দিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছলো। তাঁর সঙ্গীরা এ সংবাদে খুবই আনন্দিত হলেন। এ ঘটনাটি সত্যিই বিস্ময়করই বটে।

এখন আয়াতের শব্দগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। হুরূফে মুকাত্তাআ'ত যেগুলো সূরার প্রথমে এসে থাকে, এগুলো সম্পর্কে আমি সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে আলোচনা করেছি। রোমকরা সবাই আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত। এরা বানী ইসরাঈলের চাচাতো ভাই। রোমকদেরকে বানু আসফারও বলা হয়। এরা ইউনানীয়দের মাযহাবের উপর

ছিল। ইউনানীরা ছিল ইয়াফাস ইবনে নূহ (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। এরা তুর্কীদের চাচাতো ভাই। এরা ছিল তারকার পূজারী। সাতটি তারকার উপাসনা করতো। এদেরকে মুতাহাইয়ারাহও বলা হয়। এরা উত্তরমুখী হয়ে নামায পড়তো। এদের দ্বারাই দামেশক শহরের পত্তন হয়েছিল। তারা সেখানে উপাসনালয় তৈরী করে। ওর মেহরাব উত্তরমুখী আছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের পর তিন বছর পর্যন্ত রোমকরা তাদের পূর্ব মতবাদে অটল ছিল। তাদের মধ্যে যে কেউই সিরিয়া অথবা জযীরার (উপদ্বীপের) বাদশাহ হতো তাকেই কায়সার বলা হতো। সর্বপ্রথম রোমকদের বাদশাহ কুসতুনতীন ইবনে কিসতাস খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তার মাতা ছিল মারইয়াম হাইলানিয়্যাহ গানদাকানিয়্যাহ। সে ছিল হিরানের অধিবাসিনী। সেই সর্বপ্রথম খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার কথায় তার ছেলেও এই মাযহাব অবলম্বন করে। এ লোকটিও ছিল বড় দার্শনিক, বুদ্ধিমান ও প্রতারক। এ কথাও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, সে আসলে আন্তরিকতার সাথে এ ধর্ম গ্রহণ করেনি।

একদা বহু খৃষ্টান তার দরবারে একত্রিত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনা, মতানৈক্য এবং তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আরইউসের সাথে বড় মুনাযারা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তা এমন চরমে পৌঁছে যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ৩১৮ জন পাদরী মিলিতভাবে একখানা পুস্তক রচনা করেন যা বাদশাহকে প্রদান করা হয়। এতে বাদশাহর আকীদা ও মতাদর্শকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটাকে আমানতে কুবরা বা বৃহত্তম আমানত বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা খিয়ানতে হাকীরাহ (ঘৃণ্য খিয়ানত)। এ সময় তাদের ফিকহর কিতাব লিখা হয় এবং তাতে হারাম হালালের মাসআলা বর্ণনা করা হয়। তাদের আলেমরা মনের আনন্দে যা খুশী তাই লিখেছে। দ্বীনে মসীহকে তারা মন খুলে কম বেশী করেছে। আসল দ্বীন পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিকল্পিত হয়ে গেছে। তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামায পড়া শুরু করে দেয়। শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে তারা বড় দিন ধার্য করে। তারা ক্রুসের উপাসনা শুরু করে। শূকরকে তারা হালাল করে নেয়। বহু নতুন নতুন উৎসব তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে। যেমন ঈদ, ক্রুশ, ঈদে কাদাসন, ঈদে গাতাস ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ঐ আলেমদের মর্যাদার স্তর তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে। একজন বড় পাদরী হয়ে থাকে। তার অধীনে ছোট ছোট পাদরীদের ক্রমিক পর্যায়ে মর্যাদার স্তর বন্টন করে দেয়া হয়। তারা রুহবানিয়্যাত ও বৈরাগ্যের নতুন বিদআত আবিষ্কার করে

নিয়েছে। বহু সংখ্যক গীর্জা ও মন্দির তারা তৈরী করে নিয়েছে। কুসতুনতুনিয়া শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বাদশাহ্র নামে এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে। বাদশাহ সেখানে বারো হাজার গীর্জা নির্মাণ করিয়েছে। বায়তে-লাহমে তিনটি মেহরাব তৈরী করা হয়েছে। তার মাতাও কামাকিমা তৈরী করে দিয়েছে। এই লোকদেরকে মালেকিয়্যাহ বলা হয়। কেননা, তারা বাদশাহর দ্বীনের উপর ছিল। তারপর আসে ইয়াকূবিয়্যাহ ও নাসতূরিয়্যাহ। এরা সব নাসতূরের অনুসারী ছিল। তাদের বহু দল সৃষ্টি হয়েছিল। এদের ছিল ৭২টি ফিরকা। তাদের রাজত্ব ও আধিপত্য বরাবর চলে আসছিল। একের পর এক কায়সার হতো। শেষ পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস কায়সার হন। ইনিই ছিলেন সমস্ত বাদশাহর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। তিনি একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় জ্ঞান ও দূরদর্শী লোক। এ ব্যাপারে তাঁর কোন জোড়া ছিল না। তাঁর রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারস্য সম্রাট কিসরা উঠে পড়ে লাগে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও তার সাথে মিলিত হয়। তার রাজ্য কায়সারের রাজ্য অপেক্ষাও বড় ছিল। সে ছিল অগ্নি উপাসক। উপরে বর্ণিত রিওয়াইয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তার সেনাপতি কায়সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, স্বয়ং কিসরা কায়সারের মুকাবিলা করেছিল। কায়সার যুদ্ধে পরাজিত হলেন। এমনকি তিনি কুসতুনতুনিয়ায় অবরুদ্ধ হলেন। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ চলতে থাকলো। খৃষ্টানরা তাঁর খুব সম্মান করতো। বহু দিন অবরোধ করে রাখার পরেও তারা রাজধানী দখল করতে পারলো না। কারণ এই শহরের অর্ধাংশ সমুদ্রের দিকে ছিল। আর বাকী অংশ ছিল স্থলভাগ সংলগ্ন। সামুদ্রিক পথে খাদ্য ও রসদ কায়সারের নিকট বরাবরই পৌঁছতে থাকে। অবশেষে কায়সার এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কিসরাকে বলে পাঠালেনঃ "আপনি যা ইচ্ছা আমার নিকট হতে গ্রহণ করুন এবং যে শর্তের উপর ইচ্ছা সন্ধি করুন। আপনি যা চাইবেন আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি।" কিসরা এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলো। অতঃপর সে এতো বেশী মাল চেয়ে বসলো যে, এ দুই বাদশাহ মিলে চেষ্টা করলেও তা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কায়সার এটাও মেনে নিলেন। কারণ এর দ্বারা তিনি কিসরার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেলেন। তিনি ভালরূপেই বুঝতে পারলেন যে, কিসরা অত্যন্ত নির্বোধ বাদশাহ। সে যে মাল চেয়েছে তা কোন দুনিয়াবাসীর পক্ষে জমা করা সম্ভব নয়। তিনি তার কাছে আবেদন করলেন যে, সে যেন তাঁকে সিরিয়া গিয়ে সময় মত এ মাল আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে সুযোগ দেয়।

কিসরা তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করে। সুতরাং রোমক সম্রাট তথায় গিয়ে এক বিরাট বাহিনী গঠন করলেন এবং বললেনঃ "আমি আমার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর সাথে কোথাও যাচ্ছি। যদি আমি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসি তবে এদেশ আমার। আর যদি এক বছরের মধ্যে ফিরে আসতে না পারি তবে তোমরা যাকে খুশী বাদশাহ নির্বাচিত করবে।" তাঁর প্রজাবর্গ উত্তরে বললোঃ "আমাদের বাদশাহ তো আপনিই। দশ বছর যাবতও যদি আপনি ফিরে না আসেন তাহলেও আপনিই আমাদের বাদশাহ থাকবেন।" প্রাণ নিয়ে খেলা করে এরূপ অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। গোপন রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে অতি সন্তর্পণে পারস্যের শহরে পৌঁছে গেলেন এবং আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসলেন। সেখানকার সৈন্যরা সব রোম চলে গিয়েছিল বলে জনগণ বেশীক্ষণ মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। কায়সারী সৈন্যরা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিলো। যে সামনে পড়ে তাকেই শেষ করে দেয়। কায়সার সামনের দিকে এগিয়েই চললেন। অবশেষে তিনি মাদায়েনে পৌঁছে গেলেন। সেখানে কিসরার সিংহাসন অবস্থিত ছিল। তথাকার রক্ষীবাহিনীর উপর জয়লাভ করলেন এবং চারদিক হতে ধন-দৌলত সংগ্রহ করতে লাগলেন। তথাকার সমস্ত মহিলাকে বন্দী করলেন এবং যুদ্ধপোযোগী লোকদেরকে হত্যা করে ফেললেন। কিসরার ছেলেকে জীবন্ত বন্দী করলেন। অন্দরবাসিনী মহিলাদের পাকড়াও করলেন। তার ছেলের মস্তক মুণ্ডন করে গাধায় চড়িয়ে মহিলাদেরসহ কিসরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যখন এ দলটি কিসরার কাছে পৌঁছলো তখন সে অত্যন্ত মর্মাহত হলো। তখনো সে কুসতুনতুনিয়া অবরোধ করেই আছে ও কায়সারের ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। এমতাবস্থায় তার পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকেরা অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় তার কাছে পৌঁছলো। সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো ও কঠিনভাবে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু সে কৃতকার্য হতে পারলো না। তখন সে জীজূঁ নদীর দিকে অগ্রসর হলো। কেননা, এটাই ছিল কুসতুনতুনিয়া যাবার পথ। এ পথে কায়সার বাহিনীকে বাধা দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। কায়সার এটা জানতে পেরে পূর্বেই বড় রকমের কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে নদীর মোহনায় মোতায়েন করেন এবং বাকীগুলোকে নিয়ে নদীর চড়াও-এ চলে যান। প্রায় এক দিন এক রাত চলার পর তিনি নিজের সাথে যে খড়কুটা, জন্তুর গোবর ইত্যাদি এনেছিলেন সবই পানিতে ভাসিয়ে দিলেন। এগুলো ভাসতে ভাসতে কিসরার সেনাবাহিনীর সম্মুখ দিয়ে চলতে লাগলো। তখন তারা বুঝতে পারলো যে, কায়সার এখান থেকে চলে গিয়েছেন। কারণ, সে

বুঝতে পারলো যে, এগুলো কায়সারের জন্তুর খাদ্য, গোবর ইত্যাদির অবশিষ্টাংশ। অতঃপর কায়সার আবার তাঁর সেনাবাহিনীর নিকট ফিরে আসলেন। এদিকে কিসরা তাঁর সন্ধানে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। কায়সার জীজূঁ নদী অতিক্রম করে পথ পরিবর্তন করতঃ কুসতুনতুনিয়ায় পৌঁছে গেলেন। যেদিন তিনি রাজধানীতে পৌঁছলেন সেই দিন খৃষ্টানরা অত্যন্ত আনন্দোৎসবে মেতে উঠলো। কিসরা যখন এ খবর জানতে পারলো তখন তার বিস্ময়কর অবস্থা হলো। বসার জায়গাটুকুও চলে গেল এবং চলার স্থানটুকুও শেষ হয়ে গেল। না রোম বিজিত হলো, না পারস্য টিকে থাকলো। সুতরাং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। রোমকরা জয়লাভ করলো। পারস্যের নারীরা এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারে এসে গেল। এসব ঘটনা নয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হলো। রোমকরা তাদের হারানো দেশ পারসিকদের হাত হতে পুনরুদ্ধার করে নিলো। পরাজয়ের পর পুনরায় তারা বিজয় মাঁল্যে ভূষিত হলো। আয্‌রেআ'ত ও বসরার যুদ্ধে পারসিকরা জয়লাভ করেছিল। এটা সিরিয়ার ঐ অংশ ছিল যা হিজাযের সাথে মিলিত ছিল। এটাও উক্তি আছে যে, জযীরায় এ পরাজয় ঘটেছিল যা রোমকদের সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং পারস্যের সাথে মিলিত ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মোটকথা, ৯ বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। কুরআন কারীমের بِضْعٌ শব্দ রয়েছে। এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় তিন হতে নয় বছর মেয়াদের জন্যে। জামেউত তিরমিযী ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে এই তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "সতর্কতার জন্যে এই বাজি তোমার রাখা উচিত ছিল দশ বছরের জন্যে। কেননা, بِضْعٌ শব্দের প্রয়োগ হয় তিন হতে নয় বছরের উপর।" তারপর قَبْلُ ও بَعْدُ ইযাফাতের পেশ উড়িয়ে দেয়ার কারণে তার পরের ও আগের হুকুম আল্লাহর মর্জির উপর ন্যস্ত।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আর সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"

অধিকাংশ আলেমের মতে বদরের যুদ্ধের দিন রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং আবূ সাঈদ (রঃ) একথাই বলেন। অন্য একটি দলের মত এই যে, এ বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সংঘটিত হয়েছিল। ইকরামা (রঃ), যুহরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এটাই। অন্যান্যরা বলেছেনঃ রোমক সম্রাট কায়সার মানত করেছিলেন যে, যদি তিনি পারস্য জয় করতে পারেন তবে তিনি পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করবেন। সুতরাং তিনি তাঁর এ মানত পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে সেখানেই আছেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র পত্র তাঁর হাতে আসে, যা তিনি দাহ্ইয়া কালবী (রাঃ)-এর মাধ্যমে বসরার শাসনকর্তার নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং সে তা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। পত্রটি তাঁর হস্তগত হওয়া মাত্রই তিনি ঐ সময় সিরিয়ায় অবস্থানরত হিজাযী আরবদেরকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব উমুভীও ছিলেন। কুরায়েশদের অন্যান্য বড় বড় নেতৃবর্গও হাযির ছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের সবকেই নিজের সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের মধ্যে তাঁর (রাসূলুল্লাহর সঃ) সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় কে আছে?" আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "নবুওয়াতের দাবীদারের আমিই সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়।" সম্রাট তখন তাঁকে সামনে বসালেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তাঁর পিছনে বসিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ "আমি একে নবুওয়াতের দাবীদার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবো। সে যদি উত্তরে কোন মিথ্যা কথা বলে তবে তোমরা সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করবে।" আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেনঃ "আমার যদি এ ভয় না থাকতো যে, আমি মিথ্যা বললে এরা তা ধরিয়ে দেবে এবং মিথ্যাগুলো আমার গাড়ে চাপিয়ে দেবে তবে আমি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতাম।"

হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশ ও স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন,। প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি প্রশ্ন এও ছিলঃ "তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন কি?" উত্তরে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেনঃ "আজ পর্যন্ত তো তিনি কখনো চুক্তিভঙ্গ, ওয়াদাখেলাফী, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি করেননি। বর্তমানে আমাদের সাথে তাঁর একটি চুক্তি রয়েছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তিনি কি করেন?" আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর এ কথার দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সন্ধির একটি শর্ত ছিল এই যে, দশ বছর পর্যন্ত কুরায়েশ ও নবী (সঃ)-এর মধ্যে কোন যুদ্ধ হবে না। এ ঘটনাটি এই কথারই বড় দলীল যে, রোমকরা পারসিকদের উপর হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর জয়লাভ করেছিল। কেননা, কায়সার হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে তাঁর মানত পূর্ণ করেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু যারা বলে যে, রোমকরা

পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করেছিল বদরের যুদ্ধের বছর, তারা জবাবে এ কথা বলতে পারে যে, যেহেতু রোমের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং উৎপাদন হ্রাস ও অনাবাদ বেড়ে গিয়েছিল, সেই হেতু হিরাক্লিয়াস দেশের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চার বছর পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ও মনোযোগ কাজে লাগিয়ে ছিলেন। এর পর দেশের সুখ-শান্তি ফিরে আসলে তিনি তাঁর মানত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এ মতানৈক্য এমন বড় কথা কিছু নয়। অবশ্যই রোমকদের বিজয়ে মুসলমানরা খুশী হয়েছিলেন। কেননা, আর যাই হোক না কেন তারা আহলে কিতাব তো ছিল। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ পারসিকরা ছিল অগ্নি উপাসক। কিতাবের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কাজেই মুসলমানরা যে পারসিকদের বিজয় লাভে অসন্তুষ্ট হবেন এবং রোমকদের বিজয় লাভে খুশী হবেন এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى .... رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ-

অর্থাৎ "অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে, আমরা খৃষ্টান, মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মুমিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে বহু পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে, আর তারা অহংকারও করে না। রাসূল (সঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্যে তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন।" (৫ ঃ ৮২-৮৩) তাই মহান আল্লাহ এখানে বলেছেনঃ সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু।

হযরত যুবায়ের কালাবী (রাঃ) বলেনঃ "আমি রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয়, আবার পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয়, অতঃপর রোমক ও পারসিক উভয়ের উপর মুসলমানদের বিজয় মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে সংঘটিত হতে স্বচক্ষে দেখেছি।"[১]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী এবং প্রিয় বান্দাদের ভুল-ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করার ব্যাপারে পরম দয়ালু।

মুসলমানদেরকে খবর দেয়া হয়েছে যে, রোমকরা সত্বরই পারসিকদের উপর জয়লাভ করবে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত খবর ও ওয়াদা। এটা আল্লাহর ফায়সালা। এটা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। যারা হকের নিকটবর্তী, তাদেরকে আল্লাহ হক হতে দূরে অবস্থানকারীদের উপর সাহায্য দান করে থাকেন। অবশ্য আল্লাহর কর্মপন্থা মানুষ স্বল্প জ্ঞানে বুঝতে পারে না।

অনেক লোক আছে যারা বৈষয়িক জ্ঞান খুব ভাল রাখে। এক মিনিটেই সে সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করে নেয়। আবার তা নিয়ে গবেষণা করে, ওর ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান ভালরূপে উপলব্ধি করে। এক নজরে ওর উঁচু-নীচু দেখে নিতে পারে। দুনিয়ার কাজ-কারবার ও হিসাব-নিকাশ খুব ভাল করে দেখে নেয়। কিন্তু তারা দ্বীনী কাজে এবং আখিরাতের কাজে অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ হয়ে থাকে। সহজ সরল হলেও তা তার বুঝে আসে না। আখিরাত সম্পর্কে না সে চিন্তা ভাবনা করে, না তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে, অনেক লোক আছে যারা ঠিকমত নামাযও পড়তে পারে না, অথচ টাকা পয়সা হাতে নেয়া মাত্র ওজন বলে দিতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ -এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছেঃ কাফিররা দুনিয়ার সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং আখিরাত হতে উদাসীন।

৮। তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।

٨- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

٩- اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৯। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। শক্তিতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করতো, তারা ওটা আবাদ করতো তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

١٠- ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ ع

১০। অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতো এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

যেহেতু এ সৃষ্টি জগতের অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ এবং তাঁর আধিপত্য ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শন, সেহেতু ইরশাদ হচ্ছে– তোমরা সমগ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা কর। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখে তাঁর পরিচয় লাভ কর এবং তাঁর মহাশক্তির মর্যাদা দাও। কখনো কখনো উর্ধাকাশের সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর এবং কখনো কখনো যমীনের সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এসব বৃথা বা বিনা কারণে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনরূপে।

প্রত্যেক জিনিসের একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। কিয়ামতেরও একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যা অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।

এরপর নবীদের সত্যবাদিতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ চেয়ে দেখো, তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম হয়েছে কত মন্দ! পক্ষান্তরে যারা তাঁদেরকে মেনে নিয়েছে, উভয় জগতে তাদের কি ধরনের মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয়েছে! তোমরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো, তোমাদের পূর্বের ঘটনাবলীর নিদর্শন দেখতে পাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তোমাদের অপেক্ষা ধন-দৌলত তাদের বেশী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও তারা তোমাদের চেয়ে বেশী করতো। জমি-জমা ও ক্ষেত-খামারও ছিল তাদের তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের কাছে রাসূলগণ মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্যেরা তাঁদেরকে মেনে নেয়নি, বরং তাঁদেরকে তারা অবিশ্বাস করেছিল। তারা নানা প্রকারের মন্দকার্যে লিপ্ত থাকতো। অবশেষে আল্লাহর গযব তাদের উপর পতিত হলো। ঐ সময় তাদেরকে উদ্ধার করে এমন কেউ ছিল না। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর যুলুম ছিল না। তিনি তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি হিসেবেই তাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করেছিলেন। আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, তাঁর কথায় তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ "তাদের বে-ঈমানীর কারণে আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিই এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়ে বেড়াতে ছেড়ে দিই।" (৬ ঃ ১১১) আরো বলেনঃ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ "যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন।" (৬১ঃ ৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ "যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তবে জেনে রেখো যে, তাদের কতক পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করতে চান।" (৫ ঃ ৪৯) এর উপর ভিত্তি করে اَلسُّوْاٰى শব্দটি مَنْصُوْبٌ বা যবরযুক্ত হবে اَسَاءُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ বা কর্ম হয়ে। এটাও একটা উক্তি যে, سُوْاٰى এখানে এভাবেই পতিত হয়েছে যে, তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছে, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। এই হিসেবে এই শব্দটি যবরযুক্ত হবে كَانَ -এর خَبَر বা বিধেয় হয়ে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই ব্যাখ্যাই করেছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) হতে কথাটা বর্ণনাও করেছেন। যহহাকও (রঃ) একথাই বলেন এবং প্রকৃত ব্যাপারও তাই। কেননা, এরপরেই আছেঃ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ অর্থাৎ “তা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।”

١١- اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

১১। আল্লাহ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

١٢- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১২। যেই দিন কিয়ামত হবে সেই দিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে।

١٣- وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

১৩। তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।

١٤- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ○

১৪। যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

١٥- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ○

১৫। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে।

١٦- وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

১৬। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রথমে যেমন সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হবেন। সবকেই কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে হাযির করা হবে। সেখানে তিনি প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করবেন। আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করেছে, তাদের কেউই সেদিন তাদের সুপারিশের জন্যে এগিয়ে আসবে না। কিয়ামতের দিন পাপী ও অপরাধীরা অত্যন্ত অপদস্থ ও একেবারে নির্বাক হয়ে যাবে। যখন তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তাদের মিথ্যা ও বাতিল উপাস্যরা তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এই বাতিল উপাস্যদের অবস্থাও তাদের মতই হবে। তারা পরিষ্কারভাবে তাদের উপাসকদেরকে বলে দেবে যে, তাদের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। কিয়ামত সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তারপর আর তাদের মধ্যে কোন দেখা সাক্ষাৎ হবে না। সৎকর্মশীলরা ইল্লীঈনে চলে যাবে এবং পাপী ও অপরাধীরা চলে যাবে সিজ্জীনে। ওরা সবচেয়ে উঁচু স্থানে অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করবে। আর এরা সর্বনিম্ন স্থানে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে একথাই বলছেন যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে এবং যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।

١٧- فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

১৮। আর অপরাহ্নেও যোহরের সময়; এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তারই।

١٨- وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

১৯। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

١٩- يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

সেই আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সার্বভৌম ও সীমাহীন রাজত্বের প্রকাশ ঘটবে তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা কীর্তনের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সে দিকেই পথ নির্দেশ করেছেন। তিনি যে মহান ও পবিত্র এবং তিনি যে প্রশংসার যোগ্য তারই বর্ণনা তিনি দিচ্ছেন। সন্ধ্যায় যখন ঘনঘটা অন্ধকার বয়ে আনে তখন এরপর দিন জ্যোতির্ময় আলোক নিয়ে হাযির হয়। এতোটুকু বর্ণনা করার পর তার পরবর্তী বাক্য বর্ণনা করার আগেই এ কথাগুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, দুনিয়া ও আসমানে প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তাঁর সৃষ্টিই স্বয়ং তাঁর মর্যাদার ও বুযুর্গীর দলীল। সকাল ও সন্ধ্যার তাসবীহ পাঠের কথা বলার পর এশা ও যোহরের সময়ের কথা তিনি জুড়ে দিয়েছেন। রাত্রি হলো কঠিন অন্ধকারের সময় এবং এশা ও যোহর হলো পূর্ণ অন্ধকার ও আলোকোজ্জ্বলের সময়। নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্রতা ও মহিমা তাঁরই জন্যে শোভনীয় যিনি রাত্রির অন্ধকার ও দিনের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিকারী। তিনিই সকালকে প্রকাশকারী ও রাত্রিকে বিশ্রামের জন্যে সৃষ্টিকারী। এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ‎ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا

অর্থাৎ "শপথ দিবসের, যখন ওটা (সূর্য) ওকে প্রকাশ করে এবং শপথ রজনীর, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে।" (৯১ ঃ ৩-৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَالضُّحٰى ‎ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى অর্থাৎ "শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রজনীর যখন ওটা হয় নিঝুম।" (৯৩ ঃ ১-২)

হযরত মুআয ইবনে আনাস আলজুহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বিশ্বস্ত বন্ধু আখ্যায় কেন আখ্যায়িত করেছেন এ খবর কি দেবো না? কারণ এই যে, সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি এই কালেমাগুলো পাঠ করতেন।" অতঃপর তিনি فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ হতে تُظْهِرُوْنَ পর্যন্ত দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার দিন-রাতের যা কিছু নষ্ট হয়েছে তা ফিরে পাবে।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর এবং ওর উল্টোর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বীজ হতে গাছ, গাছ হতে বীজ, মুরগী হতে ডিম, ডিম হতে মুরগী, বীর্য হতে মানুষ ও মানুষ হতে বীর্য, মুমিন হতে কাফির ও কাফির হতে মুমিন বের করে থাকেন। মোটকথা, তিনি প্রত্যেক বিষয় ও তার প্রতিপক্ষ বিষয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন। শুষ্ক মাটিতে তিনি আর্দ্রতা আনয়ন করেন এবং অনুর্বর ভূমি থেকেও তিনি ফসল উৎপাদন করেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ .... وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ -

অর্থাৎ “তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা ভক্ষণ করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ।” (৩৬ ঃ ৩৩-৩৪)

আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ .... وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ “তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ ...... যারা কবরে আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন।” (২২ ঃ ৫-৭) আরো বহু জায়গায় এ ধরনের আয়াত কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ এভাবেই তোমরাও সবাই মৃত্যুর পরে (কবর হতে) উত্থিত হবে।

٢٠- وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

২০। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো।

٢١- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

২১। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন অনেক রয়েছে। নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর সমগ্র মানব জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু অপবিত্র পানি (বীর্য) দ্বারা। অতঃপর মানুষকে তিনি খুবই সুদর্শন করে তুলেছেন। শুক্রকে তিনি জমাট রক্তে, অতঃপর গোশতে পরিণত করেছেন ও তার উপর অস্থি তৈরী করেছেন। আর অস্থিগুলোকে তিনি গোশতের আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। তারপর তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এরপর নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু সৃষ্টি করেছেন এবং মায়ের পেট হতে নিরাপদে বের করে এনেছেন। অতঃপর দুর্বলতা দূর করে দিয়ে সবলতা প্রদান করেছেন। দিন দিন শক্তিকে আরো মযবূত করেছেন। বেশ ক্ষমতাবান করে গড়ে তুলেছেন। আয়ু দান করেছেন এবং নড়াচড়া করার ও আরামের শক্তি দিয়েছেন। নানা প্রকার উপকরণ ও শারীরিক কলকজা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা করেছেন। এখান থেকে সেখানে এবং সেখান থেকে এখানে আসার শক্তি যুগিয়েছেন।

সাগরের পানিতে, মাটির উপরে ঘুরে বেড়াবার জন্যে নানা প্রকার আরোহণযোগ্য যন্ত্র ও জন্তুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষমতা, ধ্যান, গবেষণা ইত্যাদির জন্যে মস্তিষ্ক দান করেছেন। তিনি পার্থিব কাজ কারবার বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন। আখিরাতে পরিত্রাণ লাভের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমল শিখিয়েছেন।

পবিত্রময় ঐ আল্লাহ্ যিনি মানব জাতিকে প্রত্যেক কাজের অনুমান করার শক্তি দিয়েছেন, প্রত্যেককে এক এক মর্যাদায় রেখেছেন। দৈহিক গঠন ও আকৃতি, কথাবার্তা, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ নির্বাচন শক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও কার্পণ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক করেছেন। যাতে প্রত্যেকে মহান প্রতিপালকের বহু নিদর্শন নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে পারে।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা দিয়ে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রঙ এর ন্যায় মানুষের রঙ হয়ে থাকে। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ লাল, কেউ অত্যন্ত খারাপ স্বভাবের, কেউ অত্যন্ত ভাল স্বভাবের, কেউ খুব মিশুক, কেউ বদমেজাযী ইত্যাদি নানা প্রকারের হয়ে থাকে।"[১]

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ "আল্লাহ্ তিনিই যিনি তোমাদেরকে একই নফস হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।"

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর বাম দিকের ক্ষুদ্র বক্ষাস্থি হতে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটা চিন্তার বিষয় যে, যদি মহান আল্লাহ্ মানুষের সঙ্গিনী মানুষ হতে সৃষ্টি না করে অন্য প্রাণী হতে সৃষ্টি করতেন তবে মানুষ এখন যেমন স্ত্রী নিয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করে থাকে তা কখনো লাভ করতে পারতো না। প্রেম ও ভালবাসা শুধুমাত্র একই প্রকারের মৌলিক বস্তু হতে লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ্ পাক স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামী তো ভালবাসার কারণেই স্ত্রীর দেখা শোনা করে থাকে, তার প্রতি দয়া করে এবং তাকে সদা খেয়ালে রাখে। কারণ তার থেকে তার সন্তান জন্মেছে। তাদের দেখা শোনা তাদের উভয়ের মেলামেশার উপর নির্ভরশীল। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে অনেক কারণ এনে দিয়েছেন যার ফলে তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি দৃঢ় হয়েছে। এ কারণেই মানুষ নিজ নিজ জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে আরাম ও সুখে জীবন যাপন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

করছে। এগুলোও রাব্বুল আলামীনের একটা মেহেরবানী এবং তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার একটা বড় নিদর্শন। সামান্য চিন্তা করলেই এ মহান কীর্তি-কলাপ মানুষের চরম জ্ঞানের মূল দেশে পৌঁছে যায়।

২২। এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

২৩। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্যে।

٢٣- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাশক্তির নিদর্শন বর্ণনা করছেন। এ মহা প্রশস্ত আকাশের সৃষ্টি এবং তা তারকামণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, এগুলোর চাকচিক্য, এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আবর্তনশীল, কোন কোনটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে থাকে, পৃথিবীকে একটি মযবূত রূপদান করে সৃষ্টি করা, তাতে ঘনঘন বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করা, তাতে পাহাড়-পর্বত, প্রশস্ত মাঠ, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, উঁচু উঁচু টিলা, পাথর, বড় বড় গাছ ইত্যাদি সৃষ্টি করা, মানুষের ভাষা ও রং-এর বিভিন্নতা, আরবের ভাষা তাতারীরা বুঝে না, কুর্দিদের ভাষা রোমকরা বুঝে না, ইংরেজদের ভাষা তুর্কিরা বুঝে না, বার্বারদের ভাষা হাবশীরা বুঝতে পারে না, ভারতীয়দের ভাষা ইরাকীরা বুঝে না, ইনতাকালিয়া, আরমানিয়া, জাযীরিয়া ইত্যাদি, আল্লাহ জানেন আরো কত ভাষা আছে যা আদম সন্তানরা বলে থাকে। এগুলো বিশ্ব প্রতিপালকের মহাশক্তির নিদর্শন নয় কি?" ভাষার বিভিন্নতার পরে আসে রঙ-এর পার্থক্য। এগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার বিকাশ ও অসীম শক্তির নিদর্শন।

একটু চিন্তা-গবেষণা করলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হবে যে, কোথাও হয়তো লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হলো। সবাই একই বংশের, একই গোত্রের, একই দেশের এবং একই ভাষাভাষী লোক হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন দিক দিয়েই কোন পার্থক্য থাকবে না এটা সম্ভব নয়। অথচ মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। সবারই দু'টি চক্ষু, দু'টি পলক, একটি নাক, দু'টি কান, একটি কপাল, একটি মুখ, দু'টি ঠোঁট, দু'টি গণ্ড ইত্যাদি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও একজন অপরজন হতে পৃথক। কোন না কোন এমন গুণ বা বিশেষণ রয়েছে যদ্দ্বারা একজনকে অপরজন হতে অবশ্যই পৃথক করা যাবে। যেমন গাম্ভীর্য, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা বলার ভঙ্গিমা ইত্যাদি সবারই একরূপ নয়। যদিও তা কোন কোন সময় গুপ্ত ও হালকা হয়ে থাকে। কেউ খুবই সুন্দর, কেউ বদমেজাযী, সুতরাং রূপ ও আকারে একই মনে হলেও ভালভাবে লক্ষ্য করলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবেই। হয়তো প্রত্যেকেই জ্ঞানী, বড় শক্তিশালী, বড় কারিগর, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কীর্তি-কলাপের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক করা যাবেই।

নিদ্রা কুদরতের একটি নিদর্শন। এর দ্বারা মানুষ তার ক্লান্তি দূর করে থাকে এবং আরাম ও শান্তি লাভ করে। এজন্যেই পরম করুণাময় আল্লাহ রাত্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আবার কাজ কামের জন্যে, দুনিয়ার লাভালাভের জন্যে, আয়-উপার্জনের, জীবিকা অনুসন্ধানের জন্যে মহামহিমান্বিত আল্লাহ দিবস বানিয়েছেন। দিবস রজনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্যই জ্ঞানী-বুদ্ধিমানদের জন্যে এগুলো আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার বড় নিদর্শন।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাত্রে আমার ঘুম হতো না। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এটা বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি নিম্নের দু'আটি পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَیٌّ قَيُّوْمٌ يَاحَیُّ يَا قَيُّوْمُ اَنِمْ عَيْنِىْ وَاَهْدِاْ لَيْلِىْ

আমি দু'আটি পড়তে থাকলাম। তখন আমার অসুখ সেরে গেলো এবং নিদ্রা হতে লাগলো।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৪। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা-সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে।

٢٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৫। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।

٢٥- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলার বিরাট সত্তার দলীল স্বরূপ এখানে আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। আকাশে তাঁরই আদেশে বিদ্যুৎ চমকায়। তা দেখে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যে, না জানি হয়তো বিদ্যুতের ঝটকা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই তারা কামনা করে যে, বিদ্যুৎ যেন তাদের উপর পতিত না হয়। আবার মানুষ কখনো আশান্বিত হয় যে, ভালই হয়েছে, এখন বৃষ্টি হবে এবং পানি থৈ থৈ করবে, চারদিকে পানি বয়ে চলবে ইত্যাদি ধরনের আশায় আশান্বিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর ফলে যে ভূমি শুষ্ক হয়ে পড়েছিল, যাতে মোটেই রস ছিল না, ওকে তিনি পুনর্জীবিত করে তোলেন। কচি ঘাস জমিতে ঢেউ খেলে যায়। জমিতে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হতে শুরু করে। এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন রয়েছে।

তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, যমীন ও আসমান তাঁরই হুকুমে স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি আকাশকে পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়তে দেন না। আসমান যমীনকে ধরে আছে এবং ওকে ধ্বংস হতে রক্ষা করছে।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন কিছু বিশ্বাস করানোর জন্যে শপথ করতেন তখন বলতেনঃ "সেই আল্লাহর কসম, যিনি আসমান ও যমীনকে ধারণ করে আছেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে দিবেন।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।" যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ "যেই দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তাঁর প্রশংসা করতঃ তোমরা সাড়া দেবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, অতি অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছিলে।" (১৭ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় বলেনঃ

فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

অর্থাৎ "এটা তো শুধু এক বিকট শব্দ, তখনই ময়দানে তাদের অবির্ভাব হবে।" (৭৯ঃ ১৩-১৪) আরো এক জায়গায় বলেনঃ

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ -

অর্থাৎ "এটা তো শুধু একটা মহানাদ, তখনই তাদের সবকে হাযির করা হবে আমার সামনে।" (৩৬ ঃ ৫৩)

২৬। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।

২৬- وَلَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

২৭। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্যে অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৭- وَهُوَ الَّذِی يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আসমান ও যমীনের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সবাই তাঁর দাসী অথবা দাস। সবকিছুর অধিপতি একমাত্র তিনিই। তাঁর সামনে সবকিছুই অসহায়।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছেঃ "কুরআন কারীমে যেখানে কুনূতের উল্লেখ আছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আনুগত্য।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ "তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।"

পুনর্বারের সৃষ্টি সাধারণতঃ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয়ে থাকে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ তা করা তাদের উচিত নয়। তারা আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তাদের জন্যে মোটেই সমীচীন নয়। তাদের আমাকে মিথা প্রতিপন্ন করা এই যে, তারা বলে– 'আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না।' অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি সহজতর। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া এই যে, তারা বলে– 'আল্লাহর সন্তান আছে।' অথচ আল্লাহ এক ও অভাব মুক্ত। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।"[১] মোটকথা, উভয় সৃষ্টিই তাঁর কর্তৃত্বাধীন ও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। কোন কাজই তাঁর জন্যে কঠিন নয় বা তাঁর শক্তি বহির্ভূত নয়।

এটাও হতে পারে যে, সর্বনামটি خَلْقٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এখানে مَثَلٌ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদে উলূহিয়্যাত ও তাওহীদে রুবূবিয়্যাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মা'বূদ হিসেবে তিনি একক এবং প্রতিপালক হিসেবেও তিনি একক। এখানে مَثَل দ্বারা مِثَال বা তুলনা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো অতুলনীয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ অর্থাৎ "তাঁর মত বা তাঁর সাথে তুলনীয় কোন কিছুই নেই।" (৪২ঃ ১১)

এই আয়াতটি বর্ণনা করার সময় কোন কোন তাফসীরকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছেনঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

اِنَ اسْكَنَ الْغَدِيْرُ عَلٰى صَفَاءٍ * وَجَنَبَ اَنْ يُّحَرِّكَهُ النَّسِيْمُ
يُرٰى فِيْهِ السَّمَاءُ بِلَا امْتِرَاءٍ * كَذٰلِكَ الشَّمْسُ تَبْدُوْ وَالنُّجُوْمُ
كَذٰلِكَ قُلُوْبُ اَرْبَابِ التَّجَلِّىْ * يُرٰى فِىْ صَفْوِهَا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ "যদি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি পুকুরে জমা থাকে ও প্রাতঃসমীরণ ঐ পানিকে আন্দোলিত না করে তবে তাতে আকাশের প্রতিচ্ছবি পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হবে এবং সূর্য ও তারকাগুলোকেও ওর মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তরও ঠিক তদ্রূপ যে, তাঁরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা ও মর্যাদা সদা অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পান।"

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর উপর কারো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সবাই তাঁর অধীনস্থ। প্রত্যেকেই তাঁর সামনে শক্তিহীন ও অসহায়। তাঁর শক্তি ও সার্বভৌম রাজত্ব সমুদয় বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তাঁর কথায়, তাঁর কর্মে, তাঁর আইনে, তাঁর নির্বাচনে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রেই তিনি একচ্ছত্র অধিপতি।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রঃ) বলেছেন যে, وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

২৮। আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এই ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেইরূপ ভয় কর যেইরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।

২৮- ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৯। বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞানতা বশতঃ তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে থাকে; সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।	٢٩- بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

মক্কার কুরায়েশরা ও মুশরিকরা তাদের বুযর্গদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো। সেই সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে, এরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর অধীনস্থ। সুতরাং তারা হজ্ব ও উমরার সময় لَبَّيْكَ বলার সাথে সাথে বলতোঃ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ

অর্থাৎ "আমি আপনার নিকট হাযির আছি, আপনার কোন শরীক বা অংশীদার নেই, কিন্তু এই শরীক যে নিজে এবং যে জিনিসের সে মালিক, সবই আপনার অধিকারভুক্ত।" অর্থাৎ শরীকরা এবং তারা যা কিছুর মালিক তার সব কিছুর মালিক আপনিই। সুতরাং তাদেরকে এমন এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যা তারা স্বয়ং নিজেদেরই মধ্যে পেয়ে থাকে এবং যেন তারা একথাটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে। তাদেরকে বলা হচ্ছে– যা তোমরা বলছো তাতে তোমরা নিজেরাই কি সম্মত হবে? মালিকের ধন-সম্পদের উপর তার গোলাম কি সমানভাবে মালিক হয়? আর সব সময় কি তার এ উৎকণ্ঠা থাকে যে, তার গোলামরা তার ধন-সম্পদ বন্টন করে নিয়ে যাবে? না, তা কখনোই নয়। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে– যখন তোমরা নিজেদের জন্যে এটা পছন্দ কর না যে, গোলামরা তোমাদের ধন-সম্পদের অংশীদার হয়ে যাক, তখন আল্লাহ তা'আলার জন্যে তা পছন্দ করতে পার কি করে? যেমন গোলাম মালিকের সমকক্ষ হতে পারে না, তেমনই আল্লাহর কোন বান্দা তাঁর শরীক ও সমকক্ষ হতে পারে না। সত্যিই এ ধরনের কথা অতি বিস্ময়কর ও বে-ইনসাফি বটে। কি করে মানুষ আল্লাহর জন্যে এমন কিছু প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতে পারে যা তারা নিজেদের জন্যে চিন্তা করতে কষ্ট পায়। নিজেদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনলেই তারা দুঃখিত হয় এবং মুখ কালো করে

ফেলে। তারাই আবার আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদেরকে তাঁর কন্যা বলে থাকে। এটা অতি অবিচারমূলক কথা নয় কি? অনুরূপভাবে নিজেদের গোলামদেরকে যারা নিজেদের শরীক মনে করতে কখনই পারে না, তারাই আবার কি করে আল্লাহর বান্দা বা দাসকে তাঁর শরীক মনে করে? এগুলো চরম অবিচারমূলক কথা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাফিররা লাব্বায়েক বলতো এবং লা শারীকা লাকা বলে আল্লাহর অংশীদার উড়িয়ে দিতো। তারাই আবার পরক্ষণে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিতো। এ কারণেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বলা হয়েছেঃ তুমি যখন নিজ গোলামকে শরীক স্বীকার করতে পার না তখন আল্লাহর বান্দাকে তাঁর শরীক মনে কর কোন বিচারে? এ পরিষ্কার কথাটা বলার পর ইরশাদ হচ্ছে– 'এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি।' মুশরিকদের কাছে জ্ঞান সম্মত ও শরীয়ত সম্মত কোনই দলীল নেই। তারা যা কিছু বলছে সবই অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই বলছে। যখন তারা হক পথ হতে সরে গেছে তখন তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউই হক পথে আনতে পারবে না। তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। কে আছে যে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠোঁট হেলাতে পারে? কে আছে যে তার উপর দয়া করতে পারে যার উপর আল্লাহ দয়া না করেন? তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না।

৩০। তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটা সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٣٠- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩১। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٣١- مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৩২। যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।

٣٢- مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, যে দ্বীনকে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হে নবী (সঃ)! যে দ্বীনকে আল্লাহ তোমার হাতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রতিপালকের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির উপর তারাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যারা এই দ্বীনে ইসলামের অনুসারী। এরই উপর অর্থাৎ তাওহীদের উপর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রোজে আযলের উপর সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছেন। তিনি সেই দিন বলেছিলেনঃ "আমি কি তোমাদের সবারই প্রতিপালক নই?" তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিলঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক।" হাদীসটি ইনশাআল্লাহ সত্বরই বর্ণনা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকে নিজ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা কেউ ইয়াহূদিয়্যাৎ কেউ নাসরানিয়্যাৎ কবূল করে নিয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। ইমাম বুখারী (রঃ) এ অর্থই করেছেন। 'আল্লাহর সৃষ্টির অর্থ দ্বীন ও ফিতরাতে ইসলাম'।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক শিশু ফিৎরাত বা প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও মাজূসী করে গড়ে তোলে। যেমন বকরীর নিখুঁত বাচ্চা পয়দা হয়। অতঃপর বকরীর মালিক ওর কান কেটে দেয়।" তারপর তিনি فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ الخ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসওয়াদ ইবনে সারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করি ও তাঁর সাথে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করি। আল্লাহর ফযলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি। সেদিন মুসলমানরা বহু কাফিরকে হত্যা করে, এমনকি ছোট ছোট শিশুদের উপরও তারা হস্তক্ষেপ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জানতে পেরে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! এটা কেমন ধারা হলো যে, তোমরা সীমালংঘন করলে? কি করে আজ ছোট ছোট শিশুদেরকে হত্যা করা হলো?" কোন এক ব্যক্তি উত্তরে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারাও তো কাফিরদের সন্তান?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "না! না জেনে রেখো যে, কাফিরদের শিশুরা তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। সাবধান! শিশুদেরকে কখনো হত্যা করো না। যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। প্রত্যেক শিশু ফিৎরাতের উপর পয়দা হয়। তারা যা বলে তা ফিৎরাত মুতাবেকই বলে। তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী ও নাসরানী করে গড়ে তোলো।"[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তারা কথা বলতে শিখে। তারপর সে হয়তো অকৃতজ্ঞ (কাফির) হয়ে যায় অথবা কৃতজ্ঞ (মুসলমান) হয়ে যায়।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেন তখন হতেই তিনি জানেন যে, তারা বড় হলে কি আমল করবে।"[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর এমন এক যুগ এসেছে যে, আমি বলতাম, মুসলমানদের সন্তানরা মুসলমানদের সাথে এবং মুশরিকদের সন্তানরা মুশরিকদের সাথে হবে। শেষ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি আমাকে অমুক ব্যক্তি হতে শুনালো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেনঃ "তারা বড় হলে কি ধরনের কাজ করবে ও কি মতামত গ্রহণ করবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৪. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়াম ইবনে হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ভাষণে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আজ তিনি আমাকে যা শিখিয়েছেন এবং তোমরা যা হতে অজ্ঞ রয়েছ, আমি যেন তা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিই। আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি আমার বান্দাদেরকে যা দিয়েছি তা তাদের জন্যে হালাল করেছি। আমি আমার সমস্ত বান্দাকে একনিষ্ঠ খাঁটি ধর্মের অনুসারী করেছি। শয়তান তাদের কাছে যায় এবং তাদেরকে দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। হালাল বস্তুকে তাদের জন্যে হারাম করে এবং আমার সাথে শরীক স্থাপন করার জন্যে তাদেরকে প্ররোচিত করে। সে এমন কথা বলে যার কোন দলীল প্রমাণ নেই।" আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি লক্ষ্য করেছেন এবং আরব আজম সকলকে তিনি অপছন্দ করেছেন। শুধু গুটিকতক আহলে কিতাবকে তিনি পছন্দ করেছেন। তিনি আমাকে বলেনঃ "আমি তোমাকে শুধু পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি। তোমারও পরীক্ষা নেয়া হবে এবং তোমার কারণে সবারই পরীক্ষা নেয়া হবে। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করবো যা পানি দিয়ে ধৌত করা যাবে না। তুমি ওটা উঠতে বসতে পাঠ করতে থাকবে।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন যে, আমি যেন কুরায়েশদেরকে সাবধান করে দিই। আমি আশংকা প্রকাশ করলাম যে, তারা হয়তো আমার মস্তক খুলে নিয়ে রুটি বানিয়ে নেবে। তখন আমার প্রতিপালক আমাকে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, তাদেরকে আমি বের করে দেবো। যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি খরচ কর, তোমার উপর খরচ করা হবে। তুমি সৈন্য পাঠিয়ে দাও, আমি আরো পাঁচগুণ সৈন্য পাঠিয়ে দেবো। তুমি তোমার অনুগতদেরকে সাথে নিয়ে নাফরমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দাও।" জান্নাতীরা তিন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার হলো ন্যায় বিচারক বাদশাহ, যাকে সৎকর্মের তাওফীক দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন মেহেরবান সহৃদয় লোক যে প্রত্যেক আত্মীয়ের জন্যেই কোমল। তৃতীয় প্রকার হলো ঐ পাকদামান মুসলমান যে ভিক্ষা বৃত্তি হতে বেঁচে থাকে। অথচ পরিবারস্থ বহু লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। আর জাহান্নামীরা পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার হলো ঐ দুর্বল ব্যক্তি যার আকল বা জ্ঞান নেই, সে তোমাদের মধ্যে তোমাদের অনুসারী বা তাবে' স্বরূপ। তারা (হালাল) স্ত্রী ও (হালাল) মাল তালাশ করে না। দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন খিয়ানতকারী যার কোন লাভ তার জন্যে লুক্কায়িত থাকে না, যদিও ছোট হয়, কিন্তু সে খিয়ানত করবেই। তৃতীয় প্রকার হলো ঐ ব্যক্তি যে সকাল বিকাল তোমাকে তোমার পরিবার ও মাল হতে ধোঁকা দেয়।" তারপর তিনি কৃপণতা ও মিথ্যার এবং বদখাসলত অশ্লীলভাষীর উল্লেখ করেন।[১]

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা অজ্ঞানতার কারণেই আল্লাহর পবিত্র দ্বীন হতে দূরে সরে যায়, ফলে দ্বীন হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেনঃ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ "তোমার লালসা থাকলেও অধিকাংশ লোক ঈমানদার নয়।" (১২ ঃ ১০৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ "যদি তুমি ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানরত অধিকাংশের অনুসারী হও তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে ফেলবে।"(৬ ঃ ১১৭)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, তাঁরই দিকে ঝুঁকে থাকো এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর। তোমরা নামায কায়েম কর যা সব থেকে বড় ইবাদত এবং সবচেয়ে বড় আনুগত্য। তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমরা নিখুঁতভাবে তাঁর একত্বে বিশ্বাসী হও। তাঁকে ছেড়ে তোমার মনোবাসনা অন্যের কাছে পূরণের আশা করো না।

হযরত মুআয (রাঃ)-এর কাছে হযরত উমার (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ "এগুলো তিনটি জিনিস এবং এগুলোই নাজাতের উপায়। প্রথম হলো আন্তরিকতা, যা হলো ফিৎরাত বা প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় হলো নামায। প্রকৃতপক্ষে এটাই দ্বীন। তৃতীয় হলো ইতাআ'ত বা আনুগত্য। এটাই হলো মানুষের জন্যে রক্ষাকবচ।" একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আপনি ঠিকই বলেছেন। তাহলে তো আপনাকে মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করতে হবে না এবং তাদের কোন কাজে সাহায্য করা চলবে না। তাদের মত কোন কাজই করা যাবে না।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ঐ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দ্বীনকে বদল করে দিয়েছে, কোন কোন কথা মেনে নিয়েছে এবং কোন কোন কথা অস্বীকার করেছে।

فَرَّقُوْا -এর দ্বিতীয় পঠন فَارَقُوْا রয়েছে। অর্থাৎ তারা দ্বীনকে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন ইয়াহূদী, নাসারা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক ও অন্যান্য বাতিল পন্থীরা কার্যতঃ তাদের দ্বীনকে ছেড়ে দিয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ "যারা নিজেদের দ্বীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, তাদের বিষয়টি আল্লাহর প্রতি অর্পিত।" (৬ ঃ ১৫৯)

উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)-এর পূর্বে যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তারা সবাই বাতিল দ্বীনকে ধারণ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক দলই দাবী করতো যে, তারা সত্য দ্বীনের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিপথে আছে। আসলে হক বা সত্য তাদের সব দল হতেই লোপ পেয়েছিল। এই উম্মতের মধ্যেও বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি দল সত্যের উপর রয়েছে এবং অন্যান্য সব দলই বিভ্রান্ত। এই সত্যপন্থী দলটি হলো আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-কে মযবূতভাবে ধারণ করে রয়েছে, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও মুসলিম ইমামগণ ছিলেন। পূর্বযুগেও এবং এখনও। যেমন মুসতাদরাকে হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "মুক্তিপ্রাপ্ত দল ঐটি যারা ওরই অনুসরণ করবে যার উপর আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছি।"

৩৩। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে থাকে।

৩৪। তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করবার জন্যে। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫। আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে?

٣٣- وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○

٣٤- لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا وقفة فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

٣٥- اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ○

৩৬। আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন তারা উৎফুল্ল হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

٣٦- وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ○

৩৭। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করেন অথবা তা সীমিত করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

٣٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন তাদের উপর দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন অংশীবিহীন আল্লাহর কাছে তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কষ্ট ও বিপদ হতে মুক্তিলাভের জন্যে প্রার্থনা করে। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত তাদের উপর বর্ষণ করেন তখন তারা তাঁর সাথে শিরক করতে শুরু করে দেয়।

لِيَكْفُرُوْا -এর لَام -কে কেউ কেউ لَام عَاقِبَت বলেন, আবার কেউ কেউ لَام تَعْلِيْل বলেন। এখানে لَام تَعْلِيْل-ই এ বাক্যের জন্যে উত্তম বলে মনে হচ্ছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এটা তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেনঃ "যদি পুলিশ কাউকে ভয় দেখায় ও ধমক দেয় তবে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ঐ সত্তার ধমকে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হই না যাঁর অধিকারে সব কিছুই রয়েছে এবং কোন কিছু করার জন্যে 'হও' বলাই যাঁর জন্যে যথেষ্ট।"

অতঃপর মুশরিকদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তাদের শিরকের কোন দলীল অবতীর্ণ করিনি।

এরপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী মানুষের একটি বদ-স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সব মানুষই সুখের সময় আল্লাহকে ভুলে যায়।

আর বিপদে পড়লে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বলেঃ 'হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সুখ-শান্তির আর কোন আশা নেই।' কিন্তু মুমিনরা বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখের সময় ভাল কাজ করে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "মুমিনের জন্যে বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্যে যা ফায়সালা করেন তা তার জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণকরই হয়। যদি তার উপর সুখ-শান্তি আপতিত হয় এবং এজন্যে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে সেটাও হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তাকে বিপদ ও দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে এবং সে ধৈর্যধারণ করে তবে সেটাও হয় তার জন্যে মঙ্গলজনক।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা তার রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা সীমিত করেন? তিনিই মালিক মুখতার। তিনি স্বীয় কৌশল অনুযায়ী দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। তিনি কাউকে প্রচুর রিযক দান করেন এবং কাউকে অভাব-অনটনে রাখেন। কেউ অভাবের জীবন বয়ে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কেউ প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে অবশ্যই মুমিনদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

৩৮। অতএব আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্যে এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

٣٨- فَـاٰتِ ذَا الْقُـرْبٰى حَـقَّـهٗ وَالْـمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْـرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْـهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُوْنَ ۝

৩৯। মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যা দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।

٣٩- وَمَـآ اٰتَيْـتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَـرْبُوَا فِيْٓ اَمْـوَالِ النَّاسِ فَـلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَـآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْـهَ اللّٰهِ فَـاُولٰٓئِكَ هُمُ الْـمُضْعِفُوْنَ ۝

৪০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

٤٠- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ع ١٣

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক যুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মিসকীন তাকে বলা হয় যার কাছে কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু তা তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। তাদের সাথেও সদ্ব্যবহারের ও তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের আদেশ করা হয়েছে। যে মুসাফির বিদেশে গিয়ে খরচ পরিমাণ পয়সার অভাবে পড়েছে তার প্রতিও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এগুলো তার জন্যে উত্তম কাজ যে আশা পোষণ করে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্যে এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিছুই নেই। এ ধরনের লোকই দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত পাবে।

দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), যহহাক (রঃ), কাতাদা (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন লোক এ নিয়ত করে দান করে যে, লোকেরা তাকে তার চেয়ে বেশী দান করবে, এ নিয়তে দান করা জায়েয হলেও তাতে তার কোন সওয়াব হবে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্যে এর কোনই বিনিময় নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে এর থেকেও নিষেধ করেছেন।

এ অর্থে এ আদেশ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্যেই নির্দিষ্ট হবে। যহহাক (রঃ) আল্লাহ তা'আলার উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ অর্থাৎ "বেশী প্রাপ্তির নিয়তে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না।" (৭৪ঃ ৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, সুদ দুই প্রকারের রয়েছে। এক হলো ব্যবসায় সুদ। এটা তো হারাম। দ্বিতীয় সুদ হলো এই যে, বেশী পাওয়ার

নিয়তে কাউকে কিছু দান করা। এটা বৈধ। অতঃপর তিনি وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا الخ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যাকাত আদায়ের সওয়াব তো আছেই। যাকাত প্রদানকারীকে খুবই বরকত দেয়া হয়। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তা-ই বৃদ্ধি পায় ও তারাই সমৃদ্ধশালী।" অর্থাৎ তাদের জন্যে সওয়াব ও প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছেঃ "হালাল উপার্জন দ্বারা একটি মাত্র খেজুর সাদকা করা হলে আল্লাহ রাহমানুর রাহীম স্বীয় দক্ষিণ হস্তে তা গ্রহণ করেন এবং তা এমনভাবে প্রতিপালন করেন ও বাড়িয়ে দেন, যেমনভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়া বা উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি খেজুর উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও বড় হয়ে যায়।"

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা। মানুষ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় উলঙ্গ, অজ্ঞ, শ্রবণশক্তিহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, শারীরিক শক্তিহীন অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ সবকিছু দান করেন। ধন-দৌলত দেন, মালিকানা দেন, উপার্জনক্ষম করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করার বুদ্ধি দান করেন। মোটকথা, অসংখ্য নিয়ামত দান করেন।

হযরত খালেদ (রাঃ)-এর দুই পুত্র হযরত হাব্বাহ (রাঃ) ও হযরত সাওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আমরা একদা নবী (সঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। ঐ সময় তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করলাম। তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো, তোমরা রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়তে থাকে (অর্থাৎ তোমরা জীবিত থাকো)। মানুষ উলঙ্গ ও অভুক্ত অবস্থায় দুনিয়ায় আসে। একটি ছাল বা বাকলও তার পরনে থাকে না। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাকে রিযিক দান করেন।"[১] এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তিনি এই জীবনের অবসানের পর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তাঁর মহান পবিত্রতম সত্তা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাঁর শরীক হোক এ হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। অথবা তাঁর সমকক্ষ কেউ হোক, তাঁর সন্তানাদি ও পিতা-মাতা থাক, তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। তিনি একক, তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

---

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

٤١- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○	**৪১। মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।**
٤٢- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ○	**৪২। বলঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরামা (রঃ), যহহাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এখানে بَرٌّ দ্বারা জঙ্গল ও মরু প্রান্তরকে বুঝানো হয়েছে। আর بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শহর ও গ্রামকে। অন্যেরা বলেন যে, بَرٌّ দ্বারা মানুষের সুপরিচিত স্থল ভাগকে বুঝানো হয়েছে এবং بَحْرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সমুদ্রকে যা মানুষের নিকট পরিচিত।

স্থল ভাগের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফসল ও ফল-মূল পয়দা না হওয়া এবং দুর্ভিক্ষ হওয়া। আর সমুদ্রের বিপর্যয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টি না হওয়া, জলজন্তুগুলো অন্ধ হয়ে যাওয়া। মানব হত্যা এবং জলযান জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে জল ও স্থলভাগের বিপর্যয়। এখানে بَحْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীপসমূহ এবং بَرٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শহর, লোকালয় ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম বর্ণিত ব্যাখ্যাটি বেশী প্রকাশমান। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর এ বর্ণনাটিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়লার বাদশাহর সাথে সন্ধি করেন, তাতে তিনি তার বাহর অর্থাৎ শহরের নাম উল্লেখ করলেন।

ফল বা খাদ্যশস্যের ক্ষতি মানুষের পাপের কারণে হয়ে থাকে। যারা আল্লাহর অবাধ্য তারাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আসমান ও যমীনের শুদ্ধি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা হয়ে থাকে। সুনানে আবি দাউদে হাদীস আছেঃ “যমীনে একটি হদ (পাপের শাস্তি) কায়েম হওয়া যমীনবাসীর পক্ষে চল্লিশ

দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা উত্তম।” এটা এই কারণে যে, হদ কায়েম হলে পাপীরা পাপকার্য হতে বিরত থাকবে। আর দুনিয়ায় যখন পাপকার্য বন্ধ হয়ে যাবে তখন দুনিয়াবাসী আসমান ও যমীনের বরকত লাভ করবে।

শেষ যুগে যখন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীতে নাযিল হবেন ও পবিত্র শরীয়ত মুতাবেক ফায়সালা দিতে থাকবেন, যেমন শূকরের হত্যা, ক্রুসের পরাজয়, জিযিয়া বন্ধ অর্থাৎ হয় ইসলামের কবূলিয়ত, না হয় যুদ্ধ। তারপর তাঁর সময় দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের পতন ও ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংস সাধন হয়ে যাবে, তখন যমীনকে বলা হবেঃ “তোমার বরকত ফিরিয়ে আন।” সেই দিন একটি ডালিম ফল একটি বড় দলের (খাদ্য হিসেবে) যথেষ্ট হবে। এ ডালিম এতো বড় হবে যে, ওর ছালের নীচে এসব লোক ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ একটি গোত্রের জন্যে যথেষ্ট হবে। এসব বরকত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীয়ত জারীকরণের ফলে হবে। তাঁর দেয়া শরীয়ত বিধি যেমন বাড়তে থাকবে এ বরকতের পরিমাণও তেমন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অপরপক্ষে, ফাজের বা পাপাচারী লোকের ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, তার মৃত্যুর কারণে শহরের লোকজন, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সবাই শান্তিলাভ করে থাকে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, যিয়াদের আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে খেজুরের বড় আঁটির মত গমের দানা ছিল। তাতে লিখা ছিলঃ “এটা ঐ সময় উৎপন্ন হতো যখন ন্যায়-নীতিকে কাজে লাগানো হতো।”

যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে ফাসাদ দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এর ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

অর্থাৎ “আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করি যাতে তারা ফিরে আসে।”(৭ ঃ ১৬৮)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশ্রিক। সেগুলো দেখে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

৪৩। তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর নির্দেশে অনিবার্য যে দিবস তা আসার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

٤٣- فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ○

৪৪। যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্যে রচনা করে সুখ-শয্যা।

٤٤- مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ○

৪৫। কারণ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

٤٥- لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সরল সঠিক দ্বীনের উপর দৃঢ় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ইবাদত করার হিদায়াত করছেন। তিনি বলেনঃ জান-মাল দিয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড় কিয়ামত আসার পূর্বে। যখন কিয়ামত সংঘটনের আদেশ হয়ে যাবে তখন ঐ সময়কে কেউই বন্ধ করতে পারবে না। সেদিন ভাল ও মন্দ পৃথক হয়ে যাবে। একদল জান্নাতে যাবে এবং আর একদল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। কাফির তার কুফরীর বোঝার নীচে চাপা পড়ে যাবে। সৎলোকেরা তাদের কৃত সৎকর্মের কারণে উত্তম ও সুখময় স্থানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুণ্য অনেকগুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং এভাবে তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তাদের এক একটি পুণ্য দশগুণ হতে বাড়াতে বাড়াতে সাতশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এভাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না। তা সত্ত্বেও তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না।

٤٦- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৪৬। তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্যে ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্যে; এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলো বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

٤٧- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৭। আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, বৃষ্টি শুরু হবার পূর্বে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করে জনগণকে বৃষ্টির আশায় আশান্বিত করা তাঁরই কাজ। তারপর বৃষ্টি প্রদান করে থাকেন তিনিই, যাতে লোকবসতি আবাদ হয়, জীবজন্তু জীবিত থাকে এবং সাগরে জাহাজ চলতে পারে। জাহাজ চলাও আবার বায়ুর উপর নির্ভরশীল। তখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রুজী-রোজগারের জন্যে এখানে চলাফেরা করতে পারে। অতএব মানুষের উচিত আল্লাহর অসংখ্যা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

এরপর মহান আল্লাহ প্রিয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেনঃ যদি তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে জানবে যে, এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরকেও তাদের উম্মতরা বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল। তাদের কাছে তারাও উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ আনয়ন করেছিল এবং মু'জিযা দেখিয়েছিল। অবশেষে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আল্লাহর আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। মুমিনরা ঐ আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজ ফযল ও করমে স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য করা নিজের উপর অবশ্যকর্তব্য করে নিয়েছেন।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের ইজ্জত রক্ষা করে তবে আল্লাহর উপর এটা হক যে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবেন।" অতঃপর তিনি وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন।[১]

৪৮। আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট এটা পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।

৪৮- اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৪৯। যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল।

৪৯- وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝

৫০। আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন; এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫٠- فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫১। এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে যে, শস্য পীত বর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	٥١- وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, তিনি বায়ু পাঠিয়ে দেন, আর তা মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো সাগর থেকে অথবা অন্য যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে হুকুম করে মেঘমালা আনয়ন করেন। অতঃপর রাব্বুল আলামীন মেঘকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, বিস্তার করেন এবং অল্প থেকে বেশী করেন। এটা ঘটে থাকে যে, এক হাত বা দু'হাত মেঘ দেখা গেল, তারপর তা আকাশের চতুর্দিককে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এও দেখা যায় যে, সাগর হতে মেঘ উত্থিত হচ্ছে। এ বিষয়টিকেই এ আয়াতে اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ الخ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ঐ মেঘকে খণ্ড খণ্ড করে স্তরে স্তরে সাজানো হয় এবং পানিতে তা কালো হয়ে যায়। তারপর তা মাটির নিকটবর্তী হয়ে যায়। অতঃপর ঐ মেঘ হতে পানি বর্ষিত হয়। যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয় সেখানকার লোকের ফসল ফলে যায়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এরাই বৃষ্টি হতে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। পূর্ণ নৈরাশ্যের সময়, বরং নৈরাশ্যের পর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং স্থলভাগ জলময় হয়ে ওঠে। এখানে তাকীদ বা গুরুত্ব বুঝাবার জন্যেই قَبْلُ শব্দটিকে দুইবার আনা হয়েছে।'ہٗ' সর্বনামটি اِنْزَال -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এও হতে পারে যে, বাক্যের প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা বৃষ্টির চরম মুখাপেক্ষী ছিল। এবার তাদের আশা পূর্ণ হয়ে গেল।

পূর্বে তারা সময়মত বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়ার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এই নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ মেঘ উঠলো ও বৃষ্টি বর্ষিত হলো। বৃষ্টির পানি চারদিকে জমে গেল এবং তাদের শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয়ে উঠলো। দুর্ভিক্ষ প্রাচুর্যে পরিবর্তিত হলো। অথবা মাঠ শুষ্ক ছিল, ফসলবিহীন ছিল, এখন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে চতুর্দিকে সবুজ ফসল দেখা যেতে লাগলো।

তাই তো আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এরপর তিনি বলেনঃ যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখতে পায় যে, তাদের শস্য পীত বর্ণ ধারণ করেছে তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ .... بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ـ

অর্থাৎ “তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। বলবেঃ আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে! আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।” (৫৬ ঃ ৬৩-৬৭)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, বাতাস আট প্রকারের হয়ে থাকে। চারটি রহমতের ও চারটি যহমতের। রহমতের চারটি বাতাসের নাম হলোঃ নাশেরাত, মুবাশশারাত, মুরসালাত ও যারইয়াত। আর যহমত বা শাস্তির চারটি বাতাসের নাম হলোঃ আকীম, সারসার, আসেফ ও কাসেফ। এগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি বাতাস শুষ্ক অঞ্চল হতে প্রবাহিত হয়, দ্বিতীয় দু'টি প্রবাহিত হয় সামুদ্রিক অঞ্চল হতে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “বাতাস অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ তা উত্থিত হয় অন্য যমীন হতে। যখন আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি বাতাসের দায়িত্বে নিয়োজিত দারোগাকে এই আদেশ করলেন। দারোগা বললোঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমি কি বায়ুমণ্ডলের ভাণ্ডারের এতোটা ছিদ্র করে দিবো যে পরিমাণ ছিদ্র বলদের নাকের হয়?” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “না, না তাহলে তো সমগ্র পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে। তাতো নয়, বরং অল্প একটু ছেড়ে দাও, যা আংটি পরিমাণ হবে।” ঐটুকু পরিমাণ বাতাস যখন ছাড়া হলো ও বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলো তখন যেখানে ওর ধাক্কা লাগলো সেখানকার সবকিছু ভূমি বরাবর হয়ে গেল। যে অঞ্চলের উপর দিয়ে ঐ বায়ু প্রবাহিত হলো ওর নাম নিশানা মিটিয়ে দিলো।”[১]

৫২। তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٥٢- فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ○

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীব। এর মারফু' হওয়া অস্বীকৃত। সম্ভবতঃ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিজস্ব কথা হবে।

৫৩-وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৫৩। আর তুমি অন্ধকেও পথে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা হতে। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শুনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! কবরের মৃত ব্যক্তিদেরকে কিছু শুনানো তোমার সাধ্যের অতীত। মৃত ব্যক্তি, যারা কবরে আছে, তাদেরকে তোমার কথা শুনানো যেমন অসম্ভব, তেমনিই কানে যারা বধির, যারা শুনেও শুনে না, যারা তোমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদেরকেও তুমি তোমার কথা শুনাতে পারবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হক হতে অন্ধ হয়ে গেছে তাকে তুমি পথ দেখাতে ও হিদায়াত করতে পারবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। যদি তিনি চান তবে মৃতকে জীবিতদের কথা শুনাতে পারেন। সুপথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা তাঁরই কাজ। তুমি তো শুধু তাকেই শুনাতে পার যে ঈমানের নিকটবর্তী, আল্লাহর কাছে নতশির হতে প্রস্তুত ও তাঁর ফরমাবরদার বা বাধ্য। এরা হক কথা শুনে এবং মানে। এগুলো তো হলো মুসলমানদের অবস্থা। আর পূর্বে যেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো সেগুলো কাফিরদের অবস্থা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

অর্থাৎ "তারাই আহ্বানে সাড়া দেবে যারা কান লাগিয়ে (আল্লাহর কালাম) শুনে এবং মৃতদেরকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁরই নিকট তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (৬ ঃ ৩৬)

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, বদরের যুদ্ধে যেসব মুশরিক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল এবং যাদেরকে বদরের উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাদেরকে সম্বোধন করে ধমকের সুরে লজ্জিত করছিলেন তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁর নিকট আরয করেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা মরে গেছে তাদেরকে আপনার এভাবে সম্বোধন করার কারণ কি (তারা কি শুনতে পাচ্ছে)?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! আমি তাদেরকে

যা বলছি তা তোমরা ততোটা শুনতে পাও না যতোটা তারা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারছে না।" হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর মুখে এ ঘটনা শুনে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ বলেছিলেনঃ "তারা এখন খুব ভালরূপেই জানছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলতাম সবই সত্য ছিল।" অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) মৃত ব্যক্তিদের শুনতে না পাওয়ার দলীল - اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى -এই আয়াত দ্বারা গ্রহণ করেছেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা শুনতে পেয়েছিল, যেন তারা যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর এ হাদীসকে সবাই সহীহ বলেছেন। কারণ এ হাদীসের বহু সাক্ষী রয়েছেন। ইবনে আবদিল বার (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে একটি সহীহ রিওয়াইয়াত উল্লেখ করেছেন যে, যখন কোন লোক তার ভাই-এর কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে যাকে সে দুনিয়ায় চিনতো ও সালাম করতো, তখন আল্লাহ তা'অলা তার রূহকে ফিরিয়ে দেন, যেন সে তার সালামের উত্তর দিতে পারে।

৫৪। আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন মানুষের উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্য করে। মানুষের উৎস তো মাটি। এর থেকেই শুক্রের উৎপত্তি। এরপর জমাট রক্ত। তারপর গোশত, এরপর অস্থি, অস্থির উপর গোশত এবং অবশেষে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। তারপর মায়ের পেট হতে পাতলা ও দুর্বল হয়ে বের হয়ে আসে। আবার ধীরে ধীরে বড় হয়, শক্তি সঞ্চয় করে ও মযবূত হয়। তারপর বাল্যকালের বসন্তকাল দেখে। এরপর যৌবনে পদার্পণ করে। অতঃপর তাকে বার্ধক্য পেয়ে বসে এবং সে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শক্তিশালী

হওয়ার পর মানুষের এই দুর্বলতা তার একটি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার। তার চলাফেরা, উঠা-বসা, নাচন-কুদন, মোটকথা তার সমস্ত শক্তি লোপ পায়। শরীরের চামড়া কুঁচকিয়ে যায়, দাঁত পড়ে যায়, গাল বসে যায় এবং চুল সাদা হয়ে যায়। আল্লাহ যা চান তাই করেন। সৃষ্টি ও ধ্বংস তার সীমাহীন শক্তির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ সবই তাঁর দান। তিনি সবকিছুরই মালিক। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। না তাঁর মত কারো জ্ঞান আছে, না তাঁর মত কারো শক্তি আছে।

হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর সামনে এই আয়াতটি مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا পর্যন্ত পাঠ করলে তিনিও তা তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "আমিও এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পাঠ করেছিলাম যেমন তুমি আমার সামনে পাঠ করলে। তখন তিনিও এটা পাঠ করেন যেমন আমি তোমার পাঠের পর এটা পাঠ করলাম।"[১]

৫৫- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝

৫৫। যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হতো।

৫৬- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবেঃ তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো। এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।

৫৭- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৫৭। সেই দিন সীমালংঘন কারীদের ওযর আপত্তি তাদের কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবে না।

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিররা দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে একেবারেই মূর্খ। তাদের মূর্খতা এভাবেই প্রকাশ পায় যে, তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে। পরকালেও তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলবেঃ 'আমরা দুনিয়ায় মাত্র এক ঘন্টাকাল অবস্থান করেছি।' একথা বলে তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে, এতো কম সময়ের কারণে তাদের উপর কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমার্হ মনে করা হোক। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, এভাবেই দুনিয়ায় তারা সত্যভ্রষ্ট হতো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা (এই অজ্ঞ কাফিরদেরকে) বলবেঃ তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো। আর এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না। তাই তোমরা অজ্ঞই থেকে গেলে।

সুতরাং কিয়ামতের দিন এই সীমালংঘনকারীদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের ওযর আপত্তি তাদের কোনই উপকারে আসবে না। তাদেরকে আর দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ـ

অর্থাৎ "যদি তারা দুনিয়ায় ফিরে আসতে চায় তবে তারা ফিরে আসতে পারবে না।" (৪১ ঃ ২৪)

৫৮। আমি তো মানুষের জন্যে এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন হাযির কর, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবেঃ তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।

৫৮- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

৫৯। যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এভাবে মোহর করে দেন।

৫৯- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬০। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

٦٠- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সত্যকে আমি এই পাক কালামে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছি যাতে সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর যেন তারা তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করে। তাদের কাছে যে কোন মু'জিযাই আসুক না কেন, সত্যের নিদর্শন তারা যতই দেখুক না কেন, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তারা অবশ্যই বলবেঃ তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী। এটা যাদু, বাতিল ও মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

অর্থাৎ "যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা সমস্ত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনয়ন করবে না যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (১০ ঃ ৯৬-৯৭)

তাই এখানে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ এইভাবে তাদের অন্তরে মোহর করে দেন। হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার উপর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। অবশ্যই তিনি একদিন তোমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর বিজয় দান করবেন। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, কাজের উপর দৃঢ় থাকো। তোমার কাজ হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-ওদিক হয়ো না। এরই মধ্যে সমস্ত হিদায়াত লুক্কায়িত আছে, বাকীগুলো সবই বাতিলের স্তূপ।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামায পড়ছিলেন এমন সময় একজন খারেজী তাঁর নাম ধরে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেঃ

وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ -

অর্থাৎ "তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে অহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"(৩৯ ঃ ৬৫)

এটা শুনে হযরত আলী (রাঃ) নীরব হলেন এবং সে যা বললো তা বুঝলেন। অতঃপর নামাযের মধ্যেই তিনি জবাবে فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا یَسْتَخِفَّنَّكَ الخ -এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ "তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।"[১]

এই পবিত্র সূরাটির ফযীলত এবং ফজরের নামাযে এটা পড়া মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

নবী (সঃ)-এর সহাবীদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। এই নামাযে তিনি এই সূরায়ে রূম তিলাওয়াত করেন। ইত্যবসরে কিরআতে তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। নামায শেষে তিনি সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমনও কতকগুলো লোক আমাদের সাথে নামাযে শামিল হয়ে যায় যারা ভালভাবেও নিয়মিত অযু করে না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা নামাযে দাঁড়াবে তারা যেন উত্তমরূপে অযু করে নেয়।"[২]

এই হাদীসটি দ্বারা একটি বিস্ময়কর রহস্য উদঘাটিত হলো এবং একটি বড় খবর এই পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুক্তাদীদের অযু সম্পূর্ণরূপে ঠিক না হওয়ার ক্রিয়া বা প্রভাব তার উপরও পড়েছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, ইমামের নামাযের সাথে মুক্তাদীদের নামাযও মুআল্লাক বা দোদুল্যমান।

সূরা ঃ রূম এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদও সুন্দর এবং মতনও উত্তম।

সূরাঃ লোকমান, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩৪, রুকূ' ঃ ৪)

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣٤ رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আলিফ- লাম- মীম।

١- الٓمّٓ ۚ

২। এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

৩। পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের জন্যে।

٣- هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

৪। যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

٤- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

৫। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

٥- اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

সূরায়ে বাকারার তাফসীরের প্রারম্ভেই হুরূফে মুকাত্তাআ'তের অর্থ ও মতলব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী তাদের জন্যে এই কুরআন হিদায়াত, শিক্ষা ও রহমত স্বরূপ। যারা নামায কায়েম করার সময় নামাযের রুক্ন, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযতের সাথে সাথে নফল, সুন্নাত ইত্যাদিও পূর্ণভাবে আদায় করে। যারা ফরয যাকাত আদায় করে, আত্মীয়দের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করে ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, দানশীলতার কাজ নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যায় এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে বলে আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যারা পুণ্যের কাজ করে যায় এবং মহান প্রতিপালকের পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখে। যারা রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে না এবং লোকদের প্রশংসাও চায় না। এ ধরনের গুণবিশিষ্ট লোকেরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং এরাই তারা যারা দ্বীন ও দুনিয়ায় হবে সফলকাম ও কৃতকার্য।

٦- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৬। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে; তাদেরই জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

٧- وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىْ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝

৭। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দু'টি বধির; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।

উপরে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোকেরা আল্লাহর কিতাব হতে হিদায়াত গ্রহণ করতঃ কিতাব শুনে লাভবান হতো। এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, পাপী ও দুষ্ট লোকেরা আল্লাহর কিতাব শুনে কোন উপকার লাভ করতো না, বরং এর পরিবর্তে গান-বাজনা, ঢোল-করতাল নিয়ে মত্ত থাকতো।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ الخ-এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্র কসম! এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গান-বাজনা ও রাগ-রাগিণী নিয়ে সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকা।" তাকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তিনবার কসম করে বলেনঃ "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গান-বাজনা ও রাগ-রাগিণী।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত মাকহূল (রঃ), হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রঃ) প্রমুখ গুরুজনেরও এটাই উক্তি। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে, গান-বাজনা, রঙ-তামাশা ইত্যাদির ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই নয়, বরং এ কাজের পিছনে টাকা পয়সা খরচ করা, একে আন্তরিকভাবে পছন্দ করা ও ভালবাসাও এর অন্তর্ভুক্ত।

তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, বাতিলকে তারা সত্যের উপর প্রাধান্য দেয় এবং ক্ষতিকর বিষয়কে লাভজনক বিষয়ের উপর স্থান দিয়ে থাকে।

একটি উক্তি এও আছে যে, অসার বাক্য ক্রয় করা দ্বারা গায়িকা বা ছুক্রী ক্রয় করাকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "গান-বাজনা কারিণী ও গায়িকা মেয়ে বেচাকেনা করা হারাম। বেচে তার মূল্য ভক্ষণ করাও অবৈধ। এ ব্যাপারেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ الخ-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।"[১]

যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শিরক্কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মত এই যে, প্রত্যেক কথা, যা কালামুল্লাহ্ ও শরীয়তের অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করে তার সবগুলোই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করা। একটি কিরআত বা পঠনে لِيَضِلَّ রয়েছে। তখন لَام টি لَام عَاقِبَت হবে অথবা لَام تَعْلِيْل হবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদেরই জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যেমন তারা আল্লাহর পথ ও তাঁর কিতাবকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, তেমনই কিয়ামতের দিন তাদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে। তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে।

এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ এই হতভাগারা, যারা খেল-তামাশায়, গান-বাজনায় ও রাগ-রাগিণীতে মত্ত ছিল তারা কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তা শোনা হতে তারা নিজেদের কানকে বধির করে ফেলেছিল, এগুলো তাদের ভাল লাগতো না, শুনলেও তারা তা শোনার মত শুনতো না, বরং তা শোনা তাদের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। এটাকে তারা বাজে কাজ মনে করতো। এ কারণে এর মান-সম্মান তাদের কাছে ছিল না। এ জন্যে এ থেকে তারা কিছুই লাভবানও হয়নি। এ থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। এখানে আল্লাহর বিধি-বিধান দেখে তারা যেমন বিরক্ত হচ্ছে, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর আযাব দেখেও বিরক্ত হবে। এখানে আল্লাহর আয়াত শুনে তারা বিরক্তি বোধ করছে বটে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরিমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহ্র (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৮। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে সুখদ কানন।

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝

৯। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٩- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

এখানে ভাল লোকদের শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মেনে নিয়েছে, শরীয়ত মুতাবেক কাজ করেছে তাদের জন্যে জান্নাত নির্ধারিত আছে, যার মধ্যে নানা প্রকারের নিয়ামত থাকবে। বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দর ঝকঝকে তকতকে পোশাক, সুন্দর সুন্দর গাড়ী-ঘোড়া, পবিত্র ডাগর চোখা পরমা সুন্দরী হূরীরা বিদ্যমান থাকবে। সেখানে এসব নিয়ামত কখনো নিঃশেষ হবে না। না এগুলো নষ্ট হবে, না ধ্বংস হবে, না কমে যাবে। এসব নিয়ামত অবশ্যই দেয়া হবে। কেননা, এটা আল্লাহর ওয়াদা এবং তিনি তাঁর ওয়াদা কখনো ভঙ্গ করেন না। তিনি দয়ালু, অনুগ্রহশীল ও পরম করুণাময়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই। সবকিছুই তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ জ্ঞান-বিবেক বহির্ভূত নয়। তিনি কুরআন কারীমকে মুমিনদের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষাদানকারী করেছেন। আর বেঈমানদের জন্যে এটা বোঝা স্বরূপ ও চোখের কাঁটার ন্যায়। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا-

অর্থাৎ “আমি অবতীর্ণ করি কুরআন যা মুমিনদের জন্যে আরোগ্য ও রহমত। আর এটা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” (১৭ ঃ ৮২)

১০। তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো; তিনিই পৃথিবীতে

١٠- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ

رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○

স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

١١- هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ع

১১। এটা আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যমীন, আসমান ও সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আসমানকে তিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং উচ্চে স্থাপন করে রেখেছেন। আসলে আকাশের কোন স্তম্ভই নেই, যদিও মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন যে, স্তম্ভ মানুষ দেখতে পায় না। এ প্রশ্নের পূর্ণ বিবরণ সূরায়ে রাআ'দের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ধরাধামকে দৃঢ় করার জন্যে ও নড়াচড়া করা হতে বাঁচাবার জন্যে তিনি এর উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে মানুষ ভূমিকম্প ও ঝাঁকুনি হতে রক্ষা পায়। তিনি এতো বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলোর সংখ্যা নিরূপণ কেউই করতে পারে না।

তিনি যে একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা তা বর্ণনা করার পর তিনিই যে আহার্যদাতা তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর মাধ্যমে জমি হতে সর্বপ্রকারের কল্যাণকর উদ্ভিদ তিনি উদ্গত করে থাকেন। এগুলো দেখতেও সুন্দর, খেতেও সুস্বাদু এবং খেলে কোন ক্ষতিও হয় না, বরং উপকার হয়। শা'বী (রঃ) বলেছেন যে, যমীনের সৃষ্টের মধ্যে মানুষও একটি সৃষ্টি। জান্নাতীরা সম্মানিত এবং জাহান্নামীরা হীন ও নিন্দনীয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার এই সমুদয় সৃষ্টি তো তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখন তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে পূজনীয় মেনে নিয়েছো এবং পূজা করতে রয়েছো তাদের সৃষ্টবস্তু কোথায়? তারা যখন সৃষ্টিকর্তা নয় তখন তারা পূজনীয়ও হতে পারে না। সুতরাং তাদের উপাসনা করা চরম অন্যায় ও অবিচার নয় কি? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে শির্ক্কারীদের অপেক্ষা বড় অন্ধ, বধির, অজ্ঞান এবং নির্বোধ আর কে আছে?

১২। আমি অবশ্যই লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্যে এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

১২- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

হযরত লোকমান নবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ গুরুজনের মতে তিনি নবী ছিলেন না; বরং পরহেযগার, অলী এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন হাবশী ক্রীতদাস ও ছুতার ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, তিনি মিসরে বসবাসকারী একজন হাবশী ছিলেন। তাঁকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, কিন্তু নবুওয়াত দেয়া হয়নি।

হযরত লোকমান সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "তিনি ছিলেন বেঁটে, উঁচু নাক ও মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।"

আব্দুর রহমান ইবনে হারমালা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক কৃষ্ণ বর্ণের হাবশী ক্রীতদাস হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ)-এর নিকট আগমন করে। তাকে তিনি বলেনঃ "তোমার দেহের রঙ কালো বলে তুমি নিজেকে ঘৃণ্য মনে করো না। তিনজন লোক, যাঁরা সমস্ত লোক অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তাঁরা সবাই কালো বর্ণের ছিলেন। প্রথম হলেন হযরত বিলাল (রাঃ), যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গোলাম ছিলেন। দ্বিতীয় হলেন হযরত মুহাজ্জা (রাঃ), যিনি ছিলেন

হযরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর গোলাম। তৃতীয় হলেন হযরত লোকমান হাকীম, যিনি ছিলেন হাবশের একজন সাধারণ অধিবাসী।

হযরত খালিদ রাবঈ (রঃ) বলেন যে, হযরত লোকমান ছিলেন একজন হাবশী ক্রীতদাস ও ছুতার। একদা তাঁর মনিব তাঁকে বলেঃ "তুমি একটি বকরী যবেহ কর এবং ওর গোশতের উৎকৃষ্ট দু'টি টুকরা আমার কাছে নিয়ে এসো।" তিনি হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা নিয়ে আসলেন। কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর মনিব তাঁকে এই আদেশই করলো এবং বকরীর গোশতের নিকৃষ্ট দু'টি খণ্ড আনতে বললো। তিনি এবারও উক্ত দু'টি জিনিসই নিয়ে আসলেন। তাঁর মনিব তখন বললোঃ "ব্যাপার কি? এটা কি ধরনের কাজ হলো?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এ দু'টি যখন ভাল থাকে তখন দেহের কোন অঙ্গই এ দু'টির চেয়ে ভাল নয়। আবার এ দু'টি জিনিস যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস এ দু'টোই হয়ে থাকে।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হযরত লোকমান নবী ছিলেন না, একজন সৎ লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের একজন ক্রীতদাস। তাঁর ঠোঁট ছিল মোটা এবং পদযুগল ছিল মাংসপূর্ণ।

অন্য এক বুযর্গ ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বানী ইসরাঈলের একজন বিচারক ছিলেন।

আর একটি উক্তিতে আছে যে, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর যুগে হযরত লোকমান জীবিত ছিলেন। একদা তিনি কোন এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন। তখন একজন রাখাল তাঁকে বলেঃ "তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও যে অমুক অমুক জায়গায় আমার সাথে বকরী চরাতে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে।" রাখালটি তখন তাঁকে প্রশ্ন করে– "তাহলে তুমি কি করে এ মর্যাদা লাভ করলে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "সত্য কথা বলা এবং বাজে কথা না বলার কারণেই আমি এই মর্যাদা লাভ করেছি।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি তাঁর উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ বর্ণনায় বলেনঃ "আমার এ উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা এবং বাজে কাজ বর্জন।" মোটকথা, এরূপই পরিষ্কার রিওয়াইয়াত রয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন না। এসব বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তিনি গোলাম ছিলেন। এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেননা, দাসত্ব নবুওয়াতের বিপরীত। নবীরা সবাই উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। এ জন্যেই পূর্বযুগীয় জমহূর উলামার উক্তি এই যে, হযরত লোকমান নবী ছিলেন না। হ্যাঁ, তবে ইকরামা

(রঃ) বলেন যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এটা সঠিক প্রমাণিত হবে যদি সনদ সহীহ হয়। কিন্তু এর সনদে জাবির ইবনে ইয়াযীদ জুফী রয়েছেন, যিনি দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান হাকীমকে কোন একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি তো লোকমান, তুমি কি বানু হাসহাসের গোলাম নও।" তিনি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, তাই।" লোকটি আবার প্রশ্ন করলোঃ "তুমি কি বক্‌রী চরাতে না?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, চরাতাম বটে।" পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি কৃষ্ণ বর্ণের লোক নও?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি যে কৃষ্ণ বর্ণের লোক তা তো দেখতেই পাচ্ছ ভাই। এখন তুমি আমাকে কি বলতে চাও, বল।" লোকটি বললোঃ "তাহলে বল তো, তোমার মধ্যে কি এমন গুণ আছে যার কারণে তোমার মজলিস সদা লোকে ভরপুর থাকে? জনগণ তোমার দ্বারে আসে এবং তোমার কথা আগ্রহের সাথে শ্রবণ করে?" তিনি জবাব দিলেনঃ "আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলছি সেগুলোর উপর আমল কর, দেখবে, তুমিও আমারই মত হয়ে গেছো। কথাগুলো হলো– হারাম জিনিস হতে চক্ষু বন্ধ রাখবে, জিহ্বাকে অশ্লীল কথা হতে সংযত রাখবে, হালাল খাদ্য খাবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করবে, সত্য কথা বলবে, অঙ্গীকার পূরণ করবে, অতিথির সম্মান করবে, প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং বাজে ও অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করবে। এসব গুণের কারণেই আমি এই মর্যাদা লাভ করেছি।"

একদা হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হযরত লোকমান হাকীমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, হযরত লোকমান কোন বড় পরিবারের লোক ছিলেন না এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশেরও ছিলেন না। হ্যাঁ, তবে তাঁর মধ্যে বহু উত্তম গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, স্বল্পভাষী, চিন্তাশীল ও দূরদর্শী। তিনি দিনে শয়ন করতেন না, লোকজনের সামনে থুথু ফেলতেন না, মানুষের সামনে প্রস্রাব, পায়খানা ও গোসল করতেন না, বাজে কাজ হতে দূরে থাকতেন। তিনি হাসতেন না এবং যে কথা বলতেন তা জ্ঞানপূর্ণ কথাই হতো। তাঁর ছেলে মারা গেলে তিনি ক্রন্দন করেননি। তিনি বাদশাহ ও আমীরদের দরবারে একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই গমন করতেন যে, যেন চিন্তা-গবেষণা এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ লাভ হয়। এ জন্যেই তিনি বুযর্গী লাভ করেছিলেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) একটি বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হযরত লোকমানকে নবুওয়াত ও হিকমতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের

অধিকার দেয়া হলে তিনি হিকমতকেই গ্রহণ করেন। তখন রাত্রে তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং সারা রাত ধরে তাঁর উপর হিকমত বর্ষণ করতে থাকেন। সকাল হলে দেখা যায় যে, তাঁর মুখ দিয়ে যতগুলো কথা বের হচ্ছে সবই জ্ঞানপূর্ণ কথা। তাঁকে নবুওয়াতের উপর হিকমতকে পছন্দ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "যদি আল্লাহ্ আমাকে নবী বানিয়ে দিতেন তবে তো কোন কথাই থাকতো না। আমি ইনশাআল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করতে পারতাম। কিন্তু যখন আমাকে নবুওয়াত ও হিকমতের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হলো তখন আমি ভয় পেলাম যে, হয়তো নবুওয়াতের দায়িত্ব আমি ভালরূপে পালন করতে পারবো না। তাই আমি হিকমতকেই গ্রহণ করলাম।"[১]

হযরত কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিকমতের মাধ্যমে ইসলামকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। হযরত লোকমান নবী ছিলেন না এবং তাঁর কাছে অহীও আসতো না। সুতরাং হিকমত দ্বারা বোধশক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি লোকমানকে নির্দেশ দিয়েছিলাম– আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। জেনে রেখো যে, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজেরই মঙ্গলের জন্যে করে, এতে আল্লাহর লাভ-লোকসান কিছুই নেই। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্যে রচনা করে সুখ-শয্যা।" (৩০ ঃ ৪৪) এখানে বলা হয়েছেঃ যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জানা উচিত যে, এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি বান্দাদের কাজের ব্যাপারে বেপরোয়া। বান্দাদের সবাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন। সমগ্র ধরাবাসী যদি কাফির হয়ে যায় তাহলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না। তিনি সকল হতে অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করি না।

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন সাঈদ ইবনে বাশীর, যিনি দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

١٣- وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১৩। স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।

١٤- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسٰنَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

১৪। আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

١٥- وَإِنْ جٰهَدٰكَ عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৫। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে যে নসীহত করেছিলেন ও উপদেশ দিয়েছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তিনি হলেন লোকমান ইবনে আনকা ইবনে

সুদূন। সুহাইলী (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিল সা'রান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাঁকে হিকমত দান করা হয়েছিল। তিনি যে উত্তম ওয়াজ ও নসীহত স্বীয় পুত্রকে করেছিলেন তা বিষদভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরেছেন। পুত্র অপেক্ষা প্রিয় মানুষের কাছে আর কিছুই নেই। মানুষ তার ছেলেকে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ও মূল্যবান সামগ্রী দিতে চায়। তাই হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে সর্বপ্রথম যে নসীহত করলেন তা হচ্ছে– হে আমার প্রিয় বৎস! একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করো না। জেনে রেখো যে, এর চেয়ে বড় নির্লজ্জতাপূর্ণ ও জঘন্যতম কাজ আর কিছুই নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (যারা ঈমান এনেছে ও তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি– ৬ঃ ৮৩) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের কাছে এটা খুবই কঠিন ঠেকে। তাঁরা বলেনঃ 'আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা যা বুঝেছো তা নয়। তোমরা কি হযরত লোকমানের কথা শুননি? তিনি বলেছিলেনঃ "হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।"[১]

এই উপদেশের পর হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয় উপদেশ যা দেন সেটাও গুরুত্বের দিক দিয়ে বাস্তবিকই এমনই যে, প্রথম উপদেশের সাথে এটা মিলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে।" (১৭ ঃ ২৩) কুরআন কারীমের মধ্যে প্রায়ই এ দু'টোর বর্ণনা একই সাথে দেয়া হয়েছে। সেখানেও ঠিক সেভাবেই করা হয়েছে।

وَهْنٌ শব্দের অর্থ হলো শ্রম, কষ্ট, দুর্বলতা ইত্যাদি। একটি কষ্ট তো 'হামল' বা গর্ভধারণ অবস্থায় হয় যা মাতা সহ্য করে থাকেন। গর্ভধারণের অবস্থায় মায়ের

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছে।

দুঃখ-কষ্টের কথা সবাই জানে। অতঃপর মাতা সন্তানকে দু'বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। এই দু'বছর ধরে মাতাকে তাঁর শিশু সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

অর্থাৎ "মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে যারা দুধ-পান কাল পূর্ণ করতে চায়।" (২ ঃ ২৩৩) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا - অর্থাৎ "তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস।"(৪৬ ঃ ১৫) এ জন্যেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরো বড় বড় ইমামগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল কমপক্ষে ছয় মাস হবে। মায়ের এই কষ্টের কথা সন্তানের সামনে এ জন্যেই প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেন সন্তান মায়ের এই মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আনুগত্য ও ইহসান করে। আর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দেনঃ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থাৎ "এবং বলঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের দু'জনের (অর্থাৎ আমার পিতা-মাতার) প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (১৭ ঃ ২৪)

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। সুতরাং যদি তোমরা আমার এ আদেশ মেনে নাও তবে আমি তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো।

হযরত সাঈদ ইবনে অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমাদের নিকট হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) আগমন করেন যাঁকে নবী (সঃ) প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর বলেনঃ "আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর দূতরূপে প্রেরিত হয়েছি এ কথা বলার জন্যে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। যদি তোমরা আমার কথা মেনে নাও তবে আমি তোমাদের কল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবো না। তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর হয়তো জান্নাতে যাবে, নয়তো জাহান্নামে যাবে। সেখান

হতে আর বের হবে না, বরং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে মৃত্যু নেই।”[১]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং তাদের কথায় আমার সাথে শরীক করে বসবে না। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহ্সান করাও পরিত্যাগ করবে। তোমাদের উপর তাদের পার্থিব যে হক রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করবে। যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখবে যে, তোমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।

হযরত সা'দ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “এ আয়াতটি আমারই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আমার মাতার খুবই খিদমত করতাম এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত থাকতাম। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করলেন তখন আমার মা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। সে আমাকে বললোঃ “তুমি এই নতুন দ্বীন কোথায় পেলে? জেনে রেখো, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই দ্বীন তোমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, নচেৎ আমি পানাহার বন্ধ করে দেবো। আর এভাবে না খেয়ে মারা যাবো।” আমি ইসলাম পরিত্যাগ করলাম না। সুতরাং আমার মা পানাহার বন্ধ করে দিলো। ফলে চতুর্দিকে আমার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়লো যে, আমি আমার মায়ের হন্তা। আমার মন খুবই ছোট হয়ে গেল। আমি আমার মায়ের খিদমতে হাযির হলাম, তাকে বুঝালাম এবং অনুনয় বিনয় করে বললাম ঃ তুমি তোমার এই হঠকারিতা হতে বিরত হও। জেনে রেখো যে, এই সত্য দ্বীন যে আমি ছেড়ে দেবো এটা সম্ভব নয়। এভাবে আমার মায়ের উপর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হলো। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললামঃ আম্মা! জেনে রেখো যে, তুমি আমার কাছে আমার প্রাণ হতেও প্রিয় বটে, কিন্তু তাই বলে আমার দ্বীন হতে অধিক প্রিয় নও। আল্লাহ্র কসম! তোমার একটি জীবন কেন, তোমার মত শতটি জীবনও যদি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক এক করে সবই বেরিয়ে যায় তবুও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করবো না। আমার এ কথায় আমার মা নিরাশ হয়ে গেল এবং পানাহার শুরু করে দিলো।”[২]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) তাঁর 'আশারাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

١٦- يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

১৬। হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সব বিষয়ের।

١٧- يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ج

১৭। হে বৎস! নামায কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করবে, এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

١٨- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○ج

১৮। অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

١٩- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○ع

১৯। তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

এগুলো হযরত লোকমানের অন্যান্য উপদেশ। যেহেতু এগুলো হিকমতে পরিপূর্ণ সেহেতু কুরআন কারীমে এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যেন লোকেরা এর উপর আমল করতে পারে। বলা হচ্ছেঃ মন্দ কাজ, যুলুম, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি সরষের দানা পরিমাণই হোক না কেন এবং তা যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা

হোক না কেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

অর্থাৎ "আমি (কিয়ামতের দিন) ইনসাফের তারাযূ রেখে দিবো, সুতরাং কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (২১ ঃ ৪৭) আর এক জায়গায় আছেঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

অর্থাৎ "কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭-৮)

সেই নেকী অথবা বদী কোন বাড়ীতে, কোন অট্টালিকায়, কোন দূর্গে, কোন পাথরের ফাঁকে, আসমানের উপরে, মাটির নীচে, মোটকথা যেখানেই করা হোক না কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গোপন থাকে না। আল্লাহ পাক তা পেশ করবেনই। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। অন্ধকার রাত্রে পীপিলিকা চলতে থাকলেও তিনি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পান।

কেউ কেউ বলেন যে, صَخْرَة দ্বারা ঐ পাথরকে বুঝানো হয়েছে যা সাত তবক যমীনের নীচে থাকে। এর কিছু কিছু সনদও সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। যদি এটা সঠিক প্রমাণিত হয় তবে ভাল কথা। সাহাবীদের একটি জামাআত হতেও এটা বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। খুব সম্ভব যে, এটাও ইসরাঈলী বর্ণনা। কিন্তু তাদের কিতাবসমূহের কোন কথাকে আমরা সত্যও বলতে পারি না, মিথ্যাও না। এটা তো প্রকাশমান যে, ওটা সরিষার দানা পরিমাণ কোন তুচ্ছ ও নগণ্য আমল হোক এবং তা এতো গোপনীয় হোক যে, কোন পাথরের মধ্যে রয়েছে। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন লোক এমন পাথরের মধ্যেও কোন আমল করে যার কোন দরযা-জানালা নেই ও কোন ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'আলা তা জনগণের সামনে প্রকাশ করে দিবেন, সেই আমল ভালই হোক আর মন্দই হোক।

এরপর হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি নামাযের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ওর ফরয, ওয়াজিব, আরকান, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযত করবে। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর কথা সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। প্রত্যেক ভাল কাজের জন্যে সকলকে উৎসাহিত করবে। মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। যেহেতু ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকের কাছে তিক্ত লাগে, সত্যভাষী লোকদের সাথে সবাই শত্রুতা রাখে, সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর পথে উন্মুক্ত তরবারীর নীচে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করার সময় অলস হয়ে বসে না পড়া খুব বড় বাহাদুরীর কাজ। হযরত লোকমান তাই স্বীয় পুত্রকে এ কাজের উপদেশই দিয়েছেন।

এরপর হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলেনঃ অহংকারবশে তুমি মানুষের দিক হতে তোমার মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ো না। তাদেরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান ও নিজেকে বড় মনে করো না। বরং তাদের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ "তুমি সমস্ত মুসলিম ভাই-এর সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করবে। এটাও তোমার জন্যে বড় একটা পুণ্যের কাজ।"

অতঃপর হযরত লোকমান বলেনঃ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। এমন যেন না হয় যে, তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে, তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং গরীব ও মিসকীনদের সাথে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করবে। মুখ ঘুরিয়ে কথা বলাও অহংকার।

صَعَرٌ একটা অসুখের নাম। উটের ঘাড়ে ও মাথায় এ অসুখ বেশী প্রকাশ পায়। এ অসুখে ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। অহংকারী লোকদেরকে এ অসুখের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরব দেশের লোক এই অহংকারের অবস্থাকে صَعَرٌ বলে থাকে। আর এ শব্দের ব্যবহার তাদের কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে গর্বভরে চলা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

অর্থাৎ "তুমি দম্ভভরে চলাফেরা করো না, যেহেতু না তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে পারিবে।" (১৭ ঃ ৩৭) এ

আয়াতের তাফসীরও যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে একদা অহংকারের উল্লেখ করা হলে তিনি ওর খুবই নিন্দে করলেন এবং বললেন যে, এই রূপ আত্মম্ভরী ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই রাগান্বিত হন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন কাপড় সাফ করি এবং তা খুব পরিষ্কার হয় তখন আমাকে খুব ভাল লাগে। অনুরূপভাবে ভাল চামড়ার জুতা পায়ে দিলে মন খুব আনন্দিত হয়। লাঠির সুন্দর আচ্ছাদনীও মনে আনন্দ দেয়। (তাহলে এটা কি অহংকার হবে)?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "না, এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার ওরই নাম যে, তুমি সত্যকে ঘৃণা করবে ও লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে।"[১]

মহান আল্লাহ হযরত লোকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেনঃ তুমি মধ্যম চালে চলবে। খুব ধীরে ধীরেও না এবং খুব ডিং মেরে ও দম্ভভরেও না। আর কথা বলার সময় খুব বড়াবাড়ী করবে না। অযথা খুব চীৎকার করে কথা বলবে না। জেনে রাখবে যে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

এই খারাপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অকারণে চীৎকার করা ও ডাঁট-ডপট করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। যে নিজের জিনিস দান করে ফিরিয়ে নেয় তার উপমা হলো ঐ কুকুর যে বমি করে ঐ বমি চাটতে থাকে।"

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, সে শয়তানকে দেখতে পায়।"[২] অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রাত্রির কথা উল্লেখ আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত লোকমান হাকীমের এ উপদেশগুলো অত্যন্ত উপকারী ও লাভজনক বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁর আরো বহু জ্ঞানগর্ব উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। নমুনা ও নিয়ম-রীতি হিসেবে আমরাও অল্পকিছু বর্ণনা করছিঃ

১. এ রিওয়াইয়াতটি অন্য ধারায় খুব লম্বাভাবেও বর্ণিত আছে এবং তাতে হযরত সাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকাল ও তাঁর অসিয়তের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, লোকমান হাকীম বলেছেনঃ "যখন আল্লাহকে কোন জিনিস সপে দেয়া হয় তখন তিনি ওর হিফাযত করে থাকেন।"[১]

হযরত কাসিম ইবনে মুখাইমারাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি تَقَنُّع হতে বেঁচে থাকো, কেননা এটা রাতের বেলায় ভীতিপ্রদ এবং দিনের বেলায় নিন্দনীয় জিনিসি।"[২]

হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে আরো বলেনঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয়ই হিকমত বা প্রজ্ঞা মিসকীনদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়।"[৩]

আউন ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি কোন মজলিসে হাযির হবে তখন ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মজলিসের এক দিকে বসে পড়বে। অন্যেরা কিছু না বললে তুমিও কিছু বলবে না, বরং নীরব থাকবে। মজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহর যিকরে মশগুল হয়ে যায় তবে তুমি তাতে সবচেয়ে বড় অংশ নেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি তারা বাজে গল্প শুরু করে দেয় তবে তুমি ঐ মজলিস ছেড়ে চলে আসবে।"[৪]

হাফ্স ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান একটি সরিষাপূর্ণ থলে নিজের পার্শ্বে রেখে তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। প্রত্যেকটি উপদেশের পর তিনি একটি করে সরিষা থলে হতে বের করতে থাকেন। অবশেষে থলে শূন্য হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাঁর ছেলেকে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি আমি এই উপদেশগুলো কোন পাহাড়কে করতাম তবে পাহাড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।" শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্রেরও এ অবস্থাই হয়।[৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা হাবশীদেরকে গ্রহণ করে নাও। কেননা, তাদের তিনজন

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এটাও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. এটাও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।
৫. ইবনে আবি হাতিম (রঃ)-ই এটা বর্ণনা করেছেন।

জান্নাতবাসীদের নেতা। তারা হলো– লোকমান হাকীম (রঃ), নাজ্জাশী (রঃ) এবং মুআয্যিন বিলাল (রাঃ)।"[১]

বিনয় ও নম্রতার বর্ণনা ঃ

হযরত লোকমান (রঃ) স্বীয় পুত্রকে এর উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) এই মাসআলার উপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা এখানে ওর মধ্য হতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বর্ণনা করছি ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "বহু বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট ও ময়লা কাপড় পরিহিত লোক রয়েছে যারা বড় লোকদের দ্বারে পৌঁছতে পারে না, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এতো মর্যাদা রয়েছে যে, তারা যদি তাঁর নামে কসম খেয়ে কোন কাজ করতে লাগে তবে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে থাকেন।"

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) এ ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

একদা হযরত উমার (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, এই কবরবাসী (সঃ) হতে আমি একটি হাদীস শুনেছিলাম যা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ "সামান্য রিয়াকারীও শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ লোকদেরকে ভালবাসেন যারা পরহেযগার। যারা লোকদের মধ্যে অপরিচিত অবস্থায় থাকে, যাদেরকে গণ্যমান্য মনে করা হয় না। যদি তারা কোন সমাবেশে না আসে তবে কেউ তাদের সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করে না। আর কোন সমাবেশে তারা হাযির হলে কেউ তাদেরকে স্বাগত জানায় না। তাদের অন্তর হিদায়াতের প্রদীপ স্বরূপ। তারা প্রত্যেক ধূলিময় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে জ্যোতি আহরণ করে থাকে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ময়লা কাপড় পরিহিত বহু লোক এমন রয়েছে যাদেরকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা হয়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এতো বেশী মর্যাদার অধিকারী যে, তারা আল্লাহর নামে কসম খেলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে থাকেন। যদিও আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব সুখ-সম্পদ প্রদান করেননি, কিন্তু তারা যদি বলেঃ "হে আল্লাহ! আমরা আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছি।" তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে তা প্রদান করেন।

১. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালেম ইবনে আবিল জুদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, সে যদি কারো দরযায় গিয়ে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা একটি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) অথবা একটি পয়সা চায় তবে সে তাকে তা দেয় না। কিন্তু সে আল্লাহ্র এতো প্রিয়পাত্র যে, সে তাঁর কাছে যদি পূর্ণ জান্নাতও চেয়ে বসে তবুও তিনি তাকে তা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি তাকে দুনিয়া দেন না এবং তার থেকে বিরতও রাখেন না। কেননা, এটা কোন উল্লেখযোগ্য জিনিস নয়। সে দু'টি ময়লাযুক্ত চাদর পরিহিত থাকে। যদি সে কোন ব্যাপারে কসম খেয়ে বসে তবে আল্লাহ তার কসম পুরো করে থাকেন।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের বাদশাহ তারাই যাদের মাথার চুল বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো, ধূলিমলীন চেহারা বিশিষ্ট। তারা কোন ধনী ও আমীরের বাড়ী যেতে চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় না। তারা কোন বড় বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই দরিদ্রদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাদের প্রয়োজন এবং মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পূর্বেই তারা দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে। কাজেই তাদের মনের আশা মনেই থেকে যায়। কিয়ামতের দিন তারা এতো বেশী জ্যোতি লাভ করবে যে, তা যদি বন্টন করে দেয়া হয় তবে তা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্যে যথেষ্ট হবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) কবিতায় বলেন ঃ

اَلَا رُبَّ ذِىْ طَمْرِيْنِ فِىْ مُنْزِلٍ غَدًا * زُرَّابِيُـهِ مَبْثُـوْثَـةٌ وَنَمَارِقُـهٗ
قَدْ اِطَّرَدَتْ اَنْـوَارُهٗ حَـوْلَ قَصْـرِهٖ * وَاشْرَقَ وَالْتَفَتَ عَلَيْهِ حَدَائِقُهٗ

অর্থাৎ "বহু লোক এমন রয়েছে যাদেরকে দুনিয়ায় তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা হয়, তারাই কাল কিয়ামতের দিন সিংহাসন, মুকুট, রাজ্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। বাগানে, নদীতে এবং সুখ-সাগরে তারা অবস্থান করবে।"

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় অলী হলো ঐ ব্যক্তি যে মুমিন, ধন-দৌলত যার কম, যে নামাযী, ইবাদতকারী, অনুগত, গোপনে ও প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকারকারী, জনগণের মধ্যে যার কোন মান-সম্মান নেই, যাকে কেউ ইশারা ইঙ্গিতেও ডাকে না এবং এর উপর যে ধৈর্যধারণ করে থাকে।" এরপর রাসূলুল্লাহ

(সঃ) স্বীয় হাত ঝেড়ে বলেন ঃ "তার মৃত্যু তাড়াতাড়ী এসে থাকে এবং তার মীরাস খুব কম হয়। তার জন্যে ক্রন্দনকারীদের সংখ্যা অতি অল্প হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছে দরিদ্র লোকেরা যারা নিজেদের দ্বীন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা যেখানে তাদের দ্বীন দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা করে সেখান থেকে সরে পড়ে। এরা কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে একত্রিত হবে।"

হযরত ফুযাইল ইবনে আইয়ায (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদেরকে বলবেনঃ "আমি কি তোমাকে ইনআম ও সম্মান প্রদান করিনি। আমি কি তোমাকে বহু কিছু দান করিনি? আমি কি তোমার দেহ আচ্ছাদিত করিনি? আমি কি এটা করিনি, ওটা করিনি? তোমাকে কি লোকদের মধ্যে সম্মানিত করিনি?" তাহলে তুমি যদি পার যে, তুমি জনগণের নিকট অপরিচিত থাকবে তবে তাই কর। জনগণ যদি তোমার প্রশংসা করে তবে এতে তোমার লাভ কি? আর যদি তারা তোমার দুর্নাম করে তবেই বা তোমার ক্ষতি কি? আমাদের কাছে তো ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যাকে লোকে মন্দ বলে এবং সে আল্লাহর নিকট উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

ইবনে মুহাইরিয (রঃ) তো দু'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমার খ্যাতি যেন ছড়িয়ে না পড়ে।" খলীল ইবনে আহমাদ (রঃ) দু'আয় বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে আপনার কাছে মর্যাদাবান করে রাখুন, আমার নিজের দৃষ্টিতে আমাকে হেয় ও তুচ্ছ করে রাখুন এবং জনগণের মধ্যে আমাকে মধ্যম ধরনের মর্যাদা দান করুন।"

শুহরাত বা খ্যাতির ব্যাপারে যা এসেছে তার অনুচ্ছেদ ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, লোকেরা তার দ্বীনদারী বা দুনিয়াদারীর খ্যাতি ছড়াতে শুরু করে দেয়, তার দিকে অঙ্গুলি উঠতে শুরু করে, তার দিকে ইশারা ইঙ্গিত করতে লাগে। এই পর্যায়ে এসে বহু লোক ধ্বংস হয়ে যায়, শুধু ঐ ব্যক্তিই রক্ষা পায় যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেন না, বরং দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতেও এ রিওয়াইয়াতটি মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। তিনি এটা রিওয়াইয়াত করলে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেঃ "আপনার দিকেও তো মর্যাদার অঙ্গুলি উঠানো হয়ে থাকে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তুমি বুঝতে পারনি। এখানে অঙ্গুলি উঠানো দ্বারা দ্বীনী বিদআত ও পার্থিব পাপাচারকে বুঝানো হয়েছে।"

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "তুমি প্রসিদ্ধি লাভ করতে চেয়ো না। তুমি নিজেকে উঁচু করে তুলো না যে, জনগণের মধ্যে তোমার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। তুমি বিদ্যা অর্জন কর, তবে নিজেকে গোপন রাখো এবং নীরব থাকো যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পার। সৎকর্মশীলদেরকে সন্তুষ্ট রাখো এবং পাপাচারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করো।"

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রঃ) বলেছেনঃ "খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি অন্বেষণকারী ব্যক্তি আল্লাহর অলী হতে পারে না।" হযরত আইয়ূব (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন সে তো নিজের মর্যাদা মানুষের নিকট গোপন রাখে।

মুহাম্মাদ ইবনে আ'লা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহভক্ত মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে না।

হাম্মাক ইবনে সালমাহ (রঃ) বলেনঃ "সাধারণ লোকের সাথে মেলামেশা ও বন্দু-বান্ধবের আধিক্য হতে বেঁচে থাকো।"

হযরত আইয়াস ইবনে উসমান (রাঃ) বলেনঃ "যদি নিজের দ্বীনকে নিখুঁত রাখতে চাও তবে জনগণের সাথে খুব কম মেলামেশা করো।"

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ)-এর নিয়ম ছিল এই যে, যখন তিনি তাঁর মজলিসে তিনজন লোককে একত্রিত হতে দেখতেন তখন নিজে সেখান হতে চলে যেতেন।

হযরত তালহা (রাঃ) যখন দেখতেন যে, তাঁর কাছে ভীড় জমে গেছে তখন তিনি বলতেনঃ "এগুলো লোভের মাছি ও আগুনের পতঙ্গ।"

হযরত হানযালা (রাঃ)-কে জনগণ ঘিরে দাঁড়ালে হযরত উমার (রাঃ) চাবুক উঁচু করে ধরে বললেনঃ "এতে অনুসারীদের জন্যে রয়েছে অবমাননা এবং অনুসৃতের জন্যে রয়েছে ফিৎনা।"

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে লোকেরা চলতে শুরু করলে তিনি বলেনঃ "আমার গোপনীয়তা যদি তোমাদের উপর প্রকাশ হয়ে পড়তো তবে সম্ভবতঃ তোমাদের দু'জন লোকও আমার পিছনে চলা পছন্দ করতো না।"

হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন, যখন আমরা কোন মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতাম এবং হযরত আইয়ূব (রঃ) আমাদের সাথে থাকতেন, তখন তিনি সালাম করতেন এবং তারা খুব আবেগের সাথে উত্তর দিতো। সুতরাং এটা একটা নিয়ামত ছিল। হযরত আইয়ূব (রঃ) খুব লম্বা জামা পরিধান করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "আগেকার দিনে লম্বা জামার খুব সম্মান ছিল। কিন্তু লম্বা জামা পরিধানকারীর সম্মান করা হতো তাকে বড় করার জন্যে।" একদা তিনি তাঁর একটা টুপি সুন্নাত পদ্ধতিতে রঙ করিয়ে নেন। কিছুদিন এ টুপিটি পরার পর তিনি আর ওটা ব্যবহার করলেন না। তিনি বলেনঃ "আমি লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণ লোক এ ধরনের টুপি ব্যবহার করে না।"

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) বলেনঃ "তোমরা এমন পোশাক পরিধান করবে যা দেখে লোকে ঘৃণা না করে।"

সাওরী (রঃ) বলেন যে, পূর্বযুগীয় মনীষীরা না খুব জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করতেন, না অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর পোশাক পরতেন।

আবূ কিলাবা (রঃ)-এর কাছে কোন একজন লোক অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও মূল্যবান পোশাক পরে আগমন করে। তখন তিনি বলেনঃ "এই চিৎকারকারী গাধা হতে বেঁচে থাকো।"

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে অহংকার পোষণ করে, কিন্তু সে বিনয় প্রকাশ করে তার বাহ্যিক পোশাকে। যেন তার চাদর একটি বড় হাতুড়ী।

হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি আছে যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে বলেনঃ "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে এসে থাকো দরবেশী পোশাকে, অথচ তোমাদের অন্তর তো নেকড়ে বাঘের অন্তরের ন্যায়? দেখো, তোমরা রাজা-বাদশাহদের পোশাক পরিধান করবে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে।"

উত্তম চরিত্রের বর্ণনা ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে উত্তম মুমিন কে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম সেই সবচেয়ে উত্তম মুমিন।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমল কম হওয়া সত্ত্বেও শুধু উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষ বড় বড় মর্যাদা ও জান্নাতের উত্তম মনযিল লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, আমল অধিক হওয়া সত্ত্বেও শুধু দুশ্চরিত্র হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামের নিম্নস্তরে চলে যায়।" তিনি আরো বলেছেনঃ "সৎ স্বভাবের মাঝেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত আছে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উত্তম চরিত্রের কারণে মানুষ এমন ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে যে রাত্রে দাঁড়িয়ে ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "সাধারণভাবে জান্নাতে প্রবেশ লাভের মাধ্যম কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র।" আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সাধারণতঃ কি কারণে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করে?" তিনি জবাবে বলেনঃ "দু'টি ছিদ্র বিশিষ্ট জিনিসের কারণে অর্থাৎ মুখ ও গুপ্তাঙ্গ।"

হযরত উসামা ইবনে শুরাইক (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় প্রত্যেক জায়গা হতে আরববাসীরা তাঁর নিকট আগমন করে এবং জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষকে সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিস কি দেয়া হয়েছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "উত্তম চরিত্র।"

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেনঃ "নেকীর পাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যার চরিত্র উত্তম।"

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে যেমন আল্লাহ তা'আলা সকাল সন্ধ্যায়

প্রতিদান দিয়ে থাকেন তেমনই তিনি সৎ চরিত্রের অধিকারীকেও তার উত্তম চরিত্রের বিনিময় প্রদান করে থাকেন।”

হযরত আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় এবং জান্নাতের মনযিলে আমার চেয়ে অধিক দূরবর্তী যার চরিত্র খারাপ ও ভাষা কর্কষ।”

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পূর্ণ ঈমানদার ও উত্তম চরিত্রের লোক ঐ ব্যক্তি, যে সবারই সাথে উত্তম ব্যবহার করে ও প্রেম প্রীতির সাথে মিলেমিশে থাকে।”

হযরত বকর ইবনে আবি ফুরাত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যার জন্ম ও স্বভাব-চরিত্র ভাল, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের ইন্ধন বানাবেন না।”

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মুমিনের মধ্যে দু'টি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। একটি হলো কৃপণতা এবং অপরটি হলো মন্দ চরিত্র।”

হযরত মাইমূন ইবনে মাহ্রান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলার নিকট মন্দ চরিত্র অপেক্ষা বড় পাপ আর কিছুই নেই। কেননা, মন্দ স্বভাবের কারণে এক একটি বড় পাপে মানুষ জড়িয়ে পড়ে।

কুরায়েশের একটি লোক হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর কাছে মন্দ চরিত্র অপেক্ষা বড় পাপ আর নেই। ভাল চরিত্রের কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মন্দ চরিত্র সৎ আমলকে নষ্ট করে দেয়– যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে থাকে।”

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ “মাল দ্বারা তোমরা মানুষকে বশে আনতে পার না, বরং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে বশে আনা যায়।”

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেনঃ “উত্তম চরিত্র দ্বীনের সহায়ক।”

অহংকার নিন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ “ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে এবং ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে।”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।”

হযরত সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মানুষ আত্মগরিমায় এমনভাবে মেতে ওঠে যে, আল্লাহর নিকট তার নাম যালিম ও অহংকারীদের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তখন তার উপর ঐ শাস্তি এসে পৌঁছে যা অহংকারী যালিমদের উপর পৌঁছেছিল।”

ইমাম মালিক ইবনে দীনার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ঐ সময় তাঁর দরবারে দু'লক্ষ মানুষ ও দু'লক্ষ জ্বিন সমবেত ছিল। তাঁকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, এমন কি ফেরেশতাদের তাসবীহ্ পাঠের শব্দ তিনি শুনতে পান। অতঃপর তাঁকে যমীনে ফিরিয়ে আনা হয়, এমন কি সমুদ্রের পানিতে তাঁর পা ভিজে যায়। এমন সময় গায়েবী আওয়ায হয়ঃ “যদি তার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকতো তবে যতো উপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী নীচে তাকে প্রোথিত করা হতো।”

হযরত আবূ বকর (রাঃ) একদা স্বীয় ভাষণে মানুষের জন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, সে দু'জন মানুষের প্রস্রাবের স্থান হতে বের হয়ে থাকে। এটা তিনি এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, শ্রোতারা তা শুনতে ঘৃণা বোধ করে।

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে সে বড়ই উদ্ধত ও যালিম। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ

“(হে মুসা আঃ)! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ।” (২৮ ঃ ১৯)

হযরত হাসান (রঃ) বলেনঃ "যে দু'বার নিজের হাতে নিজের পায়খানা পরিষ্কার করে সে কিসের ভিত্তিতে অহংকার করে এবং তাঁর বিশেষণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায় যিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোকে নিজের অধিকারে রেখেছেন?" হযরত যহহাক ইবনে সুফিয়ান (রঃ) হতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন জিনিস দ্বারা দেয়াও বর্ণিত আছে যা মানুষ হতে বের হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেনঃ "যার অন্তরে যে পরিমাণ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থাকে সেই পরিমাণ জ্ঞান তার কমে যায়।"

ইউনুস ইবনে উবায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "সিজদা করার সাথে অহংকার এবং তাওহীদের সাথে নিফাক বা কপটতা থাকতে পারে না।"

বানু উমাইয়ারা নিজেদের ছেলেদেরকে মেরে মেরে গর্বভরে চলা শিক্ষা দিতো।

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ)-কে একদা দম্ভ ও গর্বভরে চলতে দেখে হযরত তাউস (রঃ) তাঁর পার্শ্বদেশে একটি খোঁচা মেরে বলেনঃ "যার পেট মলে পরিপূর্ণ তার এ ধরনের চাল কেন?" হযরত উমার (রঃ) এতে লজ্জিত হয়ে বলেনঃ "জনাব, ক্ষমা করুন! আমাকে মেরে পিটে এ ধরনের অভ্যাস করানো হয়েছে।"

গর্ব ও ঔদ্ধত্যের নিন্দার বর্ণনা ঃ

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় মাটিতে ঝুলিয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী মাটিতে ছেঁচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। কোন একটি লোক সুন্দর চাদর গায়ে দিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে চলছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাকে মাটির মধ্যে প্রোথিত করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই থাকবে।"

২০। তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই

٢٠- اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ○

তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথ-নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

۲۱- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

২১। তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর। তারা বলেঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ দেখো, আকাশের তারকারাজি তোমাদের সেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সর্বক্ষণ জ্বলজ্বল করে তোমাদেরকে আলো প্রদান করছে। বাদল, বৃষ্টি, শিশির, শুষ্কতা ইত্যাদি সবই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত আছে। আকাশ তোমাদের মযবূত ছাদ স্বরূপ। তিনি তোমাদেরকে নহর, নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, ফল-ফুল ইত্যাদি যাবতীয় নিয়ামত দান করেছেন। এ প্রকাশ্য অসংখ্য নিয়ামত ছাড়াও অপ্রকাশ্য আরো অসংখ্য নিয়ামত তিনি দান করেছেন। যেমন রাসূলদেরকে প্রেরণ, কিতাব নাযিলকরণ ইত্যাদি। যিনি এতোগুলো নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর সত্তার উপর সবারই ঈমান আনয়ন করা একান্তভাবে উচিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো বহু লোক আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে রয়েছে। এর পিছনে তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কোন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ নেই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা নির্লজ্জের মত উত্তর দেয়– আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো।

তাদের এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ শয়তান যদি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে থাকে তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে? এদের পূর্বপুরুষরা ছিল এদের পূর্বসূরি এবং এরা হচ্ছে তাদের উত্তরসূরি।

২২। যদি কেউ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তবে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।

٢٢- وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

২৩। কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করবো তারা যা করতো। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

٢٣- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৪। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেবো স্বল্পকালের জন্যে। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো।

٢٤- نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্তে আমল করে, যে সত্যভাবে আল্লাহর অনুগত হয়, যে শরীয়তের অনুসারী হয়, আল্লাহর আদেশের উপর আমল করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে সে দৃঢ় রজ্জুকে ধারণ

করলো, সে যেন আল্লাহর ওয়াদা নিয়েছে যে, সে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা পাবে। কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ তুমি কাফিরদের কুফরীর কারণে মোটেই চিন্তিত হয়ো না। তাদেরকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সে সময় আমি তাদেরকে তাদের আমলের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করবো। আমার কাছে তাদের কোন আমলই গোপন নেই। আমি স্বল্পকালের জন্যে তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিবো। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ - مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ -

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবে না, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ তো এদের জন্য রয়েছে, পরে আমারই নিকট এদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।” (১০ ঃ ৬৯-৭০)

২৫। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ। বলঃ প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٢٥- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২৬। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

٢٦- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মুশরিকরা এটা স্বীকার করতো যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তা সত্ত্বেও তারা অন্যদের ইবাদত করতো। অথচ তারা ভালরূপেই জানতো যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়। সবই তাঁর অধীনস্থ।

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?' এ প্রশ্ন তাদেরকে করলে তারা সাথে সাথেই উত্তর দিতো যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই বটে। তাই আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও– প্রশংসা যে আল্লাহরই তা তো তোমরা স্বীকারই করছো। প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং সব তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত এবং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনিই। সৃষ্টিকার্যে ও আহকাম ধার্য করার ব্যাপারে তিনিই প্রশংসার যোগ্য।

٢٧- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৭। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢٨- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৮। তোমাদের সবারই সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইয্যত, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বুযর্গী, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। নিজের পবিত্র গুণাবলী, মহান নাম ও অসংখ্য কালেমার বর্ণনা প্রদান করছেন। না কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে, না তার পরিধি কারো জানা আছে। তার প্রকৃত তথ্য কারো জানা নেই। মানব-নেতা, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলতেনঃ

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতের গণনা ততো আমি করতে পারবো না যতোটা আপনি নিজের

নিয়ামতের বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন” বা “আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে আমি শেষ করতে পারবো না যেমন আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন।”

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ জগতের সমস্ত গাছ-পালাকে যদি কলম বানানো হয় এবং সাগরের সমস্ত পানিকে যদি কালি বানানো হয়, এরপর আরো সাতটি সাগরের পানি মিলিত করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলী, বুযর্গী এবং বাণীসমূহ লিখতে শুরু করা যায় তবে এই সমুদয় কলম ও কালি শেষ হয়ে যাবে, তথাপি একক ও শরীক বিহীন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী শেষ হবে না। এতে এটা মনে করা চলবে না যে, যদি সাতের অধিক সাগরের পানি একত্রিত করা হয় তবে আল্লাহর গুণাবলী লিখার জন্যে যথেষ্ট হবে। এটা কখনো নয়। এ গণনা শুধু আধিক্য প্রকাশের জন্যে বলা হয়েছে। এটাও মনে করা চলবে না যে, মাত্র সাতটি সাগর আছে যা সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অবশ্য বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াতে এ সাতটি সাগরের কথা বলা হয়েছে বটে, তাকে আমরা সত্যও বলতে পারি না এবং মিথ্যাও না । তবে আমরা যে তাফসীর করেছি তার পৃষ্ঠপোষক নিম্নের আয়াতটিকে বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا -

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।” (১৮ঃ ১০৯) এখানে একটি সমুদ্র উদ্দেশ্য নয়, বরং এক একটি করে যতই হোক না কেন, তবুও আল্লাহর কালেমা শেষ হবে না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা লিখাতে শুরু করেন ও বলেনঃ এ কাজ লিখো, ও কাজ লিখো, এভাবে লিখতে লিখতে সমস্ত কলম ভেঙ্গে শেষ হয়ে যাবে, তবুও লিখা শেষ হবে না।

মুশরিকরা বলতো যে, এ কালাম শেষ হয়ে যাবে। এ আয়াত দ্বারা তাদের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে। না আল্লাহর বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো শেষ হবে, না তাঁর জ্ঞানের পরিধি জরিপ করা যাবে, না তাঁর জ্ঞান ও সিফাতের পরিমাপ করা সম্ভব হবে। আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সমস্ত বান্দার জ্ঞান এমনই যেমন সমুদ্রের

পানির তুলনায় এক ফোটা পানি। আল্লাহর কথা শেষ হবার নয়। আমরা তাঁর যে প্রশংসা করি, তাঁর প্রশংসা এর বহু উপরে।

মদীনায় ইয়াহূদী আলেমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিল ঃ "আপনি যে পাঠ করে থাকেন–

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ 'তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' (১৭ ঃ ৮৫) এর দ্বারা উদ্দেশ্য কারা, আমরা, না আপনার কওম?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমরা ও তোমরা সবাই।" তারা পুনরায় বলেঃ "তাহলে আপনি কালামুল্লাহর এ আয়াতের অর্থ কি করবেন যেখানে বলা হয়েছে যে, তাওরাতে সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ "জেনে রেখো যে, তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে ওগুলো আল্লাহ তা'আলার কালেমার তুলনায় অতি অল্প। তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণই তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। কিন্তু এর দ্বারা জানা যাচ্ছে আয়াতটি মাদানী হওয়া উচিত। অথচ এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, এটা মক্কী আয়াত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরই বিজয়ী। সবকিছুই তাঁর কাছে যৎকিঞ্চিৎ ও বিজিত। কিছুই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। তিনি নিজের কথায়, কাজে, আইন-কানুনে, বুদ্ধিতে ও অন্যান্য গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববিজয়ী এবং প্রতাপশালী।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে মেরে ফেলে পুনরুজ্জীবিত করা আমার কাছে একটি লোককে মেরে জীবিত করার মতই সহজ। কোন কিছু হওয়ার ব্যাপারে আমার শুধু হুকুম করাই যথেষ্ট। কোন কিছু করতে আমাকে চোখের পলক ফেলার সমানও সময় লাগে না। দ্বিতীয়বার হুকুম করার আমার প্রয়োজন হয় না। কোন উপকরণ ও যন্ত্রপাতিরও দরকার হয় না। একটা হুকুমেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। একটি শব্দ মাত্রই সবাই জীবিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন। একটি লোকের কথা ও কাজ যেমন তাঁর কাছে গোপন থাকে না, অনুরূপভাবে সারা দুনিয়ারও কিছুই তাঁর কাছে লুক্কায়িত নয়।

٢٩- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

২৯। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

٣٠- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ۝ع

৩০। এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আল্লাহ, তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ রাত্রিকে কিছু ছোট করে দিবসকে বাড়িয়ে দেয়া এবং দিবসকে কিছু ছোট করে রাত্রিকে বাড়িয়ে দেয়া আমারই কাজ। শীতের দিনে রাত্রি বড় ও দিন ছোট এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হওয়া আমারই শক্তির প্রমাণ। চন্দ্র-সূর্যের চক্র ও আবর্তন আমারই আদেশক্রমে হয়ে থাকে। এগুলো নির্ধারিত স্থানের দিকেই চলে। নিজ স্থান থেকে এতোটুকুও এদিক ওদিক যেতে পারে না।

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)। এই সূর্য কোথায় যায় তা তুমি জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-ই খুব ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা গিয়ে আল্লাহর আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যায় এবং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। এটা খুব নিকটবর্তী যে, একদিন তাকে বলে দেয়া হবে– 'যেখান হতে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য 'সাফিয়াহ' (পশ্চাৎ ভাগের ফৌজ)-এর ন্যায় কাজ করে। দিনে নিজের চক্রের কাজে লেগে থাকে, তারপর

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

অস্তমিত হয়ে আবার রাত্রে যমীনের নীচে চলে গিয়ে ঘুরতে থাকে। অতঃপর পরের দিন আবার সকালে উদিত হয়। এভাবেই চাঁদও কাজ করতে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ "তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন?"(২২ ঃ ৭০) তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই খবর তিনিই রাখেন। যেমন তিনি বলেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীন।" (৬৫ ঃ ১২)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এগুলো এরই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ, তিনি তো সমুচ্চ, মহান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর দাস। কারো এ ক্ষমতা নেই যে, তাঁর হুকুম ছাড়া একটি অণুকে নড়াতে পারে। একটি মাছি সৃষ্টি করার জন্যে যদি সমস্ত দুনিয়াবাসী একত্রিত হয় তবুও তারা তাতে অপারগ হয়ে যাবে। এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ সমুচ্চ ও মহান। তাঁর উপর কারো কোন কর্তৃত্ব চলে না। তাঁর কাছে সবাই হেয় ও তুচ্ছ।

৩১। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

٣١- اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৩২। যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

٣٢- وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ○

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেনঃ আমার আদেশে সাগরে জাহাজ চলতে থাকে। যদি আমি জাহাজগুলোকে পানিতে ভাসার ও পানি কেটে চলার আদেশ না করতাম এবং ওগুলোর মধ্যে এ ক্ষমতা না রাখতাম তবে ওগুলো কেমন করে পানিতে চলতো? এর মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে আমার শক্তির প্রমাণ পেশ করছি। দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা এ থেকে বহু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

যখন কাফিরদেরকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা ঘিরে ফেলে এবং তাদের জাহাজ ডুবুডুবু অবস্থায় পতিত হয় আর পাহাড়ের ন্যায় তরঙ্গমালা জাহাজকে এধার থেকে ওধার ও ওধার থেকে এধার ঠেলে নিয়ে যায় তখন তারা শিরক ও কুফরী ভুলে যায় এবং কেঁদে কেঁদে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّآ إِيَّاهُ

অর্থাৎ "সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা আল্লাহ ছাড়া সবকেই ভুলে যাও।" (১৭ ঃ ৬৭) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ

অর্থাৎ "যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে।" (২৯ ঃ ৬৫) মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ কাফের হয়ে যায়।' মুজাহিদ (রঃ) এই তাফসীর করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তারা শির্ক করতে শুরু করে দেয়।" (২৯ ঃ ৬৫) আর ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন مُقْتَصِدٌ-এর অর্থ হচ্ছে কাজে মধ্যমপন্থী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

অর্থাৎ "তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোর যালিম হয়ে যায় এবং কেউ কেউ মধ্যমপন্থী থাকে।" (৩৫ ঃ ৩২) এও হতে পারে যে, উভয়কেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। প্রকৃত মতলব এই যে, যারা এ প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং যিনি তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের উচিত ছিল পরিপূর্ণভাবে তাঁর অনুগত হওয়া ও সৎ আমলে আত্মনিয়োগ করা। আর সদা-সর্বদা সৎ আমলের প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু এ না করে তাদের কেউ কেউ মধ্যমপন্থী থাকে এবং কেউ কেউ পূর্ণভাবেই কুফরীর দিকে ফিরে যায়।

خَتَّارٌ বলা হয় গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতককে। خَتَرٌ-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা।

كَفُوْرٌ বলে مُنْكِرٌ বা অস্বীকারকারীকে, যে নিয়ামতরাশিকে অস্বীকার করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ভুলে যায়।

৩৩। হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

٣٣- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وقفة وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিয়ামতের দিন হতে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতির নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ তোমরা এমন দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা পুত্রের কোন উপকার করতে পারবে না এবং পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। সেই দিন একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা দুনিয়ার উপর কোন ভরসা করো না এবং আখিরাতকে ভুলে যেয়ো না। তোমরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ো না। সে তো শুধু পর্দার আড়াল থেকে শিকার করতে জানে।

অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হযরত উযায়ের (আঃ) যখন নিজ সম্প্রদায়ের কষ্ট দেখলেন এবং তাঁর চিন্তা ও দুঃখ বেড়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি বলেনঃ "আমি অনুনয়-বিনয়ের সাথে খুব কাঁদলাম ও মিনতি করলাম। আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি ও দু'আ করতে থাকি। একবার খুব মিনতির সাথে দু'আ করছি ও কাঁদছি, এমন সময় আমার সামনে একজন ফেরেশতা আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ ভাল লোক কি মন্দ লোকের জন্যে সুপারিশ করবে? পিতা কি পুত্রের কোন কাজে আসবে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "কিয়ামতের দিন তো ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার দিন। ঐ দিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সামনে থাকবেন। কেউই তাঁর বিনা হুকুমে মুখ খুলতে পারবে না। কাউকেও কারো ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে না। না পিতাকে পুত্রের পরিবর্তে এবং না পুত্রকে পিতার পরিবর্তে পাকড়াও করা হবে। ভাই ভাই-এর বদলে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে না এবং প্রভুর বদলে গোলাম ধরা পড়বে না। কেউ কারো জন্যে দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবে না এবং কারো প্রতি কারো কোন খেয়ালই থাকবে না। কেউ কারো উপর কোন দয়া করবে না এবং কারো প্রতি কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করবে না। কারো প্রতি কেউ কোন ভালবাসা দেখাবে না। সেদিন কাউকেও কারো পরিবর্তে পাকড়াও করা হবে না। সবাই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা নিয়ে ফিরবে, একে অপরের বোঝা সেদিন বহন করবে না।

৩৪। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে।

٣٤- إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝	**কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।**

এগুলো হচ্ছে গায়েবের চাবি কাঠি যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। আল্লাহ যাকে জানিয়ে দেন সে ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। কিয়ামত সংঘটিত হবার সঠিক সময় না কোন নবী-রাসূলের জানা আছে, না কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতার জানা আছে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন, কোথায়, কতটুকু বর্ষিত হবে তার জ্ঞান আল্লাহ্রই আছে। তবে এ কাজের ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে যখন নির্দেশ দেয়া হবে তখন তিনি জানতে পারবেন। এভাবে গর্ভবতী নারীর জরায়ুতে পুত্র সন্তান আছে কি কন্যা সন্তান আছে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। অবশ্যই এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে যখন হুকুম করা হয় তখন তিনি তা জানতে পারেন যে, সন্তান নর হবে কি নারী হবে, পুণ্যবান হবে কি পাপী হবে। অনুরূপভাবে কেউই জানে না যে, সে আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং এটাও কেউই জানে না যে, কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ

অর্থাৎ “গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর নিকটেই আছে, তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না।” (৬ ঃ ৫৯) হাদীসে রয়েছে যে, গায়েবের চাবি হচ্ছে এই পাঁচটি জিনিস যেগুলোর বর্ণনা اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الخ-এই আয়াতে রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “পাঁচটি জিনিস রয়েছে যেগুলোর খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।” অতঃপর তিনি اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ الخ-এ আয়াতটিই পাঠ করেন।

সহীহ বুখারীর শব্দ এও রয়েছে যে, এ পাঁচটি জিনিস হলো গায়েবের চাবি, যেগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না।”

মুসনাদে আহমাদে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তি রয়েছেঃ “পাঁচটি জিনিস ছাড়া আমাকে সবকিছুরই চাবি দেয়া হয়েছে।” অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের মজলিসে বসেছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট একটি লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ "ঈমান কি"? রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বলেনঃ "ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।" লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "ইসলাম কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে।" লোকটি বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ইহসান কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "ইহসান এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, অথবা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না কিন্তু তিনি তোমাকে দেখছেন (এরূপ খেয়াল রেখে তাঁর ইবাদত করবে)।" লোকটি বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "এটা জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। তবে আমি তোমাকে এর কতকগুলো নিদর্শনের কথা বলছি। যখন দাসী তার মনিবের জন্ম দেবে এবং যখন উলঙ্গ পা ও উলঙ্গ দেহ বিশিষ্ট লোকেরা নেতৃত্ব লাভ করবে। কিয়ামতের জ্ঞান ঐ পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।" অতঃপর তিনি إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ-এ আয়াতটি পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "যাও, তোমরা লোকটিকে ফিরিয়ে আন।" জনগণ দৌড়িয়ে গেল। কিন্তু লোকটিকে কোথাও দেখতে পেলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "ইনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি আগমন করেছিলেন।"[১] আমরা এ হাদীসের ভাবার্থ সহীহ বুখারীর শরাহতে ভালভাবে বর্ণনা করেছি।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর হাতের তালু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাঁটুর উপর রেখে প্রশ্নগুলো করেছিলেন যে, ইসলাম কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "ইসলাম এই যে, তুমি তোমার চেহারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিবে

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।” হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন বলেনঃ “এরূপ করলে কি আমি মুসলমান হয়ে যাবো?” জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যাঁ, এরূপ করলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে।” হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে বলে দিন, ঈমান কি?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপর, পরকালের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর, নবীদের উপর, মৃত্যুর উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর, জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর, হিসাবের এবং মীযানের উপর। আরো বিশ্বাস রাখবে তকদীরের ভাল-মন্দের উপর।” হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ “এরূপ করলে কি আমি মুমিন হবো?” তিনি জবাব দেনঃ “হ্যাঁ, এরূপ করলে তুমি মুমিন হবে।” অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সুবহানাল্লাহ! এটা ঐ পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।” অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الخ -এই আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। নিদর্শনগুলোর মধ্যে এও রয়েছে যে, মানুষ লম্বা-চওড়া অট্টালিকা নির্মাণ করতে শুরু করবে।

মুসনাদে আহমাদে একটি সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত আছে যে, বানু আমির গোত্রের একটি লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ “আমি আসবো কি?” নবী (সঃ) তখন লোকটির কাছে তাঁর খাদেমকে পাঠালেন, যেন সে তাকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়। কেননা, সে অনুমতি চাইতে জানে না। তাকে প্রথমে সালাম দিতে হবে এবং পরে বলতে হবেঃ “আমি আসতে পারি কি?” লোকটি শুনলো এবং সালাম করে আগমনের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি পেয়ে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ “আপনি আমাদের জন্যে কি নিয়ে এসেছেন।” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি তোমাদের জন্যে কল্যাণই নিয়ে এসেছি। শুনো, তোমরা এক আল্লাহরই ইবাদত করবে। লাত ও উয্যাকে ছেড়ে দেবে। দিন-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করবে, বছরের মধ্যে এক মাস রোযা রাখবে, ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করবে।” লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জ্ঞানের মধ্যে এমন কিছু বাকী আছে কি যা আপনি জানেন না।?” তিনি জবাবে বললেনঃ “হ্যাঁ, এমন জ্ঞানও রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।” অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ .. الخ-এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একজন গ্রামবাসী (বেদুইন) নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে, বলুন তো তার কি সন্তান হবে?

আমাদের শহরে দুর্ভিক্ষ পড়েছে, বলুন তো বৃষ্টি কখন হবে? আমি কখন জন্মগ্রহণ করেছি তা তো আমি জানি, এখন বলুন তো কখন আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো?” তার এসব প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তিনি এগুলোর খবর রাখেন না। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এগুলোই হলো গায়েবের চাবি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, গায়েবের চাবি-কাঠি আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “যে তোমাদেরকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগামীকালকের কথা জানতেন, তুমি বুঝবে যে, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তো বলেন যে, কাল কি করবে তা কেউ জানে না।” কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এমন কতকগুলো জিনিস আছে যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা কাউকেও দেননি। ওগুলোর জ্ঞান নবীদেরও নেই, ফেরেশতাদেরও নেই। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। কারো এ জ্ঞান নেই যে, সে কোন সালে, কোন মাসে এবং কোন দিনে আসবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন হবে এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। গর্ভবতী নারীর জরায়ুতে পুত্র সন্তান আছে কি কন্যা সন্তান আছে, সন্তান লাল বর্ণের হবে কি কালো বর্ণের হবে এ জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। কেউ এটা জানে না যে, সে আগামীকাল ভাল কাজ করবে কি মন্দ কাজ করবে, মরবে কি বেঁচে থাকবে। হতে পারে যে কালই মৃত্যু বা কোন বিপদ এসে পড়বে। কেউই জানে না যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে, কোথায় তার কবর হবে। হতে পারে যে, তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে অথবা কোন জনমানবহীন জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করবে। কেউই জানে না যে, সে কঠিন মাটিতে, না নরম মাটিতে প্রোথিত হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, যে ব্যক্তির মৃত্যু অন্য দেশের মাটিতে লিখা তাকে কোন কার্যোপলক্ষে সেখানে যেতে হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।

আলী হামদানের কবিতায় এ বিষয়টিকে খুব ভালভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

একটি হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন যমীন আল্লাহকে বলবেঃ “এগুলো আপনার আমানত যা আপনি আমার কাছে রেখেছিলেন।” তিবরানী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ লোকমান এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ সাজদাহ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩০, রুকূ' ঃ)

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٣٠، رُكُوْعَاتُهَا :٩)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুমআ'র দিন ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম-তানযীল আস্-সাজদাহ' এবং 'হাল আতা আলাল ইনসানে' পাঠ করতেন।[১]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 'আলিফ-লাম-মীম-তানযীল আস্-সাজ্দাহ' এবং 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক' এ দু'টি সূরা (রাত্রে) তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না।[২]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- الٓمّٓ ○

১। আলিফ-লাম-মীম।

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২। এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩। তবে কি তারা বলেঃ এটা তো সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার প্রতিপালক হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয় তো তারা সৎপথে চলবে।

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ'ত রয়েছে ওগুলোর পূর্ণ আলোচনা আমরা সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে করে এসেছি। সুতরাং এখানে

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) কিতাবুল জুমআ'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন

পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এই কিতাব আল–কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিকদের এ কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। না, না, এটা তো চরম সত্য কথা যে, এ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটা এজন্যেই অবতীর্ণ করা হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কওমকে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন নবী আগমন করেননি। যাতে তারা সত্যের অনুসরণ করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

٤- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪। আল্লাহ, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٥- يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

৫। তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।

٦- ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ۙ

৬। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছয় দিনে যমীন, আসমান ও এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আরশের উপর সমাসীন হন। এর তাফসীর ইতিপূর্বে গত হয়েছে। মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণতা প্রাপ্তি তাঁরই হাতে। সবকিছুর তদবীর ও তদারক তিনিই করে থাকেন। সবকিছুরই উপর আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোন বন্ধু ও অভিভাবক নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো কোন সুপারিশ চলবে না।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছো এবং যাদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছ, তোমরা কি বুঝতে পার না যে, এতো বড় শক্তিশালী সত্তা কি করে তাঁর একজন শরীক গ্রহণ করতে পারেন? তিনি তাঁর সমকক্ষতা, পরামর্শদাতা ও শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্যও নেই, পালনকর্তাও নেই।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাতটি ধারণ করে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যমীন, আসমান এবং এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিবসে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি মাটিকে শনিবার, পাহাড়কে ররিবার, গাছ-পালাকে সোমবারে, মন্দ জিনিসকে মঙ্গলবার, জ্যোতিকে বুধবার, জীবজন্তুকে বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদম (আঃ)-কে শুক্রবার আসরের পরে দিবসের শেষভাগে সৃষ্টি করেন। তাঁকে তিনি সারা দুনিয়ার মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। এতে লাল, কালো, সাদা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সব রকমের মাটি ছিল। এ কারণেই আদম সন্তান ভাল ও মন্দ হয়ে থাকে।"[১]

আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্তম আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং সাত তবক যমীনের নীচে পর্যন্ত চলে যায়। যেমন অন্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীন। তাঁর হুকুম এগুলোর মাঝে অবতীর্ণ হয়।" (৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নিজ কাচারীর দিকে উঠিয়ে নেন যা দুনিয়ার আকাশের উপরে রয়েছে। যমীন হতে প্রথম আসমান পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধানে

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে মুআল্লাল বলে উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রয়েছে। ঐ পরিমাণই ওর ঘনত্ব। এতো দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও ফেরেশতারা চোখের পলকে নীচে আসেন ও উপরে যান। এজন্যেই বলা হয়েছেঃ তোমাদের হিসেবে সহস্র বছরের সমান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ প্রতিদিন আমলগুলো অবগত হয়ে থাকেন। ছোট ও বড় সব আমল তাঁর কাছে আনীত হয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু নিজের অধীনস্থ করে রেখেছেন। সমস্ত বান্দার গ্রীবা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকে। তিনি মুমিন বান্দাদের উপর বড়ই স্নেহশীল। তাদের উপর তিনি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

٧- الَّذِىٓ اَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِيۡنٍ ۞

৭। যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهٗ مِنۡ سُلٰلَةٍ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍ ۞

৮। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।

٩- ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيۡهِ مِنۡ رُّوۡحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ‌ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَشۡكُرُوۡنَ ۞

৯। পরে তিনি ওকে করেছেন সুঠাম এবং ওতে ফুঁকে দিয়েছেন রূহ তার নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি (আল্লাহ) সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সবই তিনি এমন সুন্দরভাবে ও উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন যা ধারণা করা যায় না। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিই কত উত্তম, কত দৃঢ় ও কত মযবূত! আকাশ-পাতাল সৃষ্টির সাথে সাথে মানব-সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে যা পুরুষের পিঠ ও স্ত্রীর বক্ষস্থল হতে বের হয়ে থাকে।

পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন নিজের নিকট হতে। মানুষকে তিনি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ দান করেছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এর পরও মানুষ খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। তাদের পরিণতি অতি উত্তম ও আনন্দদায়ক যারা আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তিসমূহকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী তাঁর পথে ব্যবহার করে থাকে। মহান তাঁর শান ও মর্যাদাপূর্ণ তাঁর নাম।

১০। তারা বলেঃ আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুতঃ তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।

١٠- وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ○

১১। বলঃ তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।

١١- قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○ ع

কাফিরদের আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে তারা বিশ্বাসী নয়। ওটা তারা অসম্ভব বলে মনে করে। তারা বলে থাকেঃ যখন আমরা মরে সড়ে পচে যাবো এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর আবার কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? দুঃখের কথা এই যে, আল্লাহকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে থাকে। তারা তাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে আল্লাহর অসীম শক্তির সাথে তুলনা করে। তারা জানে ও স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক কথা এই যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারও শক্তি যে তাঁর আছে এটা তারা স্বীকার করে না। অথচ তারা তো তাঁরই শক্তিতে চালিত হচ্ছে। তাঁর তো শুধু হুকুম মাত্র। যখনই তিনি কোন কিছুকে বলেনঃ হও, আর তেমনি তা হয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'মালাকুল মাউত' একজন ফেরেশতার উপাধী। হযরত বারা (রাঃ)-এর ঐ হাদীসটি যার বর্ণনা সূরায়ে ইবরাহীমে গত হয়েছে, ওর দ্বারাও প্রথম কথাটি এটাই বোধগম্য হয়ে থাকে। আর কোন কোন আসারে তাঁর নাম আযরাঈলও (আঃ) রয়েছে এবং এটাই প্রসিদ্ধও বটে। হ্যাঁ, তবে তাঁর সঙ্গী-সাথী ও তাঁর সাথে কাজকারী আরো ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা দেহ হতে রূহ বের করে থাকেন এবং হুলকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর মালাকুল মাউত ওটা নিয়ে নেন। তাঁদের জন্যে দুনিয়াকে ছোট করে দেয়া হয়। যেমন আমাদের সামনে খাবারের খাঞ্চা থাকে। মন চায় যে, সেটা এমন স্থানে রাখা হোক যাতে সেটা থেকে খাবার উঠিয়ে নেয়ার সুবিধা হয়। ফেরেশতাদের কাছে দুনিয়াও ঠিক তদ্রূপ।

এই বিষয়ের উপর একটি মুরসাল হাদীসও রয়েছে। আর ওটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিও বটে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেনঃ একজন আনসারীর শিয়রে মালাকুল মাউতকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে মালাকুল মাউত! আমার সাহাবীর রূহ সহজভাবে কব্য্ করুন।" মালাকুল মাউত উত্তরে বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ও চিত্তকে আনন্দিত রাখুন। কেননা, আমি প্রত্যেক মুমিনের ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন করে থাকি। শুনুন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! সারা দুনিয়ার প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে, স্থলে হোক বা জলে হোক, প্রত্যেক দিন আমি পাঁচবার চক্কর লাগিয়ে থাকি। তাদের ছোট ও বড় নিজেদেরকে যতটা চিনে তার চেয়ে বেশী আমি তাদেরকে চিনি। হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর আদেশ না হওয়া পর্যন্ত আমি একটি মশারও জান কবয করতে পারি না।"[১]

হযরত জাফর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মালাকুল মাউতের দিনের মধ্যে পাঁচবার একটি মানুষের খোঁজ-খবর নেয়ার অর্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় তাকে দেখে নেয়া। যদি সে নামাযের হিফাযতকারী হয় তবে ফেরেশতা তার নিকটে অবস্থান করেন এবং শয়তান তার থেকে দূরে থাকে। শেষ সময়ে ফেরেশতা তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তালকীন দিয়ে থাকেন।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মালাকুল মাউত প্রত্যেকদিন প্রতিটি বাড়ীতে দু'বার করে এসে থাকেন। কা'ব আহবার (রঃ) তো এর সাথে সাথে একথাও বলেন যে, মালাকুল মাউত দরজার উপর অবস্থান করেন এবং সারা দিনের মধ্যে সাতবার দৃষ্টিপাত করেন যে, ঐ বাড়ীর লোকদের মধ্যে কারো জান কবয করার নির্দেশ হয়েছে কি-না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে। কবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এবং সেখানে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

١٢- وَلَوْ تَرٰىٓ اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○

১২। এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।

١٣- وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১৩। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

١٤- فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ

১৪। তবে শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমরা যা করতে তজ্জন্যে তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ পাপীরা যখন নিজেদের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখবে তখন অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় মাথা নীচু করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের চোখ এখন উজ্জ্বল হয়েছে এবং আমাদের কানগুলো খাড়া হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। এখন আমরা বুঝে সুঝে কাজ করবো। আমাদের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। ঐ সময় কাফিররা নিজেদের তিরস্কার করতে থাকবে। জাহান্নামে প্রবেশের সময় তারা আক্ষেপ করে বলবেঃ

لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ۔

অর্থাৎ "(তারা আরো বলবেঃ) যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।" (৬৭ ঃ ১০) অনুরূপভাবে এরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন (পার্থিব জগতে)। তাহলে আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। আর আল্লাহ তা'আলাও জানেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে দেন তবে তারা পূর্বের মতই কাফির হয়ে যাবে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে ও তাঁর রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا

অর্থাৎ "তুমি যদি দেখতে যে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না।" (৬ঃ ২৭)

এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا -

অর্থাৎ "যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানকারী সবাই অবশ্যই ঈমান আনতো।" (১০ ঃ ৯৯) কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই দানব ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো। এটা আল্লাহর অটল ফায়সালা। আমরা তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাঁর সমুদয় কথা হতে ও তাঁর শাস্তি হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ঐদিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবেঃ তবে শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। একে তোমরা অসম্ভব মনে করতে। আজ আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এটা শুধু বদল বা বিনিময় হিসেবে বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম যেমন তোমরা তোমাদের এদিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে।" (৪৫ ঃ ৩৪)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যা করতে তজ্জন্যে তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো। অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا - اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا .... فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا -

অর্থাৎ "সেথায় তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোন পানীয়– ফুটন্ত পানি ও পূঁজ ব্যতীত... আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো।" (৭৮ ঃ ২৪-৩০)

১৫। শুধু তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং

١٥- اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ

سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○	তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।
١٦- تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○	১৬। তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালকের ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।
١٧- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○	১৭। কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সত্যিকারের ঈমানদারদের লক্ষণ এই যে, তারা আন্তরিকতার সাথে কান লাগিয়ে আমার কথা শ্রবণ করে থাকে। আর ঐ অনুযায়ী তারা আমল করে। মুখে তারা এগুলো স্বীকার করে ও সত্য বলে মেনে নেয়। আর অন্তরেও তারা এগুলোকে সত্য বলেই জানে। তারা সিজদায় পড়ে তাদের প্রতিপালকের তসবীহ্ পাঠ করে ও প্রশংসা কীর্তন করে। সত্যের অনুসরণে তারা মোটেই পিছ পা হয় না। তারা হঠকারিতা করে না। এ বিদআতগুলো কাফিররা করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ـ

অর্থাৎ "যারা আমার উপাসনায় অহংকার করে, সত্বরই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (৪০ ঃ ৬০)

এই খাঁটি ঈমানদারদের একটি লক্ষণ এটাও যে, রাত্রে তারা বিছানা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে থাকে। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী নামাযকে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এশার নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। আবার কারো কারো মত এই যে, এর দ্বারা এশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে। এই মুমিনরা আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়া ও তাঁর

নিয়ামত লাভ করার জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে থাকে। সাথে সাথে তারা দান খায়রাতও করে থাকে। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। তারা এমন পুণ্যের কাজও করে যার সম্পর্ক তাদের নিজেদের সাথে। আবার এমন পুণ্যের কাজগুলোও করে যেগুলোর সম্পর্ক থাকে অন্যদের সাথে। এসব পুণ্যের কাজে তিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী, যাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ আদম-সন্তানদের নেতা ও দোজাহানের গৌরব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাঁর নিম্নের কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

وَفِينَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَـابَهٗ * اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِّنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ

اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى قُلُوْبُنَا * بِـهٖ مُـوْقِنَـاتٌ اَنَّ مَـاقَـالَ وَاقِـعُ

يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهٗ عَنْ فِرَاشِهٖ * اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

অর্থাৎ "আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) রয়েছেন যিনি সকাল হওয়া মাত্রই আল্লাহর পবিত্র কিতাব পাঠ করে থাকেন। তিনি আমাদেরকে অন্ধত্বের পর পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাদের অন্তর এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তিনি যা বলেছেন তা সংঘটিত হবেই। রাত্রে যখন মুশরিকরা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে তখন তাঁর পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক হয়ে যায় (অর্থাৎ তিনি শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন)।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির উপর খুবই খুশী হন। এক হলো ঐ ব্যক্তি যে শান্তি ও আরামের নিদ্রায় বিভোর থাকে, কিন্তু হঠাৎ তার আল্লাহর নিয়ামত ও শাস্তির কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং তখনই সে বিছানা ত্যাগ করে উঠে পড়ে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে দেয়। দ্বিতীয় হলো ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে লিপ্ত রয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে অনুভব করে যে, মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তখন সে এ চিন্তা করে যে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন এবং সামনে অগ্রসর হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং সে সম্মুখে অগ্রস হওয়াই পছন্দ করলো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তই থাকলো। শেষ পর্যন্ত সে স্বীয় গর্দান আল্লাহর পথে লুটিয়ে দিলো। আল্লাহ তা'আলা গর্বভরে ফেরেশতাদেরকে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বলেন এবং তার প্রশংসা করেন।"[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। সকালের দিকে আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে চলছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি খুব বড় প্রশ্ন করেছো। তবে আল্লাহ যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার জন্যে তা সহজ হয়ে যায়। তাহলে শুনো, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে ও বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে।" তারপর তিনি বলেনঃ "আমি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহের কথা কি বলে দিবো না? তাহলোঃ রোযা ঢাল স্বরূপ, দান-খায়রাত পাপ ও অপরাধ মুছে ফেলে এবং মধ্য রাত্রে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছে যান। এরপর তিনি বলেনঃ "আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (আমরে দ্বীনের) মাথা, স্তম্ভ এবং চূড়া ও উচ্চতার কথা বলবো না? জেনে রেখো যে, এই আমরের (দ্বীনের) মাথা ইসলাম, এর স্তম্ভ নামায এবং এর চূড়া ও উচ্চতা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।" তারপর তিনি বলেনঃ "আমি কি তোমাকে এসব কাজের নেতার খবর দিবো না?" অতঃপর তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেনঃ "এটাকে সংযত রাখবে।" আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা যে কথা বলছি একারণেও কি আমাদেরকে পাকাড়ও করা হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ "ওরে নির্বোধ মুআ'য (রাঃ)! তোমার কি এটুকুও জানা নেই যে, মানুষকে মুখের ভরে (অথবা নাকের ভরে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে শুধু তার জিহ্বার ধারের কারণে।"[১]

এ হাদীসই কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। একটি সনদে এও আছে যে, تَتَجَافٰى الخ -এ আয়াতটি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার রাত্রের নামায পড়া।" অন্য রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, মানুষের অর্ধরাত্রে নামাযে দাঁড়ানোকে বুঝানো হয়েছে। তারপর তাঁর উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করাও বর্ণিত আছে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম ও শেষের সমস্ত

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

লোককে একত্রিত করবেন। তখন একজন ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবেন যাঁর ঘোষণা সমস্ত সৃষ্টজীব শুনতে পাবে। তিনি ঘোষণা করবেনঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত কে তা আজ সবাই জানতে পারবে।" আবার তিনি ঘোষণা করবেনঃ "যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক থাকতো (অর্থাৎ যারা তাহাজ্জুদ পড়তো) তারা যেন দাঁড়িয়ে যায়।" তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে খুবই কম।"[১]

হযরত আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত বিলাল (রাঃ) বলেনঃ "যখন تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ الخ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আমরা মজলিসে বসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) কেউ কেউ মাগরেবের পর এশা পর্যন্ত নামাযের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।"[২]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। যেহেতু তারা গোপনে ইবাদত করতো সেহেতু আমিও গোপনে তাদের জন্যে তাদের নয়নপ্রীতিকর নিয়ামতরাজি মওজুদ করে রেখেছি যা কেউ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, না কল্পনা করেছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্যে এমন রহমত ও নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছি যা কেউ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।"[৩] এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ "কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।"

এই রিওয়াইয়াতে قُرَّةِ -এর স্থলে قُرَّاتِ পড়াও বর্ণিত আছে।

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নিয়ামত দেয়া হবে তা কখনো শেষ হবে না।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের এই একটি মাত্র সনদ।
৩. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তার কাপড় পুরাতন হবে না, তার যৌবনে ভাটা পড়বে না। তার জন্যে জান্নাতে এমন নিয়ামত রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি।"[১]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস সাই'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, তিনি জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করেন। হাদীসের শেষ ভাগে তিনি বলেনঃ "তাতে এমন নিয়ামত রয়েছে যা চক্ষু দেখেনি, কর্ণ শুনেনি এবং মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি।" অতঃপর তিনি تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হতে يَعْمَلُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।"[২]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্যে এমন নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং মানুষের অন্তর কল্পনাও করতে পারেনি।"[৩]

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মহিমান্বিত প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতীদের মর্যাদা কি?" উত্তরে মহান আল্লাহ বলেনঃ "সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী হলো ঐ ব্যক্তি যে সমস্ত জান্নাতীর জান্নাতে চলে যাওয়ার পরে আসবে। তাকে বলা হবেঃ "জান্নাতে প্রবেশ কর।" সে বলবেঃ "হে আল্লাহ! কোথায় যাবো? সবাই তো নিজ নিজ স্থান দখল করে নিয়েছে এবং নিজ নিজ জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে?" তাকে বলা হবেঃ "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমাকে এতোটা দেয়া হবে যতোটা দুনিয়ার কোন বাদশাহর ছিল?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, আমি এতেই সন্তুষ্ট হবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "যাও, তোমাকে ততটাই দেয়া হলো এবং আরো ততোটা, আরো ততোটা, আরো ততোটা ও আরো ততোটা।" সে তখন বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! যথেষ্ট হয়েছে। আমি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।" আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "যাও, আমি তোমাকে এগুলো সবই দিলাম এবং আরো দশগুণ দিলাম। তোমার জন্যে আরো রয়েছে যা তোমার মন চাইবে

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এবং তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।” সে বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমার তো আশা পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমি খুশী হয়েছি।” হযরত মূসা (আঃ) তখন বললেনঃ “হে আল্লাহ! তাহলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জান্নাতীদের অবস্থা কি?” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “এরা ঐ সব লোক যাদের কারামত আমি স্বহস্তে বপন করেছি এবং ওর উপর আমার মোহর লাগিয়েছি। সুতরাং তা কেউ না দেখতে পেয়েছে, না শুনতে পেয়েছে, না কেউ অন্তরে ধারণা করতে পেরেছে। এর স্বরূপ মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবের فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ -এ আয়াতটি।”[১]

হযরত আমির ইবনে আবদিল ওয়াহেদ (রঃ) বলেন যে, তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছেঃ একজন জান্নাতী স্বীয় হূরের ভালবাসা ও প্রেমালাপে সত্তর বছর পর্যন্ত মশগুল থাকবে। অন্য কোন দিকে সে লক্ষ্যই করবে না। তারপর যখন সে অন্য দিকে লক্ষ্য করবে তখন দেখবে যে, প্রথমটির চেয়ে অধিকতর সুন্দরী ও নূরানী চেহারার হূর পাশেই বসে আছে। এ হূরটি তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে বলবেঃ “এবার আমার বাসনাও পূর্ণ হবে।” লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ “তুমি কে?” সে উত্তরে বলবেঃ “আমি অতিরিক্তদের মধ্যে একজন।” তখন সে সম্পূর্ণরূপে তারই প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পুনরায় তার সাথে সত্তর বছরকাল প্রেমালাপে ও আমোদ আহ্লাদে সে কাটিয়ে দেবে। এরপর অন্য দিকে যখন তার দৃষ্টি ফিরবে তখন দেখবে যে, এর চেয়েও বেশী সুন্দরী হূর পাশেই অবস্থান করছে। এ হূরটি বলবেঃ “এখন তো সময় হয়েছে, এবার তো আমার পালা।” জান্নাতী লোকটি তাকে প্রশ্ন করবেঃ “তুমি কে?” হূরটি উত্তর দেবেঃ “আমি তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ'।[২]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতারা দুনিয়ার দিনের পরিমাপে প্রতিদিন তিনবার করে জান্নাতীদের কাছে আসবেন জান্নাতে আদন হতে আল্লাহ প্রদত্ত উপঢৌকন নিয়ে যা তাদের জান্নাতে থাকবে না। এ আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐ ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেনঃ “আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।”

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবুল ইয়ামানী আল হাওযানী হতে অথবা অন্য কেউ হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের একশ'টি শ্রেণী বা স্তর রয়েছে। প্রথমটি চাঁদির তৈরী। ওর যমীনও চাঁদির এবং বাসভবনগুলোও চাঁদির। ওর মাটি হলো মৃগনাভি। দ্বিতীয়টি সোনার তৈরী, যমীনও সোনার, ঘরবাড়ীও সোনার, পানপাত্রও সোনার এবং মাটি হলো মৃগনাভি। তৃতীয়টি মণি-মুক্তার তৈরী, যমীনও মণি-মুক্তার, বাড়ী-ঘরও মণি-মুক্তার, পানপাত্রগুলোও মণি-মুক্তার এবং মাটি হলো মৃগনাভি। বাকী সাতানব্বইটি তো হলো এমনই যেগুলো না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে এবং না কোন অন্তরে কল্পনা জেগেছে। অতঃপর তিনি فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِیَ لَهُمْ الخ -এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) হযরত রূহুল আমীন (হযরত জিবরাঈল আঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ "মানুষের পাপ ও পুণ্য আনয়ন করা হবে। একটি অপরটি হতে কম করা হবে। অতঃপর যদি একটি পুণ্যও বেঁচে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং জান্নাতের প্রশস্ততা দান করবেন।" বর্ণনাকারী ইয়াযদারদকে জিজ্ঞেস করেনঃ "পুণ্য কোথায় গেল?" উত্তরে তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّاٰتِهِمْ

অর্থাৎ "এরা ওরাই যাদের ভাল কাজগুলো আমি কবূল করে নিয়েছি এবং পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (৪৬ ঃ ১৬) বর্ণনাকারী বলেনঃ "তাহলে فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ... الخ -এ আয়াতের অর্থ কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "বান্দা যখন পুণ্যের কাজ গোপনে করে তখন আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার শান্তির জন্যে নয়নপ্রীতিকর যা গোপন করে রেখেছিলেন তা তাকে প্রদান করবেন।"[২]

১৮। তবে কি যে ব্যক্তি মুমিন হয়েছে, সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।

১৮- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوٗنَ ○

১৯। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের

১৯- اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটাও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্যে জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।

٢٠- وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

২০। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ যে অগ্নির শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

٢١- وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

২১। বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে।

٢٢- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ○ ع

২২। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

আল্লাহ তা'আলার আদল, ইনসাফ ও করুণার কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি সৎকর্মশীল ও পাপাচারীকে সমান চোখে দেখেন না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থাৎ “যারা মন্দ কাজে লিপ্ত আছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের মত করবো? তাদের জীবন ও মরণ সমান। তাদের অভিসন্ধি কতই জঘন্য!” (৪৫ ঃ ২১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ-

অর্থাৎ “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে কি আমি ঐ লোকদের মত করবো যারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে? অথবা আমি কি আল্লাহ-ভীরুদেরকে পাপাচারীদের মত করবো?” (৩৮ঃ ২৮) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ ‘জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়।’ (৫৯ঃ ২০)

এখানেও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মুমিন ও কাফির এক মর্যাদার লোক হবে না। বলা হয়েছে যে, এ আয়াত হযরত আলী (রাঃ) এবং উকবাহ ইবনে আবি মুঈতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই দুই প্রকারের লোকের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কালামের সত্যতা স্বীকার করে ও ওটা অনুযায়ী আমল করে তাকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যেখানে বাড়ী ঘর রয়েছে, অট্টালিকা রয়েছে, উঁচু উঁচু প্রাসাদ রয়েছে এবং শান্তিতে বসবাসের উপযোগী সমস্ত উপকরণ রয়েছে। এটা হবে তার ভাল কাজের বিনিময়ে আপ্যায়ন। পক্ষান্তরে যারা আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, যেখান হতে তারা বের হতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

অর্থাৎ “যখনই তারা তথাকার (জাহান্নামের) দুঃখ-কষ্ট হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।” (২২ ঃ ২২)

হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! তাদের হাত-পা বাঁধা থাকবে। অগ্নিশিখা তাদেরকে নিয়ে উপরে-নীচে যাওয়া-আসা করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে শাস্তি দিতে থাকবেন।”

তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবেঃ যে অগ্নির শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। عَذَابِ اَدْنٰى বা লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো এ জন্যেই দেয়া হয় যে, যেন মানুষ সতর্ক হয়ে যায় ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। একটি উক্তি এও আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাপসমূহের ঐ নির্ধারিত শাস্তি যা দুনিয়ায় দেয়া হয়ে থাকে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় হুদূদ বলা হয়। এও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা কবরের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। সুনানে নাসাঈতে রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুর্ভিক্ষ। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, ধূম্র বহির্গত হওয়া, ধর-পাকড় হওয়া, ধ্বংসাত্মক শাস্তি হওয়া, বদরের যুদ্ধে কাফিরদের বন্দী ও নিহত হওয়া। কেননা, বদর-যুদ্ধের এ পরাজয়ের কারণে মক্কার ঘরে ঘরে শোক ও বিলাপের ছায়া পড়ে গিয়েছিল। এই আয়াতে এই আযাবের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে?

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর যিকর হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। যারা এরূপ করে তারা মর্যাদাহীন, নীতি বিহীন ও বড় পাপী।

এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকি।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তিনটি কাজ যে করে সে পাপী হয়ে যায়। যে অন্যায়ভাবে পতাকা বাঁধে অথবা পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করে কিংবা যালিমের সাহায্যার্থে তার সাথে গমন করে, সে পাপী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অবশ্যই আমি অপরাধী ও পাপীদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি হাতিমও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল হাদীস।

২৩। আমি তো মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্যে পথ-নির্দেশক করেছিলাম।

٢٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

২৪। আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। যখন তারা ধৈর্যধারণ করতো তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

٢٤- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

২৫। তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন ওর ফায়সালা করে দিবেন।

٢٥- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর কিতাব তাওরাত দান করেন। সুতরাং নবী (সঃ) যেন তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করেন। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মি'রাজের রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে মি'রাজের রাত্রে হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-কে দেখানো হয়েছে। তিনি গোধুম বর্ণের দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি দেখতে শিনওয়াহ গোত্রের লোকের মত ছিলেন। ঐ রাত্রে আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দেখেছি। তিনি মধ্যম দেহ বিশিষ্ট সাদা ও লাল মিশ্রিত রং-এর ছিলেন। তাঁর চুলগুলো ছিল সোজা ও লম্বা। ঐ রাত্রেই আমি হযরত মালেক (আঃ)-কেও দেখেছি যিনি ছিলেন জাহান্নামের দারোগা। আর আমি

দাজ্জালকে দেখেছি।” এগুলো হলো ঐসব নিদর্শন যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'সুতরাং তুমি তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করো না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবশ্যই হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এটা মি'রাজের রাত্রের ঘটনা।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি মূসা (আঃ)-কে বানী ইসরাঈলের জন্যে পথ-নির্দেশক করেছিলাম। আবার এ অর্থও হতে পারে– আমি মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত কিতাবকে পথ-নির্দেশক বানিয়েছিলাম। যেমন সূরায়ে বানী ইসরাঈলে রয়েছেঃ

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا -

অর্থাৎ “আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম এবং ওকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্যে পথ-নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলামঃ তোমরা আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করো না।” (১৭ ঃ ২)

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের মধ্যে যারা আমার হুকুম পালন করেছিল, আমার নিষেধকৃত কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, আমার রাসূলদের অনুসরণে ধৈর্য সহকারে দৃঢ় থেকেছিল, তাদেরকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম। তারা আমার আহকাম জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দিতো এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করতো এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতো। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন শুরু করে দিলো তখন আমি তাদের এ পদ-মর্যাদা ছিনিয়ে নিলাম ও তাদের অন্তর শক্ত করে দিলাম। ভাল আমল ও সঠিক বিশ্বাস তাদের থেকে দূর হয়ে গেল। পূর্বে তারা দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে বেঁচে থাকতো।

সুফিয়ান (রঃ) বলেনঃ 'এ লোকগুলো এরূপই ছিল। মানুষের জন্যে এটা উচিত নয় যে, তারা এমন নেতার অনুসরণ করবে যে দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে বেঁচে থাকে না। তিনি আরো বলেনঃ 'দ্বীনের জন্যে ইলম অপরিহার্য যেমন দেহের জন্যে খাদ্য অপরিহার্য।'

হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছেঃ “ঈমানের মধ্যে সবর বা ধৈর্যের স্থান এমন যেমন দেহের মধ্যে মাথার স্থান। তুমি কি আল্লাহ পাকের এ উক্তি শুননি? তিনি বলেন– আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শন করতো, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল তখন তারা

ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।" হযরত সুফিয়ান (রঃ)-কে হযরত আলী (রাঃ)-এর উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "এর ভাবার্থ হচ্ছে– যেহেতু তারা সমস্ত কাজের মূলকে গ্রহণ করেছে সেহেতু আল্লাহ তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিয়েছেন।" কোন কোন আলেম বলেছেন যে, ধৈর্য ও বিশ্বাস দ্বারা দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করা যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ "অবশ্যই আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছি এবং তাদেরকে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র খাবার খেতে দিয়েছি, আর তাদেরকে সারা দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।" (৪৫ ঃ ১৬) যেমন তিনি এখানে বলেনঃ তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে (অর্থাৎ বিশ্বাস ও আমলের বিষয়ে) মতবিরোধ করছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন ওর ফায়সালা করে দিবেন।

٢٦- اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

২৬। এটাও কি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করলো না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবে না?

٢٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۗءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

২৭। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও? তারা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?

আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ এসব দেখার পরেও কি এই অবিশ্বাসকারীরা সত্য পথের অনুসারী হবে না? তাদের পূর্ববর্তী কত পথভ্রষ্টদেরকে তো আমি ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। আজ কেউ তাদের খোঁজ-খবরও নেয় না। তারাও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আল্লাহর কথা হতে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। সবাই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ـ

অর্থাৎ "তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি?" (১৯ ঃ ৯৮) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই অবিশ্বাসকারীরা ঐ অবিশ্বাসকারীদের বাসভূমিতে চলাফেরা করে, কিন্তু তাদের কাউকেও এরা দেখতে পায় না। যারা তাদের বাসভূমিতে চলাফেরা করতো, বসবাস করতো। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এর থেকে এরা শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই কথাটিকেই কুরআন হাকীমে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছেঃ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا অর্থাৎ "ঐ তো তাদের ঘরবাড়ীগুলো তাদের যুলুমের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।" (২৭ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ-اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ .... وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ـ

অর্থাৎ "আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালিম, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং কত সুদৃঢ় প্রাসাদও! তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৫-৪৬) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি এরা শুনবে না?

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, দয়া, অনুগ্রহ, ইহ্সান ও ইনআ'মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও, তারা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?

তাফসীরকারদের এও উক্তি আছে যে, জুরূয্ হচ্ছে মিসরের যমীন। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য তা নয়। মিসরেও যদি এরূপ ভূমি থাকে তো থাক। এই আয়াতে জুরূয দ্বারা এ সমুদয় ভূমিকে বুঝানো হয়েছে যা শুষ্ক হয়ে গেছে এবং পানির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে ও শক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য মিসরের জমিও এরূপই বটে। নীল নদের পানি দ্বারা ওকে সিক্ত করা হয়। আবিসিনিয়ার বৃষ্টির পানি নিজের সাথে লাল মাটিও বয়ে নিয়ে যায়। মিসরের মাটি কিছুটা লবণাক্ত ও বালুকাময়। কিন্তু ওটা এই পানি ও মাটির সাথে মিশে চাষাবাদের যোগ্য হয়ে ওঠে। এ কারণে তারা প্রতি বছর প্রতিটি ফসল পেয়ে থাকে। এ সবকিছুই এই বিজ্ঞানময়, ক'রুণাময়, স্নেহময় এবং দয়ালু আল্লাহরই মেহেরবানী। তাঁর সত্তাই প্রশংসার যোগ্য।

বর্ণিত আছে যে, যখন মিসর বিজিত হলো তখন মিসরবাসীরা আজমের 'বাউনাহ্' মাসে হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং বললোঃ "আমাদের প্রাচীন প্রথা আছে যে, আমরা এ মাসে নীল নদে উৎসর্গ বা বলি দিয়ে থাকি। এটা না করলে নদীতে পানি থাকে না। আমাদের প্রথা এই যে, আমরা এ মাসের বারো তারিখে একটি কুমারী মেয়েকে সাথে নিই, যে মেয়েটি হবে তার পিতার একমাত্র কন্যা। তার পিতাকে টাকা পয়সা দিয়ে সম্মত করি। অতঃপর মেয়েটিকে সুন্দর পোশাক ও অলংকার পরিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি। এর পর থেকে নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। এরূপ না করলে নীল নদে পানি বাড়ে না।" ইসলামের সেনাপতি মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) তাদেরকে উত্তর দেনঃ "এটা একটি অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রথা। ইসলামে এর অনুমতি নেই। ইসলাম তো এরূপ অভ্যাস ও প্রথাকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যেই এসেছে। তোমরা আর এরূপ করতে পারবে না।" তারা তখন একাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু নীল নদের পানি বাড়লো না। পুরো মাস কেটে গেলো। কিন্তু নদী শুষ্কই রয়ে গেল। মিসরের জনগণ বিরক্ত হয়ে মিসর ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করলো। মিসর বিজয়ীর খেয়াল হলো যে, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত উমার ফারুক (রাঃ)-কে এ ঘটনা অবহিত করা হোক। তিনি তাই করলেন। ঘটনা অবহিত হওয়া মাত্রই হযরত উমার (রাঃ) আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে লিখা ছিল ঃ "আপনি যা করেছেন ভালই করেছেন। এখন আমি একটি পত্র নীল নদের নামে পাঠাচ্ছি। আপনি ওটাকে নীল নদে নিক্ষেপ করবেন।" হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) পত্রটি বের করে পাঠ করলেন।

তাতে লিখিত ছিলঃ "এ পত্রটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমার (রাঃ)-এর পক্ষ হতে মিসরবাসীর নীল নদের নিকট। হামদ ও দরূদের পর কথা এই যে, তুমি যদি নিজের পক্ষ হতে নিজের ইচ্ছামত চলে থাকো তবে বেশ, তুমি চলো না। আর যদি এক মহা-প্রতাপশালী আল্লাহ তোমাকে জারী রেখে থাকেন তবে আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।" পত্রটি নিয়ে গিয়ে সেনাপতি ওটা নীল নদে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর একটি রাত্রি অতিবাহিত না হতেই নীল নদে ষোল হাত গভীর হয়ে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করলো এবং ক্ষণেকের মধ্যেই মিসরের শুষ্কতা আর্দ্রতায় পরিবর্তিত হলো। বাজারের চড়া দর নিম্নমুখী হলো। পত্রের সাথে সাথেই সমগ্র মিসরভূমি উর্বরতা লাভ করলো এবং চারদিক সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠলো। নীল নদ পূর্ণ গতিতে চলতে লাগলো। ইতিপূর্বে প্রতি বছর নীল নদে যে একটি করে জীবন বলি দেয়া হতো তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।[১]

এই আয়াতের বিষয়ের অনুরূপ নিম্নের আয়াতটিওঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا -

অর্থাৎ "মানুষের তার খাদ্যের দিকে তাকানো উচিত যে, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও মাটি ফেরে শস্য ও ফল উৎপাদন করি।"(৮০ ঃ ২৪-২৫) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন যে, এর পরও কি তারা লক্ষ্য করবে না?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জুরুয হলো ঐ ধরনের জমি যা বৃষ্টির পানিতে সম্পূর্ণ সিক্ত হয় না। পরে নদী-নালার পানি দ্বারা জলপূর্ণ হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ইয়ামনে এই ধরনের জমি রয়েছে। হাসান (রঃ) বলেন যে, এ ধরনের জমি ইয়ামন ও সিরিয়ায় আছে। ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এগুলো ঐ প্রকারের জমি যাতে ফসল উৎপাদিত হয় না এবং ধূলি-ধূসরিত হয়ে থাকে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত–

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا -

অর্থাৎ 'তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি।' (৬৩ ঃ ৩৩)

১. এটা হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ী তাবারী (রঃ) তাঁর 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২৮। তারা জিজ্ঞেস করেঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন হবে এই ফায়সালা?

٢٨- وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৯। বল, ফায়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

٢٩- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৩০। অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে।

٣٠- فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের তাড়াহুড়ার খবর দিচ্ছেন যে, তারা তাচ্ছিল্যের সাথে বলতোঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি যে বলে থাকো এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকো যে, তুমি আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সে সময় কখন আসবে? আমরা তো তোমাকে বহুদিন থেকেই পরাজিত, অধীনস্থ ও দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। এখন তুমি আমাদেরকে আমাদের উপর তোমার বিজয় লাভের সময়টা বলে দাও।" তাদের একথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর আযাব যখন এসে যাবে এবং যখন তাঁর গযব ও ক্রোধ পতিত হবে, তা দুনিয়াতেই হোক বা আখিরাতেই হোক, তখন না ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে, না তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ -

অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ দলীল-প্রমাণসহ আসলো তখন তাদের কাছে যে জ্ঞান আছে তা নিয়ে তারা খুশী হয়ে গেল (দু'টি আয়াত পর্যন্ত)।"(৪০ ঃ ৮৩)

এর দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মক্কা বিজয়ের দিন তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করে নিয়েছিলেন এবং প্রায় দু'হাজার লোক ইসলাম কবূল করেছিল। যদি এই বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হতো তবে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ইসলাম গ্রহণ কবূল করতেন না। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে, সেই দিন কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না। এখানে فَتْحٌ -এর অর্থ হচ্ছে ফায়সালা। যেমন কুরআন কারীমের এক জায়গায় আছেঃ

فَافْتَحْ بَيْنِى وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا

অর্থাৎ "তুমি আমার ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।"(২৬ ঃ ১১৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ "তুমি বল– আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে তিনি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন।"(৩৪ ঃ ২৬) আর একটি আয়াতে আছেঃ

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

অর্থাৎ "তারা ফায়সালা প্রার্থনা করছে এবং যারা উদ্ধত ও হঠকারী তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।"(১৪ ঃ ১৫) আরো এক জায়গায় আছেঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ "এর পূর্বে তারা কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো।"(২ ঃ ৮৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاۤءَكُمُ الْفَتْحُ

অর্থাৎ "যদি তোমরা ফায়সালা কামনা কর তবে ফায়সালা তো তোমাদের কাছে এসেই গেছে।" (৮ ঃ ১৯)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে।" অর্থাৎ তুমি এই মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর এবং তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে থাকো। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেনঃ

اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

অর্থাৎ "তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অহী করা হয়েছে তার তুমি অনুসরণ কর, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"(৬ ঃ ১০৭)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের ওয়াদাকে সত্য বলে মেনে নাও। তাঁর কথা অপরিবর্তনীয়, তাঁর কথা সত্য। সত্বরই তিনি তোমাকে তোমার বিরুদ্ধাচারীদের উপর বিজয় দান করবেন। তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তারাও অপেক্ষমান রয়েছে। তারা চায় যে, তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হোক। কিন্তু তাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে ভুলেন না। তাদেরকে তিনি পরিত্যাগও করেন না। যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর ফরমান অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় তারা আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে পারে না। কাফির ও মুশরিকরা মুমিনদের উপর যে বিপদ-আপদ দেখতে চায় তাই তিনি তাদের উপরই নাযিল করে থাকেন। তারা আল্লাহর আযাবের শিকার হবেই। আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

সূরা ঃ সাজদাহ এর
তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ আহযাব, মাদানী
سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৭৩, রুকূ' ঃ ৯)

(اٰيَاتُهَا : ٧٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত যির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "সূরায়ে আহযাবের কতটি আয়াত গণনা করা হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ " তেহাত্তরটি।" তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "না, না। আমি তো দেখেছি যে, এ সূরাটি প্রায় সূরায়ে বাকারার সমান ছিল। এই সূরার মধ্যেই নিম্নের আয়াতটিও আমরা পাঠ করতামঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "বুড়ো ও বুড়ী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলো, এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" এর দ্বারা জানা যায় যে, এই সূরার কতকগুলো আয়াত আল্লাহর নির্দেশক্রমে রহিত হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

١- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১। হে নবী (সঃ)! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

২। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী হয় তার অনুসরণ কর; তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৩। আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর, এবং কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সতর্ক করার সুন্দর পন্থা এই যে, বড়দেরকে বলতে হবে যাতে ছোটরা তা শুনে সাবধান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে যখন কোন কথা গুরুত্বের সাথে বলেন তখন বুঝে নিতে হবে যে, অন্যের জন্যে এর গুরুত্ব আরো বেশী। আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী পুণ্য লাভ করার নিয়তে তাঁর ফরমানের আনুগত্য করা এবং তাঁর ফরমান অনুযায়ী তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করার নাম হলো তাকওয়া। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা না মানা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা এবং স্বীকার করে নেয়ার নিয়তে তাদের কথা না শোনার নামও তাকওয়া। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের ফল বা পরিণাম সম্যক অবগত। তাঁর সীমাহীন হিকমতের কারণে তাঁর কোন কাজ, কোন কথা বিবেচনা ও নীতি বহির্ভূত হয় না। তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ অতএব তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তারই অনুসরণ কর, যাতে তুমি খারাপ পরিণতি ও বিভ্রান্তি হতে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা'আলার কাছে কারো ক্রিয়াকলাপ গোপন নেই। নিজের সমস্ত কাজকর্মে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর। তাঁর উপর যে ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ শক্তিশালী। তাঁর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় বা তাঁর দিকে যে ঝুঁকে পড়ে সে সফলকামই হয়ে থাকে।

٤- مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ۝

৪। আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাকো, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্র, যাদেরকে তোমরা পুত্র বলে থাকো, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি, এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

৫- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫। তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সঙ্গত যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পূর্বে ভূমিকা ও প্রমাণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটি ঐ কথা বলেছেন যা সবাই অনুভব করে থাকে। অতঃপর সেদিক থেকে চিন্তা ও খেয়াল ফিরিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেনঃ কোন মানুষের হৃদয় বা অন্তর দু'টি হয় না। এভাবেই তুমি বুঝে নাও যে, তুমি যদি তোমার কোন স্ত্রীকে মা বলে দাও তবে সে সত্যিই তোমার মা হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে অপরের পুত্রকে তুমি পুত্র বানিয়ে নিলে সে সত্যিকারের পুত্র হবে না। কেউ যদি ক্রোধের সময় তার স্ত্রীকে বলে ফেলেঃ তুমি আমার কাছে এমনই যেমন আমার মায়ের পিঠ। এরূপ বললে সে সত্যি সত্যিই মা হয়ে যাবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ

অর্থাৎ "তারা তাদের মা নয়, তাদের মা তো তারাই যাদেরকে তারা জন্ম দিয়েছে বা প্রসব করেছে।" (৫৮ ঃ ২) এ দু'টি কথা বর্ণনা করার পর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মানুষের পালক পুত্র তার প্রকৃত পুত্র হতে পারে না। এ আয়াতটি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে পোষ্যপুত্র করে রেখেছিলেন। তাঁকে যায়েদ (রাঃ) ইবনে মুহাম্মাদ (সঃ) বলা হতো। এ আয়াত দ্বারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উদ্দেশ্য। যেমন এই সূরারই মধ্যে রয়েছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

অর্থাৎ "মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, রবং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (৩৩ ঃ ৪০)

এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। তোমরা কারো ছেলেকে অন্য কারো ছেলে বলবে এবং এভাবেই বাস্তব পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তার পিতা সেই যার পিঠ হতে সে বের হয়েছে। একটি ছেলের দু'টি পিতা হওয়া অসম্ভব, যেমন একটি বক্ষে দু'টি অন্তর হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলে থাকেন ও সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

এ আয়াতটি একটি কুরায়েশীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যে প্রচার করে রেখেছিল যে, তার দু'টি অন্তর আছে এবং দুটোই জ্ঞান ও বোধশক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার একথাকে খণ্ডন করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি আতংকগ্রস্ত হলেন। তখন যেসব মুনাফিক তাঁর সাথে নামায পড়ছিল তারা পরস্পর বলাবলি করলোঃ "দেখো, তাঁর দু'টি অন্তর রয়েছে, একটি তোমাদের সাথে এবং অপরটি তাদের সাথে।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

যুহরী (রঃ) বলেন যে, এটা শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কোন লোকের দু'টি অন্তর হয় না, তেমনই কোন ছেলের দু'টি পিতা হয় না। এ মুতাবেকই আমরাও এ আয়াতের তাফসীর করেছি। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বে তো এর অবকাশ ছিল যে, পালক পুত্রকে পালনকারীর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তার পুত্র বলে ডাকা যাবে। কিন্তু এখন ইসলাম এটাকে রহিত করে দিয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাকে তার প্রকৃত পিতার দিকে সম্পর্ক লাগিয়ে ডাকতে হবে। ন্যায়, হক ও সত্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে যায়েদ (রাঃ) ইবনে মুহাম্মাদ (সঃ)

বলতাম। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এটা বলা পরিত্যাগ করি। পূর্বে তো পালক পুত্রের ঐ সমুদয় হক থাকতো যা ঔরষজাত ছেলের থাকে।”

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সালেহ বিনতে সুহায়েল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সালিম (রাঃ)-কে মৌখিক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন কুরআন তার ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত তার থেকে পর্দা করিনি। সে আসে এবং যায়। আমার স্বামী হযরত হুযাইফা (রাঃ) তার এভাবে যাতায়াতে কিছুটা অসন্তুষ্ট রয়েছেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “তাহলে যাও, সালিম (রাঃ)-কে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। এতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।”

মোটকথা পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যায়। এখন স্পষ্ট ভাষায় এরূপ পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণকারীদের জন্যে বৈধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তারা তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করে নিতে পারে। হযরত যায়েদ (রাঃ) যখন তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রাঃ)-কে তালাক দেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বিয়ে করে নেন এবং এভাবে মুসলমানরা একটি কঠিন সমস্যা হতে রক্ষা পেয়ে গেলেন। এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَحَلَائِلُ اَبْنَاۤئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

অর্থাৎ “এবং তোমাদের জন্যে অবৈধ বা নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রীরা।” (৪ ঃ ২৩) তবে এখানে দুগ্ধ সম্পর্কীয় ছেলেরাও ঔরষজাত ছেলেদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীস রয়েছে যে, দুধপানের কারণে ঐ সব আত্মীয় হারাম যা বংশের কারণে হারাম হয়ে থাকে। তবে কেউ যদি স্নেহ বশতঃ কাউকেও পুত্র বলে ডাকে তাহলে সেটা অন্য কথা, এতে কোন দোষ নেই।

মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ন্যায় আবদুল মুত্তালিব বংশের ছোট বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালাফাহ হতে রাত্রেই জামরাতের দিকে বিদায় করে দেন এবং আমাদের উরুতে হাত বুলিয়ে বলেনঃ “হে আমার ছেলেরা!

সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাতের উপর কংকর মারবে না।" এটা দশম হিজরীর যিলহজ্ব মাসের ঘটনা। এটা প্রমাণ করছে যে, স্নেহের বাক্য ধর্তব্য নয়।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যাঁর ব্যাপারে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে 'হে আমার প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধু।

উমরাতুল কাযার বছরে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হযরত হামযা (রাঃ)-এর কন্যা তাঁকে চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়তে শুরু করে। হযরত আলী (রাঃ) তখন তাকে ধরে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "এটা তোমার চাচাতো বোন, একে ভালভাবে রাখো।" তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "এই শিশু কন্যার হকদার আমরাই। আমরাই একে লালন-পালন করবো।" হযরত আলী (রাঃ) প্রমাণ পেশ করলেন যে, সে তার চাচার মেয়ে। আর হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন যে, সে তাঁর ভাই-এর কন্যা। হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বললেন ঃ "এটা আমার চাচার মেয়ে এবং তার চাচী আমার বাড়ীতেই আছে অর্থাৎ হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ)।" অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ফায়সালা করলেন যে, এ কন্যা তার খালার কাছেই থাকবে, যেহেতু খালা মায়ের স্থলাভিষিক্তা। হযরত আলী (রাঃ)-কে তিনি বললেনঃ "তুমি আমার ও আমি তোমার।" হযরত জাফর (রাঃ)-কে বললেনঃ "তোমার আকৃতি ও চরিত্র তো আমার সাথেই সাদৃশ্যযুক্ত।" হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে তিনি বললেনঃ "তুমি আমার ভাই ও আমার আযাদকৃত দাস।" এ হাদীসে বহু কিছু হুকুম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ন্যায়ের হুকুম শুনিয়ে দিলেন, অথচ দাবীদারদেরকেও তিনি অসন্তুষ্ট করলেন না, বরং নম্র ভাষার মাধ্যমে তাঁদের অন্তর জয় করলেন। তিনি এ আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি আমার ভাই ও বন্ধু।"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "এ আয়াত অনুযায়ী আমি তোমাদের দ্বীনী ভাই।" হযরত উবাই (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! যদি জানা যেতো যে, তার পিতা ছিল গাদা তবে অবশ্যই তার দিকে সে সম্পর্কিত হতো।"

হাদীসে এসেছে যে, যদি কোন লোক তার সম্পর্ক জেনে শুনে তার পিতা ছাড়া অন্যের দিকে জুড়ে দেয় তবে সে কুফরী করলো। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নিজেকে নিজের সঠিক ও প্রকৃত বংশ হতে সরিয়ে অন্য বংশের সাথে সম্পর্কিত করা খুব বড় পাপ।

এরপর বলা হচ্ছেঃ তোমরা যদি তোমাদের সাধ্যমত তাহকীক ও যাচাই করার পর কাউকেও কারো দিকে সম্পর্কিত কর এবং সেটা ভুল হয়ে যায় তবে এতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন বলিঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে অপরাধী করবেন না।" (২ ঃ ২৮৬) সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা এ প্রার্থনা করে তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাই করলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রার্থনা কবূল করে নিলাম।"

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি বিচারক (বিচারের ব্যাপারে) ইজতেহাদ (সঠিকতায় পৌঁছার জন্যে চেষ্টা-তদবীর ও চিন্তা-ভাবনা) করে এবং এতে সে সঠিকতায় পৌঁছে যায় তবে তার জন্যে দ্বিগুণ পুণ্য রয়েছে। আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায় তবে তার জন্যে রয়েছে একটি পুণ্য।[১]

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল-চুক এবং যে কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।" এখানেও মহান আল্লাহ একথা বলার পর বলেনঃ কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে।

কসম সম্পর্কেও ঐ একই কথা। উপরে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নসব বা বংশ পরিবর্তনকারী কাফিরের পর্যায়ভুক্ত, সেখানেও বলা হয়েছে যে, এরূপ অপরাধ হবে জেনে শুনে করলে।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন কারীমের আয়াত, যার তিলাওয়াত বা পঠন এখন মানসূখ বা রহিত, তাতে রয়েছেঃ

فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ إِنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَاءِكُمْ

অর্থাৎ "তোমাদের নিজেদের পিতাদের দিক হতে সম্পর্ক সরিয়ে নেয়া কুফরী।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজমের আয়াত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে রজম করেছেন অর্থাৎ ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "আমরা পাঠ করতাম কুরআন কারীমের وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَاءِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُورٌ إِنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَاءِكُمْ -এ আয়াতটি (যার পঠন এখন রহিত হয়ে গেছে)।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল। আমি তো আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।" একটি রিওয়াইয়াতে শুধু ইবনে মারইয়াম (আঃ) আছে। আর একটি হাদীসে আছে যে, মানুষের মধ্যে তিনটি কুফরী (স্বভাব) রয়েছে। ওগুলো হচ্ছেঃ বংশকে ভর্ৎসনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, মৃতের উপর ক্রন্দন করা এবং তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

٦- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ

৬। নবী (সঃ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীরা তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিররা অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○	**তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে তা করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ।**

আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তাঁর রাসূল (সঃ) নিজের জীবন অপেক্ষা নিজের উম্মতের উপর অধিকতর দয়ালু, এজন্যে তিনি তাঁর রাসূল (সঃ)-কে তাদের উপর তাদের জীবনের চেয়েও বেশী অধিকার দিয়েছেন। তারা নিজেদের জন্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, বরং রাসূল (সঃ)-এর প্রত্যেক হুকুমকে জান-প্রাণ দিয়ে তাদেরকে কবূল করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

অর্থাৎ "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে ওটা মেনে না নেয়।" (৪ ঃ ৬৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে প্রিয় হই তার নিজের জান, মাল, সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা।" সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু হতেই প্রিয়।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! না (এতেও তুমি মুমিন হতে পার না), বরং আমি যেন তোমার কাছে তোমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হই।" তখন তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! (এখন হতে) আপনি আমার নিকট সব কিছু হতেই প্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি আমার নিজের জীবন হতেও।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! এখন (তুমি পূর্ণ মুমিন হলে)।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নবী (সঃ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত মুমিনের সবচেয়ে বেশী হকদার আমিই, এমনকি তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও। তোমরা ইচ্ছা করলে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -এই আয়াতটি পড়ে নাও। জেনে রেখো যে, যদি কোন মুসলমান মাল-ধন রেখে মারা যায় তবে সেই মালের হকদার হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যদি কোন মুসলমান তার কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে মারা যায় অথবা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায় তবে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব ভারও আমারই উপর ন্যাস্ত।"

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্নীগণ মুমিনদের মাতাতুল্য। তাঁরা তাদের সম্মানের পাত্রী। সম্মান, বুযর্গী ইত্যাদির দিক দিয়ে তাঁরা যেন তাদের মা। হ্যাঁ, তবে মায়ের সাথে অন্যান্য আহকাম যেমন নির্জনতা ইত্যাদিতে পার্থক্য আছে। তাঁদের গর্ভজাত কন্যাদের সাথে এবং বোনদের সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। কোন কোন আলেম তাঁদের কন্যাদেরও মুসলমানদের বোন বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মুখতাসার গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা ইবারতের প্রয়োগ, হুকুম সাব্যস্ত করা নয়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) প্রমুখ কোন না কোন উম্মুল মুমিনীনের ভাই ছিলেন। তাঁকে মামা বলা যাবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, বলা যেতে পারে। বাকী রইলো এখন এই কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আবুল মুমিনীন (মুমিনদের পিতা) বলা যাবে কি-না? এটাও খেয়াল করা প্রয়োজন যে, আবুল মুমিনীন বললে স্ত্রীলোকেরাও এসে যায়। جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ-এর মধ্যে আধিক্য হিসেবে স্ত্রী লিঙ্গও রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আবুল মুমিনীন বলা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর দু'টি উক্তির মধ্যেও অধিকতর সঠিক উক্তি এটাই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে اُمَّهَاتُهُمْ -এর পরে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ (এবং তিনি তাদের পিতা) এরূপও রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মাযহাবেও একটি উক্তি এটাই এবং নিম্নের হাদীসটিও এ উক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের পিতাদের স্থলাভিষিক্ত। আমি তোমাদেরকে

শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে কিবলার দিকে যেন মুখ না করে এবং পিঠও যেন না করে, ডান হাতে যেন ঢিলা ব্যবহার না করে এবং ডান হাতে যেন ইসতিন্জাও না করে।"[১] তিনি ইসতিন্জার জন্যে তিনটি ঢিলা নিতে বলেছেন। গোবর ও হাড় দ্বারা ইসতিন্জা করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পিতা বলা যাবে না। কেননা কুরআন কারীমে রয়েছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

অর্থাৎ "মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।" (৩৩ ঃ ৪০)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর।' ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন ঐ দিক দিয়েই তাঁরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হতেন। শপথ করে যাঁরা সম্বন্ধ জুড়ে দিতেন তাঁরাও তাঁদের সম্পত্তির হকদার হয়ে যেতেন। এ আয়াত দ্বারা এগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পূর্বে কোন আনসার মারা গেলে তাঁর নিকটাত্মীয়রা ওয়ারিস হতো না, বরং মুহাজিররা ওয়ারিস হতেন, যাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত যুহায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ "এই হুকুম বিশেষভাবে আমাদের আনসার ও মুহাজিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় আগমন করি তখন আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। এখানে (মদীনায়) এসে আমরা আনসারদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। তাঁরা আমাদের উত্তম ভাই সাব্যস্ত হন। এমনকি তাঁদের মৃত্যুর পর আমরা তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতাম। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে। হযরত উমার (রাঃ)-এর হয়েছিল অমুকের সাথে। হযরত উসমান (রাঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন একজন যারকী ব্যক্তির সাথে। আর স্বয়ং আমার ভাই হয়েছিলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। ঐ সময় তাঁর ইন্তেকাল হলে আমিও তাঁর ওয়ারিস হয়ে যেতাম। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং মীরাসের সাধারণ হুকুম আমাদের জন্যেও প্রযোজ্য হয়ে গেল।

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তবে তা করতে পার। তুমি তার জন্যে অসিয়ত করে যেতে পার।

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর এই হুকুম প্রথম হতেই এই কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি। মধ্যখানে পাতানো ভাই-এর উপর যে ওয়ারিসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটা শুধু একটা বিশেষ যুক্তিসঙ্গতার ভিত্তিতে হয়েছিল একটা বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর এটা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন মূল হুকুম জারী হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

৮- لِيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ع

৭। স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের নিকট হতেও এবং নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), মারইয়াম তনয় ঈসা (আঃ)-এর নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।

৮। সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্যে। তিনি কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি এই পাঁচজন স্থিরপ্রতিজ্ঞ নবীর নিকট হতে এবং সাধারণ সমস্ত নবীর নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তাঁরা আমার দ্বীনের প্রচার করবেন ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁরা পরস্পরে একে অপরকে সাহায্য করবেন এবং একে অপরকে সমর্থন করবেন। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক কায়েম রাখবেন। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেনঃ তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ! যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বললোঃ আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" (৩ঃ ৮১) এখানে সাধারণ নবীদের বর্ণনা দেয়ার পর বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের নামও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের নাম নিম্নের আয়াতেও রয়েছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (৪২ঃ ১৩)

এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যিনি ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম নবী ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাঁরা ছিলেন মধ্যবর্তী নবী। এতে সূক্ষ্মদর্শিতা এই রয়েছে যে, প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর পরবর্তী নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। আর মধ্যবর্তী নবীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তো এই ক্রমপর্যায় রয়েছে যে, প্রথম ও শেষের নাম উল্লেখ করার পর মধ্যবর্তী নবীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে সর্বপ্রথম সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নবী। অতঃপর একের পর এক ক্রমানুযায়ী অন্যান্য নবীদের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবীর উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন! এই আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি সমস্ত নবীর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছি এবং দুনিয়ায় সর্বশেষে আগমন করেছি। তাই আমা হতেই শুরু করা হয়েছে।" এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর

একজন বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে বাশীর দুর্বল এবং সনদ হিসেবে এটা মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে। এটাই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ কেউ এটাকে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে পাঁচজন নবী আল্লাহ তা'আলার নিকট খুইব পছন্দনীয়। তাঁরা হলেনঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)। এর একজন বর্ণনাকারী হামযাহ দুর্বল। এও বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে যে অঙ্গীকারের বর্ণনা রয়েছে তা হলো ওটাই যা আল্লাহ তা'আলা রোযে আযলে হযরত আদম (আঃ)-এর পিঠ হতে সমস্ত মানুষকে বের করে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ)-কে উচ্চে তুলে ধরা হয়। তিনি তাঁর সন্তানদের দেখেন। তাদের মধ্যে তিনি ধনী, নির্ধন, সুন্দর, কুৎসিত সর্বপ্রকারের লোককেই দেখতে পান। তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! যদি আপনি এদের সবাইকে সমান করতেন তবে কতই না ভাল হতো!" মহামহিমান্বিত আল্লাহ জবাবে বলেনঃ "এটা এজন্যেই করা হয়েছে যে, যেন আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।" তাদের মধ্যে যাঁরা নবী ছিলেন তিনি তাঁদেরকেও দেখেন। তাঁরা জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশিত ছিলেন। তাঁদের উপর নূর বর্ষিত হচ্ছিল। তাঁদের নিকট হতেও নবুওয়াত ও রিসালাতের একটি বিশেষ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছে ঃ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবার জন্যে, অর্থাৎ তাদেরকে রাসূল (সঃ)-এর হাদীসগুলো পৌঁছিয়ে দিতো। আর আল্লাহ তা'আলা অমান্যকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন বেদনাদায়ক শাস্তি।

সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করছি যে, আপনার রাসূলগণ আপনার বান্দাদের কাছে আপনার বাণী কমবেশী ছাড়াই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা পূর্ণভাবে মঙ্গল কামনা করেছেন এবং সত্যকে পরিষ্কারভাবে উজ্জ্বল পন্থায় জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, যদিও হতভাগ্য ও হঠকারীরা তাঁদেরকে মানেনি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, আপনার রাসূলদের সমস্ত কথা ন্যায় ও সত্য। যারা তাঁদের পথ অনুসরণ করেনি তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তারা বাতিলের উপর রয়েছে।

৯। হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখোনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

১০। যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।

١٠- اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ○

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। যখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তিসহ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের ঘটনা এই যে, বানু নাযীরের ইয়াহুদী নেতৃবর্গ, যাদের মধ্যে সালাম ইবনে আবি হাকীক, সালাম ইবনে মুশকাম, কিনানাহ, ইবনে রাবী প্রমুখ ছিল, মক্কায় এসে পূর্ব হতেই প্রস্তুত কুরায়েশদেরকে যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করলো এবং তাদের সাথে অঙ্গীকার করলো যে, তারা তাদের অধীনস্থ লোকদেরকে সাথে নিয়ে তাদের দলে যোগদান করবে। সেখানে তাদের সাথে কথা শেষ করে তারা গাতফান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করলো এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকেও তাদের সাথে মিলিত করলো।

কুরায়েশরাও এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সারা আরবে আলোড়ন সৃষ্টি করলো এবং আরো কিছু লোক যোগাড় করে নিলো। এসবের সরদার নির্বাচিত হলেন আবূ সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব এবং গাতফান গোত্রের নেতা নির্বাচিত হলো উয়াইনা ইবনে হাসান ইবনে বদর। এভাবে চেষ্টা তদবীর চালিয়ে তারা দশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করলো এবং মদীনার দিকে ধাওয়া করলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ পেয়ে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে মদীনার পূর্ব দিকে খন্দক খনন করতে শুরু করলেন। সমস্ত মুহাজির ও আনসার এ খনন কার্যে অংশগ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও একাজে অংশ নিলেন। স্বয়ং তিনি কাদা-মাটি বহন করতে লাগলেন। মুশরিকদের সেনাবাহিনী বিনা বাধায় মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মদীনার পূর্বাংশে উহুদ পাহাড় সংলগ্ন স্থানে নিজেদের শিবির স্থাপন করলো। এটা ছিল মদীনার নিম্নাংশ। মদীনার উপরাংশে তারা এক বিরাট সৈন্য দল পাঠিয়ে দিলো যারা মদীনার উঁচু অংশে শিবির স্থাপন করলো এবং নীচে ও উপরের দিক থেকে মুলমানদেরকে অবরোধ করে ফেললো। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিল। কোন কোন রিওয়াইয়াতে শুধু সাতশ' বলা হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুকাবিলার জন্যে আসলেন। তিনি সালা পাহাড়কে পিছনের দিকে করলেন। শত্রুদের দিকে মুখ করে তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। যে খন্দক তিনি খনন করেছিলেন তাতে পানি ইত্যাদি ছিল না। তা শুধু একটি গর্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিশু ও মহিলাদেরকে মদীনার একটি মহল্লায় একত্রিত করে রেখে দেন। মদীনায় বানু কুরায়যা নামক ইয়াহূদীদের একটি গোত্র বসবাস করতো। তাদের মহল্লা ছিল মদীনার পূর্ব দিকে। নবী (সঃ)-এর সাথে তাদের দৃঢ় সন্ধিচুক্তি ছিল। তাদেরও বিরাট দল ছিল। প্রায় আটশ' জন বীর যোদ্ধা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুশরিক ও ইয়াহূদীরা তাদের কাছে হুয়াই ইবনে আখতাব নাযরীকে পাঠিয়ে দিলো। সে তাদেরকে নানা প্রকারের লোভ-লালসা দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিলো। তারাও ঠিক সময়ে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং প্রকাশ্যভাবে সন্ধি ভেঙ্গে দিলো। বাইরে দশহাজার শত্রু সৈন্য ছাউনি ফেলে বসে আছে। এদিকে ইয়াহূদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতা যেন বগলে ফোড়া বের হওয়া। বত্রিশ দাঁতের মধ্যে জিহ্বা অথবা আটার মধ্যে লবণের মত মুসলমানদের অবস্থা হয়ে গেল। এ সাতশ জন লোক কি-ই বা করতে পারে? এটা ছিল ঐ সময় যার চিত্র কুরআন কারীম অংকন করেছে যে, তখন মুমিনরা

পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। শত্রুরা একমাস ধরে অবরোধ অব্যাহত রাখলো। যদিও মুশরিকরা খন্দক অতিক্রম করতে মক্ষম হলো না। তবে তারা মাসাধিককাল ধরে মুসলমাদেরকে ঘিরে বসে থাকলো। এতে মুসলমানরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমর ইবনে আবদে অদ্দ, যে ছিল আরবের বিখ্যাত বীর পুরুষ, সেনাপতিত্ব বিষয়ে যে ছিল অদ্বিতীয়, একবার সে নিজের সাথে কয়েকজন দুঃসাহসী বীরপুরুষকে নিয়ে সাহস করে অশ্ব চালনা করলো এবং খন্দক পার হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অশ্বারোহীদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু বলা হয় যে, তাদেরকে তিনি প্রস্তুত না পেয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে তাদের মুকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন। অল্পক্ষণ ধরে উভয় পক্ষের বীরপুরুষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকলো। অবশেষে আল্লাহর সিংহ হযরত আলী (রাঃ) শত্রুদেরকে তরবারীর আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এতে মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন এবং তাঁদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে গেল। তাঁরা বুঝে নিলেন যে, তাদের জয় সুনিশ্চিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ভীষণ বেগে ঝড় তুফান ও ঘূর্ণিবার্তা প্রবাহিত হতে শুরু করলো। এর ফলে কাফিরদের সমস্ত তাঁবু মূলোৎপাটিত হলো। কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। অগ্নি জ্বালানো কঠিন হয়ে গেল। কোন আশ্রয়স্থল তাদের দৃষ্টিগোচর হলো না। পরিশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এরই বর্ণনা কুরআন কারীমে দেয়া হয়েছেঃ এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু। এ আয়াতে যে বায়ুর কথা বলা হয়েছে হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর মতে ওটা ছিল পূবালী হাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি বলেনঃ "পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং আ'দ সম্প্রদায়কে 'দাবূর' দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"

ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, দক্ষিণা হাওয়া উত্তরা হাওয়াকে আহযাবের যুদ্ধের সময় বলেঃ "চল, আমরা উভয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাহায্য করি।" তখন উত্তরা হাওয়া জবাবে বলেঃ "রাত্রে গরম বা প্রখরতা চলে না।" অতঃপর পূবালী হাওয়া প্রবাহিত হলো।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমার মামা হযরত উসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধের রাত্রে কঠিন শীত ও প্রচণ্ড বাতাসের সময় খাদ্য ও লেপ আনার জন্যে আমাকে মদীনায় প্রেরণ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি আমাকে বলেনঃ "আমার কোন সাহাবীর সাথে তোমার দেখা হলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।" আমি চললাম। ভীষণ জোরে বাতাস বইতে ছিল। যে সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছিল আমি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলাম। যিনি পয়গাম শুনছিলেন তিনিই তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে চলে আসছিলেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ পিছন ফিরেও দেখছিলো না। বাতাস আমার ঢালে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং আমি তাতে আঘাত পাচ্ছিলাম। এমনকি ওর লোহা আমার পায়ে পড়ে গেল। আমি ওটাকে নীচে ফেলে দিলাম।"[১]

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি এমন এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখোনি।" তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। তাঁরা মুশরিকদের অন্তর ও বক্ষ ভয়, সন্ত্রাস এবং প্রভাব দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি তাদের সমস্ত নেতা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কাছে ডেকে ডেকে বলেছিলঃ "তোমরা মুক্তির পথ অন্বেষণ কর, বাঁচার পথ বের করে নাও।" এটা ছিল ফেরেশতাদের নিক্ষিপ্ত ভয় ও প্রভাব এবং তাঁরাই ছিলেন ঐ সেনাবাহিনী যার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

কুফার অধিবাসী একজন নব্যযুবক হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে আবূ আবদিল্লাহ (রাঃ)! আপনি বড়ই ভাগ্যবান যে, আপনি আল্লাহর নবী (সঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর মজলিসে বসেছেন। বলুন তো, তখন আপনি কি করতেন?" হযরত হুযাইফা (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহর কসম! আমি তখন জীবন দানে প্রস্তুত থাকতাম।"এ কথা শুনে যুবকটি বলেনঃ "শুনুন চাচা! যদি আমরা নবী (সঃ)-এর যামানা পেতাম তবে আল্লাহর শপথ! আমরা তাঁর পা মাটিতে পড়তে দিতাম না। তাঁকে আমরা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়ে ফিরতাম।" তিনি তখন বললেনঃ "হে আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তাহলে একটি ঘটনা বলি, শুনো। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) গভীর রাত্রি পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেনঃ "কাফিরদের খবরাখবর আনতে পারে এমন কেউ তোমাদের মধ্যে আছে কি? আল্লাহর নবী (সঃ) তার সাথে শর্ত করছেন যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাঁর এ কথায় কেউই দাঁড়ালো না। কেননা সবারই ভয়, ক্ষুধা ও ঠাণ্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আবার তিনি অনেকক্ষণ ধরে নামায পড়লেন। তারপর পুনরায় বললেনঃ "যে

১. এটাও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ব্যক্তি বিপক্ষ দলের খবর নিয়ে আসবে, আমি তাকে অভয় দিচ্ছি যে, সে অবশ্যই (অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায়) ফিরে আসবে। আমি দু'আ করি যে, তাকে যেন আল্লাহ জান্নাতে আমার বন্ধু হিসেবে স্থান দেন।" এবারও কেউ দাঁড়ালো না। আর দাঁড়াবেই বা কি করে? ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পেট কোমরের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাজতে শুরু করেছিল। ভয়ে তাদের রক্ত পানি হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। আমার তো তখন আর তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকলো না। তিনি বললেনঃ "হুযাইফা (রাঃ) তুমি যাও এবং দেখে এসো তারা কি করছে। দেখো, তুমি যে পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে না আসো সে পর্যন্ত নতুন কোন কাজ করে বসো না।" আমি 'খুব আচ্ছা' বলে আমার পথ ধরলাম। সাহস করে আমি শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেখানে গিয়ে বিস্ময়কর অবস্থা দেখলাম। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সৈন্যরা আনন্দের সাথে নিজেদের কাজ করতে রয়েছে। বাতাস চুলার উপর হতে ডেকচিগুলোকে উল্টিয়ে ফেলেছে। তাঁবুর খুঁটি উৎপাটিত হয়েছে। তারা আগুন জ্বালাতে পারছে না। কোন কিছুই সজ্জিত অবস্থায় নেই। ঐ সময় আবূ সুফিয়ান দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে কুরায়েশরা! তোমরা নিজ নিজ সঙ্গী হতে সতর্ক হয়ে যাও। নিজ সাথীদের দেখা শোনা কর। এমন যেন না হয় যে, অন্য কেউ তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে।" আমি কথাগুলো শুনার সাথে সাথে আমার পাশে যে কুরায়েশী দাঁড়িয়েছিল তার হাত ধরে ফেললাম এবং তাকে বললামঃ কে তুমি? সে উত্তরে বললোঃ "আমি অমুকের পুত্র অমুক।" আমি বললামঃ এখন থেকে সতর্ক থাকবে। আবূ সুফিয়ান বললেনঃ "হে কুরায়েশের দল! আল্লাহর কসম, আমাদের আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। আমাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং আমাদের উটগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বানু কুরাইযা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা আমাদেরকে খুব কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর এই ঝড়ো হাওয়া আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আমরা রান্না করে খেতে পারছি না। তাঁবু ও থাকার স্থান আমরা ঠিক রাখতে পারছি না। তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছো। আমি তো ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছি। আমি তোমাদের সকলকেই ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি।" এ কথা বলেই পাশে যে উটটি বসিয়ে রাখা হয়েছিল তার উপর তিনি উঠে বসলেন। উটকে মার দিতেই সে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে সময় আমার এমন সুযোগ হয়েছিল যে,

আমি ইচ্ছা করলে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে একটি তীরের আঘাতেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ ছিল যে, আমি যেন নতুন কোন কাজ না করে বসি। তাই আমি এ কাজ হতে বিরত থাকলাম। এখন আমি ফিরে চললাম এবং আমার সৈন্যদলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। আমি যখন পৌঁছি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়ছিলেন। চাদরটি ছিল তাঁর কোন এক পত্নীর। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আমাকে তাঁর দুই পায়ের মাঝে বসিয়ে নিলেন এবং তাঁর ঐ চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করলেন। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করলেন। আর আমি সেখানেই চাদরমুড়ি দিয়ে বসে থাকলাম। তাঁর নামায পড়া শেষ হলে আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। গাতফান গোত্র যখন কুরায়েশদের ফিরে যাবার কথা শুনলো তখন তারাও নিজেদের তলপি-তলপা বেঁধে নিয়ে ফিরে চললো।”

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর কসম! কন্‌কনে শীত সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন কোন গরম হাম্মাম খানায় রয়েছি। ঐ সময় আবূ সুফিয়ান (রাঃ) আগুন জ্বেলে তাপ গ্রহণ করছিল। আমি তাঁকে দেখে চিনে ফেললাম। সাথে সাথে আমি কামানে তীর যোজন করলাম। মনে করলাম যে, তীর ছুঁড়ে দিই। তিনি আমার তীরের আওতার মধ্যেই ছিলেন। আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন কারণই ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা আমার স্মরণ হয়ে গেল যে, আমি যেন এমন কোন নতুন কাজ করে না বসি যার ফলে শত্রুরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি আমার বাসনা পরিত্যাগ করলাম। যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম তার পূর্ব পর্যন্ত আমি কোন ঠাণ্ডা অনুভব করিনি। আমার মনে হচ্ছিল যে, যেন আমি গরম হাম্মাম খানায় আছি। তবে যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম তখন খুবই ঠাণ্ডা অনুভূত হতে লাগলো। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলেন। আমি সকাল পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমালাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ বলে জাগালেনঃ “হে নিদ্রিত ব্যক্তি! জেগে ওঠো।”

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন ঐ তাবেয়ী বলেনঃ “হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতাম এবং তাঁর যুগটা পেতাম।” তখন হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ “হায়! যদি তোমার মত আমার ঈমান হতো। তাঁকে না দেখেই তুমি তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছো! তবে হে আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যে

আকাঙ্ক্ষা করছো তা শুধু আকাঙ্ক্ষাই মাত্র। সেই সময় থাকলে তুমি কি করতে তা তুমি জানো না। আমাদের উপর দিয়ে কত কঠিন সময় গত হয়েছে!" অতঃপর তিনি তাঁর সামনে উপরোল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি একথাও বললেনঃ "ঝড় তুফানের সাথে সাথে বৃষ্টিও বর্ষিত হচ্ছিল।"

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথের ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন তখন মজলিসে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেনঃ "আমরা যদি সে সময় উপস্থিত থাকতাম তবে এই করতাম, ঐ করতাম।" তাঁদের একথা শুনে হযরত হুযাইফা (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করেনঃ "বাহির হতে তো দশ হাজার সৈন্য আমাদেরকে ঘিরে বসে আছে, আর ভিতর হতে বানু কুরাইযার আটশ' জন ইয়াহূদী বিদ্রোহী হয়ে গেছে এবং শিশুরা ও নারীরা মদীনায় পড়ে আছে। এভাবে সবদিক দিয়েই বিপদ লেগে আছে। যদি বানু কুরাইযা গোত্র এদিকে লক্ষ্য করে তাহলে ক্ষণেকের মধ্যে শিশু ও নারীদের ফায়সালা করে দিবে। আল্লাহর শপথ! এ রাত্রের মত ভীতি-বিহ্বল অবস্থা আমার আর কখনো হয়নি। এর উপর ঝড় বইছে, তুফান সমানভাবে চলতেই আছে, চতুর্দিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, মেঘ গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সবই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর ইচ্ছেতেই হচ্ছে। সাথীদেরকে কোথায় দেখা যাবে? নিজের হাতের অঙ্গুলীও দেখা যায় না। মুনাফিকরা বাহানা করতে শুরু করে দিয়েছে যে, তাদের ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পরিবারকে দেখবার কেউ নেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেন তাদেরকে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাউকেও ফিরে যেতে বাধা দিলেন না। যেই অনুমিত চায় তাকেই তিনি বলেনঃ "যাও, আগ্রহের সাথেই যাও।" সুতরাং তারা এক এক করে সরে পড়ে। আমরা শুধু প্রায় তিনশর মত রয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে আমাদেরকে এক এক করে দেখলেন। আমার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আমার কাছে শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার না ছিল কোন অস্ত্র এবং ঠাণ্ডা হতে বাঁচবার না ছিল কোন ব্যবস্থা। শুধু আমার স্ত্রীর ছোট একটি চাদর ছিল যা আমার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেনি। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আসলেন তখন আমি আমার হাঁটুতে মাথা লাগিয়ে কাঁপছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটা কে?" আমি উত্তরে বললামঃ আমি হুযাইফা। তিনি তখন বললেনঃ "হে হুযাইফা (রাঃ)! শুন।" তাঁর একথা শুনে আল্লাহর কসম! পৃথিবী আমার উপর সংকুচিত হয়ে গেল যে, না জানি হয়তো তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলবেন। আর দাঁড়ালে

তো আমার দুর্গতির কোন সীমা থাকবে না। কিন্তু করি কি? আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশ তো? বাধ্য হয়ে বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।" তিনি বললেনঃ "শত্রুদের মধ্যে এক নতুন ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে। যাও, এর খবর নাও।" আল্লাহর কসম! ঐ সময় আমার চেয়ে অধিক না কারো ভয়-ভীতি ছিল, না আমার চেয়ে বেশী কাউকেও ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ শোনা মাত্রই আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার জন্যে দু'আ করছেন এটা আমার কানে আসলো। তিনি দু'আ করছিলেনঃ "হে আল্লাহ! তার সামনে হতে, পিছন হতে, ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, উপর হতে এবং নীচ হতে তাকে হিফাযত করুন।" তাঁর দু'আর সাথে সাথে আমার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে বললেনঃ "শুন হে হুযাইফা (রাঃ)! সেখান হতে আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন কিছু করে বসো না।"

এ রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ "ইতিপূর্বে আমি আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে চিনতাম না। ওখানে গিয়ে আমি এ শব্দই শুনতে পেলামঃ "চল, ফিরে চল।" একটি আশ্চর্য ব্যাপার এও দেখলাম যে, ঐ ভয়াবহ বাতাস যা ডেকচিগুলোকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল তা শুধু তাদের সেনাবাহিনীর অবস্থানস্থল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আল্লাহর শপথ! তা থেকে অর্ধ হাতও বাইরে যায়নি। আমি দেখলাম যে, পাথর উড়ে উড়ে তাদের উপর পড়ছিল। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন দেখলাম যে, পাগড়ি পরিহিত প্রায় ২০ জন অশ্বারোহী রয়েছেন যাঁরা আমাকে বললেনঃ "যাও, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে যথেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে তিনি পরাজিত ও লাঞ্ছিত করেছেন।" এই বর্ণনায় এও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোন বিপদের সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়া শুরু করে দিতেন। এতে আরো রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর পৌঁছানো হয় তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ আয়াতে নিম্ন অঞ্চল হতে আগমনকারী দ্বারা বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ

করছিলে। এমনকি কোন কোন মুনাফিক তো এটা মনে করে নিয়েছিল যে, এ যুদ্ধে কাফিররাই জয়যুক্ত হবে। সাধারণ মুনাফিকদের কথা তো দূরে থাক, এমনকি মুতাব ইবনে কুশায়ের বলতে শুরু করলোঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আমাদেরকে বলেছিলেন যে, আমরা নাকি কাইসার ও কিসরার ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবো, অথচ এখানকার অবস্থা এই যে, পায়খানায় যাওয়াও আমাদের জন্যে কষ্টকর হয়ে পড়েছে।" এ রকম বিভিন্ন লোকের ধারণা বিভিন্ন ছিল। তবে মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের জয় সুনিশ্চিত।

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের প্রাণ তো হয়েছে কণ্ঠাগত, এখন আমাদের বলার কিছু আছে কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, তোমরা বলো–

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং আমাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করুন।"

এদিকে মুসলমানদের এ দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল, আর ঐ দিকে আল্লাহর সৈন্য বাতাসের রূপ ধারণ করে এসে পড়ে এবং কাফিরদের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়।[১]

১১। তখন মুমিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

১১- هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○

১২। এবং মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিলঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

১২- وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ○

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

١٣- وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ○

১৩। আর তাদের এক দল বলেছিলঃ হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল, এবং তাদের মধ্যে একদল নবী (সঃ)-এর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিলঃ আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানরা যে ভীতি-বিহ্বলতা ও উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহির হতে আগত শত্রুরা পূর্ণ শক্তি ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিতরে শহরের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইয়াহূদীরা হঠাৎ করে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মুসলমানরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে পতিত হয়েছে। মুনাফিকরা প্রকাশ্যভাবে পৃথক হয়ে গেছে। দুর্বল মনের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে শুরু করেছে। তারা একে অপরকে বলছেঃ "পাগল হয়েছো না কি? দেখতে পাচ্ছ না যে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে? চলো, পালিয়ে যাই।"

ইয়াসরিব দ্বারা মদীনাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "স্বপ্নে আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রথম আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওটা বোধহয় হিজর হবে। কিন্তু না, তা ইয়াসরিব।" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ স্থানটি হলো মদীনা। অবশ্য একটি দুর্বল রিওয়াইয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াসরিব বলে সে যেন তা হতে তাওবা করে। মদীনা তো হলো তাবা, ওটা তাবা।[১]

বর্ণিত আছে যে, আমালীকের মধ্যে যে লোকটি এখানে এসে অবস্থান করেছিল তার নাম ছিল ইয়াসরিব ইবনে আবীদ ইবনে মাহলাবীল ইবনে আউস

১. এ হাদীসটি শুধু মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনে আমলাক ইবনে লাআয ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)। তার নামানুসারেই এ শহরটিও ইয়াসরিব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

একটি উক্তি এও আছে যে, তাওরাত শরীফে এর এগারোটি নাম রয়েছে। ওগুলো হলোঃ মদীনা, তাবা, তায়্যেবাহ্, সাকীনা, জাবিরাহ্, মুহিব্বাহ্, মাহবূবাহ্, কাসিমাহ্, মাজবূরাহ্, আযরা এবং মারহূমাহ্।

কা'ব আহ্বার (রঃ) বলেন, আমরা তাওরাতে একথাগুলো পেয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদীনা শরীফকে বলেনঃ "হে তাইয়্যেবা, হে তাবা এবং হে মাসকীনা! ধন-ভাণ্ডারে জড়িত হয়ে পড়ো না। সমস্ত জনপদের মধ্যে তোমার মর্যাদা সমুন্নত হবে।" কিছু লোক খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেছিলঃ 'হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল।' বানু হারিসা গোত্র বলতে শুরু করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের বাড়ীতে চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ওগুলো জনহীন অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং আমাদেরকে বাড়ী ফিরে যাবার অনুমতি দিন।" আউস ইবনে কায়সী বলেছিলঃ "আমাদের বাড়ীতে শত্রুদের ঢুকে পড়ার ভয় রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের কথা বলে দিলেন যে, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত ছিল না।

১৪। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করতো, তবে অবশ্য তারা তাই করে বসতো, তারা এতে কালবিলম্ব করতো না।

١٤- وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ○

১৫। তারা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٥- وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ○

١٦- قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৬। বলঃ তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।

١٧- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭। বলঃ কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা করতে ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

যারা ওযর করে জিহাদ হতে পালিয়ে যাচ্ছিল যে, তাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে কুফরীর মধ্যে প্রবেশের জন্যে প্ররোচিত করতো তবে তারা অবশ্যই কোন চিন্তা-ভাবনা না করে কুফরীকে কবূল করে নিতো। তারা সামান্য ভয়-ভীতির কারণে ঈমানের কোন হিফাযত করতো না ও ঈমানকে আঁকড়ে ধরে থাকতো না। এভাবে মহান আল্লাহ্ তাদের নিন্দে করেছেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। তারা জানে না যে, আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ এভাবে মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে কোন লাভ হবে না, এতে তোমাদের প্রাণ রক্ষা পেতে পারে না। বরং হতে পারে যে, এর কারণে অকস্মাৎ আল্লাহর পাকড়াও এসে যাবে এবং

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। দুনিয়া তো চিরস্থায়ী আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ জিনিস।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৮। আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলেঃ আমাদের সঙ্গে এসো। তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়।

١٨- قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ ○

১৯। তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশতঃ যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যু-ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা ঈমান আনেনি, এজন্যে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।

١٩-اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاۤءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰۤئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ব্যাপক ও প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বারা ঐ লোকদের ভালরূপেই অবগত আছেন যারা অন্যদেরকেও জিহাদে গমন হতে বাধা দেয় এবং নিজেদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বলেঃ "তোমরাও আমাদের সঙ্গেই থাকো এবং নিজেদের ঘরবাড়ী, আরাম-আয়েশ, জমি-জমা ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে জিহাদে যোগদান করো না।" তারা নিজেরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। কোন কোন সময় তারা মুখ দেখিয়ে যায় এবং নাম লিখিয়ে দেয় সেটা অন্যকথা।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ) ও মুমিনদেরকে বলেনঃ এরা অত্যন্ত কৃপণ। তাদের নিকট থেকে তোমরা কোন আর্থিক সাহায্য পাবে না এবং তোমাদের প্রতি তাদের অন্তরে কোন সহানুভূতিও নেই। তোমরা যখন গনীমতের মাল প্রাপ্ত হও তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়। যখন বিপদ আসে তখন তোমরা দেখতে পাও যে, মৃত্যু ভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ দূর হয়ে যায় তখন তারা ধনের লোভে তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তারা নবী (সঃ)-কে বলেঃ আমরা তো আপনারই সঙ্গী। আমরা আপনার সঙ্গে থেকে রীতিমত যুদ্ধ করেছি। সুতরাং গনীমতের মালে আমাদেরও অংশ রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা মুখও দেখায় না। তারা পলাতকদের আগে এবং যোদ্ধাদের পিছনে থাকে। মালের দিকে তারা মাছির মত লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। মিথ্যা ও কাপুরুষতা এ দুটো দোষই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এ দুটো দোষে যারা দোষী হয় তাদের কাছে কল্যাণের কোন আশা করা যায় কি? শান্তির সময় প্রতারণা, দুশ্চরিত্রতা এবং রূঢ়তা, আর যুদ্ধের সময় ভীরুতা ও নারীত্বপনা! যুদ্ধের সময় ঋতুবতী নারীর ন্যায় পৃথক হয়ে যাওয়া, আর মাল নেয়ার সময় গাধার মত লোভনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই তাদের কাজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা ঈমান আনেনি, এজন্যে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।

২০। তারা মনে করে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হতো যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে	٢٠- يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْـــزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْـــرَابِ

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ۞

থেকে তোমাদের সংবাদ নিতো! তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করতো।

এই মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও ভীতি-বিহ্বলতার অবস্থা এই যে, কাফির সৈন্যরা যে ফিরে গেছে এ বিশ্বাসই তাদের হয়নি। তাদের মনে এ ভয় রয়েই গেছে যে, না জানি হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে। মুশরিকদের সৈন্যদেরকে দেখেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি তারা মুসলমানদের সাথে ঐ শহরেই না থাকতো তবে কতই না ভাল হতো! বরং তারা যদি অশিক্ষিত ও অজ্ঞদের সাথে কোন জনমানবহীন গ্রামে অথবা কোন বন জঙ্গলে অবস্থান করতো এবং কোন পথিককে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো তবে কতই না ভাল হতো!

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও যুদ্ধ অল্পই করতো। তাদের মন তো মরে গেছে। কাপুরুষতার ঘুণ তাদেরকে ধরে বসেছে। তারা যুদ্ধ করবে কি, কী বীরত্বপনা তারা দেখাবে?

২১- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞

২১। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

২২- وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ۞

২২। মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলে উঠলোঃ এটা তো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।

এ আয়াত ঐ বিষয়ের উপর বড় দলীল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত কথা, কাজ ও অবস্থা আনুগত্য ও অনুসরণের যোগ্য। আহযাবের যুদ্ধে তিনি যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও বীরত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যেমন আল্লাহর পথের প্রস্তুতি, জিহাদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং কাঠিন্যের সময়ও আসমানী সাহায্যের আশা যে তিনি করেছিলেন, এগুলো নিঃসন্দেহে এ যোগ্যতা রাখে যে, মুসলমানরা এগুলোকে জীবনের বিরাট অংশ বানিয়ে নেয়। আর যেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে নিজেদের জন্যে উত্তম নমুনা বানিয়ে নেয় এবং তাঁর গুণাবলী যেন নিজেদের মধ্যে আনয়ন করে। এই কারণেই ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশকারী লোকদের জন্যে আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে ঘোষণা দেনঃ তোমরা আমার নবী (সঃ)-এর অনুসরণ কর না কেন? আমার রাসূল (সঃ) তো তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছেন। তাঁর নমুনা তোমাদের সামনে বিদ্যমান ছিল। তোমাদেরকে তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বনের কথা শুধু শিক্ষাই দিচ্ছেন না বরং কার্যে অটলতা, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা তিনি নিজের জীবনেও ফুটিয়ে তুলেছেন। তোমরা যখন আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাসের দাবী করছো তখন তাঁকে নমুনা বানাতে আপত্তি কিসের?

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর সেনাবাহিনী, খাঁটি মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য সঙ্গীদের পাকা ঈমানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুমিনরা যখন শত্রুপক্ষীয় ভীরু ও কাপুরুষ সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলে উঠলোঃ এটা তো তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।

খুব সম্ভব আল্লাহর যে ওয়াদার দিকে এতে ইঙ্গিত রয়েছে তা সূরায়ে বাকারার নিম্নের আয়াতটিঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ -

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থ সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল।

এমনকি রাসূল এবং তার সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠেছিলঃ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"(২ ঃ ২১৪) অর্থাৎ এটা তো পরীক্ষা মাত্র। এদিকে তোমরা যুদ্ধে অটল থেকেছো, আর ওদিকে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) সত্য বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো। অর্থাৎ তাদের ঈমান পূর্ণ হয়ে গেল এবং আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেলো। ঈমান বেশী হওয়ার একটি দলীল এই আয়াতটি এবং অন্যদের তুলনায় তাঁদের ঈমান বেশী হওয়ারও দলীল। জমহূর ইমামগণও একথাই বলেন যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। আমরাও সহীহ বুখারীর শরাহের শুরুতে এটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

মহান আল্লাহ তাই বলেনঃ তাদের ঈমান যা ছিল, কঠিন বিপদের সময় তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

২৩। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

٢٣- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۙ

২৪। কারণ আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٤- لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ

এখানে মুমিন ও মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সময় আসার পূর্বে মুনাফিকরা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকে কিন্তু যখন সময় এসে যায় তখন অত্যন্ত ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর

সাথে কৃত ওয়াদা সব ভুলে যায়। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে মুমিনরা তাদের ওয়াদা পূর্ণভাবে পালন করে। কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করে এবং কেউ কেউ শাহাদাতের প্রতীক্ষায় থাকে।

হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যখন আমি কুরআন মাজীদ লিখতে শুরু করি তখন একটি আয়াত আমি পাচ্ছিলাম না। অথচ সূরায়ে আহযাবে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে তা শুনেছিলাম। অবশেষে হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত আনসারী (রঃ)-এর নিকট আয়াতটি পাওয়া গেল। ইনি ঐ সাহাবী, যাঁর একার সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান করে দিয়েছিলেন।"[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ ... الخ-এ আয়াতটি হযরত আনাস ইবনে নাযার (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি এই যে, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি বলে মনে অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তাঁর দুঃখের কারণ ছিল এই যে, যে যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেই যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। সুতরাং তাঁর মত হতভাগ্য আর কে আছে? তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেনঃ "আবার যদি জিহাদের সুযোগ এসে যায় তবে অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলাকে আমার সত্যবাদিতা ও সৎ সাহসিকতা প্রদর্শন করবো আর এও দেখিয়ে দেবো যে, আমি কি করছি!" অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের সুযোগ আসলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সামনের দিক হতে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ফিরে আসছেন। তাঁকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আবূ আমর (রাঃ)! কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! উহুদ পাহাড়ের এই দিক হতে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।" এ কথা বলেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে তরবারী চালনা করেন। কিন্তু মুসলমানরা সবাই ফিরে গিয়েছিলেন বলে তিনি একা হয়ে গেলেন। তাঁর এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে মুশরিকরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর দেহে আশিটিরও বেশী যখম হয়েছিল। কোনটি ছিল বর্শার যখম

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এবং কোনটি ছিল তরবারীর যখম। শাহাদাতের পর তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভগ্নী তাঁকে তাঁর হাতের অঙ্গুলীগুলোর অগ্রভাগ দেখে চিনতে পারেন। তাঁর ব্যাপারেই مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا الخ-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, যখন মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে তখন তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা (মুসলমানরা) যা করলো এজন্যে আমি আপনার নিকট ওযর প্রকাশ করছি এবং মুশরিকরা যা করেছে সে জন্যে আমি আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি।" তাতে এও রয়েছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "আমি আপনার সাথেই রয়েছি। আমি তাঁর সাথে চলছিলামও বটে। কিন্তু তিনি যা করছিলেন। তা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত ছিল।"

হযরত তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ উহুদের যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে এসে মিম্বরের উপর আরোহণ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মর্যাদার বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ الخ-এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ আয়াতে যাঁদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাঁরা কারা?" ঐ সময় আমি সামনের দিক হতে আসছিলাম এবং হাযরামী ও সবুজ রঙ-এর দু'টি কাপড় পরিহিত ছিলাম। আমার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেনঃ "হে প্রশ্নকারী ব্যক্তি! এই লোকটিও তাদের মধ্যে একজন।"[২]

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা ইবনে তালহা (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে গমন করেন। যখন তিনি তাঁর দরবার হতে ফিরে আসতে উদ্যত হন তখন তিনি তাঁকে ডেকে বলেনঃ "হে মূসা (রাঃ)! এসো, আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ الخ-এই আয়াতে যেসব লোকের বর্ণনা রয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা হযরত তালহাও (রাঃ) একজন।"[৩]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এটাও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

এঁদের বর্ণনা দেয়ার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আবার যুদ্ধের সুযোগ আসলে তারা তাদের কাজ আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

এই ভীতি এবং এই সন্ত্রাস এই কারণেই ছিল যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন তাদের সত্যবাদিতার জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন আলেমুল গায়েব। তাঁর কাছে প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই সমান। যা হয়নি তা তিনি তেমনি জানেন যেমন জানেন যা হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অভ্যাস এই যে, বান্দা কোন কাজ যে পর্যন্ত না করে বসে সে পর্যন্ত তাকে শুধু নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করেন না। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদের এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।" (৪৭ ঃ ৩১) সুতরাং অস্তিত্বের পূর্বের জ্ঞান, তারপর অস্তিত্ব লাভের পরের জ্ঞান উভয়ই আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আর অস্তিত্বে আসার পর হবে পুরস্কার অথবা শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎ "অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করবার নন।" (৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি খাঁটি অন্তরে তাওবা করার তাওফীক দেন। ফলে তারা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাঁর করুণা ও রহমত তার গযব ও ক্রোধের উপর বিজয়ী।

২৫। আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য

২৫- وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى

করলেন। যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।	اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহসান বা অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি ঝড়-তুফান ও অদৃশ্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শক্তি-সাহস সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা কঠিন নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অকৃতকার্য অবস্থায় তারা অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বিশ্ব শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে না থাকতো তবে এ ঝড়-তুফান তাদের সাথে ঐ ব্যবহারই করতো যেমন ব্যবহার করেছিল আ'দ জাতির সাথে। যেহেতু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেছেনঃ 'যতদিন তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ততদিন আল্লাহ তাদের উপর সাধারণ আযাব নাযিল করবেন না', সেহেতু তিনি তাদেরকে তাদের দুষ্টামির স্বাদ গ্রহণ করালেন তাদের একতাকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাদেরকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন এবং নিজের আযাব সরিয়ে নিলেন। তাদের একতাবদ্ধতা তাদের প্রবৃত্তি প্রসূত ছিল বলে ঝড়-তুফানই তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো। যারা চিন্তা-ভাবনা করে এসেছিল তারাও সবাই মাটির সাথে মিশে গেল। কোথায় গেল তাদের গনীমতের মাল এবং কোথায় গেল তাদের বিজয়! তাদের জীবনের উপর মরিচা পড়ে গেল। তারা হাতে হাত মলতে লাগলো; দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো। ঘুরানো চক্রে আপতিত হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াই অকৃতকার্য হয়ে তারা ফিরে গেল। দুনিয়ার ক্ষতি তাদের পৃথকভাবে হলো এবং আখিরাতের শাস্তি তো পৃথকভাবে আছেই। কেননা, কেউ যদি কোন কাজ করার নিয়ত করে এবং তা কার্যে পরিণত করে, তবে সে তাতে কৃতকার্য হোক আর নাই হোক, পাপ তার হবেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা ও তাঁর দ্বীনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ইত্যাদি সব কিছুই তারা করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উভয় জগতের বিপদ তাদের উপর আপতিত করে তাদের অন্তর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের মুকাবিলা করেন। মুসলমানরা না তাদের সাথে লড়েছে, না তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। বরং মুসলমানরা তাদের জায়গাতেই অবস্থান করেছে। আর কাফির ও মুশরিকরা এমনিতেই পলায়ন করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেনাবাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করলেন, নিজের বান্দাদের তিনি সাহায্য

করলেন এবং নিজেই তিনি যথেষ্ট হয়ে গেলেন। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَیْءَ بَعْدَهُ

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর ওয়াদা সত্য, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হলো এবং এরপরে আর কিছুই নেই।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আহযাবের যুদ্ধে দু'আ করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, হে তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে আন্দোলিত ও প্রকম্পিত করুন।"[২]

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।' এতে একটি অতি সূক্ষ্ম কথা এই আছে যে, মুসলমানরা শুধু এই যুদ্ধ হতেই মুক্ত হননি, বরং আগামীতে সদা-সর্বদার জন্যে সাহাবীগণ (রাঃ) যুদ্ধ হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। মুশরিকরা আর তাঁদের উপর আক্রমণ করার সাহস কখনো করেনি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, আহযাবের যুদ্ধের পর কাফিরদের এ সাহস হয়নি যে, তারা মদীনার উপর অথবা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কোন স্থান হতে আক্রমণ করে। তাদের এ অপবিত্র পদক্ষেপ হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে এবং তাঁর বাসস্থান ও আরামের জায়গাকে সুরক্ষিত রেখেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। বরং অপরপক্ষে মুসলমানরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা আরব উপমহাদেশ হতে শিরক ও কুফরী সমূলে উৎপাটিত করেছেন। যখন কাফিররা এ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখনই রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বলেছিলেনঃ "এ বছরের পর কুরায়েশরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। বরং তোমরাই তাদের সাথে যুদ্ধ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

করবে।" তাই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজিত হলো। আল্লাহর শক্তির মুকাবেলা করা বান্দার সাধ্যাতীত। আল্লাহকে কেউই পরাজিত করতে পারে না। তিনিই স্বীয় শক্তি ও সাহায্যবলে ঐ সম্মিলিত বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাদের নাম নেয়ার মত কেউই থাকলো না। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন এবং স্বীয় ওয়াদাকে সত্য করে দেখালেন। তিনি স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য করলেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্যে।

٢٦- وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ○

٢٧- وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ○ ع

২৬। কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছো এবং কতককে করছো বন্দী।

২৭। এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যা তোমরা এখনো পদানত করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, যখন মুশরিক ও ইয়াহূদীদের সেনাবাহিনী মদীনায় আসে ও অবরোধ সৃষ্টি করে তখন বানু কুরাইযা গোত্রের ইয়াহূদীরা যারা মদীনার অধিবাসী ছিল এবং যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুক্তি হয়েছিল, তারাও ঠিক এই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং সন্ধি ভেঙ্গে দিলো। তারা চোখ রাঙাতে শুরু করলো। তাদের সরদার কা'ব ইবনে আসাদ আলাপ আলোচনার জন্যে আসলো। ম্লেচ্ছ হুয়াই ইবনে আখতাব ঐ সরদারকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করলো। প্রথমে সে সন্ধি ভঙ্গ করতে সম্মত হলো না। সে এ সন্ধির উপর দৃঢ় থাকতে চাইলো। হুয়াই বললোঃ "এটা কেমন কথা হলো? আমি তোমাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়ে তোমার মস্তকে রাজ মুকুট পরাতে চাচ্ছি,

অথচ তুমি তা মানছো না? কুরায়েশরা ও তাদের অন্যান্য সঙ্গীসহ আমরা সবাই এক সাথে আছি। আমরা শপথ করেছি যে, যে পর্যন্ত না আমরা এক একজন মুসলমানের মাংস ছেদন করবো সে পর্যন্ত এখান হতে সরবো না।" কা'বের দুনিয়ার অভিজ্ঞতা ভাল ছিল বলে সে উত্তর দিলোঃ "এটা ভুল কথা। এটা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। তোমরা আমাকে লাঞ্ছনার বেড়ী পরাতে এসেছো। তুমি একটা কুলক্ষণে লোক। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে সরে যাও। আমাকে তোমার ধোঁকাবাজীর শিকারে পরিণত করো না।" হুয়াই কিন্তু তখনো তার পিছন ছাড়লো না। সে তাকে বারবার বুঝাতে থাকলো। অবশেষে সে বললোঃ "মনে কর যে, কুরায়েশ ও গাতফান গোত্র পালিয়ে গেল, তাহলে আমরা দলবলসহ তোমার গর্তে গিয়ে পড়বো। তোমার ও তোমার গোত্রের যে দশা হবে, আমার ও আমার গোত্রেরও সেই দশাই হবে।"

অবশেষে কা'বের উপর হুয়াই-এর যাদু ক্রিয়াশীল হলো। বানু কুরাইযা সন্ধি ভঙ্গ করলো। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবীগণ (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং এটা তাঁদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহও (সঃ) অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর গৃহে ধূলো-ধূসরিত অবস্থায় হাযির হলেন এবং পাক সাফ হওয়ার জন্যে গোসল করতে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁর মস্তকোপরি রেশমী পাগড়ী ছিল। তিনি খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ওর পিঠে রেশমী গদি ছিল। তিনি বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেছেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ।" হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ "ফেরেশতারা কিন্তু এখনো অস্ত্র-শস্ত্র হতে পৃথক হয়নি। আমি কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন হতে এইমাত্র ফিরে এলাম। জেনে রাখুন! আল্লাহর নির্দেশ, বানু কুরাইযার দিকে চলুন! তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করুন! আমার প্রতিও মহান আল্লাহর এ নির্দেশ রয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে প্রকম্পিত করি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যান। নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাহাবীদেরকেও প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমরা সবাই বানু কুরাইযার ওখানেই আসরের নামায আদায় করবে। যুহরের নামাযের পর এ হুকুম দেয়া হলো। বানু কুরাইযার দুর্গ মদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে

অবস্থিত ছিল। পথেই নামাযের সময় হয়ে গেল। তাঁদের কেউ কেউ নামায আদায় করে নিলেন। তাঁরা বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে আসেন।" আবার কেউ কেউ বললেনঃ "আমরা সেখানে না পৌঁছে নামায পড়বো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ খবর জানতে পেরে দু'দলের কাউকেই তিনি ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করলেন না। তিনি ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করলেন। সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে প্রদান করলেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হলো। যখন ইয়াহূদীদের দম নাকে এসে গেল তখন তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। তারা হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)-কে নিজেদের সালিশ বা মীমাংসাকারী নির্ধারণ করলো। কারণ তিনি আউস গোত্রের সরদার ছিলেন। বানু কুরাইযা ও আউস গোত্রের মধ্যে যুগ-যুগ ধরে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা চলে আসছিল। তারা একে অপরের সাহায্য করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, হযরত সা'দ (রাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বানু কাইনুকা গোত্রকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। এদিকে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যার কারণে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ক্ষতস্থানে দাগ লাগিয়েছিলেন এবং মসজিদের তাঁবুতে তাঁর স্থান করেছিলেন। যাতে তাঁকে দেখতে যাওয়ার সুবিধা হয়। হযরত সা'দ (রাঃ) যে দু'আ করেছিলেন তন্মধ্যে একটি দু'আ এও ছিলঃ "হে আমার প্রতিপালক। যদি আরো কোন যুদ্ধ আপনার নবী (সঃ)-এর উপর থেকে থাকে যেমন কাফির মুশরিকরা আপনার নবী (সঃ)-এর উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তবে আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি। আর যদি কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট না থেকে থাকে তবে আমার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকুক। কিন্তু হে আমার প্রতিপালক! যে পর্যন্ত না আমি বানু কুরাইযা গোত্রের বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি দেখে আমার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা করতে পারি সে পর্যন্ত আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করুন।" হযরত সা'দ (রাঃ)-এর প্রার্থনা কবূল হওয়ার দৃশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি এদিকে প্রার্থনা করছেন, আর ওদিকে বানু কুরাইযা গোত্র স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) তাদের যে মীমাংসা করবেন তা তারা মেনে নেবে এবং তাদের দুর্গ মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেন এসে তাদেরকে তাঁর ফায়সালা শুনিয়ে দেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)-কে গাধার উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসা হলো। আউস গোত্রের সমস্ত লোক তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললোঃ "দেখুন, বানু কুরাইযা গোত্র আপনারই লোক। তারা আপনার উপর ভরসা করেছে। তারা আপনার কওমের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সুতরাং আপনি তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন!" হযরত সা'দ (রাঃ) নীরব ছিলেন। তাদের কথার কোন জবাব তিনি দিচ্ছিলেন না। তারা তাঁকে উত্তর দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং তাঁর পিছন ছাড়লো না। অবশেষে তিনি বললেনঃ "ঐ সময় এসে গেছে, হযরত সা'দ এটা প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহর পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের তিনি কোন পরওয়া করবেন না।" তাঁর এ কথা শোনা মাত্রই ঐ লোকগুলো হতাশ হয়ে পড়লো যে, বানু কুরাইযা গোত্রের কোন রেহাই নেই। যখন হযরত সা'দ (রাঃ)-এর সওয়ারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁবুর নিকট আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা তোমাদের সরদারের অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও।" তখন মুসলমানরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে সওয়ারী হতে নামানো হলো। এরূপ করার কারণ ছিল এই যে, ঐ সময় তিনি ফায়সালাকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ঐ সময় তাঁর ফায়সালাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। তিনি উপবেশন করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "বানু কুরাইযা গোত্র তোমার ফায়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে এবং দুর্গ আমাদের হাতে সমর্পণ করেছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দাও।" হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ "তাদের ব্যাপারে আমি যা ফায়সালা করবো তাই কি পূর্ণ করা হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "নিশ্চয়ই।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "এই তাঁবুবাসীদের জন্যেও কি আমার ফায়সালা মেনে নেয়া জরুরী হবে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই।" আবার তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "এই দিকের লোকদের জন্যেও কি?" ঐ সময় তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যেই দিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইজ্জত ও বুযর্গীর খাতিরে তিনি তাঁর দিকে তাকালেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ, এই দিকের লোকদের জন্যেও এটা মেনে নেয়া জরুরী হবে।" তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে এখন আমার ফায়সালা শুনুন! বানু কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মত যত লোক রয়েছে তাদের সবাইকেই হত্যা করে দেয়া হবে। তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে।" তাঁর এই ফায়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে

সা'দ (রাঃ)! তুমি এ ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই করেছো যা আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর ফায়সালা করেছেন।” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হে সা'দ (রাঃ)! প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর যে ফায়সালা সেই ফায়সালাই তুমি শুনিয়েছো।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে গর্ত খনন করা হয় এবং বানু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় হত্যা করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ' বা আটশ'। তাদের নারীদেরকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং তাদের সমস্ত মালধন হস্তগত করা হয়। আমি এসব ঘটনা আমার 'কিতাবুস সিয়ার' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্যে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছো এবং কতককে করছো বন্দী।

এই বানু কুরাইযা গোত্রের বড় নেতা, যার দ্বারা এই বংশ চালু হয়েছিল, পূর্ব যুগে এ আশায় সে হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করেছিল যে, যে শেষ নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যেহেতু হিজায প্রদেশে আবির্ভূত হবেন, সেহেতু তারা যেন সর্বপ্রথম তাঁর আনুগত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কিন্তু শেষ নবী (সঃ)-এর যখন আগমন ঘটলো তখন তার অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। যার ফলে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হলো।

صَيَاصِى দ্বারা দুর্গকে বুঝানো হয়েছে। এই কারণে জন্তুর মাথার শিংকেও صَيَاصِى বলা হয়। কেননা, জন্তুদের দেহের সবচেয়ে উপরে শিংই থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তারাই মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। শিক্ষিত ও মূর্খ কখনো সমান হয় না। তারাই মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত হয়ে গেল। শক্তি দুর্বলতায় এবং সফলতা বিফলতায় পরিবর্তিত হলো। চিত্র নষ্ট হয়ে গেল। মিত্ররা পলায়ন করলো এবং তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লো। সম্মানের জায়গা অসম্মান দখল করে নিলো। মুসলমানদেরকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আনন্দ তাদের নিজেদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দিলো। এরপর আখিরাতের পালা তো আছেই।

তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করে দেয়া হলো। আতিয়্যা কারামী বর্ণনা করেছে, যখন আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাযির করা হলো তখন তিনি বললেনঃ "দেখো, যদি এর নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তবে একে হত্যা করে দেবে। অন্যথায় একে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করবে।" দেখা গেল যে, তখনো আমার শৈশবকাল কাটেনি। সুতরাং জীবিত ছেড়ে দেয়া হলো।

মুসলমানদেরকে তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের অধিকারী করে দেয়া হলো। এমনকি তাদেরকে ঐ ভূমিরও মালিক করে দেয়া হলো যা তখনো পদানত হয়নি। অর্থাৎ খাইবারের ভূমি অথবা মক্কা শরীফের ভূমি কিংবা পারস্য অথবা রোমের ভূমি। কিংবা হতে পারে যে, সব জায়গারই ভূমি। অর্থাৎ সব জমিই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বের হলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অবস্থা অবহিত হওয়া। এমন সময় আমার পিছন দিক থেকে কারো সবেগে আগমনের আভাষ পেলাম। তাঁর অস্ত্রের ঝনঝনানীর শব্দও আমার কানে এলো। আমি তখন রাস্তা হতে সরে গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। দেখলাম যে, হযরত সা'দ (রাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারিস ইবনে আউস (রাঃ)-ও ছিলেন। তাঁর হাতে ঢাল ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি খুবই লম্বা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন বলে তাঁর দেহ বর্মে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়নি। তাঁর হাত খোলা ছিল। যুদ্ধের কবিতা পাঠ করতে করতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি সেখান হতে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। একটি বাগানে আমি প্রবেশ করলাম। সেখানে কিছু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। একটি লোক লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। ঐ লোকদের মধ্যে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে ফেলেছিলেন এবং এ কারণে তিনি আমার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেনঃ "হে বীরাঙ্গনা! আপনি কি জানেন না যে, যুদ্ধ চলছে? আল্লাহ তা'আলাই জানেন পরিণতি কি হবে! আপনি কি করে এখানে আসতে পারলেন? ইত্যাদি অনেক কিছু বলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি আমাকে এতো বেশী তিরস্কার করলেন যে, যদি যমীন ফেটে যেতো তবে আমি তাতে ঢুকে পড়তাম। যে লোকটি মুখ ঢেকে ছিলেন তিনি হযরত উমারের এসব কথা শুনে মাথা হতে লোহার টুপি নামিয়ে ফেললেন। তখন আমি তাঁকে দেখে চিনতে পারলাম। তিনি

ছিলেন হযরত তালাহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রাঃ)। তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে নীরব করিয়ে দিয়ে বললেনঃ "কি র্ভৎসনা করছেন? পরিণামের জন্যে কি ভয়? আপনি এতো ভয় করছেন কেন? কেউ যদি পালিয়ে যায় তবে সে যাবে কোথায়? সবকিছুই আল্লাহর হাতে।" একজন কুরায়েশী হযরত সা'দ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে তীর মেরে দিলো এবং বললোঃ "আমি হলাম ইবনে আরকা।" হযরত সা'দ (রাঃ)-এর রক্তবাহী শিরায় তীরটি বিদ্ধ হয়ে গেল এবং রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। ঐ সময় তিনি দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু ঘটাবেন না যে পর্যন্ত না আমি বানু কুরাইযা গোত্রের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি।" আল্লাহ তা'আলার কি মাহাত্ম্য যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়-তুফান মুশরিকদেরকে তাড়িয়ে দিলো। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর সদয় হলেন। আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তেহামায় পালিয়ে গেল। উয়াইনা ইবনে বদর এবং তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল নজদের দিকে। বানু কুরাইযা গোত্র তাদের দুর্গে আশ্রয় নিলো। যুদ্ধক্ষেত্র শূন্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ (রাঃ)-এর জন্যে মসজিদে নববীতেই একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। ঐ সময়েই হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসলেন। তাঁর চেহারা ধূলিময় ছিল। তিনি বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতারা কিন্তু এখনো অস্ত্র-শস্ত্র খুলে ফেলেননি। চলুন, বানু কুরাইযার ব্যাপারেও একটা ফায়সালা করে নেয়া হোক। তাদের উপর আক্রমণ চালানো হোক।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হলেন এবং সাহাবীদেরকেও যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ প্রদান করলেন। বানু তামীম গোত্রের ঘরবাড়ী মসজিদে নববী সংলগ্ন ছিল। পথে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আচ্ছা ভাই! এখান দিয়ে কাউকেও যেতে দেখেছো কি?" তারা উত্তরে বললোঃ "এখনই হযরত দাহইয়া কালবী (রাঃ) গেলেন।" অথচ উনিই তো ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। তাঁর দাড়ী এবং চেহারা সম্পূর্ণরূপে হযরত দাহইয়া কালবী (রাঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়ে বানু কুরাইযার দুর্গ অবরোধ করে বসলেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হলো। যখন তারা অত্যন্ত সংকটময় অবস্থায় পতিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ "দুর্গ আমাদের হাতে ছেড়ে দাও এবং তোমরা নিজেরাও আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা ফায়সালা করবো।" তারা আবূ লুবাবা আব্দুল মুনযিরের সাথে পরামর্শ করলো। সে ইঙ্গিতে

বললোঃ "এ অবস্থায় তোমরা জীবনের আশা পরিত্যাগ কর।" তারা এটা জানতে পেরে এতে অসম্মতি জানালো। তারা বললোঃ "আমরা আমাদের দুর্গ শূন্য করে দিচ্ছি এবং এটা আপনার সেনাবাহিনীর হাতে সমর্পণ করছি। আমাদের ব্যাপারে আমরা হযরত সা'দ (রাঃ)-কে আমাদের ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। তিনি হযরত সা'দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসছিলেন যার উপর খেজুর গাছের বাকলের গদি ছিল। তাঁকে অতি কষ্টে ওর উপর সওয়ার করে দেয়া হয়। তাঁর কওম তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। তারা তাঁকে বুঝাচ্ছিলঃ "দেখুন, বানু কুরাইযা আমাদের মিত্র। তারা আমাদের বন্ধু। সুখে-দুঃখে তারা আমাদের সাথী। তাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা আপনার অজানা নয়।" হযরত সা'দ (রাঃ) নীরবে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি তাদের মহল্লায় পৌঁছেন তখন ঐদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ "এখন এমন সময় এসে গেছে যখন আমি আল্লাহর পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেই পরওয়া করবো না।" যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁবুর নিকট হযরত সা'দ (রাঃ)-এর সওয়ারী পৌঁছলো তখন তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে বললেনঃ "তোমাদের সাইয়্যেদের জন্যে উঠে দাঁড়াও এবং তাঁকে নামিয়ে নাও।" এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আমাদের সাইয়্যেদ তো স্বয়ং আল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাঁকে নামিয়ে নাও।" সবাই তখন মিলে জুলে তাঁকে সওয়ারী হতে নামিয়ে নিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে সা'দ (রাঃ)! তাদের ব্যাপারে তুমি যে ফায়সালা করতে চাও, কর।" তিনি তখন বললেনঃ "তাদের বড়দেরকে হত্যা করা হোক, ছোটদেরকে গোলাম বানিয়ে নেয়া হোক এবং তাদের মালধন বন্টন করে নেয়া হোক।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ ফায়সালা শুনে বললেনঃ "হে সা'দ (রাঃ)! এই ফায়সালায় তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুকূল্য করেছো।" অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! যদি আপনার নবী (সঃ)-এর উপর কুরায়েশদের আর কোন আক্রমণ বাকী থেকে থাকে তবে তাতে অংশগ্রহণের জন্যে আমাকে জীবিত রাখুন। অন্যথায় আমাকে আপনার নিকট উঠিয়ে নিন।" তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষতস্থান হতে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে শুরু করলো। অথচ ওটা সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়েই গিয়েছিল। সামান্য কিছু বাকী ছিল। সুতরাং তাঁকে তাঁর তাঁবুতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ), হযরত

আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও আসলেন। তাঁরা সবাই কাঁদছিলেন। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-এর ক্রন্দনের শব্দ পৃথক পৃথকভাবে বুঝতে পারছিলাম। আমি ঐ সময় আমার কক্ষে ছিলাম। সত্যিই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহচরই ছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেনঃ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (৪৮ঃ ২৯)

হযরত আলকামা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে কাঁদতেন তা বলুন তো?" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ "কারো জন্যে তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরতো না। তবে, দুঃখ ও বেদনার সময় তিনি স্বীয় দাড়ি মুবারক স্বীয় মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নিতেন।"

২৮। হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও ওর ভূষণ কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।

٢٨- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

২৯। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্যে মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

٢٩- وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর সহধর্মিণীদেরকে দু'টি জিনিসের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যদি তারা পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য ও জাঁক-জমক পছন্দ করে তবে তিনি যেন তাদেরকে তাঁর বিবাহ-সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর যদি দুনিয়ার অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর

সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনা করে তবে যেন তারা তাঁর সাথে ধৈর্য অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নিয়ামত দ্বারা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের মাতা নবী (সঃ)-এর সমস্ত সহধর্মিণীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁরা সবাই আল্লাহকে, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে এবং আখিরাতকেই পছন্দ করে নেন। ফলে মহান আল্লাহ তাঁদের সবারই উপর খুশী হন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার আনন্দ ও সুখ-শান্তিও দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী (সঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ "আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করো না। বরং পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দাও।" তিনি বলেনঃ "তিনি তো অবশ্যই জানেন যে, আমার পিতা-মাতা যে তাঁর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হবার পরামর্শ আমাকে দেবেন এটা অসম্ভব। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে আমাকে শুনিয়ে দেন। আমি উত্তরে তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করার কিছুই নেই। আমার আল্লাহ কাম্য, তাঁর রাসূল (সঃ) কাম্য এবং আখিরাতের সুখ-শান্তিই কাম্য। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য সমস্ত স্ত্রী আমার মতই কথা বলেন।"[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ "দেখো, তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করা ছাড়া তুমি নিজেই কোন ফায়সালা করে ফেলো না।" অতঃপর আমার জবাব শুনে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে যান এবং হেসে ওঠেন। তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে যান এবং তাদেরকে পূর্বেই বলেছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এ কথা বলেছে। তারা তখন বলেন যে, তাদেরও জবাব এটাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এই ইখতিয়ার প্রদানের পর আমরা যে তাঁকেই গ্রহণ করলাম, সুতরাং এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হলো না।"

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। জনগণ তাঁর দরযার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রবেশের অনুমতি পাননি এমতাবস্থায় হযরত উমার (রাঃ) এসে পড়েন।

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেন না। কিছুক্ষণ পর দু'জনকেই অনুমতি দেয়া হলো। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর পার্শ্বে বসে আছে এবং তিনি নীরব হয়ে আছেন। হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "দেখো, আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে হাসিয়ে দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি দেখতেন যে, আজ আমার স্ত্রী আমার কাছে টাকা-পয়সা চাইলো। আমার কাছে টাকা-পয়সা ছিল না। যখন কঠিন জিদ করতে লাগলো তখন আমি উঠে গিয়ে গর্দান মাপলাম।" এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠলেন এবং বলতে লাগলেনঃ "এখানেও এ ব্যাপারই ঘটেছে। দেখুন, এরা সবাই আমার কাছে ধন-মাল চাইতে শুরু করেছে!" এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে এবং হযরত উমার (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর দিকে ধাবিত হলেন এবং বললেনঃ "বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে এমন কিছু চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই?" ভাগ্য ভাল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের দু'জনকে থামিয়ে দিলেন। নতুবা তাঁরা যে নিজ নিজ কন্যাকে প্রহার করতেন এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। তখন তাঁর সব স্ত্রীই বলতে লাগলেনঃ "আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর কখনো আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমনভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলবো না।" অতঃপর এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন। তিনি আখিরাতকেই পছন্দ করলেন যেমন উপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হলো। সাথে সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) আবেদন জানালেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যে আপনাকে গ্রহণ করলাম এ কথাটি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীকে বলবেন না।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে গোপনকারী রূপে প্রেরণ করেননি। বরং আমাকে শিক্ষাদাতা ও সহজকারী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। আমাকে যে যা বলবে, আমি তাকে সঠিক ও পরিষ্কারভাবেই উত্তর দেবো।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তালাক গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। বরং দুনিয়া বা আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর সনদেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং এটা প্রকাশ্য আয়াতের বিপরীতও বটে। কেননা, প্রথম আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে রয়েছেঃ 'এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই।'

এতে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে যে, যদি তিনি স্বীয় স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করেন তবে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা জায়েয হবে কি না? কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটা জায়েয হবে, যাতে এই তালাকের ফল তারা পেয়ে যায় অর্থাৎ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও সৌন্দর্য কামনা এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হুকুম স্বীয় সহধর্মিণীদেরকে শুনিয়ে দেন তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। পাঁচজন ছিলেন কুরায়েশ বংশের। তাঁরা হলেনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ), হযরত সাওদাহ (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। আর বাকী চারজন হলেনঃ হযরত সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ), তিনি ছিলেন নাযার গোত্রের নারী। হযরত মাইমূনা বিনতে হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন হালালিয়্যাহ গোত্রের নারী। হযরত যয়নব বিনতে জহশ (রাঃ), তিনি ছিলেন আসাদিয়্যাহ গোত্রের নারী। যুওয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস (রাঃ), তিনি ছিলেন মুসতালিক গোত্রের নারী।

৩০। হে নবী- পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।

٣٠- يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরা অর্থাৎ মুমিনদের মাতারা যখন আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং আখিরাতকে পছন্দ করলেন তখন মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাঁদেরকে উপদেশ দিচ্ছেনঃ হে নবী-সহধর্মিণীরা! তোমাদের কাজ কারবার সাধারণ নারীদের মত নয়। মনে কর, যদি তোমরা নবী (সঃ)-এর অবাধ্যাচরণ কর কিংবা তোমাদের দ্বারা কোন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তবে জেনে রেখো যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। কেননা, মর্যাদার দিক দিয়ে তোমরা সাধারণ নারীদের হতে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং পাপকার্য হতে তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। অন্যথায় মর্যাদা অনুপাতে তোমাদের শাস্তিও বহুগুণে বেশী হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সবকিছুই সহজ।

এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ কথাগুলো শর্তের উপর বলা হয়েছে এবং শর্ত হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! যদি তুমি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (৩১ ঃ ৬৫) অন্য এক জায়গায় নবীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যদি তারা শিরক করে তবে তাদের আমলগুলো অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (৬ ঃ ৮৯) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যদি রহমানের (আল্লাহর) সন্তান হতো তবে আমিই হতাম সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।" (৩৯ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে রয়েছেঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন তবে তিনি স্বীয় সৃষ্টজীবের মধ্য হতে যাকে পছন্দ করতেন সন্তান বানিয়ে নিতেন। তিনি তো পবিত্র, একক, বিজয়ী এবং সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (৩৯ ঃ ৮) সুতরাং এ পাঁচটি আয়াতে শর্তের সাথে বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এরূপ হয়নি। না নবীদের দ্বারা শিরকের কাজ হয়েছে, না নবীদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দ্বারা শিরকের কাজ সম্ভব, না আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান গ্রহণ সম্ভব। অনুরূপভাবে নবী-সহধর্মিণী ও মুমিনদের মাতাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছেঃ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অশ্লীল কাজ করে বসে তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে, এর দ্বারা এটা মনে করা যাবে না যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কখনো এরূপ কোন বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ করেছেন। নাঊযুবিল্লাহ!

এক বিংশতিতম পারা সমাপ্ত

৩১। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি অনুগত হবে ও সৎকার্য করবে তাকে আমি পুরস্কার দিবো দু'বার এবং তার জন্যে রেখেছি সম্মান জনক রিযক।

٣١- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদেরকে তোমাদের অনুগত ও সৎকার্যের জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তোমাদের জন্যে জান্নাতে সম্মান জনক আহার্য প্রস্তুত রয়েছে। কেননা, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে তাঁর বাসস্থানে অবস্থান করবে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাসস্থান ইল্লীঈনের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত রয়েছে। এটা সমস্ত মানুষের বাসস্থান হতে উঁচুতে রয়েছে। এরই নাম ওয়াসিলা। এটা জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মনযিল যার ছাদ হলো আল্লাহ্র আরশ।

৩২। হে নবী-পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।

٣٢- يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○ج

৩৩। এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা নামায

٣٣- وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ

الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত থাকবে; হে নবী পরিবার। আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

٣٤- وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۟

৩৪। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীদেরকে আদব-কায়দা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। সমস্ত স্ত্রীলোক তাদের অধীনস্থ। সুতরাং এই নির্দেশাবলী সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যেই প্রযোজ্য। তিনি নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী-পত্নীরা! তোমরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের মত নও। তাদের তুলনায় তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। স্ত্রীলোকদের পরপুরুষের সাথে কোমল সুরে ও লোভনীয় ভঙ্গিতে কথা বলা নিষিদ্ধ। সুমিষ্ট ভাষায় ও নরম সুরে শুধুমাত্র স্বামীর সাথে কথা বলা যেতে পারে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ কোন জরুরী কাজকর্ম ছাড়া তোমরা বাড়ী হতে বের হবে না। মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া শরয়ী প্রয়োজন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহ্র মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না। কিন্তু তাঁদের উচিত যে, তারা বাড়ীতে যে সাদাসিধা পোশাক পরে থাকে ঐ পোশাক পরেই যেন মসজিদে গমন করে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, স্ত্রীলোকদের জন্যে বাড়ীই উত্তম।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা স্ত্রীলোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! পুরুষ লোকেরা আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত নিয়ে যায়। আমাদের জন্যে কি এমন আমল আছে যার দ্বারা আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যারা নিজেদের বাড়ীতে (পর্দার সাথে) বসে থাকে (অথবা এ ধরনের কথা তিনি বললেন), তারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের আমলের মর্যাদা লাভ করবে।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক পর্দার বস্তু। এরা যখন বাড়ী হতে বের হয় তখন শয়তান তাদের প্রতি ওঁৎ পেতে থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার খুব বেশী নিকটবর্তী হয় তখন যখন নিজেদের বাড়ীতে অবস্থান করে।"[২]

নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নারীর অন্দর মহলের নামায তার বাড়ীর নামায হতে উত্তম এবং বাড়ীর নামায আঙ্গিনার নামায হতে উত্তম।"[৩]

অজ্ঞতার যুগে নারীরা বেপর্দাভাবে চলাফেরা করতো। ইসলাম এরূপ বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ভঙ্গিমা করে নেচে নেচে চলাকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দো-পাট্টা ও চাদর গায়ে দিয়ে চলাফেরা করতে হবে। তা গায়ে দিয়ে গলায় জড়িয়ে রাখা ঠিক নয়। যাতে গলা ও কানের অলংকার অন্যের নযরে না পড়ে সেভাবে গায়ে দিতে হবে। এগুলো অসত্য ও বর্বর যুগের নিয়ম-পদ্ধতি ছিল। যা এ আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত ইদরীস (আঃ)-এর মধ্যকার ব্যবধান ছিল এক হাজার বছর। এই মধ্যবর্তী যুগে হযরত আদম (আঃ)-এর দু'টি বংশ আবাদ ছিল। একটি পাহাড়ী এলাকায় এবং অপরটি সমতল ভূমিতে বসবাস করতো। পাহাড়ীয় অঞ্চলের পুরুষ লোকেরা চরিত্রবান ও সুন্দর ছিল এবং স্ত্রীলোকেরা ছিল কুৎসিত। পুরুষদের দেহের রং ছিল শ্যামল ও সুশ্রী। ইবলীস তাদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষের রূপ ধারণ করে সমতল ভূমির লোকদের কাছে গেল। একটি লোকের গোলাম হয়ে তথায় থাকতে লাগলো। সেখানে সে বাঁশীর মত একটি

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটিও হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জিনিস আবিষ্কার করলো এবং তা বাজাতে লাগলো। এই বাঁশীর সুরে জনগণ খুবই মুগ্ধ হয়ে গেল এবং সেখানে ভীড় জমাতে শুরু করলো। এভাবে একদিন সেখানে মেলা বসে গেল। হাজার হাজার নারী-পুরুষ সেখানে একত্রিত হলো। আকস্মিকভাবে একদিন এক পাহাড়ী লোকও সেখানে পৌঁছে গেল। বাড়ী ফিরে গিয়ে সে নিজের লোকদের সামনে তাদের সৌন্দর্যের আলোচনা করতে লাগলো। তখন তারাও খুব ঘন ঘন সেখানে আসতে লাগলো। দেখাদেখির মাধ্যমে এদের নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা বেড়ে গেল। সাথে সাথে ব্যভিচার ও অনান্য অসৎ কর্ম বেড়ে চললো। এভাবেই অসভ্যতা ও বর্বরতার পত্তন হলো।

এ ধরনের কাজে বাধা দেয়ার পর কিছু কিছু নির্দেশাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহর ইবাদত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে নামায। সুতরাং তোমরা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায প্রতিষ্ঠিত করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ যাকাত প্রদান করতে হবে। এই বিশেষ আদেশ প্রদানের পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। এই আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীরা আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতটি তাঁদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের শানে নুযূল তো আয়াতের আদেশ-নিষেধ মুতাবেক হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতের বিষয়বস্তু তাদের উপর বর্তাবে যাদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তারা তো হবেই, তা ছাড়া তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ক্রিয়া-কলাপ এদের অনুরূপ হবে। দ্বিতীয় কথাটিই অধিকতর সঠিক। হযরত ইকরামা (রাঃ) বাজারে বাজারে বলে বেড়াতেনঃ "এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের জন্যে বিশেষভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ), ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও (রাঃ) এ কথা বলেছেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলতেনঃ "যদি কেউ এ ব্যাপারে মুকাবিলা করতে চায় তবে আমি মুকাবিলা করতে সদা প্রস্তুত।" এ আয়াতটি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে– একথার ভাবার্থ এই যে, এর শানে নুযূল অবশ্যই এটাই। যদি এর উদ্দেশ্য এই হয় যে, আহ্লে বায়েতের সাথে অন্যান্যরাও জড়িত, তবে এখানে আবার প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ আয়াতে বর্ণিত আহ্লে বায়েত ছাড়া অন্যান্যরাও শামিল রয়েছে।

মুসনাদে আহ্মাদ ও জামেউত তিরমিযীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফজরের নামাযের জন্যে বের হতেন তখন তিনি হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর দরযার নিকট গিয়ে বলতেনঃ "হে আহ্লে বায়েত! নামাযের সময় হয়ে গেছে।" অতঃপর তিনি এই পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান ও গারীব বলেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর এরূপ একটি হাদীসে সাত মাসের বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবূ দাঊদ আমানাকী ইবনে হারিস চরম মিথ্যাবাদী। এ রিওয়াইয়াতটি সঠিক নয়।

শাদ্দাদ ইবনে আম্মার (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি একবার হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসফা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। ঐ সময় সেখানে আরো কিছু লোক বসেছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তারা তাঁকে ভাল-মন্দ বলছিল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। যখন তারা চলে গেল তখন হযরত ওয়াসিলা (রাঃ) বললেনঃ "তুমিও হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে অসম্মানজনক মন্তব্য করলে?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, আমি তাদের কথায় সমর্থন যোগিয়েছি মাত্র। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ "তাহলে শুনো, আমি যা দেখেছি তা তোমাকে শুনাচ্ছি। একদা আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে জানতে পারি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে গিয়েছেন। আমি তাঁর আগমনের অপেক্ষায় সেখানেই বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আসছেন এবং তাঁর সাথে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইনও (রাঃ) রয়েছেন। হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অঙ্গুলী ধরে ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সামনে বসলেন এবং নাতিদ্বয়কে কোলের উপর বসালেন। একখানা চাদর দ্বারা তাঁদেরকে আবৃত করলেন। অতঃপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! এরাই আমার আহ্লে বায়েত। আর আমার আহ্লে বায়েতই বেশী হকদার।" অন্য রিওয়াইয়াতে নিম্নের কথাটুকু বেশী আছে যে, হযরত ওয়াসিলা (রাঃ) বলেন, আমি এ দেখে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও কি আপনার আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত? উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমিও আমার আহ্লে বায়েতেরই অন্তর্ভুক্ত।" হযরত ওয়াসিলা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর এই ঘোষণা আমার জন্যে বড়ই আশাব্যঞ্জক।"

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত ওয়াসিলা (রাঃ) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম এমন সময় হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় চাদরখানা তাঁদের উপর ফেলে দিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বায়েত। হে আল্লাহ! তাদের হতে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে পবিত্র করে দিন।" আমি বললামঃ আমিও কি? তিনি জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ, তুমিও। নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণের উপর রয়েছো।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমার ঘরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করছিলেন এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) রেশমী কাপড়ের একটি পুঁটলিতে করে কিছু নিয়ে আসলেন। তিনি (নবী সঃ) বললেনঃ "তোমার স্বামীকে ও দুই শিশুকে নিয়ে এসো।" সুতরাং তাঁরাও এসে গেলেন ও খেতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিছানায় ছিলেন। বিছানায় খায়বারের একটি উত্তম চাদর বিছানো ছিল। আমি কামরায় নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তিনি চাদরের ভিতর থেকে হাত দু'টি বের করলেন এবং আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বায়েত ও আমার সাহায্যকারী। আপনি এদের অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং এদেরকে পবিত্র করুন!" আমি আমার মাথাটি ঘর থেকে বের করে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও তো আপনাদের সবারই সাথে রয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি তো সদা কল্যাণের উপর রয়েছো।"[১]

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ "একদা আমার সামনে হযরত আলী (রাঃ)-এর আলোচনা শুরু হলো। আমি বললাম, আয়াতে তাতহীর তো আমার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট এসে বললেনঃ "কাউকেও এখানে আসার অনুমতি দেবে না।" অল্পক্ষণ পরেই হযরত ফাতিমা (রাঃ) আসলেন। কি করে আমি মেয়েকে তাঁর পিতার নিকট যেতে বাধা দিতে পারি? অতঃপর হযরত হাসান (রাঃ) আসলেন। কে নাতিকে তাঁর নানার কাছে যেতে বাধা দেবে? তারপর হযরত হুসাইন (রাঃ)

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এ রিওয়াইয়াতের সনদে আ'তার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং তিনি কি ধরনের বর্ণনাকারী সেটাও বলা হয়নি। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরা বিশ্বাসযোগ্য।

আসলেন। তাঁকেও আমি বাধা দিলাম না। এরপর হযরত আলী (রাঃ) আগমন করলেন। তাঁকেও আমি বাধা দিতে পারলাম না। তাঁরা সবাই যখন একত্রিত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বায়েত। সুতরাং আপনি এদের অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং এদেরকে পবিত্র করুন!" ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন এঁদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করা হলো তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও কি এদের অন্তর্ভুক্ত? কিন্তু আল্লাহ জানেন, তিনি আমার এ প্রশ্নে সন্তোষ প্রকাশ করলেন না। তবে শুধু বললেনঃ "তুমি কল্যাণের দিকেই রয়েছো।"

হাদীসের অন্য ধারাঃ হযরত আতিয়্যাহ তাফাভী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘরে ছিলেন। খাদেম খবর দিলো যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এসেছেন। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ "একটু সরে যাও, আমার আহ্লে বায়েত এসেছে।" একথা শুনে আমি ঘরের এক কোণে সরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিশুদ্বয়কে কোলে নিলেন ও আদর করলেন। একটি হাত তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর রাখলেন এবং আর একটি হাত রাখলেন হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘাড়ের উপর। অতঃপর উভয়কেই তিনি স্নেহ করলেন। তারপর একটি কালো রং এর চাদর সকলের উপর বিছিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে আবৃত করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি, আগুনের দিকে নয়। এরাও আমার আহ্লে বায়েত।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আমিও কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমিও।"[১]

অন্য ধারাঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-এ আয়াতটি আমার বাড়ীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি ঘরের দরজায় বসেছিলাম এমতাবস্থায় আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত নই? জবাবে তিনি বললেনঃ "তুমি কল্যাণের উপর রয়েছো এবং তুমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের একজন।" ঐ সময় আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) অবস্থান করছিলেন।"[২]

১. এ বর্ণনাটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য ধারাঃ হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে তাঁর কাপড়ের নীচে প্রবিষ্ট করেন। অতঃপর তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্কে বলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বায়েত।" তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। তিনি তখন বললেনঃ "তুমিও আমার পরিবারের একজন।"

অন্য হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কালো চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) আসলেন। সকলকেই তিনি তাঁর ঐ চাদরের মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন। তারপর তিনি ...إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ-এ আয়াতটি পাঠ করলেন।"[১]

অন্য ধারাঃ হযরত ইবনে হাওশিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তখন তিনি বলেনঃ তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর বাড়ীতেই তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সবচেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্রী। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উপর কাপড় নিক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহ! এরা আমার আহ্লে বায়েত। সুতরাং আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে পবিত্র করে দিন!" আমি তখন তাঁদের নিকটবর্তী হলাম। অতঃপর বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও কি আপনার আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি জবাবে বললেনঃ "নিশ্চয়ই, জেনে রেখো যে, তুমি কল্যাণের উপর রয়েছো।"[২]

অন্য হাদীসঃ হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

تَطْهِيرًا-এ আয়াতটি আমাদের পাঁচজনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আমি, হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ)।” অন্য সনদে এটা হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তিরূপে বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হয় তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ), তাঁর দুই ছেলে এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে ধরে তাঁর কাপড়ের নীচে প্রবিষ্ট করেন। অতঃপর বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার আহ্লে বায়েত।”[১]

হযরত ইয়াযীদ ইবনে হিব্বান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি, হুসাইন ইবনে সাবরা (রঃ) এবং হযরত উমার ইবনে সালমা (রঃ) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। আমরা তাঁর কাছে উপবেশন করলে হযরত হুসাইন (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ “হে যায়েদ (রাঃ)! আপনি তো বহু কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। সুতরাং হে যায়েদ (রাঃ)! আপনি বহু কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছেন! হে যায়েদ (রাঃ)! আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।” তিনি তখন বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহর কসম! এখন আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানা দূরে চলে গেছে, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি তার কিছু কিছু বিস্মরণ হয়েছি। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই কর এবং তা মেনে নাও। আমাকে তুমি এ ব্যাপারে কষ্ট দিয়ো না। শুনো, মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি পানির জায়গা রয়েছে যার নাম 'খাম'। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেনঃ “আমি একজন মানুষ। খুব সম্ভব আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার নিকট একজন দূত আগমন করবেন। আমি যেন তাঁর কথা মেনে নিই। আমি তোমাদের কাছে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও জ্যোতি রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর ও ওকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।” অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্ণভাবে আকর্ষণ করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ “আমার

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আহ্লে বায়েতের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" তিনবার তিনি একথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হুসাইন (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে যায়েদ (রাঃ)! আহ্লে বায়েত কারা? তাঁর স্ত্রীরা কি আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত নন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তাঁর স্ত্রীরাও আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত বটে, তবে তাঁর আহ্ল তাঁরা যাঁদের উপর তাঁর পরে সাদকা হারাম।" আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাঁরা কারা?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তাঁরা হলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর, হযরত আকীল (রাঃ)-এর বংশধর ও হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ "এঁদের সবারই উপর কি সাদকা হারাম?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ।"[১]

অন্য সনদে বর্ণনা করা হয়েছেঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরাও কি আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত? তিনি জবাব দিলেনঃ "না। আল্লাহর কসম! স্ত্রীরা তো দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সাথে অবস্থান করে। কিন্তু যদি স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সে তার পিত্রালয়ের সদস্যা ও নিজ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্লে বায়েত হবে তাঁর মূল ও আসাবা।[২] তাঁর পরে তাদের উপর সাদকা হারাম।" এ রিওয়াইয়াতে এ রকমই আছে। কিন্তু প্রথম রিওয়াইয়াতটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয়টিতে যা রয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো শুধু ঐ আহ্লে বায়েত যাদের কথা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা সেখানে ঐ آل উদ্দেশ্য যাদের উপর সাদকা হারাম। কিংবা এটাই যে, উদ্দেশ্য শুধু স্ত্রীরাই নয়, বরং তাঁরাসহ তাঁর অন্যান্য آل-ও উদ্দেশ্য। এ কথাটিই বেশী যুক্তিযুক্ত। এর দ্বারা এ বর্ণনা ও পূর্ববর্তী বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে। কুরআন ও পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর মধ্যেও সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে। তবে তখনই তা সম্ভব হবে যখন এ হাদীসগুলোকে সহীহ বলে মেনে নেয়া হবে। কেননা, এগুলোর কোন কোন সনদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

যে ব্যক্তি মা'রেফাতের জ্যোতি লাভ করেছে এবং যাদের কুরআন কারীম সম্পর্কে গবেষণা করার অভ্যাস আছে তারা এক দৃষ্টিতেই এটা অবশ্যই জানতে পারবে যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীরাও নিঃসন্দেহে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা, উপর হতেই প্রসঙ্গটি তাদের সম্পর্কে এবং তাঁদের ব্যাপারেই চলে আসছে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২. যেসব ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত থাকে না, বরং যাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাঁদের অংশ নেয়ার পর বাকী অংশ যারা পায় তাদেরকেই ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলা হয়।

এরপরে মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেনঃ আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

সুতরাং হযরত কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি হিসেবে আল্লাহর আয়াত ও হিকমত দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তাঁরা ছাড়া আর কেউই লাভ করতে পারেনি। তা এই যে, তাঁদের গৃহেই আল্লাহর অহী ও রহমতে ইলাহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর তাঁদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সবচেয়ে বেশী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা, হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিছানা ছাড়া আর কারো বিছানায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অহী আসেনি। এটা এ কারণেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। তাঁর বিছানা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া আর কারো জন্যে ছিল না। সুতরাং তিনি সঠিকভাবেই এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। হ্যাঁ, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীরাই যখন তাঁর আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত তখন তাঁর নিকটাত্মীয়গণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন হাদীসে গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার আহ্লে বায়েত সবচেয়ে বেশী হকদার।"

সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি এসেছে এটা ওর সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যখন لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ (ঐ মসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত) (৯ ঃ ১০৮) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেনঃ هُوَ مَسْجِدِىْ هٰذَا অর্থাৎ "ওটা আমার এই মসজিদ।" কথাটি মসজিদে কুবা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। হাদীসে এটা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "এই মসজিদ বলতে কোন মসজিদকে বুঝানো হয়েছে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী (সঃ)।" সুতরাং যে মর্যাদা মসজিদে কুবার ছিল সে মর্যাদা মসজিদে নববীরও (সঃ) রয়েছে। এ জন্যে এই মসজিদকেও ঐ নামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো। তিনি ঐ সময় নামায পড়ছিলেন। বানী আসাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তি হঠাৎ এসে পড়লো

এবং সিজদারত অবস্থায় তাঁকে ছুরি মেরে দিলো। ছুরিটি তাঁর গোশতের উপর লাগলো। কয়েক ঘন্টা মাত্র তিনি শয্যাগত থাকলেন। যখন একটু সুস্থ হলেন তখন তিনি মসজিদে এলেন এবং মিম্বরের উপর বসে বসে খুৎবা পাঠ করলেন ও বললেনঃ "হে ইরাকবাসী! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। আমি তোমাদের নেতা ও তোমাদের মেহমান। আমি আহ্লে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত। যাঁদের সম্পর্কে إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন এবং বাক্যগুলো বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন। যারা মসজিদে ছিল তারা কাঁদতে লাগলো।

একবার তিনি এক সিরিয়াবাসীকে বলেছিলেনঃ "তুমি কি সূরায়ে আহযাবের আয়াতে তাতহীর তিলাওয়াত করেছো?" সে জবাব দিলোঃ "হ্যাঁ। এর দ্বারা কি আপনাদেরকেই বুঝানো হয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ 'হ্যাঁ।' সে বললোঃ "আল্লাহ তা'আলা বড়ই স্নেহশীল, দয়াময়, সবজান্তা এবং সবকিছুরই খবর তিনি রাখেন। তিনি জানতেন যে, আপনারা তাঁর দয়া ও স্নেহলাভের যোগ্য। তাই তিনি আপনাদেরকে এ নিয়ামতগুলো দান করেছেন।"

সুতরাং তাফসীরে ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবেঃ "হে মুমিনদের মাতা ও নবী (সঃ)-এর স্ত্রীরা! তোমাদের উপর যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তোমরা স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে এমন বাড়ীতে অবস্থান করতে দিয়েছেন যেখানে আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয়। আল্লাহর এসব নিয়ামতের জন্যে তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এখানে হিকমতের অর্থ হাদীস। আল্লাহ তা'আলা শেষ পরিণতিরও খবর রাখেন। তাই তিনি সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারিণী কারা হবেন তা তিনি নির্বাচন করেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোও তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় অনুগ্রহ। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

৩৫- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ

৩৫। অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী সত্যবাদী পুরুষ ও

وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন?" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ "একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার যত্ন করছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলো ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তাঁর কথাগুলো শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে পাঠ করছিলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

অর্থাৎ "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেনঃ অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী।"[১]

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কতিপয় স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলেছিলেন।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, স্ত্রীলোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদেরকে একথা বলেছিলেন।

১. হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদের বর্ণনা করেছেন। অন্য ধারায় ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম ও ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমান ইসলাম হতে পৃথক এবং ঈমান ইসলাম হতে বিশিষ্টতর। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ

অর্থাৎ "আরব মরুবাসীরা বলেঃ আমরা ঈমান আনলাম। (হে মুহাম্মাদ সঃ) তুমি বলঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বলঃ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।"(৪৯ ঃ ১৪)

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না।" আবার এ বিষয়ের উপর সবাই একমত যে, ব্যভিচার দ্বারা মানুষ প্রকৃত কাফের হয়ে যায় না। এটা একটা দলীল যা আমি শরহে বুখারীতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমাণ করেছি।

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ - قُنُوْت শব্দের অর্থ হলো শান্তভাবে আনুগত্য করা। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি কি যে রাত্রিকালে আনুগত্যকারী হয় সিজদাকারী ও দণ্ডায়মানরূপে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের করুণার আশা রাখে?"(৩৯ ঃ ৯) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে সবাই তাঁর অনুগত।"(৩০ ঃ ২৬) আরো একটি জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে মারইয়াম (আঃ)! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' কর।"(৩ ঃ ৪৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ অর্থাৎ "তোমরা আনুগত্যের অবস্থায় আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হও।"(২ ঃ ২৩৮) অতএব বুঝা গেল যে, ঈমানের মর্যাদা ইসলামের উপরে। উভয়ের একত্র মিলনে মানুষের ভিতরে আনুগত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সত্য কথা বলা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আর এ অভ্যাস

সর্বাবস্থাতেই প্রশংসনীয়। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি অজ্ঞতার যুগেও কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। সত্যবাদিতা ঈমানের একটি লক্ষণ। সত্যবাদী লোক পরিত্রাণ পেয়ে থাকে। মানুষের উচিত সব সময় সত্য কথা বলা। সত্যবাদিতা মানুষকে সৎ কাজের ও জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মিথ্যা কথা বলা পরিহার করা উচিত। মিথ্যাবাদিতা মানুষকে অসৎ কাজ এবং ফিস্ক ও ফুজুরের পথ দেখিয়ে থাকে। আর ফিসক ও ফুজুর মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সত্যবাদী লোক যখন সব সময় সত্য কথা বলে, সত্য কাজের প্রচেষ্টা চালায় তখন তার নামটি সিদ্দীকের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী লোক সব সময় মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যার প্রচেষ্টা চালায় বলে তার নামটি আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এ সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে।

সবর বলা হয় বিপদে-আপদে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। তাকদীরের সাথে জড়িয়ে সবরকে লিখার কোন দলীল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে কঠিন সবর বলা হয় মানসিক আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণ করাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে এর প্রতিদান অত্যন্ত বেশী। অতঃপর যখন ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হয় তখন সবর আপনা আপনিই এসে যায়।

خُشُوْع-এর অর্থ হলো শান্তি, সন্তুষ্টি ও অনুরোধ। মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় বিরাজ করে তখন মানুষের মনে এটা আপনা আপনিই এসে পড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সব জায়গায় চির বিরাজমান বলে বিশ্বাস করে তার অন্তরে এটা প্রবেশ করে। তখন সে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করে যে, যেন সে স্বয়ং আল্লাহকে দেখছে। আল্লাহকে দেখছে এ ধারণা যদি করতে না পারে তবে অবশ্যই এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিশ্চয়ই দেখছেন।

সাদকা বলা হয় সেই দানকে যা গরীব-দুঃখীকে দেয়া হয়, যাদের আয়-উপার্জন করার কোন ক্ষমতা নেই। এ ধরনের লোককে নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে দান করাকেই সাদকা বলে। এ নিয়তে দান করলে এটা আল্লাহর আনুগত্য বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে তাঁর সৃষ্টজীব উপকৃত হয়ে থাকে।

হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন যেই দিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এই সাত প্রকারের মধ্যে একটি এও আছে যে, সে যা কিছু দান-খায়রাত করে তা এতো গোপনে করে যে, তার দক্ষিণ হস্ত যা দান

করে বাম হস্ত তা জানতে পারে না। হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, সাদকা দোষগুলোকে মুছে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এ বিষয়ের উপর আরো বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো স্ব-স্ব স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

রোযা সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা শরীরের যাকাত অর্থাৎ এর দ্বারা শরীর পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। আর এটা মন্দ স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেয়।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখার পর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখে সে আসসায়েমূন ও আসসায়েমাতের অন্তর্ভুক্ত। রোযা কাম-শক্তিকে প্রশমিত করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা যেন বিয়ে করে নেয়। যাতে তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী হয় এবং তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পার। আর যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তারা যেন রোযা রাখে। এটা তার জন্যে খাসি হওয়ার সমতুল্য।" এ জন্যে রোযার বিধানের সাথে সাথে মন্দ কর্ম হতে বাঁচবার পথ দেখানো হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ-

অর্থাৎ "এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।"(২৩ঃ ৫-৭)

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ (আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী)– হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয় এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়, ঐ রাত্রে তারা দু'জন وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।"[১]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রাঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি কে হবে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অত্যধিক যিকরকারী ব্যক্তি।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মুজাহিদের চেয়েও কি বেশী?" জবাবে তিনি বললেনঃ "যদিও মুজাহিদ কাফিরের উপর তরবারী চালনা করতে করতে তরবারী ভেঙ্গে ফেলে, আর সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ে তবুও আল্লাহর যিকরকারীর মর্যাদা তার চেয়ে বেশী।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার পথ দিয়ে চলছিলেন। জামদান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেনঃ "এ জায়গাটি জামদান। সামনে চলতে থাকো, কারণ মুফরাদুনরা অগ্রগামী হয়েছে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "মুফরাদুন কারা?" জবাবে তিনি বললেনঃ "আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীরা।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন।" জনগণ বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যেও দু'আ করুন!" এবারও তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে আপনি ক্ষমা করুন!" জনগণ পুনরায় বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা চুল ছেঁটে ফেলেছে তাদের জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করুন!" এবার তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল ছেঁটেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন!"[২]

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা পাওয়ার বড় হাতিয়ার আল্লাহর যিকর ছাড়া আর কিছুই নেই।"[৩]

একবার তিনি বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমলের কথা বলে দিবো না যা তোমাদের জন্যে আল্লাহর পথে স্বর্ণ ও রৌপ্য লুটিয়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম? আর তোমরা শত্রুদের মুকাবিলা করবে, তাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করবে এবং তারাও তোমাদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করবে এর চেয়েও উত্তম? সাহাবীগণ সমস্বরে উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) (আমাদেরকে এই খবর দিন)!" তিনি তখন বললেনঃ "তোমরা মহামহিমান্বিত আল্লাহর যিকর কর।"[৪]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৪. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস আল জুনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "কোন ধরনের মুজাহিদ বড় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকরকারী (সেই সবচেয়ে বড় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য)।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেঃ "কোন রোযাদার বেশী পুণ্য লাভের যোগ্য?" জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেনঃ "যে মহামহিমান্বিত আল্লাহর অধিক যিকরকারী।" তারপর লোকটি নামায, যাকাত, হজ্ব এবং দান-খায়রাতের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করে এবং প্রত্যেকটির ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকরকারী (সেই সবচেয়ে বড় পুণ্য লাভের যোগ্য)।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বললেনঃ "তাহলে তো যিকরকারীরাই সমস্ত কল্যাণ ও পুণ্য নিয়ে গেল?" তাঁর এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই।"[১]

অধিক যিকর সম্পর্কে বাকী যে হাদীসগুলো রয়েছে তা আমরা ইনশাআল্লাহ এই সূরার নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করবো। আয়াতটি হলোঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।"

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই সমুদয় গুণের অধিকারী লোকদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের জন্যে রেখেছেন তিনি মহা প্রতিদান এবং ওটা হলো জান্নাত।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

৩৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর পয়গাম নিয়ে হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর কাছে হাযির হন। তিনি উত্তর দিলেনঃ "আমি তাঁকে বিয়ে করবো না।" তিনি বললেনঃ "এমন কথা বলো না, বরং তার সাথে বিবাহিতা হয়ে যাও।" হযরত যয়নাব (রাঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, আমাকে কিছু সময় দিন, আমি একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি।" এ ধরনের কথাবার্তা চলছে এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল। এটা শুনে হযরত যয়নাব (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি এ বিয়েতে সম্মত আছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ।" তখন হযরত যয়নাব (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে আমারও কোন আপত্তি নেই। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা করবো না। আমি তাঁকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলাম।"

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, বংশ মর্যাদার দিক থেকে হযরত যয়নাব (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ঊর্ধে ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবি মুঈত (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বপ্রথম মুহাজির মহিলা ছিলেন ইনিই। তিনি নবী (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ "আমি আমার নফসকে আপনার নিকট হিবা করলাম।" তিনি উত্তরে বললেনঃ "বেশ, আমি তা কবূল করলাম।" অতঃপর তিনি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব হযরত যয়নাব (রাঃ) হতে পৃথক হওয়ার পর এ বিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ) এ বিয়েতে অসম্মত হলেন এবং তাঁর ভাইও অমত প্রকাশ করলেন। কারণ তাঁদের ইচ্ছা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বিয়ে দেয়ার, তাঁর গোলামের সাথে নয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার করে দিয়ে বলা হয়ঃ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ "নবী (সঃ) মুমিনদের সাথে তাদের নফসের চেয়েও অধিক সম্পর্কযুক্ত।"(৩৩ ঃ ৬) সুতরাং وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াতটি خَاصٌّ বা বিশিষ্ট এবং এর চেয়েও ব্যাপক আয়াত এইটি।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন আনসারীকে বললেনঃ "তুমি জালবীব (রাঃ)-এর সাথে তোমার কন্যার বিয়ে

দিয়ে দাও।" তিনি জবাবে বললেনঃ "ঠিক আছে, আমি তার মায়ের সাথে একটু পরামর্শ করে নিই।" তিনি তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী বললেনঃ "না, হবে না। কারণ তার চেয়ে বড় বড় অমুক অমুক লোকের পয়গাম ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আজ নাকি জালবীব (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিবো?" আনসারী স্ত্রীর কথা শুনে নবী (সঃ)-এর কাছে যাবেন এমন সময় তাঁর মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে সব কথা শুনলো এবং বললোঃ "তোমরা নবী (সঃ)-এর কথা মানবে না? তিনি যখন এ বিয়েতে খুশী তখন তোমাদের এ পয়গাম রদ করা ঠিক হবে না।" তখন তাঁরা উভয়ে বললেনঃ "মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে। এ বিয়ের মাধ্যম যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তখন এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তাঁকে অমান্য করারই শামিল। তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা মোটেই ঠিক নয়। সুতরাং আনসারী সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ "এ বিয়েতে আপনি খুশী আছেন তো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমি এ বিয়েতে খুশী ও সম্মত আছি।" তখন আনসারী বললেনঃ "তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তাই হোক। আপনি বিয়ে দিয়ে দিন।" সুতরাং বিয়ে হয়ে গেল।

একদা মদীনার মুসলমানরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এ যুদ্ধে হযরত জালবীব (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। তিনি বহু কাফিরকে হত্যা করেছিলেন যাদের মৃতদেহ তাঁরই পার্শ্বে পড়েছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি দেখেছি যে, তাঁর বাড়ী সদা আনন্দমুখর থাকতো। সারা মদীনায় তাঁর মত খরচকারী লোক আর ছিল না।"

অন্য রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "হযরত জালবীব (রাঃ) বড়ই আমোদী লোক ছিলেন। এ জন্যে আমি আমার বাড়ীর লোকদেরকে বলে দিয়েছিলামঃ "এ লোকটি যেন তোমাদের কাছে না আসে। আনসারীদের অভ্যাস ছিল এই যে, তাঁরা কোন স্ত্রী লোককে বিয়ে করতেন না যে পর্যন্ত না তাঁরা জানতে পারতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সম্পর্কে কিছু বলেননি।" অতঃপর এ ঘটনাটি শুনালেন যা উপরে বর্ণিত হলো। তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত জালবীব (রাঃ) এ যুদ্ধে সাতজন কাফিরকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর কাফিররা তাঁকে ভীড়ের মধ্যে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে তাঁর কাছে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে তিনি বললেনঃ "এ ব্যক্তি সাতজন কাফিরকে হত্যা করে শহীদ হয়েছে। এ আমার এবং আমি তার।" তিনি দু'বার বা তিনবার একথাটি বললেন। অতঃপর

কবর খনন করিয়ে নিজ হাতে তাঁকে তিনি কবরে নামালেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র হাতই ছিল তাঁর জানাযা। অন্য কোন খাট-খাটুলী ছিল না। তাঁকে গোসল দেয়া ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। আর যে সতী-সাধ্বী মহিলাটি তাঁর পিতা-মাতাকে বুঝিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জন্যে দু'আ করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি এ মহিলার উপর করুণা বর্ষণ করুন! তার জীবনের যাবতীয় স্বাদ পূর্ণ করে দিন!" সমস্ত আনসারীর মধ্যে তাঁর ন্যায় অধিক খরচকারিণী আর কেউ ছিল না। যখন সে পর্দার আড়াল থেকে পিতা-মাতাকে উপরোক্ত কথা বলেছিল ঐ সময় ..وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ-এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

হযরত তাউস (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আসরের নামাযের পর দু'রাকাত (নফল) নামায পড়া যায় কি?" উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিষেধ করেন এবং ... وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। সুতরাং এ আয়াতটি শানে নুযূলের দিক দিয়ে বিশিষ্ট হলেও হুকুমের দিক দিয়ে সাধারণ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশ থাকা অবস্থায় না কেউ ঐ হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে, না ওটা মানা বা না মানার কারো কোন অধিকার থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

অর্থাৎ "কিন্তু না, তোমাদের প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।"(৪ ঃ ৬৫)

হাদীসে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার অনুগত হয়।" যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা করে তারা প্রকাশ্যে পাপী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

অর্থাৎ "যারা নবী (সঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করে তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে এর থেকে তাদের সতর্ক থাকা ও ভয় করা উচিত।"(২৪ঃ ৬৩)

٣٧- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭। স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলতেছিলেঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রাখছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেনঃ তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন তার (যয়নাবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁর উপর

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী ছিল। তাঁকে তিনি ইসলাম ও নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করেছিলেন। তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁকে তিনি গোলামী হতে মুক্তি দান করেছিলেন। তিনি বড়ই জাঁকজমকপূর্ণ লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কি সমস্ত মুসলমান তাঁকে حُبُّ الرَّسُوْلِ 'রাসূলের প্রিয়' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত উসামা (রাঃ)-কে حُبُّ مِنْ حُبٍّ 'প্রিয়ের প্রিয়' নামে সবাই সম্বোধন করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্থানে সৈন্য পাঠালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকেই দলের নেতা মনোনীত করতেন। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তবে তাঁকেই হয়তো তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত করে যেতেন।

হযরত উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি এক সময় মসজিদে অবস্থান করছিলাম এমন সময় আমার কাছে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) আসলেন ও বললেনঃ "যান, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে আমাদের জন্যে অনুমতি নিয়ে আসেন।" আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তারা কি জন্যে এসেছে তা তুমি জান কি?" আমি উত্তর দিলামঃ জ্বি না। তখন তিনি বললেনঃ "আমি কিন্তু জানি। যাও, তাদেরকে ডেকে আনো।" তাঁরা এলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বলুন তো, আপনার পরিবারে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে?" তিনি জবাবে বললেনঃ "আমার কন্যা ফাতিমা (রাঃ)।" তাঁরা বললেনঃ "আমরা হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করিনি।" তখন তিনি বললেনঃ "উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ), যাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করেছেন এবং আমিও যার প্রতি স্নেহশীল।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ফুফু উমাইমা বিনতে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ)-এর কন্যা হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ আসাদিয়্যা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর (যায়েদ রাঃ -এর) বিয়ে দিয়েছিলেন। মোহর হিসেবে দশ দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও সাত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করেছিলেন। আর দিয়েছিলেন একখানা শাড়ী, একখানা চাদর এবং একটি জামা। আরো দিয়েছিলেন পঞ্চাশ মুদ্দ (ওযন বিশেষ) শস্য ও দশ মুদ্দ খেজুর। এক বছর অথবা তা থেকে কিছু কম-বেশী সময়ের মধ্যে নিজ সংসার তিনি গুছিয়ে নিয়েছিলেন। পরে তাঁদের মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। হযরত যায়েদ (রাঃ) গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেন। তিনি

তাঁকে বুঝিয়ে বললেনঃ "সংসার ভেঙ্গে দিয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।" এই জায়গায় ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) সঠিক নয় এরূপ বহু 'আসার' বর্ণনা করেছেন, যেগুলো বর্ণনা করা উচিত নয় মনে করে আমরা ছেড়ে দিলাম। কেননা ওগুলোর মধ্যে একটিও প্রমাণিত ও সঠিক নয়। মুসনাদে আহমাদেও হযরত আনাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত রয়েছে। কিন্তু তাতেও বড়ই অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। এ জন্যে আমরা ওটাও বর্ণনা করলাম না।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হবেন একথা পূর্বে আল্লাহ তাঁকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথাটি প্রকাশ করেননি। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বুঝিয়ে বলেছিলেনঃ "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় কর।" তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ "তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যদি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর উপর অহীকৃত কিতাবুল্লাহর কোন আয়াত গোপন করতেন তবে অবশ্যই وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ ...-এ আয়াতটিই গোপন করতেন।"[১]

وَطَر শব্দের অর্থ হলো প্রয়োজন। ভাবার্থ হচ্ছেঃ যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মন ভেঙ্গে গেল এবং বহু বুঝানোর পরেও তাঁদের মনোমালিন্য কাটলো না, বরং তালাক হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত যয়নাব (রাঃ)-কে স্বীয় নবী (সঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। এজন্যে অলী, প্রস্তাব-সমর্থন, মহর এবং সাক্ষীদের কোন প্রয়োজন থাকলো না।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যখন হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি যাও এবং তাকে আমার বিবাহের পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও।" হযরত যায়েদ (রাঃ) গেলেন। ঐ সময় হযরত যয়নাব (রাঃ) আটা ঠাসছিলেন। হযরত যায়েদ

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(রাঃ)-এর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সামনে থেকে তাঁর সাথে কথা বলতে পারলেন না। বরং তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রস্তাব শুনিয়ে দিলেন। হযরত যয়নাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "থামুন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিখারা (লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ বিচার) করে নিই।" অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। আর এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ হলো এবং তাঁকে বলা হলোঃ "আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম।" সুতরাং নবী (সঃ) কোন খবর না দিয়ে সেখানে চলে গেলেন। ওলীমার দাওয়াতে তিনি সাহাবীদেরকে গোশত ও রুটি খাওয়ালেন। সব লোক খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। কতিপয় লোক সেখানে বসে থেকে খোশ-গল্পে মত্ত হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হয়ে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট গেলেন। তিনি তাঁদেরকে সালাম দিচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! বলুন, আপনি আপনার স্ত্রীকে (যয়নাব রাঃ-কে) কিরূপ পেয়েছেন?" বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "লোকেরা তাঁর বাড়ী হতে চলে গেছে এ খবর আমি তাঁকে দিলাম কি অন্য কারো মাধ্যমে তাঁকে এ খবর দেয়া হলো তা আমার জানা নেই। এরপর তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। আমি তাঁর সাথে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি পর্দা ফেলেদিলেন। ফলে আমার ও তাঁর মধ্যে আড় হয়ে গেল। ঐ সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং তিনি সাহাবীদের যা উপদেশ দেয়ার তা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা নবী (সঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করো না।"(৩৩ ঃ ৫৩)[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যয়নাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে গর্ব করে বলতেনঃ "তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশরা। আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সূরায়ে নূরের তাফসীরে আমরা এ রিওয়াইয়াতটি বর্ণনা করেছি যে, হযরত যয়নাব (রাঃ) বলেছিলেনঃ "আমার বিবাহ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।" তাঁর একথার জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমার নিষ্কলুষতা ও সতীত্বের আয়াতগুলো আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।" হযরত যয়নাব (রাঃ) তাঁর একথা স্বীকার করে নেন।

হযরত শা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত যয়নাব (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার মধ্যে তিনটি বিশেষত্ব রেখেছেন যা আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে নেই। প্রথম এই যে, আমার নানা ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় এই যে, আপনার সাথে আমার বিবাহ আল্লাহ তা'আলা আকাশে পড়িয়েছেন। আর তৃতীয় হলো এই যে, আমাদের মাঝে সংবাদবাহক ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)।"[১]

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তার সাথে তোমার বিবাহ বৈধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলেই সেই সব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আরবে এ প্রথা চালু ছিল যে, পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করা বৈধ নয়। এ আয়াত দ্বারা তাদের ঐ কু-প্রথাকে উঠিয়ে দেয়া হলো। কারণ আরব দেশে এ ধরনের পুত্র বহু বাড়ীতে বিদ্যমান ছিল। হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর জন্যে এ গৌরব প্রথম থেকেই আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র ও সতী-সাধ্বী স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৩৮- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝

৩৮। আল্লাহ নবী (সঃ)-এর জন্যে যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্যে কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ পোষ্যপুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করা যখন বৈধ কাজ তখন এ কাজ যদি নবী (সঃ) করেন তাহলে তাতে দোষ কি? তাতে কোন দোষ নেই। পূর্ববর্তী নবীদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করতেন ওর উপর আমল করায় তাঁদের কোন দোষ ছিল না। এখানে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য মুনাফিকদের ঐ কথার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলতো যে, নবী (সঃ) তাঁর ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। আল্লাহর আইন অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনই হয় না।

৩৯। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আর আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করতো না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

٣٩- الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৪০। মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٤٠- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ ع

এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের (নবীদের) প্রশংসা করছেন যাঁরা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন। তাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করেন না। কোন ভীতি-বিহ্বল কাজে অথবা কারো প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহানুভূতিই যথেষ্ট।

এই পদ ও দায়িত্ব পালনে সবারই নেতা, এমন কি প্রত্যেক কাজে-কর্মে ও প্রতিটি বিষয়ে সবারই সর্দার বা নেতা হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, পূর্বে ও পশ্চিমে সমস্ত বানী আদমের কাছে আল্লাহর

দ্বীনের প্রচার করেছেন তিনিই। যতদিন আল্লাহর এই দ্বীন চারদিকে ছড়িয়ে না পড়েছে ততদিন তিনি বরাবরই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের ব্যাপারে সদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। তাঁর পূর্বে যেসব নবী-রাসূল এসেছিলেন তাঁরা নিজ নিজ জাতির জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এসেছিলেন সারা দুনিয়ার জন্যে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।"(৭ ঃ ১৫৮)

তাঁর পরে এ দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উম্মতের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। তাঁর পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাঁরা যা কিছু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে শিখেছিলেন তা তাঁদের পরবর্তীদের শিখিয়ে দেন। তাঁরা সমস্ত কাজ ও কথা, পরিস্থিতি, রাত-দিনের সফর, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু তুলে ধরেছেন। সুতরাং তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। পরবর্তী লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে এগুলো প্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের ওয়ারিশ হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন এভাবেই ছড়াতে থাকে। কুরআন ও হাদীস জনগণের কাছে পৌঁছতে থাকে। হিদায়াত প্রাপ্তরা তাঁদের অনুসরণ করে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠেন। যাঁরা ভাল কাজ করার তাওফীক লাভ করেছেন তাঁরা তাঁদের মাসলাকের বা চলার পথের উপর চলতে থাকেন। করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদেকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন নিজেকে লাঞ্ছিত না করে যে সে কাউকে শরীয়ত বিরোধী কাজ করতে দেখেও নীরব তাকে। (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেনঃ "এ ব্যাপারে কিছু বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল"? সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে ভয় করতাম।" তখন আল্লাহ বলবেনঃ "আমাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করা উচিত ছিল।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করছেন যে, এরপরে যেন যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (সঃ) বলা না হয়। অর্থাৎ তিনি যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা নন। যদিও তিনি তাঁকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেননি। কাসেম, তাইয়েব ও তাহের নামক তার তিনটি পুত্র সন্তান হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভজাত ছিলেন। কিন্তু তিনজনই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। হযরত মারিয়াহ কিবতিয়াহ (রাঃ)-এর গর্ভজাত একটি পুত্র সন্তান ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ইবরাহীম। তিনি দুগ্ধ পান অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভজাত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চার কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেন হযরত যয়নাব (রাঃ), হযরত রুকাইয়া (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেছিলেন। শুধুমাত্র হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ইন্তেকালের ছয় মাস পরে ইন্তেকাল করেছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বরং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেছেনঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কোথায় রাখবেন তা তিনি খুব ভাল জানেন।"(৬ ঃ ১২৫) সুতরাং এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই। আর তাঁর পরে যখন কোন নবী নেই তখন তাঁর পরে কোন রাসূলও যে নেই তা বলাই বাহুল্য। রিসালাত তো নবুওয়াত হতে বিশিষ্ট। প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। তিনি যে খাতামুন নাবীঈন তা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারাও প্রমাণিত।

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "নবীদের মধ্যে আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি বাড়ী তৈরী করলো এবং ওটা পূর্ণরূপে ও উত্তমভাবে নির্মাণ করলো, কিন্তু তাতে একটা ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিলো। সেখানে কিছুই করলো না। লোকেরা চারদিক থেকে তা দেখতে লাগলো এবং ওর নির্মাণকার্যে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করলো। কিন্তু তারা বলতে লাগলোঃ 'যদি এ স্থানটি খালি না থাকতো তবে আরো কত সুন্দর হতো!' সুতরাং নবীদের মধ্যে আমি ঐ নবী যিনি ঐ স্থানটি পূর্ণ করে দিয়েছেন।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান সহীহ বলেছেন।

অপর একটি হাদীসঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “রিসালাত ও নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে আর কোন রাসূল বা নবী আসবে না।” সাহাবীদের কাছে তাঁর একথাটি খুবই কঠিন বোধ হলো। তখন তিনি বললেনঃ “কিন্তু সুসংবাদ দানকারীরা থাকবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সুসংবাদদাতা কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “মুসলমানদের স্বপ্ন, যা নবুওয়াতের একটি অংশ বিশেষ।”[১]

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার দৃষ্টান্ত ও নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে একটি ঘর বানালো এবং পূর্ণ ও সুন্দর করে বানালো। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিলো। সুতরাং যেই সেখানে প্রবেশ করে ও ওর দিকে তাকায় সেই বলেঃ ‘এটা কতইনা সুন্দর! যদি এই ইট পরিমাণ জায়গাটি ফাঁকা না থাকতো!’ আমি ঐ খালি স্থানের ইট। আমার মাধ্যমে নবীদের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে।”[২]

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার দৃষ্টান্ত ও নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করলো এবং পূর্ণভাবে করলো, কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিলো। অতঃপর আমি আগমন করলাম ও ঐ ইট পরিমাণ খালি জায়গাটি পূর্ণ করে দিলাম।”[৩]

আর একটি হাদীসঃ হযরত আবূ তোফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার পরে কোন নবী নেই। তবে সুসংবাদ বহনকারী বিদ্যমান থাকবে।” জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সুসংবাদ বহনকারী আবার কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “উত্তম ও ভাল স্বপ্ন।”

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার ও নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যে একটি ঘর নির্মাণ করলো এবং তা পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে নির্মাণ করলো। কিন্তু একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দিলো। তখন চতুর্দিক হতে লোকেরা এ ঘরটি দেখতে আসলো এবং তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। অতঃপর লোকটিকে তারা জিজ্ঞেস করলোঃ 'এখানে তুমি কেন ইট রাখোনি? এখানে ইট দিলে তো তোমার এ দালানটি পূর্ণ হতো?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আমিই ঐ ইট।"[১]

আর একটি হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে সমস্ত নবীর উপর ফযীলত দান করা হয়েছে। প্রথমঃ আমাকে জামে' কালিমাত বা ব্যাপক ও সার্বজনীন কথা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ঃ প্রভাব বা গাম্ভীর্য দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তৃতীয়ঃ আমার জন্যে গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। চতুর্থঃ আমার জন্যে সারা দুনিয়াকে মসজিদ ও অযুর স্থানরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চমঃ সমস্ত সৃষ্টির নিকট আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে। ষষ্ঠঃ আমার দ্বারা নবী আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ করা হয়েছে।"[২]

আর একটি হাদীসঃ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট আমি নবীদেরকে শেষকারীরূপে ছিলাম ঐ সময় যখন হযরত আদম (আঃ) পূর্ণরূপে সৃষ্ট হননি।"

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "নিশ্চয়ই আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (সঃ), আমি আহমাদ (সঃ), আমি মাহী। আমার কারণে আল্লাহ তা'আলা কুফরীকে মিটিয়ে দিবেন। আমি হাশের। আমার পায়ের উপর দিয়ে জনগণকে উঠানো ও একত্রিত করা হবে। আমি আকেব। আমার পরে আর কোন নবী হবে না।"[৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে এমনভাবে আসলেন যেন তিনি আমাদের থেকে

---

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা আবদুর রাযযাকের হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।

৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীসটিকে তাখরীজ করা হয়েছে।

বিদায় গ্রহণকারী। তিনি তিনবার বললেনঃ “আমি মুহাম্মাদ (সঃ) নিরক্ষর নবী। আমার পরে কোন নবী নেই। আমাকে ব্যাপক ও সার্বজনীন কালেমা প্রদান করা হয়েছে। আমি সর্ববিজয়ী ও পরিপূর্ণ জ্ঞানী। জাহান্নামের দারোগা যত আছে, আরশ বহনকারী ফেরেশতা যতজন আছেন তাঁদেরকে আমার সমস্ত উম্মতের সাথে পরিচিত করা হয়েছে। আমি যতদিন তোমাদের সাথে আছি আমার কথা মেনে চলো। যখন আমি তোমাদের মধ্য থেকে বিদায় গ্রহণ করবো তখন তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আল্লাহর কিতাব যা হালাল করেছে তাকে হালাল জানবে এবং যা হারাম করেছে তা হারাম বলে মেনে নেবে।” এ বিষয়ের উপর আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ ব্যাপক রহমতের জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণে আমাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ নবী (সঃ)-কে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর হাতে সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ স্বীয় কিতাবে এবং বিশ্ব শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মুতাওয়াতির হাদীসে এ খবর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব তাঁর পরে যদি কেউ নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী করে তবে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। যদিও সে ফন্দী করে, যাদু করে, বড় বড় জ্ঞানীদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখিয়ে দেয়, বিভিন্ন প্রকারের ডিগবাজী প্রদর্শন করে, তবুও জ্ঞানীরা অবশ্যই জানে যে, এ সবই প্রতারণা ও চালাকী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়ামনের নবুওয়াতের দাবীদার আনসী ও ইয়ামামার নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামা কাযযাবকে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তারা যা করেছিল তা দেখে দুনিয়াবাসী তাদেরকে ধরে ফেলেছিল। তাদের আসল রূপ জনগণের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরও ঐ অবস্থাই হবে যারা এ ধরনের মিথ্যা দাবী নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির কাছে হাযির হবে। এমনকি সর্বশেষে আসবে মাসীহ্ দাজ্জাল। তার চিহ্নসমূহ দেখে প্রত্যেক আলেম এবং প্রত্যেক মুমিন সে যে মিথ্যাবাদী তা জেনে নেবে। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটা অশেষ মেহেরবানী। এ ধরনের মিথ্যা দাবীদারদের এ নসীবই হয় না যে, তারা পুণ্যের আহকাম জারী করে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অবশ্য যে কাজের তার উদ্দেশ্য হবে তাতে সে সিদ্ধিলাভ করবে। তার কথা ও কাজ ধোঁকা ও প্রতারণামূলকই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ - تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ -

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে খবর দেবো কি যাদের কাছে শয়তানরা এসে থাকে? তারা প্রত্যেক ধোঁকাবাজ, পাপীর কাছে আসে।"(২৬ ঃ ২২১-২২২)

সত্য নবীদের ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা পুণ্যময় সঠিক হিদায়াত দানকারী। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁদের কথা ও কাজ পুণ্য বিজড়িত। তাঁরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। মু'জিযা বা অলৌকিক কাজের দ্বারা তাঁদের সত্যবাদিতা প্রকাশিত হয়। তাঁদের নবুওয়াতের উপর এমন সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল থাকে যে, সুস্থির মন তাঁদের নবুওয়াতকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবীর উপর কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ ও সালাম নাযিল করতে থাকুন!

৪১। হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে,

٤١- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

৪২। এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

٤٢- وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

৪৩। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনবার জন্যে, এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٣- هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

৪৪। যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান।

٤٤- تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا

বহু প্রকারের নিয়ামতদাতা আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ আমাকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করা তোমাদের উচিত। তাছাড়াও তিনি আরো বহু প্রকারের নিয়ামত প্রদানের ওয়াদা করেছেন। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে উত্তম কাজ, পবিত্র আমল, সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের পুণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা অপেক্ষা অধিক উত্তম এবং জিহাদ হতে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন কাজের কথা বলবো না?" সাহাবীগণ বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেটা কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ।"[১] وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ-এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এমন এক দু'আ শুনেছি যা আমি কখনো পরিত্যাগ করি না। তা হলোঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আপনার উপদেশের অনুসরণকারী, আপনার অধিক যিকরকারী এবং আপনার অসিয়তের অধিক হিফাযতকারী বানিয়ে দিন।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, দু'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করলো। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পেলো ও ভাল কাজ করলো।" দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের উপর ইসলামের বিধান তো অনেক রয়েছে। আমাকে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বিধান বাতলিয়ে দিন যার সাথে আমি সদা লেগে থাকবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সদা-সর্বদা তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র কর, এমনকি জনগণ তোমাদেরকে পাগল বলে ফেলে।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র কর, শেষ পর্যন্ত যেন মুনাফিকরা বলতে শুরু করে যে, তোমরা লোক দেখানো যিক্‌র করছো।"[২]

হযরত আবদুল্লহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে কওম এমন মজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্‌র হয় না, তারা কিয়ামতের দিন এ জন্যে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে।"[৩]

اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক ফরয কাজের একটা সীমা আছে এবং বিশেষ ওজর বশতঃ তা মাফও করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর যিক্‌রের কোন সীমা নেই। কোন সময়েই তা সঙ্গ ছাড়া হয় না। তবে কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তবে সেটা অন্য কথা। দাঁড়িয়ে, বসে, রাত্রে, দিবসে, স্থলে, পানিতে, বাড়ীতে, সফরে, ধনী অবস্থায় ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায় ও অসুস্থ অবস্থায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে, মোটকথা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে হবে। তুমি যখন এগুলো করতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন। আর ফেরেশতারাও তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন।

এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস ও আসার রয়েছে। এই আয়াতেও খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করার হিদায়াত করা হয়েছে। অনেকে আল্লাহর যিক্‌র ও অযীফা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যেমন ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম মামারী (রঃ) প্রমুখ। এগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের উপর সর্বোত্তম কিতাব হচ্ছে ইমাম নববী (রঃ)-এর লিখিত কিতাব।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

অর্থাৎ “আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে। তাঁরই জন্যে প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং বিকালে ও যোহরের সময়।”(৩০ ঃ ১৭-১৮)

অতঃপর এর ফযীলত বর্ণনা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্যে মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা তাঁর যিক্‌র হতে উদাসীন থাকবে? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ - فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ -

অর্থাৎ “যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মধ্য হতে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছি যে তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে থাকে ও তোমাদেরকে (পাপ হতে) পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো, এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”(২ ঃ ১৫১-১৫২)

নবী (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি, আর যে আমাকে কোন জামাআত বা দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে এমন জামাআতের মধ্যে স্মরণ করি যা তার জামাআত হতে উত্তম।”

صَلٰوة শব্দটি যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ওর অর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর ফেরেশতাদের সামনে বর্ণনা করেন। অন্য কেউ বলেছেন যে, صَلٰوة শব্দটি আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে ওর অর্থ হবে রহমত। এ দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আর صَلٰوة শব্দটি

ফেরেশতাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হলে তখন অর্থ হবে মানুষের জন্যে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ...

অর্থাৎ "আরশ বহনকারীরা ও ওর আশে-পাশে অবস্থানকারীরা তাদের প্রতিপালকের মহিমা কীর্তন করে ও তাঁর উপর ঈমান আনে এবং মুমিন বান্দাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপানি প্রত্যেক জিনিসকে রহমত ও ইলম দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন যারা তাওবা করে ও আপনার পথে চলে। তাদেরকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন এবং জান্নাতে আদনে প্রবিষ্ট করুন যার ওয়াদা আপনি তাদের সাথে করেছেন। আর তাদের সাথে তাদেরকেও পৌঁছিয়ে দিন যারা তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে সৎকর্মশীল নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। আর তাদেরকে মন্দ ও অসৎ কাজ হতে বাঁচিয়ে নিন।"(৪০ ঃ ৭-৯)

এই দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে মুমিন বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ স্বীয় রহমত বর্ষণ করেন। তাদেরকে তিনি অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের দিকে আনয়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং আখিরাতে তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি ও কঠিন শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিবেন। ফেরেশতারা বারবার মুমিনদের কাছে এসে তাদেরকে সুসংবাদ দেন। তাদেরকে তাঁরা বলেনঃ "তোমরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছো এবং জান্নাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছো।" এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। ঐ সময় রাস্তার উপর একটি ছোট

ছেলে ছিল। একটি দল আসছে দেখে ছেলেটির মা ভয় পেয়ে গেল এবং আমার ছেলে আমার ছেলে বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসলো এবং ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে একদিকে সরে গেল। ছেলের প্রতি মায়ের এই স্নেহ ও মমতা দেখে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মা কি এই ছেলেটিকে আগুনে ফেলতে পারে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে বললেনঃ "না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন না।"[১]

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বন্দিনী নারীকে দেখেন যে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা মাত্রই উঠিয়ে নিলো এবং বুকে লাগিয়ে দিয়ে দুধ পান করাতে শুরু করলো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "আচ্ছা বল তো, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মহিলাটি তার এই ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতটা স্নেহশীল ও দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু।"[২]

মহান আল্লাহর উক্তিঃ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ -

অর্থাৎ "পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবেঃ 'সালাম'।" (৩৬ ঃ ৫৮) কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ পরকালে মুমিনরা যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তারা একে অপরকে সালাম দেবে। ইবনে জারীর (রঃ) এ উক্তিটি পছন্দ করেছেন। আমি বলিঃ এই উক্তির স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "সেখানে তাদের ধ্বনি হবে– হে আল্লাহ! আপনি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবেঃ 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে– প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।"(১০ ঃ ১০)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান। অর্থাৎ জান্নাত এবং ওর সমুদয় ভোগ্যবস্তু যেগুলো তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পানাহারের দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র, বাসস্থান, স্ত্রী, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকন ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এগুলোর ধ্যান-ধারণা মানুষ করতেই পারে না। এগুলো এমনই যে, মানুষ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি।

৪৫। হে নবী (সঃ)! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।

٤٥- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۝

৪৬। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।

٤٦- وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝

৪৭। তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ।

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

৪৮। আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনো না; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করো এবং নির্ভর করো আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং

তাঁকে বললামঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে আমাকে তার খবর দিন। উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, কুরআন কারীমে তাঁর যে বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে তারই কতক অংশ তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। তাওরাতে রয়েছেঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদেরকে তুমি সতর্ক করবে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কঠোর চিত্ত ও কর্কশভাষী নও। তুমি বাজারে গোলমাল ও চীৎকার করে বেড়াও না। তুমি মন্দকে মন্দ দ্বারা দূরীভূত কর না। বরং তুমি ক্ষমা ও মাফ করে থাকো। আল্লাহ তোমাকে কখনো উঠিয়ে নিবেন না যে পর্যন্ত না তুমি মানুষের বক্রকৃত দ্বীনকে সোজা করবে। আর তারা যে পর্যন্ত না বলবেঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। যার দ্বারা অন্ধের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে যাবে, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং মোহরকৃত অন্তর খুলে যাবে।"[১]

হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে শুইয়া (আঃ) নামক একজন নবীর নিকট অহী করলেনঃ "তুমি তোমার কওম বানী ইসরাঈলের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখের ভাষায় আমার কথা বলবো। আমি অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মধ্যে একজন নিরক্ষর নবীকে পাঠাবো। সে না বদ স্বভাবের হবে, না কর্কশভাষী হবে। সে হাটে-বাজারে হট্টগোল সৃষ্টি করবে না। সে এতো শান্ত-শিষ্ট হবে যে, জ্বলন্ত প্রদীপের পার্শ্ব দিয়ে সে গমন করলেও প্রদীপটি নিভে যাবে না। যদি সে বাঁশের উপর দিয়েও চলে তবুও তাতে তার পায়ের শব্দ হবে না। আমি তাকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করবো। সে সত্যভাষী হবে। আমি তার সম্মানার্থে অন্ধের চক্ষু খুলে দিবো, বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে এবং দাগ ও কালিমাযুক্ত অন্তরকে পরিষ্কার করে দিবো। আমি তাকে প্রত্যেক ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করবো। সমস্ত ভাল স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। লোকের অন্তর জয়কারী হবে তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সৎ কাজ করা তার প্রকৃতিগত বিষয় হবে। তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে। তার কথাবার্তা হবে হিকমত পূর্ণ। সত্যবাদিতা ও অঙ্গীকার পালন হবে তার স্বভাবগত বিষয়। ক্ষমা ও সদাচরণ হবে তার চরিত্রগত গুণ। সত্য হবে তার শরীয়ত। তার স্বভাব-চরিত্রে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা। হিদায়াত হবে তার কাম্য। ইসলাম হবে

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তার মিল্লাত। তার নাম হবে আহমাদ (সঃ)। তার মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করবো, মূর্খদেরকে বিদ্বান বানিয়ে দিবো। অধঃপতিতকে করবো মর্যাদাবান। অপরিচিতকে করবো খ্যাতি সম্পন্ন ও সকলের পরিচিত। তার কারণে আমি রিক্ত হস্তকে দান করবো প্রচুর সম্পদ। ফকীরকে বানিয়ে দিবো বাদশাহ। কঠোর হৃদয়ের লোকের অন্তরে আমি দয়া ও প্রেম-প্রীতি দিয়ে দিবো। মতভেদকে ইত্তেফাকে পরিবর্তিত করবো। মতপার্থক্যকে করে দিবো একমত। তার কারণে আমি দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করবো। সমস্ত উম্মত হতে তার উম্মত হবে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা সম্পন্ন। মানব জাতির উপকারার্থে তাদের আবির্ভাব ঘটবে, তারা সৎ কার্যের নির্দেশ দান করবে ও মন্দ কার্যে বাধা দেবে। তারা হবে একত্ববাদী মুমিন ও নিষ্ঠাবান। পূর্ববর্তী নবীদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তারা মেনে নেবে। তারা মসজিদে, মজলিসে, চলা-ফেরাতে এবং উঠা-বসাতে আমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী হবে। তারা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ও বসে নামায পড়বে। আল্লাহর পথে দলবদ্ধ ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক আমার সন্তুষ্টির অন্বেষণে ঘরবাড়ী ছেড়ে জিহাদের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকবে। অযু করার জন্যে তারা মুখ-হাত ধৌত করবে। পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত তারা কাপড় পরিধান করবে। আমার কিতাব তাদের বুকে বাঁধা থাকবে। আমার নামে তারা কুরবানী করবে। তারা হবে রাত্রে আবেদ এবং দিনে মুজাহিদ। এই নবীর আহ্লে বায়েত ও সন্তানদের মধ্যে আমি অগ্রগামী, সত্যের সাধক, শহীদ ও সৎ লোকদেরকে সৃষ্টি করবো। তারপরে তার উম্মত দুনিয়ায় সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করতে থাকবে এবং ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করবে। তাদেরকে যারা সাহায্য করবে তাদেরকে আমি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবো। পক্ষান্তরে তাদের যারা বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং অমঙ্গল কামনা করবে তাদের জন্যে আমি খুব মন্দ দিন আনয়ন করবো। আমি এই নবীর উম্মতকে নবীর ওয়ারিশ বানিয়ে দিবো। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে আহ্বানকারী হবে। তারা ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ঐ ভাল কাজ আমি তাদের হাতেই সমাপ্ত করাবো, যা তারা শুরু করেছিল। এটা আমার অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ আমি যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকি এবং আমি বড় অনুগ্রহশীল।”[১]

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاَ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঐ সময় যখন তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা করে পাঠাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমরা দু'জন যাও, সুসংবাদ শুনাবে, ঘৃণা উৎপাদন করবে না, সহজ পন্থা বাতলাবে, তাদের প্রতি কঠোর হবে না। কেননা, আমার প্রতি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে– 'হে নবী (সঃ)! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।' অর্থাৎ তুমি তোমার উম্মতের উপর সাক্ষী হবে, জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম হতে সতর্ককারী হবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে এই সাক্ষ্যদানের দিকে আহ্বানকারী হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং কুরআনের মাধ্যমে উজ্জ্বল প্রদীপ হবে।" সুতরাং আল্লাহ তা'আলার উক্তি شَاهِدًا বা সাক্ষী দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী হওয়াকে। আর কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের আমলের উপর সাক্ষী হবেন। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا অর্থাৎ "তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো।"(৪ ঃ ৪১) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অর্থাৎ "যেন তোমরা (উম্মতে মুহাম্মাদী সঃ) লোকদের (অন্যান্য নবীদের উম্মতের) উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল (সঃ) তোমাদের উপর সাক্ষী হন।"(২ ঃ ১৪৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরদেরকে জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী। আর তুমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বানকারী। তোমার সত্যতা ঐ রকম সুপ্রতিষ্ঠিত যেমন সূর্যের আলো সুপ্রতিষ্ঠিত। যদি কোন হঠকারী লোক অকারণে হঠকারিতা করে তবে সেটা অন্য কথা।

এরপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মেনে নিয়ো না, বরং তাদের কথা ছেড়ে দাও। আর তারা যে তোমাকে কষ্ট দেয় ও তোমার প্রতি নির্যাতন করে সেটা তুমি উপেক্ষা কর, ওটাকে কিছুই মনে করো না, বরং আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হও। কর্মবিধায়করূপে তিনিই যথেষ্ট।

٤٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৯। হে মুমিনরা! তোমরা মুমিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

এই আয়াতে অনেকগুলো হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু বিবাহ বন্ধনের পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। এর প্রমাণ হিসেবে এর চেয়ে উত্তম আর কোন আয়াত নেই। এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে বিবাহ কি শুধু ঈযাব্-কবূলের নাম? না কি শুধু সহবাসের জন্যেই বিবাহ? না কি উভয় কাজের জন্যেই বিবাহ? কুরআন কারীমে কথাটি বন্ধন ও সহবাস উভয় কাজের জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে শুধু বন্ধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সহবাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এখানে মুমিনাতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, সাধারণতঃ মুমিনরা মুমিনা নারীদেরকেই বিয়ে করে থাকে। তবে আহলে কিতাব স্ত্রীদের ব্যাপারেও এটাই প্রযোজ্য হবে। পূর্বযুগীয় গুরুজনদের একটি বড় দল এ আয়াত হতে একটি দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তালাক তখনই প্রযোজ্য হবে যখন পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকবে। এ আয়াতে বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বে তালাক সহীহ নয় এবং তা প্রযোজ্যও হয় না। ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং আরো কয়েকজন বড় বড় মনীষীরও উক্তি এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর মত এই যে, বিবাহের পূর্বেও তালাক হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি বলে, "আমি যদি অমুক মহিলাকে বিয়ে করি তবে সে তালাকপ্রাপ্তা।" এমতাবস্থায় তাঁদের উভয়ের মতে যদি সে ঐ মহিলাকে বিয়ে করে তবে তার তালাক হয়ে যাবে। আবার ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মধ্যে ঐ লোকটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে বলেঃ "আমি যে মহিলাকে বিয়ে করবো সেই তালাকপ্রাপ্তা

হবে।" এই অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, যে নারীকেই সে বিয়ে করবে সেই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ)-এর মত এই যে, তার তালাক হবে না। কেননা লোকটি কোন নারীকে নির্দিষ্ট করেনি। জমহূর উলামা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের দলীল এ আয়াতটি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি কেউ বলেঃ "আমি যে মহিলাকে বিয়ে করবো তার উপরই তালাক পড়ে যাবে," তবে এর হুকুম কি? উত্তরে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "এই অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিবাহের পরে তালাকের কথা বলেছেন। সুতরাং বিবাহের পূর্বের তালাক কিছুই নয়।"

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইবনে আদম যার মালিক নয় তাতে তালাক নেই।"[১] অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।"[২]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমরা মুমিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন নারীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় তবে তার জন্যে কোন ইদ্দত নেই। সুতরাং সে তখনই যার সাথে ইচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তবে যদি এই অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

সুতরাং বিবাহের পরেই এবং স্পর্শ করার পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, আর যদি এ বিবাহের মহরও ধার্য হয়ে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। কিন্তু যদি মহর নির্ধারিত না হয়ে থাকে তবে অল্প কিছু স্ত্রীকে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ, (রঃ) ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের জন্যে মহর নির্ধারণ করে থাকো তবে যা নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক তারা পাবে।"(২ ঃ ২৩৭) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ "যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে এতে কোন অপরাধ নেই। যদি তাদের জন্যে কোন মহর নির্ধারণ না করে থাকো তবে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে তাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে দাও। ধনী তার শক্তি অনুযায়ী দেবে এবং গরীবও তার শক্তি অনুযায়ী দেবে, এটা প্রচলিত পন্থায় দিতে হবে, এটা সৎকর্মশীলদের জন্যে অবশ্যকরণীয় কাজ।"(২ ঃ ২৩৬)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) ও হযরত আবূ উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমাইয়া বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেন। অতঃপর সে যখন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো তখন তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন এটা অপছন্দ করলো। তখন তিনি হযরত আবূ উসায়েদ (রাঃ)-কে হুকুম করলেন যে, তার বিদায়ের সামান তৈরী করে দেয়া হোক এবং মূল্যবান দু'খানা কাপড় তাকে পরিয়ে দেয়া হোক।[১]

হযরত আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) বলেন যে, যদি স্ত্রীর জন্যে মহর নির্ধারণ করা হয় এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়া হয় হবে তার জন্যে অর্ধেক মহর ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মহর ধার্য করা না হলে তাকে সাধ্যমত প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু দিতে হবে এবং এটাই হবে সৌজন্যের সাথে বিদায় করা।

৫০। হে নবী (সঃ)! আমি তোমার জন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মহর তুমি প্রদান করেছো এবং বৈধ করেছি ফায় হিসাবে আল্লাহ

٥٠- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَاۤءَ

---

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে, এবং বিবাহের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মুমিনা নারী নবী (সঃ)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী (সঃ) তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ, এটা বিশেষ করে তোমারই জন্যে, অন্য মুমিনদের জন্যে নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি যেসব স্ত্রীর মহর আদায় করে দিয়েছো তারা তোমার জন্যে হালাল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত স্ত্রীর মহর ছিল সাড়ে বারো উকিয়া, যার মূল্য হয় তখনকার পাঁচশ' দিরহাম। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ)-এর মহর ছিল এই পরিমাণই। হযরত নাজ্জাশী (রঃ) নিজের পক্ষ হতে চারশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত সুফিয়া বিনতে হুওয়াই (রাঃ)-এর মহর ছিল শুধু তাঁকে আযাদী দান। খাইবারের ইয়াহূদীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে নেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেসা মুসতালেকিয়্যাহ যত অর্থের উপর মুকাতাবা করেছিলেন, তার সমুদয় অর্থ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রাঃ)-কে আদায় করে দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এভাবেই যেসব বাঁদী গানীমাতের মাল স্বরূপ তাঁর অধীনে এসেছিল সেগুলোও তাঁর জন্যে হালাল ছিল। সুফিয়া (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়্যা (রাঃ)-এর মালিক হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আযাদ করে দিয়ে বিবাহ করেছিলেন। রাইহানা বিনতে শামাউন্ নায্রিয়্যাহ ও মারিয়া কিবতিয়্যারও তিনি মালিক ছিলেন। হযরত মারিয়া (রাঃ)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি সন্তানও হয়েছিল যাঁর নাম ছিল ইবরাহীম। যেহেতু বিবাহের ব্যাপারে নাসারা ও ইয়াহূদীদের ভিতরে খুব বাড়াবাড়ী প্রচলিত ছিল এবং সেভাবেই কাজ করা হয়েছিল, সেহেতু আদল ও ইনসাফ বিশিষ্ট সহজ ও স্বচ্ছ শরীয়ত মধ্যম পন্থা প্রকাশ করে দিয়েছে। নাসারাগণ সাত পিড়ী পর্যন্ত যে পুরুষ বা স্ত্রী লোকের নসবনামা (বংশ তালিকা) পেতো না তার বিবাহ জায়েয বলে মেনে নিতো না। ইয়াহূদীরা ভাই বা বোনের ছেলে মেয়েদেরকে বিবাহ করে নিতো। ইসলাম ভাতিজী ও ভাগিনীর সাথে বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করেছে। চাচার মেয়ে, ফুফুর মেয়ে, মামার মেয়ে ও খালার মেয়ের সাথে বিবাহ ইসলাম জায়েয রেখেছে। এ আয়াতের শব্দগুলো কতই না চমৎকার! عَمٌّ (চাচা) এবং خَالٌ (মামা) এ শব্দগুলোকে এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর عَمَّات (ফুফুরা) এবং خَالَات (খালারা) এই শব্দগুলোকে বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। এতে পুরুষ লোকদের স্ত্রীলোকদের উপর এক ধরনের ফযীলত বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِل (ডান ও বাম হতে) (১৬ ঃ ৪৮) يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে বের করে আনেন) (২ ঃ ২৫৭) এবং وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ (তিনি অন্ধকার ও আলো করেছেন)। (৬ ঃ ১) এখানে ডানের ফযীলত বামের উপর এবং আলোর ফযীলত অন্ধকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ شَمَائِل শব্দটিকে বহু বচন এবং يَمِيْن শব্দটিকে এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ظُلُمٰت শব্দটিকে বহু বচন এবং نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর আরো বহু উপমা দেয়া যেতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেনঃ "আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম এলো। আমি আমার অপারগতা প্রকাশ করলাম। তিনি তা মেনে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ

তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন। আমি তাঁর জন্যে বৈধকৃত স্ত্রীদের মধ্যেও ছিলাম না এবং তাঁর সাথে হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্তও না। বরং আমি মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলাম। আমি ছিলাম আযাদকৃতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১] তাফসীর কারকগণও একথাই বলেছেন। আসল কথা হলো যারা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছেন। হযরত কাতাদা (রঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে وَالّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ রয়েছে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ কোন মুমিনা নারী নবী (সঃ)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী (সঃ) তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এ আদেশ দু'টি শর্তের উপর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! মুমিনা নারী তোমার জন্যে বৈধ যদি সে নিজেকে তোমার নিকট নিবেদন করে যে, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে বিনা মহরে বিয়ে করতে পার। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ

অর্থাৎ "আর আমি তোমাদেরকে নসীহত করলেও আমার নসীহত তোমাদের কোন উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন।"(১১ঃ ৩৪) এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তির মত। তিনি বলেছিলেনঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ "হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো তবে তাঁর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।"(১০ ঃ ৮৪)

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ ...

অর্থাৎ "যদি মুমিনা নারী নবী (সঃ)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করে।"

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটি মহিলা এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি নিজেকে আপনার জন্যে নিবেদন করেছি।" অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি তার

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রয়োজন আপনার না তাকে তবে আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তাকে তুমি মহর হিসেবে দিতে পার এমন কোন জিনিস তোমার কাছে আছে কি?" উত্তরে লোকটি বললোঃ "আমার কাছে আমার এই লুঙ্গিটি ছাড়া আর কিছুই নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "একটি লোহার আংটি হলেও তুমি খোঁজ কর।" তখন সে খোঁজ করলো, কিন্তু কিছুই পেলো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তোমার কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে কি?" লোকটি জবাব দিলোঃ "হ্যাঁ, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তাহলে তুমি তাকে কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে বিয়ে করে নাও।"[১]

হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হযরত আনাস (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলেন এবং ঐ সময় তাঁর নিকট তাঁর কন্যাও ছিল। হযরত আনাস বলেন যে, একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ "আমার কোন প্রয়োজন আপনার আছে কি?" তখন তাঁর কন্যাটি বলেঃ "মহিলাটির লজ্জা-শরম কত কম!" তার একথা শুনে হযরত আনাস (রাঃ) তাকে বলেনঃ "ঐ মহিলা তোমার চেয়ে বরং ভাল যে, সে নিজেকে নবী (সঃ)-এর নিকট নিবেদন করেছে।"[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি মহিলা নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার এ রকম এ রকম একটি মেয়ে আছে।" অতঃপর সে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিলো। অতঃপর বললোঃ "আমি চাই যে, আপনি আমার এ মেয়েকে বিয়ে করে নিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলেন। মহিলাটি কিন্তু তার কন্যার প্রশংসা করতেই থাকলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে বললো যে, তার মেয়ে কখনো রোগে ভোগেনি এবং তার মাথায় কখনো ব্যথা হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমার মেয়ের আমার প্রয়োজন নেই।"[৩]

---

১. হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাটি নবী (সঃ)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করেছে সে হলো হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)।[১]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইনি বানী সালীম গোত্রভুক্ত ছিলেন। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি অত্যন্ত সতী-সাধ্বী রমণী ছিলেন। হতে পারে যে, উম্মে সালীমই ছিলেন হযরত খাওলা (রাঃ) আবার তিনি অন্য কোন মহিলাও হতে পারেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত উমার ইবনুল হাকাম (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তেরোটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরায়েশ গোত্রভুক্ত। তাঁরা হলেনঃ হযরত খাদীজা (রা), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। তিনজন ছিলেন বানু আমির ইবনে সাসা গোত্রভুক্ত। দু'জন ছিলেন বানু হিলাল ইবনে আমির গোত্রভুক্ত। তাঁরা হলেন হযরত মায়মূনা বিনতে হারিস (রাঃ), ইনি তিনিই যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন এবং হযরত যয়নাব, উম্মুল মাসাকীন (রাঃ)। একজন ছিলেন বানু বকর ইবনে কিবলা গোত্রভুক্ত। ইনি ঐ মহিলা যিনি দুনিয়াকে পছন্দ করেছিলেন। একজন স্ত্রী ছিলেন বানুল জুন গোত্রভুক্ত, যিনি ছিলেন আশ্রয় প্রার্থিনী। আর একজন স্ত্রী ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহশ আসাদিয়্যা (রাঃ)। আর দু'জন ছিলেন বন্দিনী। তাঁরা হলেন ঃ সুফিয়া বিনতে হুওয়াই ইবনে আখতাব (রাঃ) এবং জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস ইবনে আমর ইবনুল মুসতালিক আল খুযাইয়্যা (রাঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে মুমিনা নারী নিজেকে নবী (সঃ)-এর নিকট নিবেদন করেছিলেন তিনি হলেন মায়মূনা বিনতে হারিস (রাঃ)। কিন্তু এতে ইনকিতা বা ছেদ-কাটা রয়েছে। এ রিওয়াইয়াতটি মুরসাল। এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, হযরত যয়নাব (রাঃ), যাঁর কুনইয়াত ছিল উম্মুল মাসাকীন, তিনি হলেন যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ)। তিনি ছিলেন আনসারিয়্যা। তিনি নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর নিকট ইন্তেকাল করেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইখতিয়ারে দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি

---

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ সব স্ত্রী হতে আত্মগরিমায় থাকতাম যাঁরা নিজেদেরকে তাঁর নিকট নিবেদন করেছিলেন। আমি বিস্ময় বোধ করতাম যে, কেমন করে স্ত্রীলোক নিজেকে নিবেদন করতে পারে! অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা নিম্ন লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

অর্থাৎ "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছো, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।"(৩৩ ঃ ৫১) তখন আমি বললামঃ আপনার প্রতিপালক তো আপনার পথ খুবই সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এমন কোন স্ত্রীলোক ছিল না যে নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে।[২] ইউনুস ইবনে বুকায়ের (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন যে, যেসব স্ত্রীলোক নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নিবেদন করেছে তাদের একজনকেও তিনি গ্রহণ করেননি, যদিও এটা তাঁর জন্যে জায়েয ও বিশিষ্ট ছিল। কেননা, এটা তাঁর ইচ্ছার উপর ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

অর্থাৎ "নবী (সঃ) যদি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা বিশেষ করে তোমারই জন্যে, অন্য মুমিনদের জন্যে নয়। তবে যদি মহর আদায় করে তাহলে জায়েয হবে। যেমন হযরত বরূ' বিনতে ওয়াশিক (রাঃ) নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। যখন তাঁর স্বামী মারা যান তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফায়সালা করলেন যে, তার বংশের অন্যান্য মহিলাদের মত তাকে মহর দিতে হবে। এভাবেই শুধু সহবাসের পর মহর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হুকুমের বাইরে রয়েছেন। ঐ স্ত্রী লোকদেরকে কিছু দেয়া তাঁর উপর ওয়াজিব ছিল না। তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি বিনা মহরে, বিনা ওলীতে এবং বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ)-এর ঘটনা। হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ কোন স্ত্রী লোকের এ অধিকার নেই যে, বিনা মহরে ও বিনা ওলীতে সে কারো কাছে নিজেকে বিবাহের জন্যে পেশ করতে পারে। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই খাস ছিল।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। অর্থাৎ কোন পুরুষ এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারে না। হ্যাঁ, তবে স্ত্রীদের ছাড়াও সে দাসীদেরকে রাখতে পারে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। অনুরূপভাবে মুমিনদের জন্যে ওলী, মহর ও সাক্ষীরও শর্ত রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতের জন্যে এই নির্দেশ। কিন্তু তাঁর জন্যে এই ধরা-বাঁধা কোন বিধান নেই এবং এ কাজে তাঁর কোন দোষও নেই।

৫১। তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছো তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এই জন্যে যে, এতে তোমাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না, আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

٥١- تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ সব মহিলাকে অবজ্ঞা করতেন যাঁরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হিবা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, নারীরা বিনা মহরে নিজেকে হিবা করতে লজ্জা বোধ করে না? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "আমি দেখি যে, আপনার চাহিদার ব্যাপারে প্রশস্ততা আনয়ন করেছেন।"[১] ইমাম বুখারীও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য এই মহিলারাই। এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা কবূল করবেন এবং যাকে ইচ্ছা কবূল করবেন না। এর পরেও তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যাদেরকে তিনি কবূল করেননি তাদেরকেও ইচ্ছা করলে পরে কবূল করে নিতে পারেন।

হযরত আমের শা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাঁদেরকে দূরে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে শুরায়েকও (রাঃ) ছিলেন।

এই বাক্যের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অধিকার দেয়া হয়েছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের মধ্যে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারেন। যাকে ইচ্ছা আগে করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা পিছে করতে পারেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সারাটি জীবন স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল ও ইনসাফের সাথে (পালা) ভাগ-বাটোয়ারা করে গেছেন। ফকীহদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ মত পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর (পালার) সমতার বণ্টন ওয়াজিব ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও স্ত্রীর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে অনুমতি চাইতেন।" বর্ণনাকারী মুআয (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি বলতেন?" উত্তরে তিনি বলেন, আমি বলতামঃ এটা যদি আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে আমি অন্য কাউকেও আমার উপর প্রাধান্য দিতে চাইনে।[২]

সুতরাং সঠিক কথা যা অতি উত্তম এবং যার দ্বারা এই উক্তিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতাও এসে যায়, তা এই যে, আয়াতটি সাধারণ। নিজেকে নিবেদনকারী ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরা সবাই এর আওতায় পড়ে যায়। নিজেদেরকে হিবাকারিণীদের ব্যাপারে তাদেরকে বিয়ে করা ও না করা এবং বিবাহিতা স্ত্রীদের মধ্যে (পালা) বণ্টন করা বা না করা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই বিধান এই জন্যে যে, এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না, আর তুমি তাদেরকে যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। অর্থাৎ তাঁরা যখন জানতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর পালা বন্টন জরুরী নয় তবুও তিনি সমতা প্রতিষ্ঠিত রাখছেন তখন তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তাঁরা তাঁর ইনসাফকে মুবারকবাদ জানাবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অর্থাৎ কার প্রতি কার আকর্ষণ আছে তা আল্লাহ ভালরূপেই অবগত আছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (পালা) বন্টন করতেন। অতঃপর তিনি বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِعْلِىْ فِيْمَآ اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যা আমার অধিকারে ছিল তা আমি করলাম, এখন যা আপনার অধিকারে আছে, কিন্তু আমার অধিকারে নেই সেজন্যে আপনি আমাকে তিরস্কার করবেন না।"

৫২- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ۟ع

৫২। এরপর তোমার জন্যে কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে এটা গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীরা ইচ্ছা করলে তাঁর বিবাহ বন্ধনে থাকতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে পৃথক হয়ে যেতে পারেন এ অধিকার তিনি তাঁদেরকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মুমিনদের মাতারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অঞ্চল ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেননি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁরা পার্থিব একটি প্রতিদান এই লাভ করলেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিলেনঃ এরপর তোমার জন্যে কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী

গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। পরে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে আরো বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরপরে আর কোন বিয়ে করেননি। এ বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়া এবং এতদসত্ত্বেও তা না করার মধ্যে এক বড় যৌক্তিকতা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ইহসান তাঁর স্ত্রীদের উপর রয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেননি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকেও তাঁর জন্যে হালাল করেছেন।"[১]

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে তাঁর ইচ্ছায় যে কোন মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ হওয়ার আয়াত হলো تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ এটাই যা এর পূর্বে গত হয়েছে। বর্ণনা করার দিক দিয়ে ওটা পূর্বে এবং নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে পরে। সূরায়ে বাকারাতেও অনুরূপভাবে মৃত্যুর ইদ্দত সম্পর্কীয় পরের আয়াতটি মানসূখ বা রহিত এবং পূর্বের আয়াতটি ওর নাসিখ বা রহিতকারী। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এই আয়াতের অন্য আর একটি অর্থও অনেক আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেনঃ এর উদ্দেশ্য হলোঃ যেসব স্ত্রীলোকের বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া অন্যেরা হালাল নয়। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে স্ত্রীরা ছিলেন, তাঁরা যদি তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করতেন তাহলে কি তিনি আর বিবাহ করতে পারতেন না?" উত্তরে হযরত উবাই (রাঃ) বললেনঃ "কেন পারতেন না?" তখন প্রশ্নকারী لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ -এ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। তখন হযরত উবাই (রাঃ) বললেনঃ "এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রীদের যে প্রকারগুলো ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী, দাসী, চাচা, ফুফু, মামা ও খালাদের মেয়েরা এবং নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হিবাকারী স্ত্রী লোকেরা, এগুলো ছাড়া অন্য প্রকারের যারা হবে এবং তারা যদি বর্ণিত গুণের অধিকারিণী না হয় তবে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে হালাল নয়।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এই হিজরতকারিণী মুমিনা নারীরা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করতে

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে। অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ

অর্থাৎ "ঈমানের পরে যারা কুফরী করে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।" (৫ঃ ৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ (৩৩ ঃ ৫০)-এই আয়াতে স্ত্রী লোকদের যে প্রকারগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন ঐগুলো তো হালাল, ওগুলো ছাড়া অন্যগুলো হারাম। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এগুলো ছাড়া সর্বপ্রকারের স্ত্রী লোকই হারাম, তারা মুসলমানই হোক বা ইয়াহূদীই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক। আবূ সালেহ্ (রঃ) বলেন যে, গ্রাম্য ও অপরিচিতা স্ত্রী লোকদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যে স্ত্রী লোকগুলো হালাল ছিল তাদের মধ্য হতে তিনশ' জনকে বিয়ে করলেও তা হালাল হবে। মোটকথা, আয়াতটি সাধারণ। যেসব স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে ছিলেন এবং যেসব স্ত্রীর প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর যেসব লোক হতে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে তাঁদের থেকেই এর অনুকূলেও বর্ণিত আছে। সুতরাং এতে কোনই বৈপরীত্য নেই। এর উপর একটি কথা বাকী থেকে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে তালাক দিয়েছিলেন এবং পরে আবার ফিরিয়েও নিয়েছিলেন। আর হযরত সাওদা (রাঃ)-কে তিনি তালাক দিতে চেয়েছিলেন যার উপর হযরত সাওদা (রাঃ) নিজের পালার দিনটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রদান করেছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর উত্তর এই দিয়েছিলেন যে, এটা এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কথা এটাই বটে কিন্তু আমরা বলি যে, এ জবাবেরও দরকার নেই। কারণ এ আয়াতে তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে বিয়ে করা এবং তাদেরকে বের করে দিয়ে অন্যকে ঘরে আনায় বাধা প্রদান করা হয়েছে, তালাক দেয়ার কথা বলা হয়নি ও উল্লেখ করা হয়নি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত সাওদা (রাঃ)-এর ঘটনার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির শানে নুযূলঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَّالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ

অর্থাৎ "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আংশকা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।"(৪ ঃ ১২৮)

আর হযরত হাফসা (রাঃ) সম্পর্কীয় ঘটনাটি সুনানে আবি দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছনঃ হযরত উমার (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট এমন অবস্থায় প্রবেশ করেন যে, তিনি কাঁদছিলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কাঁদছো কেন? সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে তালাক দিয়েছেন। নিশ্চয়ই একবার তিনি তোমাকে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর আমারই কারণে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যদি তিনি তোমাকে তালাক দিয়ে থাকেন তবে আমি কখনো তোমার সাথে কথা বলবো না।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাড়াবাড়ী করতে ও কাউকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে সে স্থানে অন্য কাউকে আনতে নিষেধ করেছেন ও দাসীকে হালাল করেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "অজ্ঞতার যুগে একটি জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যে, জনগণ তাদের স্ত্রীদেরকে আপোসে বদলা-বদলী করে নিতো। একজন নিজের স্ত্রী অন্যকে দিয়ে দিতো এবং অন্যজন তার স্ত্রী ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিতো। ইসলাম এ ধরনের জঘন্য প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।" এক সময়ের একটি ঘটনা এই যে, উয়াইনা ইবনে হাসান আল ফাযারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করলো এবং নিজের অজ্ঞতা যুগের অভ্যাস অনুযায়ী অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করলো। ঐ সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি অনুমতি না নিয়ে আসলে কেন?" সে উত্তরে বললোঃ "আমি তো আজ পর্যন্ত মুযার গোত্রের কারো কাছে অনুমিত প্রার্থনা করিনি।" অতঃপর সে বললোঃ "আপনার নিকট যে মহিলা বসেছিলেন উনি কে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ "সে হলো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)।" সে বললোঃ "আপনি আমার কাছে তাঁকে দিয়ে দিন, আর আমি তাঁর পরিবর্তে আমার স্ত্রীকে আপনার কাছে দিয়ে দিচ্ছি। তার সৌন্দর্যের কোন তুলনাই হয় না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "এরূপ করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন।" যখন সে চলে গেল তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "লোকটি কি বলছিল? এবং সে কে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেনঃ "সে হলো এক নির্বোধ সরদার। তুমি তো তার কথা শুনেছো। এমন নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে তার কওমের সরদার।"[১]

১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, এ হাদীসের একজন বর্ণনকারী ইসহাক ইবনে আবদিল্লাহ রয়েছেন। তিনি খুবই নিম্ন পর্যায়ের লোক।

٥٣- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ؗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৩। হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথা-বার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ তোমাদের এই আচরণ নবী (সঃ)-কে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনও সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।

٥٤- اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৪। তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখো– আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

এ আয়াতে পর্দার হুকুম রয়েছে ও আদবের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় ওগুলোর মধ্যে এটিও একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "আমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত আল্লাহর আমি আনুকূল্য করেছি তিনটি বিষয়ে। আমি বলেছিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানিয়ে নিতেন (তাহলে কতই না ভাল হতো)। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেনঃ

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও।"(২ ঃ ১২৫) আমি বলেছিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার স্ত্রীদের নিকট সৎ ও অসৎ সবাই প্রবেশ করে থাকে। সুতরাং যদি আপনি তাদের উপর পর্দা করতেন (তবে খুব ভাল হতো)! আল্লাহ তা'আলা তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীরা মর্যাদা বোধের কারণে কিছু বলতে কইতে শুরু করেন তখন আমি বললামঃ অহংকার করবেন না। যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তবে সত্বরই আল্লাহ তা'আলা আপনাদের পরিবর্তে তাঁকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এরূপই আয়াত অবতীর্ণ করেন।" সহীহ মুসলিমে চতুর্থ আর একটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তাহলো বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে ফায়সালা সংক্রান্ত বিষয়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকারের লোকই এসে থাকে। সুতরাং যদি আপনি মুমিনদের মাতাদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)।" তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর ঐ সময়টা ছিল ৫ম হিজরীর যুল-কাদাহ মাসের ঐ দিনের সকাল যেই দিন তিনি হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে স্ত্রী রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং যে বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন। অনেকেই এ ঘটনাটি তৃতীয় হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন তিনি জনগণকে ওলীমার দাওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসে গল্প-গুজবে মেতে উঠে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উঠবার জন্যে তৈরী হলেন, কিন্তু

তখনো তারা উঠলো না। তা দেখে তিনি উঠে গেলেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে সাথে উঠে চলে গেল। কিন্তু এর পরেও তিনজন লোক বসে থাকলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে আসলেন। কিন্তু দেখেন যে, তখনো লোকগুলো বসেই আছে। এরপর তারা উঠে চলে গেল। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি তখন এসে নবী (সঃ)-কে খবর দিলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। তখন তিনি এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সাথে যেতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ফেলে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।"[১]

অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সময় জনগণকে রুটি ও গোশ্ত আহার করিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ)-কে তিনি লোকদেরকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। লোকেরা এসেছিল ও খেয়েছিল এবং ফিরে যাচ্ছিল। যখন আর কাউকেও ডাকতে বাকী থাকলো না তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ খবর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে দস্তরখান উঠিয়ে নিতে বললেন। পানাহার শেষ করে সবাই চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তিনজন লোক পানাহার শেষ করার পরেও বসে বসে গল্প করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বেরিয়ে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের দিকে গেলেন। অতঃপর বললেনঃ "হে আহ্লে বায়েত! তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক!" উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ "আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আপনার (নব-পরিণিতা) স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আপনাকে আল্লাহ বরকত দান করুন!" এভাবে তিনি তাঁর সমস্ত স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং সবারই সাথে একই কথা-বার্তা হলো। অতঃপর ফিরে এসে দেখলেন যে, ঐ তিন ব্যক্তি তখনো গল্পে মেতে আছে। তারা তখনো যায়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লজ্জা-শরম খুব বেশী ছিল বলে তিনি তাদেরকে কিছু বলতে পারলেন না। তিনি আবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরের দিকে চলে গেলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি জানি না যে, লোকগুলো চলে গেছে এ খবর তাঁকে আমিই দিলাম কি অন্যেরা দিলো। এ খবর পেয়ে তিনি ফিরে আসলেন এবং এসে তাঁর পা দরযার চৌকাঠের উপর রাখলেন। এক পা তাঁর দরযার ভিতরে ছিল এবং আর এক পা দরযার বাইরে ছিল এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ফেলে দিলেন এবং পর্দার আয়াত নাযিল হয়ে গেল। একটি রিওয়াইয়াতে তিনজনের স্থলে দু'জন লোকের কথা রয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন এক বিবাহে হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) মালীদা (এক প্রকার খাদ্য) তৈরী করেন এবং পাত্রে রেখে আমাকে বলেনঃ "এটা নিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং বলোঃ এ সামান্য উপঢৌকন হযরত উম্মে সালীম (রাঃ)-এর পক্ষ হতে। তিনি যেন এটা কবূল করে নেন। আর তাঁকে আমার সালাম জানাবে।" ঐ সময় জনগণ খুব অভাবী ছিল। আমি ওটা নিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম বললাম ও হযরত উম্মে সালীমেরও (রাঃ) সালাম জানালাম এবং খবরও পৌঁছালাম। তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, ওটা রেখে দাও।" আমি তখন ঘরের এক কোণে ওটা রেখে দিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ "অমুক অমুককে ডেকে নিয়ে এসো।" তিনি বহু লোকের নাম করলেন। তারপর আবার বললেনঃ "তাছাড়া যে মুসলমানকেই পাবে ডেকে নিয়ে আসবে।" আমি তাই করলাম। যাকেই পেলাম তাকেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট খাবারের জন্যে পাঠাতে লাগলাম। ফিরে এসে দেখলাম যে ঘর, বৈঠকখানা ও আঙ্গিনা লোকে পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রায় তিনশ' লোক এসে গেছে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ "যাও, ঐ খাবারের পাত্রটি নিয়ে এসো।" আমি সেটা নিয়ে আসলে তিনি তাতে হাত লাগিয়ে দু'আ করলেন এবং আল্লাহ যা চাইলেন তিনি মুখে উচ্চারণ করলেন। অতঃপর বললেনঃ "দশ দশজন লোকের দল করে বসিয়ে দাও।" সবাই বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করলো। এভাবে খাওয়া চলতে লাগলো। সবাই খাওয়া শেষ করলো। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ "পাত্রটি উঠিয়ে নাও।" আমি তখন পাত্রটি উঠালাম। আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না যে, যখন আমি পাত্রটি রেখেছিলাম তখন তাতে খাবার বেশী ছিল, না এখন বেশী আছে। বেশকিছু লোক তখনো বসে বসে গল্প করছিল। উম্মুল মুমিনীন দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। লোকগুলোর এতক্ষণ ধরে বসে থাকা এবং চলে না যাওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে খুবই কঠিন ঠেকছিল। কিন্তু তিনি লজ্জা করে কিছুই বলতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই মানসিক অবস্থার কথা জানতে পারলে লোকগুলো অবশ্যই উঠে চলে যেতো। কিন্তু তারা কিছুই জানতে পারেনি বলে নিশ্চিন্তে গল্পে মেতেছিল। তিনি ঘর হতে বের হয়ে স্ত্রীদের কক্ষের দিকে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন যে, তারা তখনো বসেই আছে। তখন তারা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো এবং তাড়াতাড়ি চলে গেলো। তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন এবং পর্দা লটকিয়ে দিলেন। আমি আমার কক্ষেই ছিলাম এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হলো। তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করতে করতে বেরিয়ে আসলেন। সর্বপ্রথম এ আয়াতটি মহিলারাই শুনেছিলেন। আমি তো এর পূর্বেই শুনেছিলাম।

হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রস্তাব নিয়ে যাবার রিওয়াইয়াতটি فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ-এ আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে। এর শেষে কোন কোন রিওয়াইয়াতে এও আছে যে, এরপর লোকদেরকে উপদেশ দেয়া হয় এবং হাশিমের এ হাদীসে এই আয়াতের বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সতী-সাধ্বী সহধর্মিণীরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ময়দানের দিকে চলে যেতেন। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) এটা পছন্দ করতেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতেনঃ 'এভাবে তাঁদেরকে যেতে দিবেন না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেদিকে কোন খেয়াল করতেন না। একদা হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রাঃ) বাড়ী হতে বের হলেন। এদিকে হযরত উমার (রাঃ) চাচ্ছিলেন যে, এ প্রথা রহিত হয়ে যাক। তিনি তাঁর দেহের গঠন দেখেই তাঁকে চিনতে পারলেন এবং উচ্চ স্বরে বললেনঃ "(হে সাওদা রাঃ)! আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। এই রিওয়াইয়াতে এ প্রকারই বলা হয়েছে। কিন্তু আসল কথাটি হলো এই যে, এটা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। কাজেই মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে হযরত সাওদা (রাঃ) বের হয়েছিলেন। একথা এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত উমার (রাঃ)-এর একথা শুনে সাথে সাথে ফিরে চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রের খাদ্য খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে একটি হাড় ছিল এমতাবস্থায় হযরত সাওদা (রাঃ) সেখানে পৌঁছে তাঁর ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ঐ সময় অহী নাযিল হয়। যখন অহী আসা শেষ হলো তখনো তাঁর হাতে ঐ হাড়টি ছিল। তিনি তা ফেলে দেননি। তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করেছেন।" এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ অভ্যাসে বাধা প্রদান করেছেন যা অজ্ঞতার যুগে ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। যেমন তখন বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়ীতে যাওয়া প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে (সঃ) সম্মানের সাথে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। একটি হাদীসেও এ বিষয়টি রয়েছেঃ "সাবধান! স্ত্রী লোকদের নিকট যেয়ো না।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বতন্ত্র করলেন যাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। আরো বলা হচ্ছেঃ তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবী-গৃহে প্রবেশ করো না এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেয়ো। মুজাহিদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, খাদ্য রান্না করা এবং প্রস্তুত হওয়ার সময়েই যেতে হবে না। যখন বুঝতে পারবে যে, খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে তখনই যে উপস্থিত হয়ে যাবে এ আচরণ আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় নয়। এটা তোফায়লী বনে যাওয়া হারাম হওয়ার দলীল। ইমাম খতীব বাগদাদী (রঃ) এটা নিন্দনীয় হওয়ার উপর একটি পূর্ণ কিতাব লিখেছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমাদেরকে আহ্বান করলে প্রবেশ করো এবং ভোজন শেষে চলে যেয়ো।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্য হতে কাউকেও যদি তার ভাই (খাবার জন্যে) আহ্বান করে তবে তার দাওয়াত কবূল করা উচিত। ঐ দাওয়াত বিবাহের হোক বা অন্য কিছুরই হোক।"[১]

অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে যদি একটি খেজুরের দাওয়াত দেয়া হয় তবুও আমি তা কবূল করবো।" দাওয়াত খাওয়ার নিয়ম-কানুনের কথাও তিনি বলেছেনঃ "যখন খাওয়া শেষ হয়ে যাবে তখন সেখানে জেঁকে বসে থেকো না, বরং সেখান হতে চলে যেয়ো। গল্পে মশগুল হয়ে যেয়ো না।" যেমন বর্ণিত তিন ব্যক্তি করেছিল, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি লজ্জা করে কিছু বলতে পারেননি। এর উদ্দেশ্যে এও বটে যে, বিনা অনুমতিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে চলে যাওয়া তাঁর জন্যে কষ্টদায়ক। কিন্তু তিনি লজ্জা-শরমের কারণে তোমাদেরকে কিছু বলতে পারেন না। আল্লাহর এটা স্পষ্ট নির্দেশ যে, এর পরে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন আদেশ করেছেন তখন তোমাদের উচিত তা মেনে নেয়া। যেমন বিনা অনুমতিতে তাঁর সহধর্মিণীদের সামনে চলে যাওয়া নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে তাঁদের দিকে চোখ তুলে তাকানোও নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তোমরা তাঁর পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমি নবী (সঃ)-এর সাথে মালীদাহ্ (এক প্রকার খাদ্য) খাচ্ছিলাম। এমন সময় হযরত উমার (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁকে ডেকে নেন। তখন তিনি (আমাদের সাথে) খেতে শুরু করে দেন। খেতে খেতে তাঁর অঙ্গুলী আমার অঙ্গুলীতে ঠেকে যায়। তখন তিনি বলে উঠেনঃ "যদি আমার কথা মেনে নিতেন ও পর্দার ব্যবস্থা করা হতো তবে কারো উপর কারো দৃষ্টি পড়তো না।" ঐ সময়েই পর্দার আয়াত নাযিল হয়ে যায়।"[২]

অতঃপর এই পর্দার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিকতর পবিত্র।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনো সঙ্গত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীরা এখানে ও জান্নাতে তাঁরই সহধর্মিণী থাকবেন। সমস্ত মুসলমানের তাঁরা মাতা। এই জন্যে তাঁদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ আদেশ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ সহধর্মিণীদের জন্যে যাঁরা তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু নবী (সঃ) তাঁর যে পত্নীদেরকে তাঁর জীবদ্দশায় তালাক দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সহবাস হয়েছে তাকে কেউ বিয়ে করতে পারে কি না এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। আর যার সাথে সহবাস হয়নি তাকে অন্য লোক বিয়ে করতে পারে।

হযরত আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কীলা বিনতে আশআস ইবনে কায়েস রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অধিকারভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর সে ইকরামা ইবনে আবূ জেহেলের সাথে বিবাহিতা হয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এটা খুবই অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে বুঝিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-এর খলীফা! সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী ছিল না। তিনি তাকে কোন অধিকারও প্রদান করেননি এবং পর্দারও হুকুম দেননি। তার কওমের হীনতার সাথে তার নিজের হীনতা ও নীচতার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ) হতে তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।" একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা কখনো সঙ্গত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহর কাছে উন্মুক্ত। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও গোপন নেই। চোখের খিয়ানত, অন্তরের গোপন তথ্য, মনের বাসনা ইত্যাদি তিনি সবই জানেন।

৫৫। নবী-পত্নীদের জন্যে তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নিপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে ওটা পালন না করা অপরাধ

٥٥- لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ

اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○	নয়। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী লোকদের জন্যে যেসব নিকটতম আত্মীয়ের সামনে বের হলে কোন দোষ হবে না, এ আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সূরায়ে নূরে বলা হয়েছেঃ “নারীরা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।” এর পূর্ণ তাফসীর এই আয়াতের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। চাচা ও মামার উল্লেখ এ জন্যেই করা হয়নি যে, সম্ভবতঃ তারা তাদের ছেলেদের সামনে এদের বিশেষণ বর্ণনা করে দেবে। হযরত শা'বী (রঃ) ও ইকরামা (রঃ) তো এ দু'জনের সামনে স্ত্রী লোকের দো-পাট্টা নামিয়ে ফেলা মাকরূহ মনে করতেন। نِسَآءِ هِنَّ দ্বারা মুমিন নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

مَا مَلَكَتْ দ্বারা দাস-দাসীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বে এর বর্ণনা গত হয়েছে। হাদীসও আমরা সেখানে আনয়ন করেছি। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন।

٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○	৫৬। আল্লাহ নবী (সঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবী (সঃ)-এর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনরা! তোমরাও নবী (সঃ)-এর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবুল আলিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করার ভাবার্থ হলো তাঁর নিজ

ফেরেশতাদের কাছে নবী (সঃ)-এর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া। আর ফেরেশতাদের তাঁর উপর দরূদ পাঠের অর্থ হলো তাঁর জন্যে দু'আ করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, বারাকাতের দু'আ। আলেমগণ বলেন যে, আল্লাহর দরূদ অর্থ তাঁর রহমত এবং ফেরেশতাদের দরূদ পাঠের অর্থ ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আ'তা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সালাতের ভাবার্থ হলোঃ

سبوح قدوس سبقت رحمتي على غضبي

অর্থাৎ "আমি মহান ও পবিত্র, আমার রহমত আমার গযবের উপর বিজয়ী।" এই আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্য এই যে, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কদর, মান-মর্যাদা ও ইজ্জত-সম্মান মানুষের নিকট প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর প্রশংসাকারী এবং তাঁর ফেরেশতারা তাঁর উপর দরূদ পাঠকারী। মালায়ে আ'লার এই খবর দিয়ে জগতবাসীকে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারাও যেন তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাতে থাকেন। যাতে মালায়ে আ'লা ও দুনিয়াবাসীর মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

হযরত মূসা (আঃ)-কে বানী ইসরাঈল জিজ্ঞেস করেছিলঃ "আপনার উপর কি আল্লাহ তা'আলা দরূদ পড়ে থাকেন?" আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর কাছে অহী পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেনঃ "তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, হ্যাঁ, মহান আল্লাহ নিজ নবী ও রাসূলদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন। এ আয়াতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের উপরও রহমত বর্ষণ করে থাকেন। তিনি বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর। আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও।" (৩৩ ঃ ৪১-৪৩) অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

অর্থাৎ "তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলেঃ আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আশীষ ও দয়া বর্ষিত হয়।" (২ ঃ ১৫৫-১৫৭) হাদীসে রয়েছেঃ "আল্লাহ তা'আলা কাতারের (সারীর) ডান দিকের লোকদের উপর দরূদ পড়ে থাকেন।" অন্য হাদীসে আছেঃ "হে আল্লাহ! আবুল আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হযরত জাবির (রাঃ)-এর স্ত্রী আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর উপর ও তাঁর স্বামীর উপর দরূদ পাঠ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর রহমত বর্ষণ করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস এসেছে। ওগুলোর মধ্যে আমরা কিছু কিছু বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। তাঁরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত কা'ব ইবনে আজরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে সালাম করা তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর সালাত বা দরূদ পাঠ কেমন?" উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন আপনি দরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।"[১]

অন্য হাদীসঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আপনার উপর সালাম, কিন্তু আপনার উপর আমরা দরূদ পাঠ করবো কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বলোঃ

১. এভাবে এই দরূদ শরীফ ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁর বর্ণনায় عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ শব্দ নেই।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আপনি দরূদ নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর, যেমন দরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর এবং বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর।"[১]

অন্য হাদীসঃ আবূ হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে আমরা আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?" জবাবে তিনি বলেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের উপর ও তাঁর সন্তানদের উপর যেমন দরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর এবং বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, সম্মানিত।"[২]

অন্য হাদীসঃ হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন যখন আমরা হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর মজলিসে বসেছিলাম। অতঃপর তাঁকে হযরত বাশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আপনার উপর দরূদ পাঠ করি। সুতরাং কিভাবে আমরা আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?" বর্ণনাকারী বলেন যে, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ-

১. এভাবে এই দরূদ ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এভাবে এই দরূদ ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর যেমন আপনি দরূদ বর্ষণ করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর, এবং আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর সারা বিশ্বজগতে, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" আর সালাম তো তেমনই যেমন তোমরা জান।[১]

হযরত ইবনে মাসঊদ বদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সালাম তো আমরা জানি। কিন্তু আমরা যখন নামায পড়বো তখন আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করবো?" উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর।" ইমাম শাফিয়ী (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে অনুরূপ আনয়ন করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, নামাযের শেষ তাশাহ্হুদে কেউ যদি দরূদ না পড়ে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। এই জায়গায় দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। পরবর্তী যুগের কোন কোন গুরুজন এই মাসআলায় ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর মতকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা শুধু তাঁরই উক্তি। তাঁর উক্তির বিপরীত কথার উপর ইজমা হয়েছে। অথচ এটা ভুল। সাহাবীদের আর একটি দল এটাই বলেছেন, যেমন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), আবূ মাসঊদ বদরী (রাঃ) এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। তাবেয়ীদের মধ্যেও এই মাযহাবের লোক গত হয়েছেন, যেমন শা'বী (রঃ), আবূ জাফর বাকির (রঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ)। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) তো এদিকেই গিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে ও তাঁর সহচরদের মধ্যে কোনই মতানৈক্য নেই। ইমাম আহমাদ (রঃ)-এরও শেষ উক্তি এটাই, যেমন আবূ যারআহ দেমাশকী (রঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ফকীহও (রঃ) এটাই বলেন। এমন কি কোন কোন হাম্বলী মাযহাবের ইমাম বলেন যে, নামাযে কমপক্ষে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলা

১. এভাবে ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ওয়াজিব। যেমন তিনি তাঁর সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা দিয়েছেন। আর আমাদের কোন কোন সঙ্গী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধরের উপর দরূদ পাঠও ওয়াজিব বলেছেন। মোটকথা, নামাযে দরূদ পাঠ ওয়াজিব হওয়ার উক্তিটি খুবই প্রকাশমান। আর হাদীসেও এর দলীল বিদ্যমান রয়েছে। পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগের গুরুজনদের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ছাড়াও অন্যান্য ইমামগণও এই উক্তিই করেছেন। সুতরাং এটা বলা কোনক্রমেই ঠিক হবে না যে, এটা শুধু ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর উক্তি এবং এটা ইজমার বিপরীত। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। তাছাড়া নিম্নের হাদীসটিও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

হযরত ফুযালা ইবনে উবায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে তার নামাযে দু'আ করতে শুনতে পান যে দু'আয় সে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী (সঃ)-এর উপর দরূদও পাঠ করেনি। তখন তিনি বলেনঃ "এ লোকটি খুব তাড়াতাড়ি করলো।" তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেনঃ "তোমাদের কেউ যখন দু'আ করবে তখন যেন প্রথমে মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করে ও তাঁর উপর সানা পড়ে, তারপর যেন নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছা করে তাই যেন চায়।"[১] এর সমর্থনে নিম্নের হাদীসটিও রয়েছেঃ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার অযু নেই তার নামায নেই, ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে অযুর সময় বিসমিল্লাহ বলে না, ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যে নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়ে না এবং ঐ ব্যক্তিরও নামায হয় না যে আনসারকে ভালবাসে না।"[২]

অন্য হাদীসঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হবে তা আমরা জানি। কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) (তিনি এটাকে সহীহ বলেছেন), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইবনে খুযাইমা (রঃ) এবং ইবনে হিব্বান (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহ, আপনার রহমত এবং আপনার বরকত নাযির করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন তা করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।"[১]

হযরত সালামা আল কানদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) জনগণকে নিম্ন লিখিত দু'আটি শিক্ষা দিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَجَبَّارَ الْقُلُوْبِ عَلٰى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيْدِهَا اِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلٰوتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةِ تَحَنُّنِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْفَاتِحِ لِمَا اَغْلَقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ لِلْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا جَمِلَ فَاضْطَلِعْ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ، مُسْتَوْفِزًّا فِيْ مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَكِلٍ فِيْ قَدَمٍ، وَلَا وَهْنٍ فِيْ عَزْمٍ، وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبْسًا لِقَابِسٍ اٰلَاءِ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهِ اَسْبَابَهُ، بِهِ هَدَيْتَ الْقُلُوْبَ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْاِثْمِ وَاَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ، وَنَائِرَاتِ الْاَحْكَامِ، وَمُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ، فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَأْمُوْنُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ، وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ، وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً، وَرَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِيْ عَدْنِكَ وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ، مُهَنَّاتٍ لَهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ، مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَحْلُوْلِ وَجَزِيْلِ عَطَاءِكَ الْمَلُوْلِ، اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهٗ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهٗ وَاَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَاَجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ، مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ، وَخُطَّةِ فَضْلٍ وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيْمٍ ـ[২]

---

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবূ দাঊদ আলআ'মা, যার নাম নাফী ইবনে হারিস পরিত্যক্ত ব্যক্তি।

২. এ হাদীসের সনদ ঠিক নয়। এর বর্ণনাকারী আবূ হারবাজ মুযযীঃ সালামা কানদী পরিচিতও নয় এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিতও নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে তখন খুব উত্তমরূপে পাঠ করবে। কারণ তোমরা জান না যে, হয়তো এটা তাঁর উপর পেশ করা হবে।" জনগণ তখন তাঁকে বললেনঃ "তাহলে আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিন।" তিনি বললেন, তোমরা বলোঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগ্রহ, আপনার রহমত এবং আপনার বরকত দান করুন রাসূলদের নেতা, সংযমীদের ইমাম, নবীদেরকে শেষকারী, আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর, যিনি কল্যাণের ইমাম, মঙ্গলের পরিচালক এবং রহমতের রাসূল। হে আল্লাহ! তাঁকে প্রশংসিত জায়গায় পাঠিয়ে দিন যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা ঈর্ষা পোষণ করেন। হে আল্লাহ! আপনি দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন আপনি দরূদ নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান।"[১]

হযরত ইউনুস ইবনে খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁকে এমন এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন যিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উপর সালাম সম্পর্কে আমরা জানি। এখন বলুনঃ আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করতে হবে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াতটি মাওকূফ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পরিবারের উপর, যেমন দরূদ নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর ও ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। আর দয়া করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পরিবারের প্রতি, যেমন দয়া করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের উপর যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত।"[১]

এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে রহম বা করুণারও দু'আ রয়েছে। জমহূরের এটাই মাযহাব। এর আরো দৃঢ়তা নিম্নের হাদীস দ্বারা হয়ঃ হাদীসটি এই যে, একজন গ্রাম্য লোক বলেছিলঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দয়া করুন এবং আমাদের সাথে আর কারো উপর দয়া করবেন না।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি খুব বেশী প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করে দিলে।" কাযী আইয়ায (রঃ) জমহূর মালেকিয়া হতে এর অবৈধতা বর্ণনা করেছেন এবং আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আবি যায়েদ (রঃ) এটাকে জায়েয বলেছেন।

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত রাবীআ'হ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে তার জন্যে ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন যতক্ষণ সে আমার উপর দরূদ পড়তে থাকে। সুতরাং বান্দা এখন দরূদ পাঠ কম করুক অথবা বেশী করুক।"[২]

আর একটি হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লোকদের মধ্যে যারা আমার উপর অধিক দরূদ পাঠকারী তারাই হবে কিয়ামতের দিন সর্বোত্তম লোক।"[৩]

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (রঃ)।

হযরত যায়েদ ইবনে তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন আগন্তুক আমার নিকট এসে বলেনঃ "যে বান্দা আপনার উপর একটি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।" তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি অবশ্যই আমার দু'আর অর্ধেক সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে ব্যয় করবো।" জবাবে তিনি তাকে বললেনঃ "তুমি ইচ্ছা করলে তাই কর।" লোকটি আবার বললোঃ "আমার দু'আর দুই তৃতীয়াংশ সময় আমি আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগাবো।" তিনি বললেনঃ "ইচ্ছা হলে তাই কর।" লোকটি পুনরায় বললোঃ "আমি আমার দু'আর সর্বাংশই আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগিয়ে দিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা হতে মুক্তি দান করবেন এবং তিনিই তোমার জন্যে যথেষ্ট হবেন।"[১]

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মধ্যরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হতেন এবং বলতেনঃ "প্রকম্পিতকারী আসছে এবং ওকে অনুসরণকারী পরবর্তী ধ্বনিও রয়েছে এবং মৃত্যু তার মধ্যে যা আছে তা নিয়ে আসছে।"[২]

হযরত উবাই (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা রাত্রে নামায পড়ে থাকি। আমি আমার নামাযের এক তৃতীয়াংশ সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে কাটিয়ে দিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "অর্ধেক (কাটাবে)।" তিনি বললেনঃ "ঠিক আছে, তাহলে অর্ধেক সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগিয়ে দিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "দুই তৃতীয়াংশ।" হযরত উবাই (রাঃ) বললেনঃ "আমি আমার নামাযের সমস্ত সময়ই আপনার উপর দরূদ পাঠে ব্যয় করে দিবো।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।"

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উঠতেন ও বলতেনঃ "হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর! প্রকম্পিতকারী আসছে এবং ওকে অনুসরণকারীও আসছে। মৃত্যু তার মধ্যস্থিত বিপদ-আপদ নিয়ে চলে আসছে, মৃত্যু তার মধ্যস্থিত বিপদ-আপদ নিয়ে চলে আসছে।" হযরত উবাই (রাঃ) তখন

১. এ হাদীসটি ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল কাযী (রঃ)।

বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনার উপর অধিক দরূদ পাঠ করে থাকি। বলুন তো, আমি আমার নামাযের কত অংশ আপনার উপর দরূদ পাঠে ব্যয় করবো?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "তুমি যা চাইবে।" তিনি বললেনঃ "এক চতুর্থাংশ?" নবী (সঃ) জবাব দিলেনঃ "তুমি যা ইচ্ছা করবে। তুমি যদি বেশী সময় ব্যয় কর তবে সেটা তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে।" উবাই বললেনঃ "তাহলে অর্ধেক?" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি যা চাইবে, তবে তুমি যদি বেশী কর তখন তা তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হবে।" হযরত উবাই বললেনঃ "তাহলে দুই তৃতীয়াংশ?" নবী (সঃ) জবাব দিলেনঃ "তুমি যা ইচ্ছা করবে। তবে যদি তুমি বেশী কর তা তোমার জন্যে হবে কল্যাণকর।" তখন হযরত উবাই (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে আমার নামাযের সমস্ত সময়ই আমি আপনার উপর দরূদ পাঠে কাটিয়ে দিবো।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে আল্লাহ তোমাকে সমস্ত চিন্তা ও দুর্ভাবনা হতে রক্ষা করবেন এবং গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।"[১]

হযরত উবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমি আমার সমস্ত দরূদ আপনার উপর পাঠ করি তবে কি হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত চিন্তা হতে বাঁচিয়ে নিবেন। (এবং তোমার সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।"[২]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন। তিনি এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদায় পড়ে থাকলেন যে, আমার মনে সন্দেহ হলো, তার রূহ বের হয়ে যায়নি তো! নিকটে গিয়ে আমি তাঁকে দেখতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তিনি মাথা উঠালেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" আমি আমার অবস্থা তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম। তিনি তখন বললেনঃ "ব্যাপার ছিল এই যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি শুভ সংবাদ শুনাচ্ছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আপনাকে বলেছেন– যে তোমার উপর দরূদ পাঠ করবে আমিও তার উপর রহমত নাযিল করবো এবং যে তোমার উপর সালাম পাঠাবে আমিও তার উপর সালাম পাঠাবো।"[৩] অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, শেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "আমি মহিমান্বিত আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এ সিজদা করেছিলাম।"

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কার্যোপলক্ষে বের হন। তাঁর সাথে যাবে এমন কেউ ছিল না। তখন হযরত উমার (রাঃ) দ্রুত গতিতে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে থাকেন। দেখেন যে, তিনি সিজদায় পড়ে রয়েছেন। তিনি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তিনি সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি যে আমাকে সিজদার অবস্থায় দেখে দূরে সরে গেছো এটা খুব ভাল কাজ করেছো, জেনে রেখো যে, আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেনঃ "আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি একবার আপনার উপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।"[১]

হযরত আবূ তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের নিকট আসেন, ঐ সময় তাঁর চেহারায় আনন্দের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সাহাবীগণ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "একজন ফেরেশতা আমার নিকট এসে আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে তার উপর আল্লাহর দশটি রহমত নাযিল হবে। অনুরূপভাবে আমার উপর কেউ একটি সালাম পাঠালে আল্লাহ্ তার উপর দশটি সালাম পাঠাবেন।"[২]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি দরূদের বিনিময়ে সে দশটি পুণ্য লাভ করবে, দশটি গুনাহ্ তার মাফ হয়ে যাবে, মর্যাদা দশ ধাপ উঁচু হয়ে যাবে এবং ওরই অনুরূপ তার উপর ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একটি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন।"[৩]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর, কেননা এটা তোমাদের যাকাত। আর তোমরা আমার জন্যে আল্লাহর নিকট ওয়াসিলা যাঞ্চ্ঞা কর। এটা জান্নাতের একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা। ওটা একজন লোকই শুধু লাভ করবে। আমি আশা করি যে, ঐ লোকটি আমিই হবো।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন।
৪. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তার উপর সত্তর বার দরূদ নাযিল করবেন। এখন যার ইচ্ছা কম করুক এবং যার ইচ্ছা বেশী করুক। জেনে রেখো যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন, তিনি যেন কাউকেও বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমি মুহাম্মাদ (সঃ) উম্মী নবী।" একথা তিনি তিনবার বলেন। এরপর বলেনঃ "আমার পরে কোন নবী নেই। আমাকে অত্যন্ত উন্মুক্ত এবং খুবই ব্যাপক ও খতমকারী কালাম প্রদান করা হয়েছে। জাহান্নামের দারোগা ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা আমি জানি। আমাকে বিশেষ দানে ভূষিত করা হয়েছে। আমাকে ও আমার উম্মতকে সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। যতদিন আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবো ততদিন তোমরা আমার কথা শুনবে ও মানবে। যখন আমার প্রতিপালক আমাকে উঠিয়ে নিবেন তখন তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করবে।"[১]

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় সে যেন আমার উপর দরূদ পাঠ করে।"

অন্য হাদীসঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।"[২]

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তার দশটি গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

অন্য হাদীসঃ হযরত হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি বখীল বা কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।"[৩]

অন্য হাদীসঃ হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না সে হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃপণ।"[৪]

আর একটি হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যার সামনে

---

১. মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন।
৪. এ হাদীসটি ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। ঐ ব্যক্তির নাক ধূলো-মলিন হোক যার উপর রমযান মাস অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ তার গুনাহ্ মাফ হলো না। ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খিদমত করে) সে জান্নাতে যেতে পারলো না।"[১]

এ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়া ওয়াজিব। আলেমদের একটি বড় দল এই মতের সমর্থক। যেমন তাহাবী (রঃ), হালীমী (রঃ) প্রমুখ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়তে ভুলে গেছে সে জান্নাতের পথ ভুল করেছে।"[২]

কোন কোন আলেম বলেন যে, মজলিসে অন্ততঃ একবার দরূদ পাঠ ওয়াজিব এবং পরেরগুলো মুস্তাহাব।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যারা কোন মজলিসে বসে এবং আল্লাহর যিকর ও নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ছাড়াই উঠে পড়ে তারা কিয়ামতের দিন হতভাগ্য হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"[৩]

অন্য রিওয়াইয়াতে আল্লাহর যিকরের উল্লেখ নেই। তাতে এও আছে যে, তারা জান্নাতে গেলেও দরূদ পাঠের সওয়াব লাভে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আফসোস করতে থাকবে।

কারো কারো উক্তি এই যে, জীবনে একবার নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ওয়াজিব, তারপর মুস্তাহাব, যাতে আয়াতের উপর আমল করা যায়। কাযী আইয়ায (রঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ ওয়াজিব হওয়ার কথা বলার পর এই উক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু তাবারী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা তো নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ মুস্তাহাব হওয়াই প্রমাণিত হচ্ছে এবং এর উপর ইজমা হওয়ার তিনি দাবী করেছেন। খুব সম্ভব তাঁরও উদ্দেশ্য এটাই যে, একবার ওয়াজিব এবং পরে মুস্তাহাব। যেমন তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দান। কিন্তু আমি বলি যে, এটা খুবই গারীব বা দুর্বল উক্তি। কেননা, নবী (সঃ)-এর

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হাদীস কিন্তু পূর্বের হাদীস দ্বারা এটা সবলতা লাভ করেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উপর বহু সময় দরূদ পাঠের নির্দেশ এসেছে। এগুলোর মধ্যে কোনটা ওয়াজিব এবং কোনটা মুস্তাহাব। যেমন আযান সম্পর্কে হাদীসে এসেছেঃ হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যখন তোমরা মুআয্যিনকে আযান দিতে শোন তখন সে যা বলে তোমরাও তা-ই বলো। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্যে আল্লাহর নিকট ওয়াসীল যাচ্ঞা করবে। নিশ্চয়ই ওটা জান্নাতের এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা ছাড়া আর কারো জন্যে শোভনীয় নয়। আমি আশা করি যে, আমিই সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্যে ওয়াসীলা যাচ্ঞা করবে তার জন্যে আমার শাফাআ'ত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"[১]

অন্য ধারাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্যে আমার শাফাআ'ত ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

আর একটি হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, আমার উপর তোমাদের দরূদ পাঠ তোমাদের জন্যে যাকাত। আর তোমরা আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা কর। ওয়াসীলা হচ্ছে জান্নাতের মধ্যে একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। একটি লোক ছাড়া তা কেউ লাভ করতে পারবে না এবং আমি আশা করি যে, ঐ লোকটি আমিই হবো।"[২]

হযরত রুওয়াইফা ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে এবং বলেঃ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তাঁকে আপনি আপনার নিকটতম আসন দান করুন," কিয়ামতের দিন তার জন্যে আমার শাফাআ'ত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩]

হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدِنِ الْكُبْرٰى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى كَمَا اٰتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ۔

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বড় শাফাআ'ত কবূল করুন এবং তাঁর উঁচু দরযা উপরে উঠিয়ে দিন, তাঁর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক চাহিদার জিনিস তাঁকে প্রদান করুন, যেমন প্রদান করেছিলেন ইবরাহীম (আঃ) ও মূসা (আঃ)-কে।"[১]

দরূদ পাঠ করতে হবে মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ হতে বের হবার সময়। কেননা, এরূপ হাদীস রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীস হলোঃ

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে রাসূলিল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়তেন, তারপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্যে আপনার রহমতের দরযাগুলো খুলে দিন।" আর যখন মসজিদ হতে বের হতেন তখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতেন, তারপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দরযাগুলো খুলে দিন!"

ইসমাঈল কাযী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা মসজিদে গমন করবে তখন নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে।" নামাযের শেষের আত্তাহিয়্যাতু এর আলোচনা পূর্বেই গত হয়েছে। তবে প্রথম তাশাহহুদে এটাকে কেউই ওয়াজিব বলেননি। অবশ্য এটা মুস্তাহাব হওয়ার একটি উক্তি ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর রয়েছে। যদিও দ্বিতীয় উক্তিতে এর বিপরীতও তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়তে হবে। সুন্নাত তারীকা এই যে, প্রথম তাকবীরে সূরায়ে ফাতেহা পড়তে হবে, দ্বিতীয় তাকবীরে পড়তে হবে দরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরে মৃতের জন্যে দু'আ করতে হবে এবং চতুর্থ তাকবীরে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! এর পুণ্য হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এর পরে আমাদেরকে ফিৎনায় ফেলবেন না।"

১. এর ইসনাদ উত্তম, সবল ও সঠিক।

নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের এক ব্যক্তির উক্তি হলো এই যে, জানাযার নামাযের মাসনূন তরীকা হলোঃ ইমাম সাহেব তাকবীর পড়ে আস্তে আস্তে সূরায়ে ফাতেহা পড়বেন। তারপর নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবেন এবং মৃতের জন্যে আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবেন এবং তাকবীরগুলোতে কিছুই পড়বেন না। তারপর চুপে চুপে সালাম ফিরাবেন।[১]

ঈদের নামাযের পূর্বে হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাঃ) হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এবং হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। এসে তিনি বলেনঃ "আজ তো ঈদের দিন। বলুন তো তাকবীরের নিয়ম কি?" উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "তাকবীরে তাহরীমা বলে আল্লাহর প্রশংসা করবে ও নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়বে। তারপর দু'আ করবে। এপর তাকবীর বলে এটাই করবে, আবার তাকবীর বলে এটাই করবে, পুনরায় তাকবীর বলে এটাই করবে, আবার তাকবীর বলে এটাই করবে। এরপর কিরআত পড়বে। তারপর তাকবীর পাঠ করে রুকূ' করবে। তারপর দাঁড়িয়ে পাঠ করবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করবে ও নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়বে। এরপর দু'আ করবে ও তাকবীর দিবে এবং এভাবে আবার রুকূ'তে যাবে।" হযরত হুযাইফা (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসাও (রাঃ) তাঁর কথা সত্যায়িত করেন।

নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের সাথে দু'আ শেষ করতে হবে। এটা মুস্তাহাব। হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে রুদ্ধ থাকে যে পর্যন্ত না তুমি তোমার নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ কর।"[২]

রাযীন ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর কিতাবে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে রুদ্ধ থেকে যায় যে পর্যন্ত না আমার উপর দরূদ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে আরোহীর পানপাত্রের মত করো না। তোমরা দু'আর প্রথমে, শেষে ও মধ্যে আমার উপর দরূদ পাঠ করো।"

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেছেনঃ "তোমরা আমাকে সওয়ারের পেয়ালার মত করো না। যখন সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো গ্রহণ করে তখন পানপাত্রটিও পূর্ণ করে থাকে। অযুর প্রয়োজন হলে তা থেকে অযু করে, পিপাসা পেলে তা হতে পান করে, অন্যথায় ফেলে দেয়। তোমরা দু'আর শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করে নিবে।"[৩] বিশেষ করে দু'আয়ে কুনূতে এর খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

---

১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটি গারীব বা দুর্বল হাদীস।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেনঃ "আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিয়েছেন যা বেতরের নামাযে পড়ে থাকি। সেগুলো হলোঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَآ اَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও হিদায়াত দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপদে রেখেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপদে রাখুন, যাদের আপনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তাদের মধ্যে আমারও কর্ম সম্পাদন করুন, আমাকে আপনি যা দিয়েছেন তাতে আমার জন্যে বরকত দান করুন, আপনি যে অমঙ্গলের ফায়সালা করেছেন তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ফায়সালা করেন এবং আপনার উপর ফায়সালা করা হয় না। নিশ্চয়ই যাকে আপনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যার সাথে আপনি শত্রুতা রাখেন সে সম্মান লাভ করে না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কল্যাণময় এবং সমুচ্চ।" সুনানে নাসাঈতে এর পরে রয়েছেঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ

অর্থাৎ "নবী (সঃ)-এর উপর আল্লাহ দরূদ নাযিল করুন।"

জুমআর দিনে ও রাত্রে নবী (সঃ)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। হযরত আউস ইবনে আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বোত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এদিনেই হযরত আদম (রাঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়, এই দিনেই তাঁর রূহ কবয করা হয়। এই দিনেই শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই সবাই অজ্ঞান হবে। সুতরাং তোমরা এই দিনে খুব বেশী বেশী আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দরূদ আমার উপর পেশ করা হয়।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনাকে তো যমীনে দাফন করে দেয়া হবে, সুতরাং এমতাবস্থায় কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার উপর পেশ করা হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর নবীদের দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।"[১]

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জুমআর দিন তোমরা খুব বেশী বেশী দরূদ পড়বে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবি দাঊদ, সুনানে নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ঐ দিন ফেরেশতা হাযির হন। যখন কেউ আমার উপর দরূদ পড়ে তখন তার দরূদ আমার উপর পেশ করা হয় যে পর্যন্ত না সে এর থেকে ফারেগ হয়।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "মৃত্যুর পরেও কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীদের দেহকে খাওয়া যমীনের উপর হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবীরা জীবিত থাকেন এবং তাঁদেরকে আহার্য পৌঁছানো হয়।"[১]

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জুমআর দিনে ও রাত্রে আমার উপর খুব বেশী বেশী দরূদ পড়বে।"[২]

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, যাঁর সাথে রূহুল কুদুস (হযরত জিবরাঈল আঃ) কথা বলেছেন তাঁর দেহ যমীনে খায় না।[৩]

আর একটি মুরসাল হাদীসেও জুমআর দিনে ও রাত্রে খুব বেশী করে দরূদ পাঠের হুকুম রয়েছে।

অনুরূপভাবে খতীবের উপর দুই খুৎবায় দরূদ পাঠ ওয়াজিব। এটা ছাড়া খুৎবা শুদ্ধ হবে না। কেননা, এটা ইবাদত এবং ইবাদতে আল্লাহর যিকর ওয়াজিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যিকরও ওয়াজিব হবে। যেমন আযান ও নামায। ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব এটাই।

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কবর যিয়ারত করার সময়ও তাঁর উপর দরূদ পাঠ মুস্তাহাব। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমাদের কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করে তখন আল্লাহ আমার উপর রূহ ফিরিয়ে দেন, শেষ পর্যন্ত আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি।"[৪]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে নেবে না এবং আমার কবরে মেলা বসাবে না। হ্যাঁ, তবে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে থাকে।"[৫]

---

১. এ হাদীসটি আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব এবং ছেদ কাটা। এসব ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

২. এ হাদীসটিও দুর্বল।

৩. এ হাদীসটি মুরসাল।

৪. ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নববী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

৫. এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক প্রত্যহ সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রওযা মুবারকের উপর আসতো এবং তাঁর উপর দরূদ পাঠ করতো। একদা তাকে হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বললেনঃ "তুমি এরূপ কর কেন?" সে উত্তরে বললোঃ "নবী (সঃ)-এর উপর সালাম পাঠ আমি খুব পছন্দ করি।" তখন তিনি লোকটিকে বললেন, তাহলে শুন, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি আমার পিতা হতে এবং তিনি আমার দাদা হতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। নিজেদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিয়ে নিয়ো না। যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকবে। ঐ দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে যায়।"[১]

অন্য সনদে এ রিওয়াইয়াতটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে যাতে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কবরের পার্শ্বে কতকগুলো লোককে দেখে তাদেরকে এই হাদীসটি শুনিয়েছিলেন এবং তাঁর কবরে মেলা বসাতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। খুব সম্ভব, লোকগুলোর বেআদবীর কারণেই তিনি তাদেরকে হাদীসটি শুনিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এটা শুনানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তারা হয়তো উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করছিল।

এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি একটি লোককে দিনের পর দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রওযা মুবারকের পার্শ্বে আসতে দেখে তাকে বলেনঃ "তুমি এবং যে ব্যক্তি স্পেনে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করার দিক দিয়ে উভয়েই সমান।"

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।"[২]

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "এটা একটা বিশেষ গোপনীয় বিষয়। যদি তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে তবে আমি বলতাম না। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত রেখেছেন। যখন কোন মুসলমানের সামনে আমার যিকর করা হয় এবং

১. এ হাদীসটি কাযী ইসমাঈল ইবনে ইসহাক (রঃ) স্বীয় কিতাব 'ফাযলুস সলাতে আলান্ নাবিয়্যি (সঃ)'-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদে একজন বর্ণনাকারী সন্দেহযুক্ত রয়েছে যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে তখন ঐ ফেরেশতা দু'জন বলেনঃ "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন!" তখন আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা ঐ দু'জন ফেরেশতার এ কথার জবাবে 'আমীন' বলেন।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর যেসব ফেরেশতা যমীনে চলাফেরা করেন তাঁরা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন।"[২]

একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে আমার কবরের পার্শ্বে আমার উপর সালাম পাঠ করে আমি তার ঐ সালাম শুনে থাকি এবং যে দরূদ ও সালাম পাঠায়, আমার কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।"[৩]

আমাদের সাথীরা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বেঁধেছে সে যখন তালবিয়া বা 'লাব্বায়েক' পাঠ হতে ফারেগ হবে তখন তারও উচিত নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা। মুহাম্মাদ ইবনে আবি কবর (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যখন তালবিয়া পাঠ হতে ফারেগ হবে তখন সর্বাবস্থায় তাকে নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪]

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "যখন তোমরা মক্কায় পৌঁছবে তখন সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে ও মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত নামায পড়বে। তারপর 'সাফা' পাহাড়ের উপর উঠবে যেখান থেকে তোমরা বায়তুল্লাহকে দেখতে পাবে, সেখানে সাতবার তাকবীর পাঠ করবে যার মাঝে আল্লাহর উপর হামদ ও সানা এবং নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে ও নিজের জন্যে দু'আ করবে। মারওয়া পাহাড়েও অনুরূপ কাজ করবে।"[৫] আমাদের সাথীরা একথাও বলেছেন যে, কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়ও আল্লাহর যিক্‌রের সাথে নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পড়া মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ "এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"(৯৪ ঃ ৪)

জমহূর এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, এখানে শুধু আল্লাহর যিকরই যথেষ্ট। যেমন আহারের সময়, সহবাসের সময় ইত্যাদি। এই সময়গুলোতে দরূদ পাঠ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১. এ হাদীসটিও ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই দুর্বল এবং সনদও দুর্বল।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।
৩. সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান সুদ্দী সাগীর পরিত্যক্ত।
৪. এটা ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ও ইমাম দারে কুত্নী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৫. এটা ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ খুবই উত্তম, সুন্দর ও সবল।

অন্য একটি হাদীসঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর সমস্ত নবী ও রাসূলের উপরও দরূদ ও সালাম পাঠ করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমার ন্যায় তাঁদেরকেও প্রেরণ করেছেন।"[১]

কানের টুনটুন শব্দের সময়ও নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

হযরত আবূ রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো কানে যখন টুনটুন শব্দ হবে তখন যেন সে আমাকে স্মরণ করে ও আমার উপর দরূদ পাঠ করে এবং বলেঃ "যে আমাকে মঙ্গলের স্মরণ করেছে তাকেও যেন আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করেন।"[২]

মাসআলাঃ লিখকগণ এটা মুস্তাহাব বলেছেন যে, লিখক যখনই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাম লিখবে তখনই যেন সে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ লিখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার উপর দরূদ লিখে, তার দরূদের সওয়াব ঐ সময় পর্যন্ত জারি থাকে যে সময় পর্যন্ত এ কিতাবখানা বিদ্যমান থাকে।"[৩]

فَصْل বা অধ্যায়ঃ নবীগণ ছাড়া অন্যদের উপর দরূদ পাঠ যদি নবীদের সাথে জড়িত বা মিলিতভাবে হয় তবে তা নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমন পূর্বে বর্ণিত হাদীসে গত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি দরূদ নাযিল করুন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, তাঁর স্ত্রীদের উপর এবং তাঁর সন্তানদের উপর।" হ্যাঁ, তবে শুধু গায়ের নবীদের উপর দরূদ পাঠের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে জায়েয বলেছেন এবং দলীল হিসেবে هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ (৩৩ ঃ ৪৩) এবং اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (২ ঃ ১৫৭) আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিকে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

১. এ হাদীসটি ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদে দুই জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁরা হলেন আমর ইবনে হারূন ও তাঁর শায়েখ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২. এর ইসনাদ দুর্বল এবং এটা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩. বিভিন্ন কারণে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। এমনকি ইমাম যাহাবী (রঃ)-এর শায়েখ এটাকে মাওযূ হাদীস বলেছেন

বাণীকেও দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। যখন তাঁর কাছে কোন কওমের সাদকা আসতো তখন তিনি বলতেনঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর দরূদ নাযিল করুন!" যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, যখন আমার পিতা সাদকার মাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসলেন তখন তিনি বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আবূ আওফা (রাঃ)-এর পরিবারের উপর দরূদ নাযিল করুন।"

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার উপর ও আমার স্বামীর উপর দরূদ পাঠ করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى زَوْجِكِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর রহমত নাযিল করুন।"

কিন্তু জমহূর উলামা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, স্বতন্ত্রভাবে গায়ের নবীদের উপর দরূদ পাঠ জায়েয নয়। কেননা এর ব্যবহার নবীদের জন্যে এতো বেশী প্রচলিত যে, এটা শুনা মাত্রই যমীনে এই খেয়াল জেগে ওঠে যে, এ নাম কোন নবীরই হবে। সুতরাং এটা গায়ের নবীর জন্যে ব্যবহার না করাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। যেমন আবূ বকর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা আলী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলা ঠিক হবে না, যদিও অর্থের দিক দিয়ে তেমন কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ বলা চলবে না, যদিও মুহাম্মাদও (সঃ) মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। কেননা, এ শব্দগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্যেই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর কিতাব ও সুন্নাতে صَلٰوة শব্দের ব্যবহার গায়ের নবীদের জন্যে এসেছে দু'আ হিসেবে। এ কারণেই আলে আবি আওফাকে এর পরে কেউই এই শব্দগুলোর দ্বারা স্মরণ করেনি। এই পন্থা আমাদের কাছেও ভাল লাগছে। তবে এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কেউ কেউ অন্য একটি কারণও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্যে এই 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা প্রবৃত্তি পূজকদের আচরণ। তারা তাদের বুযর্গদের ব্যাপারেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং তাদের অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ কি পর্যায়ের সে সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে যে, এটা কি তাহরীম না কারাহাতে তানযীহিয়্যাহ? না পূর্ববর্তীদের বিরোধ? সঠিক কথা এই যে, এটা মাকরূহে তানযীহী। কেননা, এটা প্রবৃত্তি পূজকদের রীতি। সুতরাং আমাদের তাদের অনুসারী হওয়া উচিত নয়। আর মাকরূহ তো ওটাই যেটা ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমাদের সাথীরা বলেনঃ নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে এটাই যে, পূর্বযুগীয় মনীষীরা 'সালাত' শব্দটিকে নবীদের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন عَزَّ وَجَلَّ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখন থাকলো সালাম সম্পর্কে কথা। এ সম্পর্কে শায়েখ আবূ মুহাম্মাদ জুওয়াইনী (রঃ) বলেন যে, এটাও صَلٰوة-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং অনুপস্থিতের উপর এটা ব্যবহৃত হয় না। আর যে নবী নয়, বিশেষ করে তার জন্যে এটা ব্যবহার করা চলবে না। সুতরাং আলী (আলাইহিস সালাম) বলা যাবে না। জীবিত ও মৃতদের এটাই হুকুম। হ্যাঁ, তবে যে সামনে বিদ্যমান থাকে তাকে সম্বোধন করে سَلَامٌ عَلَيْكَ বা سَلَامٌ عَلَيْكُمْ অথবা السّلام عليك কিংবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা জায়েয। আর এর উপর ইজমা হয়েছে।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, লেখকদের কলমে আলী আলাইহিস সালাম বা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু লিখিত হয়ে থাকে। যদিও অর্থের দিক দিয়ে এতে কোন দোষ নেই, কিন্তু এর দ্বারা অন্যান্য সাহাবীদের সাথে কিছুটা বেআদবী করা হয়। সমস্ত সাহাবীর সাথেই আমাদের ভাল ধারণা রাখা উচিত। এ শব্দগুলো তাযীম ও তাকরীমের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এ শব্দগুলো তো হযরত আলী (রাঃ)-এর চেয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর জন্যে বেশী প্রযোজ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) ছাড়া আর কারো জন্যে দরূদ পাঠ উচিত নয়। হ্যাঁ, তবে মুসলমান নর ও নারীর জন্যে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) তাঁর এক পত্রে লিখেনঃ "কতক লোক আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া লাভের চিন্তায় লেগে রয়েছে। আর কতক লোক তাদের খলীফা ও আমীরদের জন্যে 'সালাত' শব্দটি ব্যবহার করছে যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ছিল। যখন তোমার কাছে আমার এই পত্র পৌঁছবে তখন তুমি তাদেরকে বলে দেবে যে, তারা যেন 'সালাত' শব্দটি শুধু নবীদের জন্যে ব্যবহার করে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে এটা ছাড়া যা ইচ্ছা প্রার্থনা করে।"[১]

১. ইসমাঈল কাযী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। এটি উত্তম 'আসার'।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যহ সকালে সত্তর হাজার ফেরেশতা এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কবরকে ঘিরে নেন এবং নিজেদের ডানাগুলো গুটিয়ে নিয়ে তাঁর জন্যে রহমতের প্রার্থনা করতে থাকেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত্রে আসেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা দিনে আসেন। এমনকি যখন তাঁর কবর মুবারক ফেটে যাবে তখনও সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকবেন।[১]

ফরা বা শাখা ঃ ইমাম নববী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম এক সাথে পাঠ করা উচিত। শুধু صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ অথবা শুধু عَلَيْهِ السَّلَامُ বলা উচিত নয়। এ আয়াতেও দুটোরই হুকুম রয়েছে। সুতরাং صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا এরূপ বলাই উত্তম।

৫৭-اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

৫৮- وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ ع

৫৭। যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-কে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্যে রেখেছেন লাঞ্ছনা জনক শাস্তি।

৫৮। মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

যারা আল্লাহর আহকামের বিরোধিতা করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত না থেকে তাঁর অবাধ্যতায় চরমভাবে লেগে থাকে এবং এভাবে তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধমক দিচ্ছেন ও ভয় প্রদর্শন করছেন। তাছাড়া তারা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে নানা প্রকারের অপবাদ দেয়। তাই তারা অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা প্রতিমা তৈরীকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা

১. এ হাদীসটিও ইসমাঈল কাযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যুগকে গালি দেয়, অথচ যুগতো আমিই। আমিই তো রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আনয়ন করি।"[১]

ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলতোঃ 'হায়, হায়! কি যুগ এলো! খারাপ যুগের কারণেই আমাদের এ অবস্থা হলো!' এভাবে আল্লাহর কাজকে যুগের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুগকে গালি দেয়। তাহলে যুগের যিনি পরিবর্তনকারী প্রকারান্তরে তাঁকেই গালি দেয়া হলো। হযরত সুফিয়া (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিয়ে করলেন তখন কতগুলো লোক সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথামত এ আয়াত এই ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। তবে আয়াতটি সাধারণ। যে কোন দিক দিয়েই যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দিবে সেই এই আয়াতের মর্মমূলে অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কেননা, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে কষ্ট দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমি আল্লাহকে মাঝে রেখে বলছি যে, আমার পরে আমার সঙ্গীদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। আমাকে ভালবাসার কারণে তাদেরকেও ভালবাসবে। তাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারী মূলতঃ আমার সাথেই শত্রুতাকারী। তাদেরকে যারা কষ্ট দিবে তারা আমাকেও কষ্ট দিবে। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে আল্লাহকে কষ্ট দিলো। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিলো, আল্লাহ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।"[২]

মহান আল্লাহ বলেনঃ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। আল্লাহ তা'আলার এই শাস্তির প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রথমে কাফিররা শামিল ছিল, পরে রাফেযী এবং শীআ'রাও এর অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঐ সাহাবীদের (রাঃ) দোষ অন্বেষণ করতো আল্লাহ যাঁদের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট। কুরআন কারীমে জায়গায় জায়গায় তাঁদের প্রশংসা ও স্তুতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই অনভিজ্ঞ ও স্থূল বুদ্ধির লোকেরা তাঁদের মন্দ বলে ও তাঁদের নিন্দে করে। তারা তাঁদেরকে এমন দোষে দোষারোপ করে যে দোষ তাঁদের মধ্যে মোটেই নেই। সত্য কথা তো এই যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের অন্তর উল্টে গেছে। এজন্যেই তাদের জিহ্বাও উল্টে গেছে। ফলে তারা তাদের দুর্নাম করছে যারা প্রশংসার যোগ্য এবং যারা নিন্দার পাত্র তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেছেন যে, এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গীবত কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তোমার ভাই সম্পর্কে তোমার এমন আলোচনা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে।" আবার প্রশ্ন করা হলোঃ "আমি আমার ভাই সম্পর্কে যা বলি তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে (তাহলেও কি ওটা গীবত হবে)?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তুমি তোমার ভাই সম্বন্ধে যা বললে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থাকে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি তার সম্বন্ধে যা বললে তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় সুদ কোনটি (তা তোমরা জান কি)?" সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।" তখন তিনি বলেনঃ "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় সুদ হলো কোন মুসলমানকে বে-ইজ্জত ও অপদস্থ করা।" অতঃপর তিনি وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا-এ আয়াতটি পাঠ করেন।[২]

٥٩- يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

৫৯। হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٦٠- لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

৬০। মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এরূপ বর্ণনা ইমাম তিরমিযীও (রঃ) করেছেন এবং তিনি এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ৃ

তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো, এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে−

٦١- مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْآ اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝

৬১। অভিশপ্ত হয়ে; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

٦٢- سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

৬২। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনো আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, বিশেষ করে তোমার পত্নীদেরকে ও তোমার কন্যাদেরকে, কারণ তারা সারা দুনিয়ার স্ত্রীলোকদের জন্যে আদর্শ স্থানীয়া, উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী, যে তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদের সারা দেহ আচ্ছাদিত করে নেয়। যাতে মুমিন স্ত্রীলোক এবং অমুসলিম স্ত্রীলোকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবেই যেন আযাদ মহিলা ও দাসীদের মধ্যে পার্থক্য করতে কোন অসুবিধা না হয়।

'জালবাব' ঐ চাদরকে বলা হয় যা স্ত্রীলোকেরা তাদের দো-পাট্টার উপর পরে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তারা যখন কোন কাজে বাড়ীর বাইরে যাবে তখন যেন তারা তাদের দো-পাট্টা মুখের নীচে টেনে দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। শুধুমাত্র চোখ দু'টি খোলা রাখবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে হযরত উবাইদাহ সালমানী (রঃ) স্বীয় চেহারা এবং মাথা ঢেকে ও চক্ষু খুলে রেখে বলেন যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহর يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ উক্তির ভাবার্থ এটাই।"

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, নিজের চাদর দিয়ে গলা ঢেকে নিবে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ "এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আনসারদের মহিলারা যখন বাইরে বের হতেন তখন এতো গোপনীয়ভাবে

চলতেন যে, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। নিজেদের দেহের উপর তাঁরা কালো চাদর ফেলে দিতেন।"[১]

ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যুহরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "দাসীরা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা হোক, তাদেরকেও কি চাদর গায়ে দিতে হবে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "দো-পাট্টা তারা অবশ্যই পরবে, তবে তারা চাদর পরবে না, যাতে তাদের মধ্যে ও স্বাধীন মহিলাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।"[২]

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যিম্মী নারীদের সৌন্দর্য দর্শন করা শুধু ব্যভিচারের ভয়ে নিষিদ্ধ, তাদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে নয়। কেননা আয়াতে মুমিনা নারীদের বর্ণনা রয়েছে।

চাদর লটকানো হচ্ছে আযাদ সতী-সাধ্বী মহিলাদের লক্ষণ, কাজেই চাদর লটকানো দ্বারা এটা জানা যাবে যে, এরা বাজে স্ত্রী লোকও নয় এবং নাবালিকা মেয়েও নয়।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ফাসেক লোকেরা অন্ধকার মদীনার পথে বের হতো এবং নারীদেরকে অনুসন্ধান করতো। মদীনাবাসী ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীর লোক। কাজেই রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো তখন মহিলারা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে পথে বের হতেন। আর দুষ্ট শ্রেণীর লোকেরা এই সুযোগের সন্ধানেই থাকতো। অতঃপর যখন তারা চাদর পরিধানকারিণী মহিলাদেরকে দেখতো তখন বলতো যে, এঁরা আযাদ মহিলা। সুতরাং তারা দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতো। আর যখন ঐ সব মহিলাকে দেখতো যাদের দেহে চাদর থাকতো না তখন তারা বলতো যে, এরা দাসী। তখন তারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

মহান আল্লাহ বলেনঃ অজ্ঞতার যুগে বেপর্দাভাবে চলার যে প্রচলন ছিল, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর আমলকারী হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যদি মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে ও যারা নগরে গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা বিরত না হয় তবে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো এবং তাদের উপর তোমার

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটাও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আধিপত্য বিস্তার করবো। এরপর তারা খুব কম সময়ই মদীনায় অবস্থান করতে পারবে। অতি সত্বরই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যে কয়েক দিন তারা মদীনায় অবস্থান করবে সে কয়েকদিনও তারা কাটাবে অভিশপ্ত অবস্থায়। চারদিক থেকে তাদেরকে ধিক্কার দেয়া হবে। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেনঃ পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। হে নবী (সঃ)! তুমি কখনো আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

٦٣- يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ○

৬৩। লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। তুমি এটা কি করে জানবে যে, সম্ভবতঃ কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?

٦٤- اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ○ۙ

৬৪। আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।

٦٥- خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○ۚ

৬৫। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

٦٦- يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ○

৬৬। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূল (সঃ)-কে মানতাম!

٦٧- وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ○

৬৭। তারা আরো বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

٦٨- رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ○ ع

৬৮। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, লোকেরা তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও তাঁর সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। সূরায়ে আ'রাফেও এই বর্ণনা আছে এবং এই সূরায়ও রয়েছে। সূরায়ে আ'রাফ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের সঠিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছিল না। তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে এটুকু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

অর্থাৎ "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"(৫৪ ঃ ১) আরো বলেনঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থাৎ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।" (২১ঃ ১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ

অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।" (১৬ ঃ ১)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূর করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্যে (পরকালে) প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।

তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। অর্থাৎ সেখান হতে তারা বের হতেও পারবে না এবং নিষ্কৃতিও লাভ করবে না। সেখানে তাদের অভিযোগ শুনবার মত কেউ থাকবে না। সেখানে তাদের জন্যে এমন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবে না যারা তাদেরকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে বা ঐ কঠিন বিপদ হতে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। তাদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা সেদিন আফসোস করে বলবেঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে মানতাম! যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেনঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا- يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا-

অর্থাৎ "যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবেঃ হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে সে তো বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্যে মহা প্রতারক।" (২৫ ঃ ২৭-২৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ-

অর্থাৎ "কখনো কখনো কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো!" (১৫ ঃ ২)

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে ঐ কাফিরদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে, আমাদের নেতারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের কাছে হক ও সত্য আছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, তারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার উপর ছিল। তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। একতো এই কারণে যে, তারা নিজেরা কুফরী করেছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। আর তাদেরকে মহা অভিসম্পাত দিন!

একটি কিরআতে كَبِيْرًا - এর স্থলে كَثِيْرًا শব্দ রয়েছে। দুটোরই ভাবার্থ একই। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে

দিন যা আমি আমার নামাযে পাঠ করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি নিম্নের দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের উপর বহু যুলুম করেছি এবং আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। সুতরাং আপনার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[১] কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, দু'আয় كَثِیْرًا ও كَبِیْرًا এই দু'টি শব্দই মিলিয়ে নেয়া উচিত। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা এটাই যে, কোন সময় كَثِیْرًا বলতে হবে এবং কোন সময় كَبِیْرًا বলতে হবে। যেটা ইচ্ছা সেটাই বলা যাবে কিন্তু দুটোকেই এক সাথে জমা করা যাবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬৯। হে মু'মিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না, তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।

٦٩- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ اٰذَوْا مُوْسٰی فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِیْهًا ؕ

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত মূসা (আঃ) একজন বড় লজ্জাবান লোক ছিলেন।" ইমাম বুখারীও তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'কিতাবুত তাফসীর'-এ কুরআন কারীমের এই আয়াতের ভাবার্থ এভাবেই সংক্ষেপে আনয়ন করেছেন। কিন্তু নবীদের হাদীসগুলোর বর্ণনায় এটাকে দীর্ঘভাবে এনেছেন। তাতে এও রয়েছে যে, তিনি অত্যধিক লজ্জার কারণে নিজের দেহের কোন অংশ কারো সামনে উলঙ্গ করতেন না। বানী ইসরাঈল তাঁকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করলো। তারা গুজব রটিয়ে দিলো যে, তাঁর দেহে শ্বেত-কুষ্টের দাগ রয়েছে অথবা এক শিরার কারণে একটি অণ্ডকোষ বড় হয়ে গেছে বা অন্য কোন রোগ রয়েছে, যার কারণে তিনি এভাবে তাঁর দেহকে ঢেকে রাখেন।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর থেকে এই বদধারণা দূর করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। একদা তিনি নির্জনে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর পরনের কাপড় রেখে দিয়েছিলেন। গোসল শেষ করে তিনি কাপড় নিতে যাবেন এমতাবস্থায় পাথরটি দূরে সরে গেল। তিনি তাঁর লাঠিটি নিয়ে পাথরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পাথরটি দৌড়াতেই থাকলো। তিনিও হে পাথর! আমার কাপড়, আমার কাপড় বলে চীৎকার করতে করতে পাথরের পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করলেন। বানী ইসরাঈলের একটি দল এক জায়গায় বসেছিল। যখন তিনি লোকগুলোর কাছে পৌঁছে গেলেন তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথরটি সেখানে থেমে গেল। তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরে নিলেন। বানী ইসরাঈল তাঁর সমস্ত শরীর দেখে নিলো। যে গুজব তারা শুনেছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (আঃ)-কে মুক্ত করে দিলেন। রাগে হযরত মূসা (আঃ) পাথরের উপর তাঁর লাঠি দ্বারা তিন বার বা চার বার অথবা পাঁচ বার আঘাত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! ঐ পাথরের উপর তাঁর লাঠির দাগ পড়ে গিয়েছিল।"[১] এই بَرَّأَتْ বা মুক্ত করার কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে।

فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) পাহাড়ের উপর গিয়েছিলেন যেখানে হযরত হারূন (আঃ) ইন্তেকাল করেন। জনগণ হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অহেতুক সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো এবং তাঁকে শাসাতে ও ধমকাতে শুরু করলো। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ফেরেশতারা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে বানী ইসরাঈলের একটি মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে চলতে থাকলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাকশক্তি দান করলেন। তিনি প্রকাশ করলেন যে, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর কবরের সঠিক চিহ্ন জানা যায় না। শুধু ঐ পাহাড়টিই তাঁর কবরের স্থানটির কথা জানে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওকে বাকশক্তিহীন করেছেন। তাহলে হতে পারে যে, اِيْذَا বা কষ্ট দেয়া এটাই অথবা হতে পারে যে, اِيْذَا দ্বারা ঐ কষ্টকে বুঝানো হয়েছে যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি বলি যে, এটা এবং ওটা দুটোই উদ্দেশ্য হতে পারে বা এ দু'টো ছাড়া অন্য কষ্টও উদ্দেশ্য হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মধ্যে কিছু বন্টন করেন। একটি লোক বলেঃ "এই বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা হয়নি।" এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "ওরে আল্লাহর শত্রু!

---

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। এই রিওয়াইয়াত বহু সনদে বহু কিতাবে বর্ণিত আছে। কিছু কিছু মাওকুফ রিওয়াইয়াতও রয়েছে।

আমি অবশ্যই তোমার এ কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জানিয়ে দিবো।" সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জানিয়ে দিলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর সদয় হোন! তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ "আমার সাহাবীদের কেউ যেন কারো কথা আমার কাছে পৌঁছিয়ে না দেয়। কেননা, আমি পছন্দ করি যে, কারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই এমতাবস্থায় যেন আমি তোমাদের মধ্যে বের হয়ে আসি।" অতঃপর একবার তাঁর কাছে কিছু মাল আসে। তিনি তা বন্টন করে দেন। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি দু'টি লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করি। তাদের একজন অপরজনকে বলছেঃ "আল্লাহর কসম! এ বন্টনে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের ঘর কামনা করেননি।" এ কথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বলেছেন যে, কেউ যেন কারো কোন কথা আপনার নিকট পৌঁছিয়ে না দেয়। কিন্তু আমি অমুক অমুক দু'টি লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে এরূপ এরূপ কথা বলেছিল।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে যায় এবং এটা তাঁর নিকট খুবই কঠিন বোধ হয়। অতঃপর তিনি বলেনঃ "ছেড়ে দাও, হযরত মূসা (আঃ)-কে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[২]

ঘোষিত হচ্ছেঃ 'মূসা (আঃ) আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান ছিল।' তাঁর দু'আ মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হতো। হ্যাঁ, তবে তিনি আল্লাহকে দর্শনের দু'আ করেছিলেন, তা গৃহীত হয়নি। কেননা, ওটা ছিল মানবীয় শক্তি বহির্ভূত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি তাঁর ভাই-এর নবুওয়াতের জন্যে দু'আ করেছিলেন, সেটাও আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا

অর্থাৎ "আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে নবীরূপে।"(১৯ ঃ ৫৩)

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. হাদীসটি এই ধারায় ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭০। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

٧٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

৭১। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

٧١- يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁকে ভয় করার হিদায়াত করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদত এমনভাবে করে যেন তারা তাঁকে দেখছে এবং তারা সত্য ও সঠিক কথা বলে। তাদের কথায় কোন বক্রতা ও প্যাঁচ না থাকে। যখন তারা অন্তরে তাকওয়া পোষণ করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তখন এর বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন। তাদের সমস্ত গুনাহ তিনি মাফ করে দেন। আর ভবিষ্যতেও ক্ষমার সুযোগ দান করেন, যেন গুনাহ বাকী রয়ে না যায়। আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যই হলো সত্যিকারের সফলতা। এর মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম হতে দূরে থাকে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী হয়।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যোহরের নামায পড়েন। সালাম ফিরানোর পর তিনি আমাদের প্রতি বসার ইঙ্গিত করেন। সুতরাং আমরা বসে পড়ি। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার ও সঠিক কথা বলার নির্দেশ দিই।" তারপর তিনি মহিলাদের নিকট আসেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং সত্য ও সঠিক কথা বলার নির্দেশ দিই।"[১]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরে দাঁড়ালেই আমি তাঁকে বলতে শুনতামঃ “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।”[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যে এতে আনন্দ পায় যে, লোকে তার সম্মান করুক সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।”

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হলো قَوْلٌ سَدِيْدٌ বা সঠিক কথা। অন্য কেউ বলেন যে, سَدِيْدٌ -এর অর্থ হলো সত্যবাদিতা। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, قَوْلٌ سَدِيْدٌ হলো সোজা ও সঠিক কথা। এ সবই قَوْلٌ سَدِيْدٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

৭২। আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং ওতে শংকিত হলো, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করলো, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

٧٢- اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ

৭৩। পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧٣- لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ ع

(৯/৫/৬)

১. এ হাদীসটি ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) কিতাবুত তাকওয়ায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই গারীব বা দুর্বল হাদীস।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে أَمَانَت অর্থ হলো اِطَاعَت বা আনুগত্য। এটা হযরত আদম (আঃ)-এর উপর পেশ করার পূর্বে যমীন, আসমান ও পাহাড়ের উপর পেশ করা হয়। তারা সবাই কিন্তু এই বিরাট দয়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ওটা হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করেন এবং বলেনঃ "ওরা সবাই তো অস্বীকার করলো, এখন তুমি কি বলছো, বল।" হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বললেনঃ "এতে যা রয়েছে তা যদি তুমি মেনে চল তবে তুমি পুণ্য লাভ করবে ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর যদি অমান্য কর তবে শাস্তি পাবে।" তখন হযরত আদম (আঃ) বললেনঃ "আমি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত আছি।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, এখানে আমানত দ্বারা ফারায়েয উদ্দেশ্য। অন্যান্যদের কাছে যে এটা পেশ করা হয়েছিল তা আদেশ পর্যায়ে ছিল না, বরং শুধু তাদের মনোভাব জেনে নেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তাদের অস্বীকৃতি ও অক্ষমতা প্রকাশের কারণে তাদের কোন গুনাহ ছিল না। বরং ওটা তাদের এক ধরনের তা'যীম ছিল। পরিপূর্ণভাবে অনুসরণের ব্যাপারেই তারা কেঁপে উঠেছিল। তারা ভয় করেছিল যে, পূর্ণভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষ অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ আমানত উঠিয়ে নিয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই এটাও বর্ণিত আছে যে, প্রায় আসরের সময় মানুষ এই আমানত উঠিয়ে নিয়েছিল এবং মাগরিবের পূর্বেই ভুল প্রকাশ পেয়েছিল।

হযরত উবাই (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নারীদের সতীত্ব রক্ষাও একটা আমানত। হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, ফারায়েয, হুদূদ ইত্যাদি সবই আল্লাহর আমানত। কারো কারো উক্তিমতে অপবিত্রতার গোসলও আমানত। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন যে, তিনটি জিনিস হলো আল্লাহর আমানত। ওগুলো হলোঃ অপবিত্রতার গোসল, রোযা এবং নামায। ভাবার্থ এই যে, এগুলো সবই আল্লাহর আমানতের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত আদেশ পালন এবং সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা মানুষের দায়িত্ব। যে ঐ দায়িত্ব পালন করবে সে সওয়াব পাবে এবং যে পালন করবে না সে পাপী হবে এবং শাস্তি পাবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ চিন্তা করে দেখো, আসমান নিরাপদ, সুন্দর এবং সৎ ও নিষ্পাপ ফেরেশতাদের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আমানত উঠাতে সাহস করেনি। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে, ঐ আমানত

রক্ষায় অপারগ হলে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। যমীন অত্যন্ত শক্ত, দীর্ঘ ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ আমানত বহনের ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল এবং বিনীতভাবে নিজের অক্ষমতা ও অপাগরতার কথা জানিয়ে দিলো। পাহাড় স্বীয় উচ্চতা, দৃঢ়তা ও কাঠিন্য সত্ত্বেও আমানতের ব্যাপারে কেঁপে উঠলো এবং নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলো।

মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, আসমানসমূহ উত্তরে বলেছিলঃ "আমরা তো এমনিতেই আপনার বাধ্য। কিন্তু এটা বহনের শক্তি আমাদের নেই। কেননা এতে অকৃতকার্য হলে বড় রকম বিপদের আশংকা রয়েছে।" তারপর মহান আল্লাহ যমীনকে বললেনঃ "তুমি যদি এটা পূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে পার তবে আমি তোমাকে দয়া, অনুগ্রহ ও দানে ভূষিত করবো।" সে উত্তর দিয়েছিলঃ "আমি তো সবকিছুতেই আপনার অনুগত। আপনি যে আদেশই আমাকে করেন আমি তা পালন করে থাকি। কিন্তু এটা আমার সাধ্যের অতিরিক্ত।" অতঃপর পাহাড়কে বলা হলে সেও উত্তরে বলেঃ "আমি তো আপনার অবাধ্য নই। কথা হলো এই যে, যদি আমানত আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তবে তা আমি অবশ্যই উঠিয়ে নিবো, কিন্তু আসলে এটা বহনের ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং এটা হতে আমাকে অব্যাহতি দান করা হোক।" অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-কে বলা হলো তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ! যদি আমি এটা পূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে পারি তবে কি পাবো?" উত্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "তাহলে তুমি অতি সম্মানের স্থান জান্নাত লাভ করবে। তুমি দয়া ও অনুগ্রহে ভূষিত হবে। আর যদি তুমি অবাধ্য হও তবে এই অবাধ্যতার কারণে তোমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।" তিনি তখন বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি এটা গ্রহণ করে নিলাম।"

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আসমান উত্তরে বলেছিলঃ "হে আল্লাহ! আমি তারকামণ্ডলীকে স্থান এবং ফেরেশতাদেরকে জায়গা দিয়েছি, কিন্তু আমি এ দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। এতো ফরযসমূহের ভার। এটা বহনের শক্তিই তো আমার নেই।" যমীন বলেছিলঃ "হে আল্লাহ! আমার উপর আপনি গাছপালা লাগিয়েছেন, সাগর জারি করেছেন, মানুষকে স্থান দিয়েছেন। এগুলো আমি বহন করেই চলেছি। কিন্তু এখন যে আমানতের দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করতে চাচ্ছেন, এটা বহন করা আমার সাধ্যের অতীত। আমি সওয়াবের আশায় আযাবের সম্ভাবনা কাঁধে নিতে পারবো না।" পাহাড়ও এ ধরনেরই জবাব দিলো। কিন্তু মানুষ ঐ দায়িত্বভার গ্রহণ করে নিলো।

কোন কোন রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা তিন দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকে ও নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু মানুষ ওটাকে কাঁধে উঠিয়ে নেয়। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করে বলেনঃ "শুনো, যদি

তোমার নিয়ত ভাল হয় তবে আমার সাহায্য সদা তোমার উপর থাকবে। তোমার চোখের দু'টি পলক করে দিবো। আমার অসন্তুষ্টির জিনিস হতে তোমার চোখ দু'টি হেফাজত করবে। তোমার মুখে আমি দু'টি ঠোঁট বানিয়ে দিচ্ছি। সে আমার মর্জির বিপরীত কিছু বলতে চাইলে ওকে বন্ধ করে দিবে। তোমার লজ্জাস্থানের হিফাজতের জন্যে আমি পোশাকের ব্যবস্থা করছি। আমার মর্জির বিপরীত তুমি ওটা খুলবে না।"

যমীন ও আসমান সওয়াব ও আযাবকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকলো। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করে নিলো।

একটি খুবই গারীব বা দুর্বল মারফূ' হাদীসে আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমানত ও অফা মানুষের উপর নবীদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর কালাম নবীদের মুখ হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। নবীদের ভাষার মাধ্যমে তারা ভাল-মন্দ সবকিছু জানতে পেরেছে। প্রত্যেকই পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। জেনে রেখো যে, আমানতই হলো সর্বপ্রথম জিনিস যা উঠানো হয় এবং মানুষের অন্তরে এর লক্ষণ বাকী রয়েছে। তারপর উঠানো হয় অফা, আহাদ বা অঙ্গীকার ও যিম্মাদারী। কিতাবসমূহ তাদের হাতে রয়েছে। আলেমরা আমল করছে। আর অজ্ঞরা জানছে, কিন্তু না জানার ভান করছে। এখন এই আমানত এবং অফা আমি পর্যন্ত ও আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাকেই ধ্বংস করেন যে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে। তারা উদাসীনতায় লিপ্ত থাকে। হে লোক সকল! তোমরা সাবধান হয়ে যাও, ভাল হয়ে চল, শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে, তোমাদের মধ্যে ভাল আমলকারী কে?"

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন ঈমানসহ পাঁচটি জিনিস যে নিয়ে আসবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিফাজত করবে, ওগুলোর অযূ, রুকূ', সিজদা ও সময়সহ আদায় করবে আর খুশী মনে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের মালের যাকাত দিবে, অতঃপর তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! মুমিন ছাড়া এটা কেউ করতে পারে না এবং আমানত আদায় করে।" জনগণ প্রশ্ন করলেনঃ "হে আবূ দারদা (রাঃ)! আমানত আদায় করা কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অপবিত্রতার গোসল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে রক্ষার ব্যাপারে আদম সন্তানকে এর চেয়ে বড় আমানত আর কিছু দেননি।"

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে জীবন দান সমস্ত পাপ মুছে ফেলে। কিন্তু আমানতের খিয়ানতকারীকে ক্ষমা করা হয় না। খিয়ানতকারীকে কিয়ামতের দিন আনয়ন

করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবেঃ "তোমার আমানত আদায় কর।" সে উত্তর দিবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! কোথা হতে এবং কি করে আদায় করবো, দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে।" তিনবার তাকে এ কথা বলা হবে এবং তিনবারই সে এই ধরনের উত্তর দিবে। অতঃপর আদেশ করা হবেঃ "একে হাবিয়া জাহান্নামে নিয়ে যাও।" ফেরেশতারা তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সে একেবারে তলদেশে পৌঁছে যাবে। অতঃপর সেখানে ঐ আমানতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত আগুনের জিনিস তার দৃষ্টিগোচর হবে। ওটাকে সে উপরের দিকে উঠাতে থাকবে। যখন জাহান্নামের ধারে পৌঁছবে তখন তার পা পিছলে যাবে এবং আবার নীচে পড়ে যাবে। আবার জাহান্নামের তলদেশে চলে যাবে। পুনরায় উঠবে এবং পুনরায় পড়বে। চিরকাল সে ঐ শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে।

অযু এবং নামাযেও আমানত আছে। কথা-বার্তার মধ্যেও আছে আমানত। সবচেয়ে বড় আমানত ঐ জিনিসগুলোতে রয়েছে যেগুলো আমানত হিসেবে কারো কাছে রাখা হয়। হযরত বারা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলোঃ "আপনার ভাই আবদুল্লাহ (রাঃ) কি হাদীস বর্ণনা করলেন তা কি আপনি শুনলেন না?" তিনি উত্তরে বললেন যে, তিনি সত্য বলেছেন।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্যে অপেক্ষা করছি। প্রথম এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমানত মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।" অতঃপর তিনি আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে বলেনঃ "মানুষ শয়ন করবে এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানত উঠে যাবে। এমন একটি দাগ থেকে যাবে যা দেখে মনে হবে যেন কোন জ্বলন্ত কাঠ তার পায়ে লেগে আছে এবং এর ফলে তার পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। আর ওটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। কিন্তু তার ভিতরে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর তিনি একটি কংকর নিয়ে নিজ পায়ে চেপে দিয়ে লোকদেরকে তা দেখিয়ে দিলেন যে, এইভাবে জনগণ লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার থাকবে না। এমন কি এটা মশহূর হয়ে পড়বে যে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার লোক রয়েছে এবং এতদূর পর্যন্ত বলা হবে যে, এ লোকটি কতই না জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বিদ্বান ও বিচক্ষণ! অথচ তার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না।[১]

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ "দেখো, ইতিপূর্বে তো আমি অনেককেই ধার কর্জ দিতাম এবং অনেকের নিকট হতে ধার নিতাম। কেননা, সে মুসলমান হলে তো আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়ে যাবে। আর সে ইয়াহূদী বা খৃষ্টান হলে ইসলামী

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

শাসন তার নিকট হতে আমাকে আমার প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিবে। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু অমুক অমকুকে ধার কর্জ দিয়ে থাকি এবং বাকী সবাইকে ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন চারটি জিনিস তোমার মধ্যে থাকবে তখন সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। সেগুলো হলো ঃ আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, চরিত্র ভাল হওয়া এবং খাদ্য পবিত্র ও হালাল হওয়া।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) কিতাবুয যুহদে বলেছেন যে, একদা খাননাস ইবনে সাহীম অথবা জিবিল্লাহ ইবনে সাহীম (রঃ) যিয়াদ ইবনে হাদীর (রঃ)-এর সাথে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়ঃ "আমানতের কসম!"এ কথা শুনে হযরত যিয়াদ (রঃ) কাঁদতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি কাঁদতে থাকেন। তখন ইবনে সাহীম (রঃ) ভয় পেলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে খুব কঠিন কথা বের হলো না কি! তাই তিনি বলেনঃ "তিনি কি ওটাকে মন্দ জানতেন?" উত্তরে হযরত যিয়াদ (রঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, হযরত উমার (রাঃ) এটাকে খুবই মন্দ জানতেন এবং এটা হতে নিষেধ করতেন।"

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে আমানতের কসম খায় সে আমাদের মধ্যে নয়।"[৩]

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হযরত আদম (আঃ) যা করলেন এবং পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী অর্থাৎ যারা বাহ্যিক মুসলমান এবং ভিতরে কাফির ছিল, আর যারা বাইরে ও ভিতরে উভয় ক্ষেত্রেই কাফির ছিল, তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে। যারা আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে এবং তাঁর রাসূলদেরকে মেনে চলতো এবং তাঁর আনুগত্য করতো সঠিকভাবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

সূরা ঃ আহযাব এর তাফসীর সমাপ্ত

---

১. এটা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش